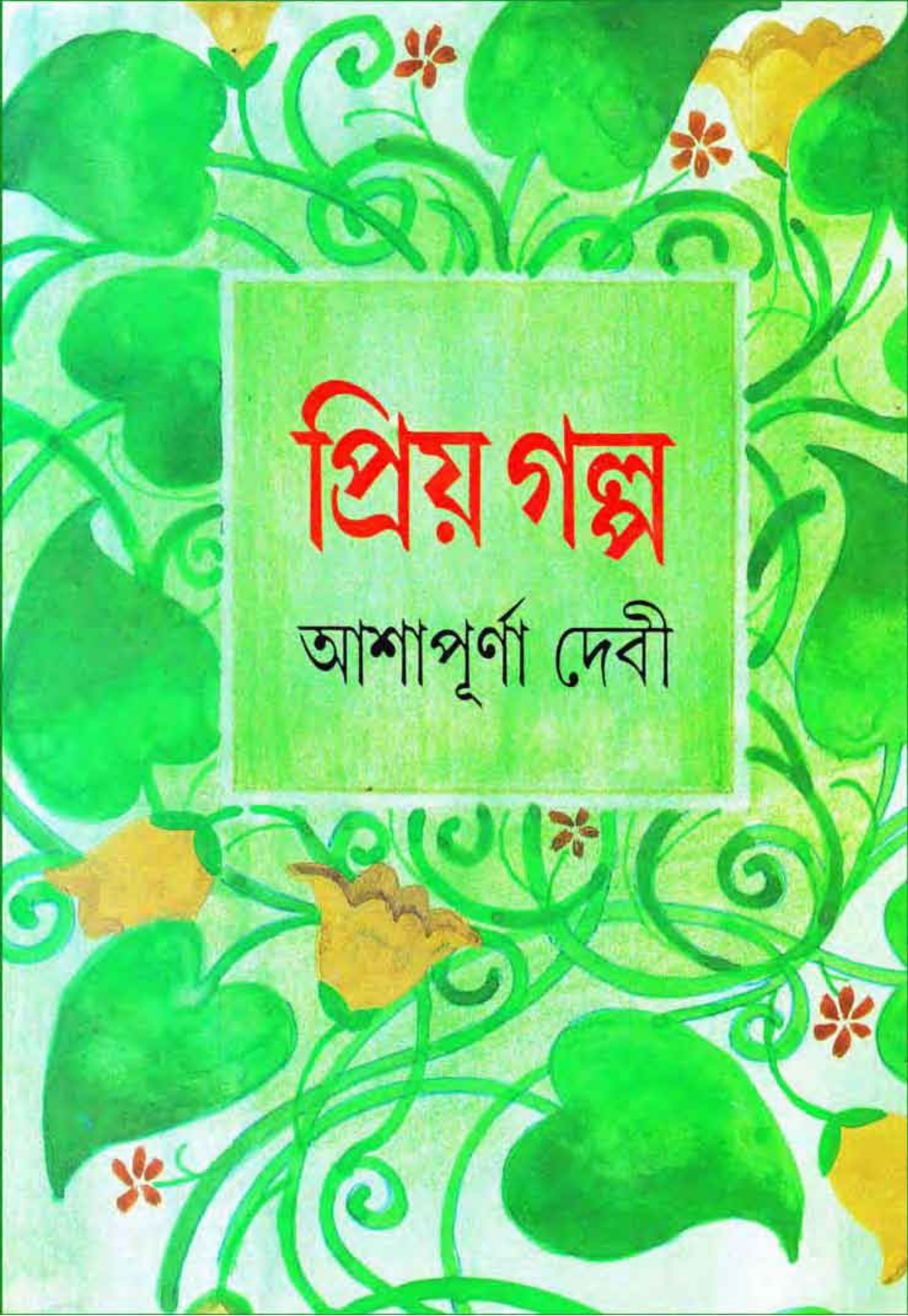
প্রিয় গল্প
আশাপূর্ণা দেবী

প্রিয় গল্প

~ www.amarboi.com ~

সাহিত্যম্ প্রকাশিত লেখিকার অন্যান্য বই

কল্যাণী
দ্বিতীয় অদ্বিতীয়
আশাপূর্ণা-বীথিকা
তিন প্রহর
নক্ষত্রের আকাশ (গল্প)
ত্রিমাত্রিক

~ www.amarboi.com ~

প্রিয় গল্প

আশাপূর্ণা দেবী

সাহিত্যম্ ॥ ১৮বি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

~ www.amarboi.com ~

আশাপূর্ণা দেবীর ছোটগল্প যাঁদের প্রিয়
তাঁদের উদ্দেশে

~ www.amarboi.com ~

ভূমিকা

সাহিত্যের কলাকৌশল, বিচার ও লেখক পাঠকের সম্পর্কের বৈপ্লবিক ধারাটির সূত্রপাত বর্তমান শতকের শুরু থেকে, অথবা বলা যায় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ থেকে। কোনও তথাকথিত পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে নয়, স্বাভাবিক অভিজ্ঞতার ফল হিসেবেই আশাপূর্ণা দেবীর লেখক-পাঠক সম্পর্কে একটি ছোট্ট বক্তব্য উপরোক্ত পরিপ্রেক্ষিতটিকে মনে পড়িয়ে দেয়। নিজের একটি গল্প সংকলনের ভূমিকায় তিনি বলেছেন, "ভূমিকা যদি হয় পাঠকের মনের ভূমি প্রস্তুত"...তাহলে "ছোট গল্পের বইয়ের জন্যে ভূমি তৈরীর কাজ লেখকের নয় পাঠকের।" অর্থাৎ গল্পের মেজাজে আর পাঠকের মনের মেজাজে মিল ঘটানোর জন্যে লেখকের কোনও প্রচেষ্টা অবান্তর।

"সাহিত্যম্" তাঁদের 'প্রিয় গল্প' সিরিজে আশাপূর্ণা দেবীর একটি সংকলন প্রকাশের যখন প্রস্তাব করেন তখন সেই সঙ্গে আমাদের দায়িত্বও দেন গল্পগুলি নির্বাচন করার। লেখিকার পুত্র ও পুত্রবধূ হিসেবে তাঁদের এই অনুরোধ আমাদের কাছে ছিল খুবই আনন্দের। কিন্তু গল্প নির্বাচনের ব্যাপারে আমরা কিছু প্রশ্ন ও সমস্যার সম্মুখীন হই। সেই কারণেই এই ভূমিকা।

প্রথমতঃ এই গল্প বাছাই-এর কাজটি লেখকই সাধারণতঃ করে থাকেন যা আর সম্ভব নয়। দ্বিতীয়তঃ 'প্রিয় গল্প' কোন্‌গুলিকে বলা যেতে পারে? পাঠকের প্রিয় না লেখকের? বহু-পঠিত ও বহু-প্রশংসিত গল্পগুলি কি সাজানো হবে এই সংকলনে? যেসব গল্প পাঠকদের মনে নানান প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে সেইসবগুলি অন্তর্ভুক্ত করতে পারলে হয়তো কাজটি সহজ হতো। কিন্তু আমাদের মনে হলো এখানে ভাবা উচিত লেখিকা জীবিত থাকলে কি চিন্তা করতেন? কারণ তাঁর মানসিকতায় একাত্ম হয়ে এই নির্বাচন হওয়া উচিত। এই ব্যাপারে তাঁর একটি উক্তি নজরে আসায় স্বস্তি পাওয়া গেল। তিনি মন্তব্য করেছেন—"একই গল্প একাধিক গ্রন্থে রাখার পক্ষপাতী আমি নই" ; "একাধিকবার পড়া গল্পগুলি তো আর নতুন স্বাদ আনতে পারে না।"—

সেই অনুযায়ী নির্বাচিত গল্পগুলি সবই নতুন, ইতিপূর্বে অন্য কোনও গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়নি। বাছাই করা হয়েছে বিভিন্ন পত্রিকার পাতা থেকে যেগুলির

~ www.amarboi.com ~

প্রকাশ সময় বাংলার সত্তর দশক থেকে নব্বুইয়ের দশক। বৈচিত্রের কারণে লেখিকার কয়েকটি কৌতুকগল্পও সংযোজিত হলো।

ছোটগল্প সংকলন সাধারণভাবে আমাদের বিভিন্ন অনুভূতিকে উজ্জীবিত করতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন হলো লেখিকার এই বিচিত্র অনুভূতির উৎস কোথায়? সে প্রশ্নের জবাবেও লেখিকার নিজস্ব মন্তব্যেরই শরণ নিতে হয়—" চিরদিনঃ আমার লেখার উপজীব্য গৃহগন্ডীবদ্ধ কিছু সাধারণ মানুষ...তাই এইসব গল্পের কাঠামোয় গল্প জিনিসটা স্বল্পই আছে। আছে শুধু ওই সাধারণ মানুষদের অতিসাধারণ জীবন কথা।"

"কিন্তু সত্যিই কি নেহাৎই সাধারণ?...অন্তরালেও কি অন্য এক জীবনলীলা বহে চলছে না? সেখানে কত বিচিত্র রং, বিচিত্র স্বাদ। কত বৈচিত্র্য আর জটিলতা, বিশালতা আর ক্ষুদ্রতার কত টানা-পোড়েন...।"

লেখিকার কথায় "ছোট গল্পের আস্বাদ গ্রহণের জন্য মনের একটি বিশেষ মেজাজের দরকার। ভারী সারি উপন্যাসের মত চমক লাগানো কোন নতুন মতবাদে, অথবা চমকপ্রদ কোন কাহিনীর অবতারণায় পাঠকের ছড়ানো ছিটোনো মনকে আয়ত্তে এনে সেখানে জাঁকিয়ে বসবার মতো জোরালো জোর ছোটগল্পের নেই। এ শুধু হঠাৎ মনের কোন একটি তার ছুঁয়ে যায়। হঠাৎ ঘরের কোন একটি জানলা খুলে দিয়ে যায়।" "একটি তুচ্ছতম ঘটনা...একটি জলবিম্বর উপর এসে পড়া চকিত একটি সূর্যালোক—এইটুকুই তো ছোটগল্পের উপাদানের পুঁজি।"

গল্পগুলি নির্বাচনে যদি পাঠকের প্রিয়ত্বের দাবী মেটে তাহলে এই সংকলন সার্থক হবে। আমরাও নিজেদের ধন্য মনে করবো। আবারও লেখিকার উক্তিরই পুনরাবৃত্তি করে এই ভূমিকা শেষ করছি—"ছোট গল্পের বইয়ের জন্য ভূমিকা তৈরীর কাজ লেখকের নয় পাঠকের।" সুতরাং "প্রিয় গল্প" গুলি পাঠক মনে কতটা নাড়া দিতে পারল তা পাঠকদের রসবোধের বিচারেই পেশ করা হলো।

১৭, কানুনগো পার্ক — নূপুর গুপ্ত
গড়িয়া, কলিকাতা-৭০০০৮৪ — সুশান্ত কুমার গুপ্ত

~ www.amarboi.com ~

সূচীপত্র

'সুখ সুখ' মুক্তো ❑ ৯
উদঘাটন ❑ ২৭
নাম ভূমিকায় ❑ ৩৫
ঝাঁকুনি ❑ ৪৪
প্রতারক প্রতারণা ❑ ৪৯
পাতাচাপা ❑ ৫৭
ঋণশোধ ❑ ৬৭
সৌরভসার ❑ ৭৫
চোখের চামড়া ❑ ৯২
আলো আগুন ছায়া ❑ ৯৯
অক্ষয়ঘট ❑ ১০৯
দৃষ্টিভঙ্গী ❑ ১১৭
বুভুক্ষু ❑ ১২৪
প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ ❑ ১৩৩
বেহায়া ❑ ১৪৯
প্রার্থনা ❑ ১৬২
চাপরাশী ❑ ১৭০
পুতুলের ছাঁচ ❑ ১৭৯
আদি অন্তকালের ❑ ১৮৭
পরাজিত ❑ ১৯৫
অহমিকা ❑ ২০৬
ঈর্ষা ❑ ২২১
স্বর্গমর্ত্য ❑ ২২৭
ক্ষমতার উৎস ❑ ২৩৫
পকেটমার ❑ ২৪৩
এক পালকের পাখি ❑ ২৫২
ঘটনার নেপথ্যে ❑ ২৬৩
সম্মানের ঘর ❑ ২৮৪

~ www.amarboi.com ~

‘সুখ সুখ’ মুক্তো

আকাশে মাথা তুলে দাঁড়ানো এই বিশাল প্রাসাদখানায় অনেক লোকের বাস। তবে রাজারাজড়াদের আকাশচুম্বি প্রাসাদের মত একনায়ক আধিপত্যের ব্যাপার যে নেই এখানে, তা সকলেই জানে।

আজকাল বড় বাড়ি মানেই তো ছোট বাড়ি। ছোট পরিবার। যার অর্থ সুখে মগ্ন পরিবার। এই বিশাল বাড়িখানার নামও তাই ‘সুখনীড়’।

এই সুখনীড় যেন একটি সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান। এখানে যাকে বলে, নানা ভাব নানা ভাষা, নানা পরিধান! তবে এই বিবিধের মাঝে কোন মহান মিলনের পরিচয় পরিস্ফুট নয়।

কে কার কড়ি ধারে?

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে নামতে যার সঙ্গে যার যেটুকু দেখা হয়ে যায়। সেও প্রধানতঃ প্রবণতা অপর পক্ষের ছায়া বাঁচিয়ে দৃষ্টি এড়িয়ে পাশ কাটিয়ে নেমে পড়া অথবা উঠে পড়া।

বারে বারে দেখার সূত্রে মোটামুটি একটু মুখ চেনা হয়ে যায়, কাজেই দৈবাৎ—সরাসরি চোখাচোখি হয়ে গেলে একটু একটু সৌজন্য হাসির বিনিময়, একটু ঘাড় নাচিয়ে ইসারায় প্রশ্ন—ভাল তো?...এই পর্যন্ত।

মোটামুটি এই।

তবে ওরই আড়ালে অন্তরালে স্বেচ্ছাকৃত দৃষ্টিবিনিময় পাশ কাটাবার বদলে, পাশ ঘেঁষে ওঠা বা নামার কৌশল এবং নামা ওঠার সময়টাকে একটু ছন্দ-বদ্ধ করে রাখার চেষ্টা, এসব কি আর হয় না? হয় নিশ্চয়ই কিন্তু সে খবর অসীমার গোচরে যে কী ভাবে এসে যায়, সুব্রত জানে না।

অসীমা যখন সুব্রতকে জ্ঞান দিতে আসে অজ্ঞান সুব্রত অবাক হয়ে ভাবে এত খবর অসীমা রাখে কী করে?

অথচ অসীমা তো ঘোরতর একটি কর্মী মহিলা। তার মহিলা সমিতি (লম্বা-চওড়া একটা নাম অবশ্য আছে ডজন দুই লেটার সম্বলিত) দক্ষিণ কলিকাতায় একটি বিশেষ নাম। যথার্থ সমাজসেবী বলে খ্যাতি আছে এ সমিতিটির।

সুব্রত অসীমার গুণগরিমায় মুগ্ধ, তবে ওর বেশি নয়। কী কী কাজকর্ম হয় ওদের, সপ্তাহে সপ্তাহে কিসের অধিবেশন হয়, অথবা মাঝে মাঝে কিসের মিটিং, সুব্রত জানে না। সুব্রত জানে ওগুলো সুখে থাকতে ভূতের কীল!

সুব্রত হচ্ছে ওই পাশ কাটানোদের দলে।

~ www.amarboi.com ~

অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে, অনেক চেষ্টা-চরিত্র করে সুব্রত এই সুখনীড় ভবন-এর কোন একটু গভীর খাঁজের মধ্যে একখানি নীড় জোগাড় করে ফেলে এখন বড় আনন্দে আছে।

তবে জোগাড় করে ফেলার ক্রেডিটটা সবটাই অসীমাকে দেওয়া উচিত।

দারুণ করিৎকর্মা মেয়ে অসীমা, নিদারুণ চৌকস!

সুব্রত যে বলে, আমি তো তোমার আগ্রহের আশ্রিত প্রজা, তোমার কৃপাতেই সুখের তরণী ভাসিয়ে তরঙ্গ কেটে বেরিয়ে যাচ্ছি, সেটা ঠাট্টা করে বললেও, প্রকৃত সত্য।

সুব্রতকে তার অফিসের কাজটুকু ছাড়া, আর কিছু তাকিয়ে দেখতে হয়? হয় না।

অথচ এ যুগে জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্যে অনেক কাঠ-খড়েরই তো দরকার? এবং সেই কাঠখড় পোড়াতে দরকার অনেক তেল। সে সবের ধারই ধারতে হয়না সুব্রতকে।

বড় নিশ্চিন্ত সুব্রত।

বড় সুখী!

এই যে এখন?

সুব্রতকে তার অফিসের গাড়িটি নিত্যনিয়মে তার সুখনীড় ভবনের দেউড়ির সামনে ছেড়ে দিয়ে চলে গেল, এরপর আর কী ভাবনা আছে তার?

নাঃ! কোনো ভাবনা নেই। নীড়ে ঢুকে পড়তে পারলেই, হাতের মুঠোয় স্বর্গ।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে থাকে সুব্রত আস্তে আস্তে।

একটু অসুবিধে, সুব্রতর ফ্ল্যাটটা পাঁচতলায়।

তো কী আর করা?

পেয়েছে এই ঢের। পঁচাশি হাজারের মধ্যে এরকম ফ্ল্যাট এখন আর পাবে কেউ? অসীমার প্রবল প্রেরণায় লোন নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তাই।

অবশ্য ফ্ল্যাট কেনার সূচনা থেকেই শোনা গিয়েছে লিফ্‌ট হবে। তার প্ল্যান রয়েছে, জায়গাও ঠিক রয়েছে। তবে কবে হবে সেটা এখন আর কেউ জানে না।

উঁচুতলার বাসিন্দারা তাদের আত্মজনকে গৌরব করে খবরটা পরিবেশন করে বলে, লিফ্‌ট হলেই ব্যস।

তা সেই ভবিষ্যৎ নিকটের স্বপ্ন দেখতে দেখতে সিঁড়ি ভাঙার কষ্টটা যেন কিঞ্চিৎ লাঘব হয়ে যায়।

আবার—

উঠতে উঠতে যখন দেখা যায় সহযাত্রী হঠাৎ গতিছন্দ ভঙ্গ করে পাশের দিকে সরে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে দরজার গায়ে বেলে আঙুলের চাপ দেয় আর টুক করে একটু চিচিংফাঁক হয়ে যাওয়া গহ্বরের মধ্যে ঢুকে পড়ে, তখন ঈর্ষা হয়।...আবার যখন নিজে সেই ভাগ্যের অধিকারী হয়ে তাকিয়ে দেখে ছতলা সাততলারা তখনো ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে উচ্চমার্গে উঠে চলেছে, তখন বেশ একটা আত্মতৃপ্তির ভাব আছে। নিজেকে বিজয়ী

~ www.amarboi.com ~

বিজয়ী বলে মনে হয়।

পাঁচতলা উঠতে পারলেই তো ব্যস! বেল টিপে সেই চিচিংফাঁকের মধ্যে ঢুকে পড়া এবং সঙ্গে সঙ্গে দরজাটা চেপে বন্ধ করে ফেলে বহিঃপৃথিবীর সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে ফেলা। একার সাম্রাজ্য। বাইরে থেকে কেউ চোখ ফেলবে এমন পথ নেই।

এই সুখনীড়ের বাসিন্দারা কেউ এমন অভব্য নয় যে, হঠাৎ বেল টিপে এসে ঢুকে পড়ে আড্ডা দিতে বসবে।

অতএব খুব নিশ্চিন্ত মনে ঢুকে পড়ে সামনের ডাইনিং কামড্রইং রুমে পাতা আরামদায়ক সোফাটিতে বসে পড়ে জীবনের পরম সাফল্যের স্বাদটি তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করা।...

তবে ইদানীং একটু ফাঁকা-ফাঁকা ভাব হত। সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরেই অসীমাকে দেখতে পাওয়া যাবে না। অসীমাদের সমিতি থেকে সম্প্রতি একটা বয়স্ক শিক্ষণ কেন্দ্র খোলা হয়েছে, বেশ মোটা সরকারি অনুদান পাওয়া যাচ্ছে। এই শিক্ষণকেন্দ্রের ইভনিং ক্লাশের ভার নিয়ে বসেছে অসীমা।

অসীমার এই দুম করে সান্ধ্য ক্লাশটা নেওয়ায় সুব্রত একটু খুঁৎ খুঁৎ করেছিল, কিন্তু অসীমার ঝঙ্কারের ধাক্কায় যে খুঁৎ খুঁতুনি মুহূর্তে পালাতে পথ পায়নি। অসীমা তার টানা টানা চোখ আরও টান টান করে প্লাক করা ভুরুর আঁকা রেখায় পৌঁছে দিয়ে বলেছিল, সমাজের মানুষ বলে পরিচয় দিতে হলে সমাজের জন্যে কিছু করতে হয় বুঝলে?

তবু সাহসে ভর করে বলেছিল সুব্রত, আরে বাবা করও তো অনেক। শুনি তো দুপুরে বস্তি-ফস্তিতে ঘুরে ঘুরে—তাদের জন্যে কত কী কর তোমরা।

তাদের জন্যে? তাদের জন্যে কিছুই করতে পারা যায় না! কী অবর্ণনীয় অবস্থার মধ্যে যে কাটায়! মিসেস মজুমদার তো বলেন প্রতিটি মানুষের উচিত এদের জন্যে কিছু করা। তোমার মত উদাসীন মনটা পেলে অবশ্য সুবিধে হত আমার। কিন্তু মনটা নিয়েই যে হয়েছে যত প্রবলেম!

তথাপি সুব্রত পিঙ্কির কথা তুলেছিল।

আমার তো ফিরতে প্রায় সাতটা বাজে, ও বেচারী বড় একা হয়ে যায়।

অসীমা সে প্রশ্নও নস্যাৎ করে দিয়েছিল।

একা আবার কী? গীতা থাকে। টি. ভি. আছে। তাছাড়া ওর পড়া নেই? আমি সন্ধ্যেবেলা তোমার মেয়েকে কোলে নিয়ে বসে থাকব?

এই সুখনীড়ের পাড়ায় এসে অসীমার চাল-চলন আমূল বদলে গেছে, শুধু কথার ভঙ্গীতে মাঝে মাঝে খাস কলকাতা দর্জিপাড়া উঁকি দিয়ে বসে। জন্মাগার বলে কথা!

তা সে ভঙ্গীটা তো অসীমা বাড়িতে ছাড়া আর কোথাও প্রকাশ করতে যায় না? স্ত্রীর মহিমায় সুব্রত এখানের অনেকেরই ঈর্ষার পাত্র। রূপটাও তো কম নয় অসীমার।

~ www.amarboi.com ~

সিঁড়িতে উঠতে উঠতে সুব্রত একবার হাত উল্টে ঘড়িটা দেখে নিল। সাতটা বাজতে পাঁচ মিনিট। ঠিক সময় মতই এসে গেছে। এক একদিন রাস্তায় জ্যামে পড়ে গিয়ে যা অবস্থা হয়।

আর একটা তলা উঠতে পারলেই সন্দেহ ভঞ্জন, তবু সুব্রত ভাবতে চেষ্টা করল, আজ অসীমার অফ আছে কিনা। সপ্তাহে দুদিন যেন অফ থাকে। সেদিন সকাল করে ফেরে অসীমা। বাড়ি ফিরে দেখতে পাওয়া যায় তাকে। মানে হাতে চাঁদ পাওয়া অথচ এমনি আশ্চর্য কিছুতেই মনে রাখতে পারে না সুব্রত, কোন কোন বারে ক্লাশ থাকে না অসীমার।

অনেকবার জিগ্যেস করা আর ভুলে যাওয়া হয়ে গেছে, এখন আর তাই বেরোবার সময় লজ্জায় জিগ্যেস করতে পারে না।

এখন তাই চারতলা পর্যন্ত উঠেও সুব্রত মনে মনে হিসেব করতে চেষ্টা করল, কোন্ কোন্ বারে যেন?...আজ কী বার?

বেল বাজানোর পর যদি অসীমা এসে দরজা খুলে দেয়, শুধু সুব্রতর মনটাই নয়, সারা বাড়িটাই যেন বেশি পাওয়ারের আলোয় ঝলসে ওঠে।...অনুভব করা যায় সুখ জিনিসটা কাকে বলে।

আজ আর সে অনুভূতি আসার সুবিধে হল না। দরজা খুলে দিল গীতা।

পিঙ্কির ছোট হয়ে যাওয়া ফ্রক পরে, বাড়ন্ত গড়ন হৃষ্ট-পুষ্ট গীতাকে যেন কেমন বোকা বোকা, চোর-চোর লাগছে।

সুব্রত বলতে গেল, কী রে, মাসিমা নেই? কিন্তু বলল না। একটু লজ্জা করল। নেই তা তো দেখতেই পাওয়া যাচ্ছে।

বসল সোফাটায়।

সিঁড়ি ভেঙে তেষ্টা পেয়ে গেছে।

জল চাইল একটু।

গীতা জল আনতে গেল।

সুব্রত পরিতৃপ্ত পরিতৃপ্ত চোখে একবার পরিবেশটি অবলোকন করে নিল।

বলতেই হবে বাহাদুরী আছে অসীমার। এই সুখ-স্বর্গটুকুতে, যেখানে যা সাজে ভাল করে সাজিয়েছে। বাঁকুড়ার ঘোড়া থেকে ঘূর্ণির দুর্গাপুতুল, কোথাকার যেন লক্ষ্মীর সরা, তার সঙ্গে দেওয়ালে নেপালী থালাও। দেওয়ালে এয়ার-ইন্ডিয়ার ক্যালেন্ডার। কী নয়? আর আশ্চর্য, সারাদিনই তো অসীমা বাড়ির বাইরে, কিন্তু বাড়িটি সারাক্ষণ ঝকঝকে চকচকে।

জল খেয়ে গেলাশটা গীতার হাতে নামিয়ে দিয়ে লজ্জার মাথা খেয়ে জিগ্যেসই করে

~ www.amarboi.com ~

ফেলল সুব্রত, তোর মাসিমা কখন আসবে, কিছু বলে গেছে?

কই? কিছুতো বলে নাই!

সুব্রত আশ্বস্ত হল।

বলে যখন যায়নি, বাড়তি দেরি কিছু হবে না।

হাতমুখ ধুয়ে ন্যান মেসোমশাই। বলে গীতা চায়ের জল চাপাতে গেল। সুব্রত চলে এল ঘরের মধ্যে!

অন্যদিন ঢুকেই টেলিভিশনের উপস্থিতি অনুভব করে, আজ তার সাড়া নেই। মাত্র দুখানা ঘরের ফ্ল্যাট, তবু কেমন যেন খাঁ-খাঁ করা লাগল!

পিঙ্কি পড়ার টেবিলে ঝুঁকে পড়ছিল, বাবাকে আসতে দেখে বইটা নিঃশব্দে কৌশলে বড় খাতার তলায় চালান করল। এই বড় খাতাখানা বোধহয় ম্যাপ ট্যাপ আঁকার। মাঝে মাঝেই ওসব এঁকে দিতে হয় সুব্রতকে। যেমন অসীমাকে মেয়ের স্কুলের সেলাই বোনাগুলো করে দিতে হয়।

সুব্রত অবশ্য সাহস করে বলে উঠতে পারল না, কী পড়ছিলি রে?

না, এত সাহস নেই সুব্রতর। মেয়েকে শাসন করা তো দূরস্থান, এই প্রশ্নটুকু করারও! হলেও মাত্র ক্লাশ নাইনের ছাত্রী, এ ধরনের প্রশ্ন করলে দলিতা ফণিনীর মত ফোঁস করে উঠবে।

ওপথে গেল না সুব্রত।

দেখল মেয়ের টেবিলে এক গ্লাশ দুধ।

সেই কথাটাই পাড়ল, তোর দুধ ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে যে?

পিঙ্কি বাপকে দেখে তাড়াতাড়ি উঠে আসবার প্রয়োজন অনুভব করল না, যেমন বসেছিল সেই ভাবেই বসে থেকে অবজ্ঞাভরে ঠোঁট উল্টে বলল, বহুক্ষণ ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

আরে সে কী? ঠিক সময় খেয়ে নিতে হয়তো? গীতাকে বল আর একবার গরম করে দিতে।

বলতে হল না, গীতার কানে আপনিই গেল। এই সাড়ে আটশো স্কোয়ারফুট ফ্ল্যাটে কারও কোনো কথাই কারও কর্ণগোচর হতে বাকি থাকে না।

গীতা এগিয়ে এসে গেলাশটা তুলে নিয়ে বলল, দুবার গরম করা হল, দুবার ঠাণ্ডা হল।

সুব্রত বলল, সে কী, কেন? খিদে নেই?

গীতা বলল, মাসিমা বাড়ি না থাকলে তো দিদি দুধ খেতে চায় না।

পিঙ্কি কড়া গলায় বলে উঠল, ফের সর্দারী? বড্ড বাড় বেড়েছে না? ফেলে দিগে যা দুধ!

সুব্রত এই কথান্তরের মধ্যে নাগ গলাতে ভরসা পেল না। মেয়ের মার ওপর যদিবা

~ www.amarboi.com ~

কিছু বাদ প্রতিবাদ চালানো যায়, মেয়ের ওপর নয়। সাহস করে কথা বলা যায় তখনই, যখন বাপী বলে গলা ধরে ঝুলে পড়ে। তখন কৃত র্থমনা হয়ে সেই মুড ভাল থাকা মেয়ের সঙ্গে গালগল্প হয়। দেখা যাচ্ছে আজ মে্ের মুড ভাল নেই!

একটু মায়া এল সুব্রতর।

কিসেই বা ভাল থাকবে? এই নিথর নিঃস্তব্ধ বাড়িতে শুধু পাঠ্যপুস্তক নিয়ে বসে থাকা, সঙ্গ বলতে ওই গীতা! ভেবে চিন্তে একটা নিরীহ প্রশ্ন করল সুব্রত, টি. ভি. আজ নীরব কেন?

পিঙ্কি মুখ বাঁকিয়ে বলল, বাজে প্রোগ্রাম। বন্ধ করে দিয়েছি।

বই খুলল।

সেই চাপা দেওয়াটা নয় অবশ্য।

সুব্রতর মনে হল, অসীমাকে একবার বলতে হবে, একটু লক্ষ্য করো তো, পিঙ্কি কী বই-টই পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে অসীমার সেই বিদ্রূপরঞ্জিত এবং লিপস্টিক রঞ্জিত ঠোঁটটা মনে পড়ে গেল। সুব্রতকে ওরকম কথা বলতে দেখলে ঠিক ওই বিদ্রূপ হাসিটি হেসে বলবে অসীমা, ওরে ব্বাস! পিতৃ কর্তব্য সম্বন্ধে খুব হুশিয়ার হয়েছো তো? ওর বয়েসটা একটু মনে রেখ। টিন এজারদের বেশি ট্যাকল করতে যাবার চেষ্টা করতে নেই।

গীতা বলল, মেসোমশাই, চা ঢালব?

ঢাল। এই, চায়ের সঙ্গে বেশি কিছু দিস না।

মেয়েটা বিশেষ স্বল্পভাষিণী নয়, সুযোগ পেলেই একটু বাড়তি কথা কয়ে নেয়। তবে এই সুযোগটা প্রায়শঃ মেসোমশাইয়ের কাছেই জোটে। মাসিমা তো সব সময় বলে, বেশি কথা বলার দরকার নেই, চুপচাপ কাজ কর তো।

আর দিদি বলে, কথার ওপর কথা বলবি তো থাপ্পড় খাবি। বকবক করার ইচ্ছে থাকে তো ঘর থেকে বেরিয়ে যা!

একদিন বলতে চেষ্টা করছিল সুব্রত। আহা ছেলেমানুষ, বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছে, হয়তো অনেক ভাই-বোনের মধ্যে মানুষ হয়েছে, সুব্রতর সেই সহানুভূতিটি পিঙ্কির হাসির খোরাক হয়েছিল। বলেছিল বাপী, তুমি এবার ধর্মযাজক হয়ে পড়ো।

আর অসীমা ওই সহানুভূতিটিকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছিল।

একেই তো কুঁড়ের সর্দার বাক্যবাগীশ, এর ওপর যদি মেসোমশাইয়ের প্রশ্রয় পায় তাহলে তো আর রক্ষে নেই। ও লোনলি ফীল করছে বলে ওর সঙ্গে গল্প করতে হবে?

তা এখন মাসিমা বাড়ি নেই!

কাজেই গীতার স্বভাবটা বাক্সর ঢাকনি খোলা হয়ে বেরিয়ে পড়ল। অতএব বলে উঠল, বেশি আবার কোতায় কী পাব মেসোমশাই? গ্যাস তো জবাব দিল।

এই সেরেছে। তাই বুঝি?

হ্যাঁ এই একটু আগে রাঁদতে রাঁদতে গেল! তা'লে শুধু বিস্কুট দেব?

~ www.amarboi.com ~

তাই দে।

বাড়ির গিন্নি বাড়িতে না থাকলে যেন বাড়ির লোকের ক্ষিদে-টিদেও কমে যায়।

চায়ে ধোঁওয়া গন্ধ কেন রে গীতা? মুখটা একটু কুঁচকে প্রশ্ন করল সুব্রত।

গীতা থতমত খেল।

ধোঁয়া গন্ধ? ধোঁয়া গন্ধ কোথা থেকে আসবে মেসোমশাই? একি আমাদের মজিলপুর? যে পাতানাতা জ্বেলে চায়ের জল গরম করা। তাতে ধোঁয়া গন্ধয় ভর্তি। জানেন মেসোমশাই এখন এক'দুদিন যে বাড়ি যাই, ওখেনের চা খেতে পারিনে। তবে হ্যাঁ, আজ এখেনে কেরোসিনের গন্ধ হতে পারে। গ্যাস গেল তো? এস্টোপেই জল করতে হল। উপায় তো নাই।

তা সত্যি, উপায় তো নেই।

এই সুখনীড়ে কয়লা জ্বালাবার আইন নেই। গ্যাস আছে সকলেরই, কিন্তু ক'দিন থাকে সেই 'আছের' সুখ? শেষ ভরসা, প্রধান ভরসা সবই তো ওই কেরোসিন। অতএব তার জন্যে লাইন লাগাও, হত্যে দাও। আর রান্নার তালিকা থেকে শক্ত জিনিসগুলো বাদ দাও।

অবশ্য খুব বেশি শক্ত জিনিস আর কী হয়? রাঁধুনী তো ওই ফ্রকপরা গীতা। তাও একবার রেঁধে তিনবার খাওয়া হয় ফ্রীজের কল্যাণে।

সংসারের কোনো কিছুই দেখতে হয় না সুব্রতকে, তবে ওই গ্যাস না থাকাটা শুনতে হয় দারুণ ভাবে। তাই সুব্রত গ্যাস ফুরোনোয় বলে উঠেছিল, এই সেরেছে।

কেরোসিন-গন্ধ চা, আর গোটাকতক বিস্কুট খেয়ে সুব্রত আবার মেয়ের কাছে চলে এলো। আবার সেই বই চালানের দৃশ্যটা চোখে ঝলসে উঠল।

কী পড়ছে মেয়েটা! খুব একটা নিষিদ্ধ কিছু নয় তো? নাঃ। একটু বলতে হবে অসীমাকে।

সুব্রত কিছু বলার আগে পিঙ্কিই বলে উঠল, ব্যঙ্গের গলায়, বাপীর গল্প করার সঙ্গীটি ভালই জুটেছে। তা আর কিছুক্ষণ মজিলপুরের গল্প শুনলে না কেন বাপী? তোমার যখন এত ইন্টারেস্টিং লাগে!

ঠিক মায়ের মত বিদ্রূপের ভঙ্গীটা শিখেছে। তার ওপর যোগ হয়েছে ঔদ্ধত্য। যেটা অসীমার মধ্যে এতটা নেই। সুব্রত বলল, ইন্টারেস্টিং লাগে, এটা আবার কখন জানলি?

সর্বদাই তো দেখতে পাচ্ছি। বেশ এনজয় কর বোঝা যায়।

তা একটা মানুষ কথা বলছে, না শুনে উপায়?

একটা মানুষ ভাবতে বসলে অবশ্য উপায় নেই। বলে আর একটু তীক্ষ্ণ হাসি হাসল সুব্রতর প্যান্ট গেঞ্জি পরা বয়ছাঁট চুল মেয়েটা।

সুব্রতর মাঝে মাঝেই সন্দেহ হয়, পিঙ্কি যেন ওই তার পুরনো জামা পরে বর্ধিত,

~ www.amarboi.com ~

উদয়াস্ত খেটে সারা মেয়েটাকে কেমন একরকম ঈর্ষার চোখে দেখে।

কেউ একটু প্রশংসা করলে (বহিরাগতরাই অবশ্য, আর কে?) যা ভাল কথা বললে জ্বলে যায়। ভাল করে কথা, আর কে বলে? অসীমা তো নয়ই। এক সুব্রতই! পিঙ্কি এর জন্যে বাপকে বিদ্রূপ করেই ক্ষান্ত হয় না, গীতার ওপরও অন্য ছুতোয় একহাত নেয়। যেটা সুব্রতর বুঝতে বাকি থাকে না।

অদ্ভুত লাগে সুব্রতর।

এত পায়, তবু মন এত সংকীর্ণ কেন? উদারতা তবে আসে কোন্ জানলা দিয়ে?

মেয়ের কাছ থেকে সরে এসে এই সুখনীড়ের পরম সম্পদ ছোট্ট ব্যালকনিটায় এসে দাঁড়াল। হুহু করা দুরন্ত বাতাস এসে গায়ে লাগল, শরীর মন সব যেন জুড়িয়ে দিল।...আঃ! কী আরাম, কী ঐশ্বর্য!

পাঁচতলার ওপর থেকে নিচের জিনিসগুলো কেমন ছোট্ট দেখতে লাগে। আর আকাশটা যেন হাতের কাছাকাছি এসে যায়। শহরের একটা বিশেষ নামকরা রাস্তার কর্ণার প্লটে এই সাততলা সুখনীড় ভবন। শহরের অন্য সব ঘরবাড়ি, আর তাদের তাকিয়ে থাকা চোখের মত আলোগুলো, কী একটা মায়াময় সৌন্দর্য বিস্তার করে রয়েছে। দেখতে দেখতে মনে হয় যেন কোনো শৈলাবাসে রয়েছে। পাহাড় অঞ্চলে বেড়াতে গেলে এ ধরনের দৃশ্য চোখে পড়ে। উঁচু-নিচু দূরে-কাছে আলোর চোখ।

এই পাহাড়চূড়ায় বাসা বাঁধতে পেরেছে সুব্রত। তবে অসীমা বলে রেখেছে আগে থেকে ওয়েটিং লিস্টে নাম দিয়ে রাখ, লিফ্‌ট হলে যেন আমাদের সাততলায় ট্রান্সফার করে দেয়।

ওরে ব্যস! আরও উঁচুতে?

লিফ্‌ট থাকলে অসুবিধে কী? দশ বারো চোদ্দ তলায় থাকছে না মানুষ? যত উঁচুতে থাকবে ততই রাস্তার ধুলো বালি থেকে দূরে থাকতে পারবে। ওপরের তলা কত নির্মল।

সুব্রতর মুখে আসছিল, কিন্তু হরবকৎ যে লোডশেডিং তার কী?

কিন্তু বলেনি। নেতিবাচক কথা শুনলে বিষম চটে যায় অসীমা।

মনে মনে ভেবেছে, রাধাও নেচেছে, সাতমন তেলও পুড়েছে।

দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে যেন নেশা লাগছিল সুব্রতর। অসীমার যে ফিরতে দেরি হচ্ছে তা মনে পড়েনি। চমকে উঠল তার কলঝঙ্কারে।

উঃ! একেবারে ধ্যানমগ্ন অবস্থা!

কৃতার্থমন্য সুব্রত ঘুরে দাঁড়াল, এই তুমি এসে গেছ?

হুঁ। তা দেখে তো মনে হচ্ছে না-এলেও কোনো ক্ষতি হত না।

সুব্রত একটু ঘনিষ্ঠ হল, আর যদি বলি অনুপস্থিতার ধ্যান করছিলাম।

সাজিয়ে বলা অনেক কিছুই বলা যায়।

বলতে বলতেই অবশ্য ব্যালকনি থেকে ঘরে ঢুকে এসেছে। শোবার ঘর। যুগল শয্যা।

~ www.amarboi.com ~

এঘরেও অসীমা যেখানে যা প্রয়োজন, সেই ভাবেই সাজিয়েছে। প্রায় নব-দম্পতীর মতই সাজ-সজ্জা। তা করবেই তো, এখানে আসার আগে কোথায় ছিল? কী ভাবে? কালীঘাট অঞ্চলে একটা পচা গলির ভাড়াটে বাড়িতে। ঘর অবশ্য ছিল সেখানে দুতলা মিলিয়ে গোটা পাঁচেক। কিন্তু যেমন ছিরি তেমনি ছাঁদ। আর ফার্নিচার বলতেই বা কী ছিল? বিয়ের পাওয়া ঢাউস একখানা খাট ছিল, সেটাতেই তিনজনে শোওয়ার ব্যবস্থা।

এখানে পিঙ্কির পড়ার ঘরেই পিঙ্কির শোবার ব্যবস্থা। মা-বাপের হৃদয়হীনতায় নয়, পিঙ্কিরই দাপটে। বলেছিল, আমি এই ঘরেই পড়ব শোব সব করব। ওঘরে রাত্তিরে মার লেকচার শুনতে শুনতে ঘুমের বারোটা বেজে যায়।

বেঁচে গিয়েছিল অসীমা।

অতএব এই নবদম্পতী-জনোচিত শয়নকক্ষ।

সুব্রতর যেন এখনও, এই দু'বছরেও বিশ্বাসে আসে না, এই সুন্দর ঘরটার মালিক সে। এই শৌখিন বেডকভার, এই বেড সুইচের সুখ। অসীমা যে কীভাবে কী করে। ঘরে এসেই অসীমা নিজের হাতব্যাগ থেকে একখানা খামের চিঠি বিছানার ওপর ফেলে দিয়ে বলে উঠল, চমৎকার একখানি চিঠি এসেছে দেখ।

সুব্রত অবাক হল, এ সময় চিঠি?

এ সময় কেন, ঠিক সময়ই এসেছে। বিকেলে বেরোবার সময়ই লেটার বক্সটা খুলি—

সুব্রতর হঠাৎ বুকটা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগল। নিশ্চয় বর্ধমানের ব্যাপার। চমৎকার যখন বলেছে, তখন দুঃসংবাদ নয়, তবে সুব্রতর পক্ষে সুসংবাদও নয়। যখন তার নামেই চিঠি।

চিঠিটা অবশ্য খোলা হয়েছে, পড়াও হয়েছে। তা তাই হয়। লেটার বক্সের চাবি তো অসীমার কাছেই থাকে।

চিঠিটা বার করল সুব্রত। দাদার চিঠি। না, তা নয়। ঠিকানাটা দাদার হাতের হলেও চিঠিটা বৌদির। বর্ধমানের বাড়ি আগলে দাদা বৌদিই থাকে। নিঃসন্তান দুটো মানুষ! দাদা ওখানের কাছাকাছি একটা গ্রামের স্কুলের মাস্টার। একবার যেন শুনেছিল হেডমাস্টার হয়েছে। খবরটা সুব্রতর কাছে গোয়ালার দুধের মতই লেগেছিল। হেড মাস্টার হলেও, এখনো তো সাইকেল চালিয়ে পাঁচ দশ মাইল রাস্তা ঠেঙাতে হয়।

কালে কস্মিনেই চিঠি, মোটামুটি খবর জানা। ছেলে মেয়েও তো নেই যে মাঝে মধ্যে কিছু খবর গজাবে।

বৌদির চিঠি দেখছি।

হুঁ। তাইতো দেখছি—

কিন্তু এটা লিখেছেন কেন?

সুব্রত একটু থমকাল, স্নেহের ঠাকুরপো, কিছুদিন আগে যে চিঠি দিয়েছি, সে চিঠি কি পাওনি? কলকাতায় শুনি আজকাল ডাকের খুব গোলমাল হয়। যাক তাই আবার লিখছি, তোমার দাদার চোখটা একবার কলকাতার বড় ডাক্তারকে দেখনো দরকার মনে

~ www.amarboi.com ~

হচ্ছে।...জানোই তো মানুষটিকে? নিজের ব্যাপার সবই উড়িয়ে দেন। কিন্তু এবারে রাজী হয়েছেন। এখানে হাসপাতালের ডাক্তার বলেছে, ছানি। আর তাড়াতাড়ি অপারেশন করতে হবে। এই বয়েসে ছানি, আমার তো বিশ্বাস হয় না। কী ভুলভাল দেখেছে হয়তো। তাই তোমার কাছে একবার চলে যেতে বলছি, তুমি বুঝে-সুঝে কোনো বড় ডাক্তারকে দেখানোর ব্যবস্থা করে দাও ভাই। টাকার জন্যে দ্বিধা কোর না। এখন তো আর স্কুলমাস্টারদের মাইনে আগের মত খারাপ নয়? আর আমাদের দুটো মানুষের কীইবা খরচ? সে যাই হোক, তোমাকে এ কথা বলা বাহুল্য। তুমি শুধু একটু তোড়জোড় করে—

সুব্রত চোখ তুলে আবার বলল, কিছুদিন আগের চিঠি মানে? এর মধ্যে কবে আবার বৌদির চিঠি এল?

অসীমা মুচকি হেসে বলল, ওটা বোধহয় একটা মফঃস্বলী চাল। চিঠিকে জোরদার করতে একটা কল্পিত আগের চিঠি অ্যাড করা। আমার পিসিমাও করতেন এরকম। প্রথমেই লিখতেন আমার আগের পত্রে অবগত আছো যে—

কিন্তু বৌদি তো ঠিক সেরকম—

তুমি যেরকম সন্দেহের টোনে কথা বলছ, যেন চিঠিটা আমি গাপ করে ফেলেছি। (উঃ ভাগ্যিস, সমিতিতে যেতে যেতে রাস্তাতেই চিঠিটার সৎকার করা হয়ে গিয়েছিল।) গাপ করবে না? দেখেই তো হাড় পিত্তি জ্বলে গিয়েছিল। সাতজন্মে খবর নেই, ছোট ভাই বলে একটু ইয়ে নেই। শুনতে পাওয়া যায় দেশের বাড়িতে নাকি অনেক আম কাঁঠাল পেয়ারা বাতাবীর গাছ আছে, কখনও তো সে সবের মুখ দেখা যায় না। দরকারের সময়—স্নেহের ঠাকুরপো বলে ভাবতে বিচ্ছিরি লাগে। অসীমা ভেবেছিল উত্তর না পেয়ে বোধহয় মানী মহিলাটি আর উচ্চবাচ্য করবেন না। সুব্রতর মুখে আগে আগে শুনেছে তো বৌদির যা অভিমান। বৌদি যা অভিমানী! সেই অভিমানের উদাহরণও কিছু কিছু বলেছে। তবে কিছু পরে থেকে আর বৌদি প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়নি। বোধহয় যেদিন অসীমা বলেছিল, উঃ তোমার বৌদি প্রসঙ্গ আর শুনতে পারি না বাবা! স্মৃতির জগতটা একেবারে বৌদিময় হয়ে আছে। তারপর থেকেই।

একবার বোধহয় বলেছিল সুব্রত, বাবা-মা তো ছিলেন না, দাদার আর আমার সংসার। বৌদিই যত্ন-টত্ন করেছে।

অসীমা নিজস্ব প্যাটার্নে হেসে বলেছিল, ওঃ! মাতৃতুল্য? তাই বল!

সে যাক। মাঝে মাঝে প্রিয়ব্রতরই এক একটা পোস্টকার্ড আসে। কখনও এমনি কুশলপত্র। কখনও বা বাড়িটা নিয়ে সমস্যার কথা। এতবড় বাড়ি কে বা থাকে। এদিকে এখানে ওখান ভেঙে পড়ছে।

সুব্রত সেসব কথার উত্তর দেয় না। সব চিঠিরও না। দেব দেব করে ভুল হয়ে যায়।

~ www.amarboi.com ~

সুব্রত বলল, কী আশ্চর্য! গাপ করার কথা কে বলছে? চিঠিটা মারই গেছে। তবে বৌদি বেচারী ভাবছে আমি এরকম একটা খবর শুনেও চুপ করে বসে আছি। সত্যি এই বয়েসে ক্যাটারাক্ট! খুব স্যাড ব্যাপার।...

এখন পিঙ্কি এ ঘরে চলে এসেছে। বলল, তোমার দাদার বয়েস কত বাপী?

বাবার দাদাকে জ্যাঠা বলতে হয়, এ কথা পিঙ্কি জানে না।

সুব্রত এখন আর ও নিয়ে কিছু বলে না। বললে, আমার থেকে দশ বছরের বড়। তার মানে বাহান্ন।

দশ বছরের! এ বয়সে চোখে ছানি পড়ে না?

আরে বাবা, রোগের কি আর বয়েস আছে আজকাল? আমারও পড়তে পারে। তবে সচরাচর এ বয়েসে পড়ে না!

হঠাৎ হিহি করে হেসে উঠে মার থমথমে মুখের দিকে একটি কটাক্ষপাত করে বলে উঠল পিঙ্কি, তার মানে তোমার সেই বেঁটে ধুতি আর লম্বা শার্ট পরা দাদাটি এখানে এসে থাকছেন? অতএব তার গিন্নীটিও? হিহি!

সুব্রত একটু বিরক্ত গলায় বলল, থাকছেন মানে?

অসীমার থমথমে মুখ থেকে উচ্চারিত হল, তা খুব ভুল বলেনি পিঙ্কি। এসে বড় ডাক্তার দেখানো, নার্সিং হোম হাসপাতাল যাহোক একটা কিছু ঠিক করা, অপারেশানের পর আফটার কেয়ার, বেশ দীর্ঘ সময়ই।

সুব্রত আস্তে বলল, উপায় বা কী!

চমৎকার।

ঠিকরে উঠল অসীমা, একেবারে নিরুপায়ের খাতায় নাম লিখে দেওয়া হয়ে গেল? প্রতিকারের চিন্তা মাত্র মাথায় এলো না? কেন, বর্ধমানের হাসপাতাল কিছু খারাপ নাকি? যথেষ্ট সুনাম আছে ওখানকার।

সুনামটা যে কী বাবদ শুনেছে অসীমা ভগবান জানেন।...তবে বলল।

সুব্রত ম্রিয়মাণ ভাবে বলল, তা সেটা তো আর বলা যায় না? কক্ষণো কিছু বলেন না।

বলার আবার কী আছে? তুমিই বা দাদার কাছে কবে কী বলতে গিয়েছ, কবে কী পেয়েছ?

সুব্রতর হঠাৎ মনে হল, ঘরের আলোটার যেন পাওয়ার কমে গেল। জানলা দিয়ে এসে পড়া লুটোপুটি বাতাসটা থেমে গেল।

আস্তে বলল, কখনো কিছুই পাইনি? জানো তো মা মারা যাওয়ার পর দাদাই আমায় মানুষ করেছিলেন অসীমা। আমায় ভাল করে পড়াবেন বলে, সাত তাড়াতাড়ি গ্রামে একটা স্কুল-মাস্টারী নিয়ে বসেছিলেন। অথচ এম. এ. পড়ার কত ইচ্ছে ছিল—

অসীমা কিছু বলার আগে হঠাৎ সমস্ত পরিবেশটাকে খান খান করে পিঙ্কির অভ্যস্থ হি হি হাসিটা ছড়িয়ে পড়ল।

~ www.amarboi.com ~

বাপী ঠিক সিনেমার অনুতপ্ত নায়কের মত কথা বলছে দেখছ মা? হিহি—ডায়লগগুলো পর্যন্ত এক। আর চোখে জলও পড়-পড়।

আঃ মেয়ে! থামো তো তুমি।

মেয়েকে যখন শাসনের ভান করে অসীমা, তখন 'মেয়ে' বলে। কথা হচ্ছে, হয়তো এটা তোমার বাপীর পক্ষে একটা কর্তব্যই। তবে এদিকটাও তো দেখতে হবে? এর মধ্যে কোথায় আর দুটো মানুষকে জায়গা দেওয়া সম্ভব? তাহলে আমাকে আর পিঙ্কিকে দিদির বাড়ি গিয়ে থাকতে হয়। তা তাতেও তো আমার কর্তব্যের ত্রুটির নিন্দে হবে।

সুব্রত পিঙ্কিকে মলিন ভাবে বলল, ওখানের ডাক্তার বলেছে বলেই যে এখানের ডাক্তার অপারেশানের কথা বলবে, তা নাও হতে পারে। হয়তো দেখিয়ে-টেখিয়ে দু'চারদিন পরে চলেই যাবেন।

ওই্ আনন্দেই থাকো বাপী। হি হি হি। কলকাতায় এসে তোমার বৌদি কালীঘাট দেখতে যাবেন না? গঙ্গায় নাইতে যাবেন না? চিড়িয়াখানা যাদুঘর দেখে নেবেন না? তাঁর তো আর—হি হি—চোখে কিছু হয়নি? পাড়াগাঁ থেকে এখানে এসে এতো সুখ আরাম ছেড়ে সহজে নড়বেন ভেবেছ? গেঁটিয়ে বসে থাকবেন।

এতো সাহস আসে কোথা থেকে পিঙ্কির? মার চোখের প্রচ্ছন্ন প্রশ্রয়ের দৃষ্টির মধ্যে থেকে?

যদিও অসীমা বলে ওঠে, আঃ মেয়ে, তুমি একটু বকবকানিটা থামাবে? এই সুব্রত শোন, (হ্যাঁ এই সুখনীড় ভবনে এসে আরও একটা উন্নতি হয়েছে অসীমার। সুব্রতকে সুব্রত বলে ডাকা! বলেছে, সেই পিতামহীদের মত ওগো হ্যাঁগো করতে আর ভাল লাগে না বাপু। সব্বাই আজকাল নাম ধরে ডাকে!) একটা কিছু ব্যবস্থা করার চিন্তা বরং হোক। এভাবে হঠাৎ এসে পড়ার কোনো মানে হয় না। সামনের সপ্তাহে আমার সমিতির বার্ষিক অধিবেশন, আমি তো তখন বাড়িতে থাকতেই পারবো না। পিঙ্কিরও উইকলি একজামিনেশান। তাছাড়া দারুণ গ্যাসের অভাব, এইমাত্র জবাব দিয়েছে। দু'সপ্তাহের আগে তো আশা নেই। একটু চক্ষুলজ্জার দায়ে মরতে তো পারি না? তুমি বরং তাড়াতাড়ি একটু গুছিয়ে গাছিয়ে চিঠি লিখে দাও, কলকাতার ডাক্তারও কিছু ভগবান নয়, বর্ধমানের ডাক্তার যা করবে তার বেশি কিছু করবে না। তাছাড়া ওখানের হসপিটালে ভীড় কম, ভালভাবে কেয়ার নিতে পারবে। আর সম্ভব হয়তো তুমি বরং একদিন দেখে আসবে।

সুব্রত প্রায় মিশিয়ে যাওয়া গলায় বলল, এভাবে লেখা ঠিক হবে? লেখা সম্ভব?

কী আশ্চর্য। অসম্ভব কিসে? মানুষ নিজের দিকটা দেখবে না? তুমি নিজেই বল, এই বাড়িতে কোথায় থাকবেন তাঁরা?

তাকিয়ে দেখল সুব্রত।

সত্যিই বটে! কোথায় জায়গা দেওয়া যাবে দু'দুটো গ্রামজীবনে অভ্যস্ত মানুষকে? এ তো আর অসীমার মেজদি নয়? হায়দ্রাবাদ থেকে এসে অনায়াসেই এখানে তিন-

~ www.amarboi.com ~

চার দিন থেকে গিয়েছিলেন। অবশ্য এমন সুন্দর ফ্ল্যাটে একটা গেস্ট রুম রাখেনি কেন বলে একটু আক্ষেপ প্রকাশও করেছিলেন।

সে যাক!

অসীমার মেজদি আর সুব্রতর বৌদি এক ক্যাটিগরির মানুষ নয়।

বৌদি এলেই বোল না তাঁর কিছু ঠাকুর দেবতার ছবি গঙ্গাজলের ঘটি বিচার-আচারের ধুয়ো ইত্যাদি থাকবে। সর্বোপরি গীতার রান্না। ভগবান জানেন গীতা কোন জাতের মেয়ে। বৌদি হয়তো বামুন নয় শুনে শিউরে উঠবে!

তাছাড়া বাথরুমে কমোড ছাড়া অন্য ব্যবস্থা নেই। আনাড়ি মানুষ কী না কি করে বসবে।

না! অসীমার বুদ্ধিই নিতে হয়।

চক্ষু লজ্জার থেকে স্বস্তি অনেক বড় জিনিস।

ক্ষীণভাবে বলল, ওসব ভাষা-ফাষা আমার আসবে না, তুমি বরং একটা—

তা জানি। সে আর তোমায় বলতে হবে না। লিখে রাখব কাল, পরশুই কপি করে পোস্ট করে দিও। দারুণ টায়ার্ড লাগছে, নাহলে আজই লিখে রাখতাম। কালই পোস্ট করা যেত।

একটা দিনে আর—

বলে সুব্রত যুগপৎ হালকা এবং ভারাক্রান্ত মন নিয়ে খেতে বসতে এল।

সুন্দর করে সাজানো টেবিল, নুন মরিচের দানীটি পর্যন্ত সুরুচির পরিচায়ক। কিনারায় ফুলকাটা দামী ডিশ, ফাইন কাচের গ্লাস। ভাঙলে মাইনে কাটা যাবে এই শাসানিতে গীতা বড় সাবধানে মাজে ঘষে।

এই ঔজ্জ্বল্যের অনুপাতে অবশ্য খাদ্য বস্তুটা মানানসই নয়। রুটি বেগুন ভাজা আর ফ্রীজ থেকে বার করা আগের দিনের যৎসামান্য মাংস।

রুটিগুলো মোটা মোটা করার অপরাধে দুঃস্থজন দুঃখে বিগলিত সোশ্যাল ওয়ার্কার অসীমা রায় গীতা নামের চোর চোর ভীতু মেয়েটাকে বকুনির চোটে কাঁদিয়ে ছেড়ে রুটিগুলোর পাশ ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেতে লাগল, আর পিঙ্কি 'পাজীটা ইচ্ছে করে খারাপ করেছে যাতে আমরা না খেতে পারি' বলে ফেলে দিয়ে পাঁউরুটি নিয়ে খেল।

সুব্রতই শুধু সেই মোটা মোটা আধকাঁচা রুটি দুটো (এই ধরনেরই প্রায়ই হয় অবশ্য। ওর বেশি ক্ষমতা ওর নেই) নীরবে খেয়ে নিয়ে উঠে পড়ে ভাবল, গীতা মেয়েটা বোধহয় পিঙ্কির থেকে ছোটই। ওর ছোট হয়ে যাওয়া জামাগুলোই তো পরে।

কিন্তু অতঃপর?

অতঃপর সেই বিলাস-বহুল শয়নকক্ষ।

মৃদুনীল মায়াবী আলোয় আচ্ছন্ন! এবং পাশে এখনো যথেষ্ট যুবতী, সুন্দরী স্ত্রী। যে স্ত্রী আজ স্বামীর মনোবৈকল্য নিঃশেষে মুছে দিতে বদ্ধপরিকর হয়ে বিছানায় এসেছে।

~ www.amarboi.com ~

এর পরেও আর মনোবৈকল্য? এর পরেও বিবেক দংশন? সকালে উঠেই ভাবল সুব্রত সত্যিই তার অসীমার কাছে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। সব রকম সমস্যাকে ম্যানেজ করবার আশ্চর্য একটা ক্ষমতা আছে ওর। ওই যে বলল, চিঠিতে এখনকার কলকাতার হাসপাতালের হালচাল ভাল করে বুঝিয়ে দিতে এবং যে কোনো একজন স্পেশালিস্টকে ইচ্ছে করলেই দেখানো যায় না, ডেট পাবার সাধনা করতে হয়, এগুলো উল্লেখ করতে, এটা কম বুদ্ধির কথা? আপাততঃ তো একটা বাঁধ দেওয়া হবে। তারপর ভেবে চিন্তে—

কিন্তু হায়! সুব্রতর ভাগ্যে যে বাঁধ দেবার আগেই বন্যা! অকস্মাৎই বজ্রাঘাত!

অসীমার লেখা পরম মুসাবিদাকরা খসড়াখানা অফিসে নিয়ে গিয়ে নিজ হস্তাক্ষরে কপি করে নিয়ে কাল পোস্ট করব বলে বাড়ি ফিরে দৃশ্য দেখে আঁৎকে উঠল সুব্রত। দাদা!

সুব্রতর ড্রইংরুম-কাম-ডাইনিং রুমের সেই মনোরম সোফার ওপর খাটো ধুতি আর লম্বা ঝুল সার্ট পরা প্রিয়ব্রত নামের লোকটা বসে। ধুতির দোষ নেই, লোকটা এমন ঢ্যাঙা যে সব ধুতিই তার খাটো হয়। দুই ভাইয়ের চেহারা ঠিক বিপরীত! লোকটা এত দীর্ঘাকৃতি বলেই কি এখানে বেখাপ্পা লাগছে ওকে?

সুব্রতর মাথার মধ্যে একটা বিদ্যুৎ শিহরণ খেলে গেল।

সুব্রতর চোখের সামনে একটা কালো পর্দা দুলে উঠল। সুব্রতর মনে হল ওই মাত্রাছাড়া ঢ্যাঙা লোকটা যেন তার লম্বা লম্বা পা ফেলে সুব্রতর এই সুখের স্বর্গটুকুকে তচনচ করে দিতে এসেছে।

খুব রাগ হল সুব্রতর। একেবারে বিনা খবরে কখন এসেছেন ইনি? অসীমা দেখে গেছে, না যায়নি? যদি দেখে না গিয়ে থাকে, ফিরে আসার পর কোন পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হবে সুব্রতকে এই আকস্মিক বজ্রাঘাতের পরিপ্রেক্ষিতে?

তবু মুখে হাসি টেনে বলতেই হয়, কখন এলে?

এই তো খানিক আগে। প্রিয়ব্রত একটু হেসে বলল, তোর নিজের বাড়ি হয়েছে, দেখব দেখব বলে কবে থেকেই ইচ্ছে। তা আসা আর হয়ে ওঠে না। এখন ছানিপড়া চোখে দেখতে এলাম। তোর বাড়ি—কত আহ্লাদের কথা।

দেখব দেখব করে।

সুব্রতর ভেতরে কী যেন একটা ঠ্যালা মারল।

সুব্রত কি কোনোদিন ডেকেছিল, দাদা তোমার ছোট ভাইয়ের বাড়িটা একবার দেখবে এসো বলে?

এদিক ওদিক তাকিয়ে একটু নিচু হয়ে নমস্কারের মত করে বলল, আসতে কষ্ট হয়নি তো?

না না, কষ্ট আর কী? একটা চোখ তো ঠিকই আছে। তোর বৌদি অবশ্য কিছুতেই

~ www.amarboi.com ~

একা ছাড়তে চাইছিল না, নাছোড়বান্দা সঙ্গে আসবে বলে। অনেক কষ্টে নিবৃত্তি করেছি। জানি তো এসে দাঁড়ালেই স্পেশালিস্ট মেলে না, অনেক অপেক্ষা করতে হয়। কতদিন আর ঘর বাড়ি ফেলে—আমি ক'দিন থেকে দেখিয়ে নিই, দেখি কী বলে! যদি এক্ষুণি অপারেশানের তাড়াহুড়ো না পড়ে ও আর কী করতে আসবে শুধু শুধু? আমি তো খুব কিছু খারাপ বুঝছি না, একটা চোখে দেখতে পাইনা এই যা। তোর বৌদি একেবারে অস্থির। কে নাকি বলেছে ছানি কাটাতে দেরি হয়ে গেলে দু'চোখই নষ্ট হয়ে যায়। সবাই তো ডাক্তার আর পণ্ডিত। এতো ব্যস্ত হল যে আমায় না বলে কয়েই নাকি পাড়ার কাকে দিয়ে ঠিকানা লিখিয়ে চিঠি দিয়ে বসেছিল। তা সে চিঠি এসে পৌঁছেছে কিনা জানি না। আবার ব্যস্ত হয়ে—

সুব্রত শুকনো গলায় বলল, আমি তো সবে কালই বৌদির একটা চিঠি পেয়েছি, তোমার হাতেরই ঠিকানা।

ওই তো শেষেরটা। শেষ অবধি ফাঁস করেই ফেলল। বুদ্ধি দেখ আমায় নিয়ে আসবে, আমাকেই লুকনো।

সুব্রত বলল, আমি তো কালই—

এই দেখ যেতে তো? ভাগ্যিস! না না আনতে যাবার কী দরকার? শরীর তো আর খারাপ নয়। চোখই খারাপ। এই আজ আমি চলে না এলে তোকে আবার ছুটতে হত। অবিশ্যি যাসনি অনেক দিন। গেলে তোর বৌদি হাতে চাঁদ পেত। তা সে একটা ভাল সময় হবে। তো এসে দেখছি বাড়ি ভোঁ ভোঁ। বৌমা বাড়ি নেই, তুই তো থাকবিই না, তোর মেয়ের একটু ছায়ামাত্র দেখলাম একবার—ব্যাস!

সুব্রত কষ্টে বলল, ভীষণ শাই। কারুর সামনে বেরোতে চায় না।

আশ্চর্য তো। কলকাতায় জন্ম কর্ম, নিশ্চয় ইংলিশ মিডিয়ামেই পড়ে-টড়ে, এতো লাজুক কেন?

তো কী আর করি, এই মেয়েটির সঙ্গেই গল্প চালাচ্ছিলাম এতক্ষণ। বেশ মেয়েটি। আমি বর্ধমান থেকে এসেছি শুনে মহা খুশি। বর্ধমান জেলায় কোতুলপুরে নাকি ওর মামার বাড়ি, বর্ধমান শহরও দেখেছে। আমাকে ওর অতীব চেনা মানুষ বলে ঠেকছে।

হা হা করে হেসে উঠল প্রিয়ব্রত গীতার ভাষাটা কোট্ করে। তা যাক, তুই হাত-মুখ ধো। সারাদিনের পর এলি।

আমি একেবারে স্নান করে ফেলি।

তা ভাল করিস। বাইরে কত ধুলো ধোঁয়া জার্ম। আমিও যাহোক করে সেরে নিয়েছি। এই মেয়েটাই ছাড়ল না। বলল মাসিমার আসতে দেরি হবে। আপনি মুখ ধুয়ে চা খেয়ে নাও। চা খাইনা শুনে কী আক্ষেপ। রেল গাড়িতে এয়েছেন বলে একটু লেবুর শরবৎ করে ঝুলোঝুলি। তা হ্যাঁরে সুবো, বাড়ি করলি, তো এমন টঙের ওপর কেন? বাড়িতে উঠছি না কেদারবদরীতে উঠছি।

সুব্রত তাড়াতাড়ি বলে উঠল, শীগগিরই লিফট হবে।

~ www.amarboi.com ~

হবে! নেই তো। দু-বছর যাবৎ এই পাহাড় ভাঙছিস তো? হার্টের অসুখ ধরে যাবে যে?

সুব্রত কি কোণঠাশা হয়ে যাবে? আবার ও তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, তোমাদের একতলা বাড়িতে থাকা অভ্যাস, তাই এত বেশি মনে হচ্ছে। কলকাতায় পাঁচ ছ-তলা ফ্ল্যাট তো আকছার! দশ-বারোতলাও রয়েছে।

আহা সে তো অফিস বাড়িটাড়ি, তাদের লিফট আছে—।

থাকার বাড়িতেও আছে। সকল রাস্তায়ই তো বড় বড় ম্যানসন। দেখলে না?

দেখলাম তো—

দাদা একটু ক্ষুব্ধ হাসি হাসল, দেখে কী মনে হচ্ছিল জানিস? সেই যে ছেলেবেলায় তোকে, খালি দেশলাই বাক্সর খোল দিয়ে অনেকতলা বাড়ি বানিয়ে দিতাম, ঠিক যেন তেমনি। তোর বাড়ি ঠিক এরকমটা ভাবিনি।

সুব্রত কী বলতে যাচ্ছিল কে জানে। পরিচিত বেল বেজে উঠল, তীব্র অসহিষ্ণু।

পাঁচতলায় উঠে আসার কষ্টে আরক্ত মুখ অসীমা এসে থমকে দাঁড়াল!

প্রিয়ব্রত বলল, এত রাত পর্যন্ত কাজ করে বেড়াও বৌমা? নাইট ক্লাশে পড়াও বুঝি?

অসীমা সে-কথার উত্তর না দিয়ে বলল, কতক্ষণ এসেছেন?

অনেকক্ষণ! এই তোমার কাজের মেয়েটি বলল, মাসিমা এই মাত্তর বেরুল। আজকাল তো আর মা বলা নেই, সব মাসিমা।

অসীমা ওই পচা কথায় কান না দিয়ে বলল, একটা খবর টবর না দিয়ে—

খবর তো তোমার দিদি দিয়েছিল বৌমা, মনে হচ্ছে তোমরা সে চিঠি পাওনি। আমায় একেবারে অস্থির করে ঠেলে পাঠাল। যেন আজ রাতেই হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছি আমি। হেসে উঠলেন হা হা করে।

অসীমাও এতক্ষণে একটু নিচু হয়ে প্রণামের ভঙ্গী করল, প্রিয়ব্রত বলল, থাক। তারপর বলে উঠল, তোমায় তো বেশ বুদ্ধিমতী বলেই জানি বৌমা, তা সুবোর এই দুর্মতিতে মত দিলে যে?

দুর্মতি।

দুর্মতি!

দুটো গলা থেকে একই শব্দ উচ্চারিত হল।

তা দুর্মতি ছাড়া আর কী? লাখখানেক টাকা খরচ করে এই বাড়ি? বাড়ি না পায়রার কোটর! বাস কর কী করে? প্রাণ হাঁপিয়ে আসে না? অথচ ওখানে কত বড় বড় ঘর দালান পড়ে আছে।

অসীমা একটু বঙ্কিম হাস্যে বলল, সেকথা বলে তো লাভ নেই। হাজার হাজার লোকের যদি প্রাণ না হাঁপায়, তো আমাদেরই বা হাঁপাবে কেন?

প্রিয়ব্রত একটু গম্ভীর ভাবে হাসল।

~ www.amarboi.com ~

অনেক বছর মাস্টারী করা হেডমাস্টারের হাসি। কোনো অর্বাচীনের কথা শুনে যেমন অবহেলার হাসি হাসে পাড়াগাঁয়ের আদর্শবাদী মাস্টার!

বলল, ওটা তো একটা তর্কের ভাষা বৌমা। হাজার হাজার লোকে কী করছে তা ভেবে তো কাজ করা হয় না। আমার পক্ষে কোন্‌টা ভাল, লোকে তাই দেখে। এর চাইতে শহরতলীতে একটু জমি কিনে খোলামেলা একটা একতলা বাড়ি করলে অনেক ভাল করতিস সুবো। একে কি বাড়ি বলে রে? পায়ের তলায় নিজের বলতে মাটি নেই, মাথার ওপর নিজের বলতে ছাত নেই, পাশ ফেরার জায়গা নেই। নাইবার ঘরে—হেসে ফেলে বলল, একটা মোটা মানুষ ঢুকলে আর ঘুরে দাঁড়াতে পারবে না। তার ভেতরে আবার বাসনমাজা। দেখে অপ্রবৃত্তি এল। তোর বৌদি তো এখানে একদিনও থাকতে পারবে না। আমি অবশ্য যা হোক করে পারতাম। এই সোফাটা সরিয়ে মাটিতে একটা বিছানা বিছিয়ে হয়ে যেত। তা ভেবে দেখছি তোদেরই অসুবিধেয় ফেলা।

হঠাৎ নিজস্ব ভঙ্গীতে হা হা করে হেসে উঠল প্রিয়ব্রত।

বলল, তোদের এই হোমিওপ্যাথিগুলির শিশিতে কবিরাজী ডোজ ধরাতে গেলে, শিশিটা ফেটে যাবে। হা হা হা! আসলে তোর বৌদির বাতিকেই আসা। নইলে বর্ধমান হাসপাতালের ডাক্তার টাক্তার কিছুই খারাপ নয়।

পরদিন সকালেই চলে গেল প্রিয়ব্রত।

বলল, সাতটার ট্রেনটা ধরতে পারলে সুবিধে।

চলে যাবার পর মা মেয়ে দুজনেই প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল সুব্রতর ওপর। খুবতো শুনিয়ে গেলেন তোমার দাদা! একটি জবাব তো দিতে পারলে না! বাড়ি বয়ে এসে অপমানের মানে?

ভ্যাঙানো গলায় বলল, দেশলাই বাক্সর মত বাড়ি! বাথরুম দেখে অপ্রবৃত্তি হয়! পায়ের তলায় মাটি নেই, মাথার ওপর ছাত নেই! এতদিনেও কেন হার্টের অসুখ হয়নি, এই আশ্চর্য। আশ্চর্য! ঘাড় হেঁট করে শুনলে বসে বসে। নেহাত তুমি ইয়ে করবে তাই, না হলে ঝেড়ে শুনিয়ে দিতে পারতাম। আর কিছু না, হিংসে। ভাইয়ের এত সুখ ঐশ্বর্য দেখে হিংসেয় বুক ফেটে যাচ্ছিল। চিরকাল গাঁয়ে পড়ে থাকলে, ওই রকম সংকীর্ণচিত্তই হয়ে যায় মানুষ।

যাক সহজে পার পাওয়া গেল এই বাঁচোয়া।

মা আর মেয়ের মধ্যে বক্তব্যের কোনো পার্থক্য নেই, পার্থক্য শুধু যা ভাষায় আর বলার ভঙ্গীতে।

অনায়াসেই এরা এগুলো সুব্রতর সামনে উচ্চারণ করে চলেছে, কারণ সে সাহস তাদের আছে। জানে এ লোকটা কামড়ানো তো দূরের কথা, ফোঁসও করবে না। আর নেহাতই যদি করে বসে, শায়েস্তা করতে দেরি হবে না।

~ www.amarboi.com ~

তা ফোঁস আর করছে কই লোকটা?

করছে না।

সুব্রত নির্বাক। সুব্রত নিথর।

সুব্রত আজকের সকালটাকে দেখতেই পাচ্ছে না। দেখতে পাচ্ছে গত কালকের সন্ধ্যাটাকে।

দেখতে পাচ্ছে সুব্রত নামের লোকটা অফিসের গাড়ি থেকে নেমে সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে, এই ফ্ল্যাটটার দরজায় বেল বাজাল। ক্ষীণ প্রত্যাশাটুকু ব্যর্থ করে দিয়ে গীতা এসে খুলে দিল দরজাটা। হাত বাড়িয়ে মেসোমশাইয়ের হাত থেকে ব্যাগটা নিয়ে পিছিয়ে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়াল। আর সুব্রত ঢুকে পড়েই একটি দীর্ঘাকৃতি মানুষকে খুব বেমানান ভাবে সুব্রতর সুখনীড়ের সব থেকে সুন্দর জায়গাটায় বসে থাকতে দেখল।

দেখেই ভয়ানকভাবে আঁৎকে উঠল সুব্রত।

অথচ সুব্রতর আহ্লাদ হওয়ার কথা। অন্ততঃ সভ্যতার নিয়ম তাই বলে। কিন্তু সুব্রত খুশি হওয়ার বদলে আঁৎকে উঠল। কারণ সুব্রত ওই বেমানান বসে থাকার দৃশ্যে একটা অশুভ সংঙ্কেত দেখতে পেল। সেই সঙ্কেতটা যেন জানিয়ে গেল, ওই মানুষটা তার লম্বা লম্বা পা ফেলে সুব্রতর সুখের ঘরে ঢুকে পড়ে সব সুখ মাড়িয়ে-গুঁড়িয়ে তচনচ করে দিতে এসেছে।

কেন এরকম মনে হয়েছিল জানে না সুব্রত। সে কী ওই ভারী মজবুত লম্বা হাত পা-ওয়ালা দীর্ঘ মানুষটার কাছে নিজেকে খুব ছোট মনে হওয়ার জন্যে? কিন্তু কেন তা হবে? চিঠিটা তো তখনও পোস্ট করা হয়নি, সুব্রতর পকেটেই ছিল। অসীমার চোখের আড়ালে পোস্ট করে ফেলার প্রশ্ন ছিল না বলেই পকেটে ছিল।

তবু সেই সঙ্কেতটা পেয়েছিল সুব্রত, আর সেটা ভুল ছিল না। সুব্রতর এতদিনকার সঞ্চয়, বুকটা ভরাট করে রাখা, নিটোল মসৃণ 'সুখ সুখ' মুক্তোটিকে ওই লোক মাড়িয়ে-গুঁড়িয়ে নস্যাৎ করে দিয়ে চলে গেল।

আর কোনো দিনও সুব্রত সেটি ফিরে পাবে না। সেই জায়গাটায় থেকে যাবে একটা গভীর শূন্যতার গহ্বর। সেই গহ্বরটা প্রতিনিয়ত সুব্রতর তুচ্ছতাটাকে স্মরণ করিয়ে দেবে।

~ www.amarboi.com ~

উদঘাটন

বাবা! লেটার বক্সের চাবিটা আপনার কাছে রাখার কোনো মানে আছে? আকস্মিক ছেলের এই তীক্ষ্ণ প্রশ্নে ভ্যাবলা হয়ে গেলেন গৌরীশঙ্কর। থতমত খেয়ে বললেন, 'মানে' মানে?

মানে আপনার তো চিঠিপত্র বিশেষ কিছুই আসে না। চাবিটা কাছে রেখে দরকার কী আপনার? ওটা আপনার বৌমার কাছেই দিয়ে রাখবেন।

দরজার কাছে দাঁড়ানো ছেলের দিকে তাকিয়ে দেখলেন গৌরীশঙ্কর, অবাক হয়ে গেলেন। 'রাখলে পারেন' নয়, 'রাখলে ভাল হয়' নয়, 'রাখবেন।' আদেশেরই সামিল! ছেলের হঠাৎ এরকম আক্রমণাত্মক ভঙ্গী কেন?

বরাবরইতো লেটার বক্সের চাবি গৌরীশঙ্করের কাছেই থাকে। তিনতলার এই ফ্ল্যাটটা যখন কেনা হয়েছিল সিঁড়ির তলার দেয়ালে লেটার বক্সটা বসানো হয়েছিল, তদবধিই তো এই 'মানেহীন' কাজটা চলে আসছে সংসারে। সারি সারি অনেকগুলো বক্স-এর সারির মধ্যে বসানো হলেও, গৌরীশঙ্করদেরটি বিশেষ স্পেশাল। অর্ডার দিয়ে করানো হয়েছিল, ডালাতে একটু কারুকার্য করে। আর পুটপুটে একটা তালা ঝোলানোর বদলে, মজবুত গা চাবি করিয়ে।...সেই চাবি তদবধি গৌরীশঙ্করের পৈতেয় আশ্রয় নিয়ে আছে।...ডুপ্লিকেট একটা ছিল, কমলিনী সেটা নিজের কাছে রেখেছিলেন। বলেছিলেন, 'তুমি কখন বাড়ি থাকো না থাকো, ওটা আমার কাছে থাক।'

তাই রেখেছিলেন গৌরীশঙ্কর, তবে হেসে বলেছিলেন 'তিনতলা সিঁড়ি ভেঙে চিঠি আনতে যেতে এনার্জিতে কুলোবে তোমার?'

কুলোয়নি কোনদিনই। হাঁটুর ব্যথা নিয়ে বারোমাসই ভুগতেন ভদ্রমহিলা। তথাপি তিনিও হেসে বলেছিলেন, তা' না কুলোক তোমারটা যদি হারিয়ে টারিয়ে যায়' ওটা বার করে দেব। আমার এক্তারে থাকলে দরকারের সময় পাওয়া যাবে। নাহলেতো—কিন্তু তেমন ঘটনা আর ঘটলো কবে ; গৌরীশঙ্করের মজবুত পৈতেয় মজবুত ভাবেই বাঁধা আছে চাবিটা এযাবৎকাল। বরং কমলিনীই হারিয়ে গেলেন। এমন হারিয়ে গেলেন যে, দরকার পড়লে জিগ্যেস করা যাবে না, চাবিটা কোথায় গো?

স্বাতী তো খোঁজবার চেষ্টা করেছে তলেতলে।

অবশ্য সুবিধেটা কমই পেয়েছে। জিগ্যেস করার উপায় নেই, সেটা তো একটা মস্তই অসুবিধে। তাছাড়া শ্বশুরঠাকুর ইহলোকে থাকলে, পরলোকগতা শাশুড়ীর বাক্স আলমারি কতই বা ঘাঁটা যায়? সেখানেও চাবির কব্জা। অথচ গৌরীশঙ্কর লোকটা কিন্তু আর দুঁদে প্যাটার্নের.নয়। আসলে লোকটা বেহুঁশ। তার উপস্থিতি কোথায় কী অসুবিধে

~ www.amarboi.com ~

ঘটাচ্ছে, অথবা তার চির অভ্যস্ত ব্যবস্থাগুলো কারো বিরক্তির কারণ হচ্ছে কি না তা লোকটা টেরই পায়না।

কমলিনী তার চাবির তোড়া অবহেলায় ফেলে চলে গেলে, গৌরীশঙ্কর সেটাকে প্রাণতুল্য করে তুলে রেখেছেন, যেন কোনো একদিন কমলিনী ফিরে এসে আবার নেবেন। কমলিনীর কোনো জিনিস এদিক ওদিক হতে দেননা গৌরীশঙ্কর অথবা অন্যের অসতর্কতায় হতে দেখলে অস্থির হন, যেন কমলিনীর কাছে জবাব দিহি করতে হবে' 'এসবের এমন দুর্দশা কেন'? এই প্রশ্নের। এ সবই তো গৌরীশঙ্করের হুঁশের অভাবের পরাকাষ্ঠা। কুটিলতার চিহ্ন কী? তিনি কি বুঝতে পারেন তিনি তাঁর মরা গিন্নীর ছুতো দেখিয়ে, ছেলের বৌটাকে সম্যক গিন্নী হতে দিচ্ছেন না?

অতএব তিনি বুঝতে পারেন না স্বাতী গৌরীশঙ্করের বড়ছেলে উদয়শঙ্করের কাছে সারাক্ষণই অভিযোগে মুখর।

সারাদিন শুধু 'বৌমা, এটা এখানে কেন?...বৌমা এটা এখানে পড়ে নষ্ট হচ্ছে কেন?...বৌমা এরকম দেখলে কিন্তু তোমার শাশুড়ী রক্ষে রাখতোনা ; কাঁহাতক সহ্য করা যায়?...যে যার নিজের পদ্ধতিতে কাজ করে, তবু এযাবৎকালতো বাড়ীর গিন্নীর পদ্ধতিতেই চলে এসেছি, এখনো তাই চলতে হবে? এক একসময় বলতে ইচ্ছে করে, আমি কি তাঁকে নিহত করেছি?

কিন্তু এসব যাহোক অভিযোগ। তুমুল হয়ে উঠেছে লেটার বক্সের চাবিটা নিয়ে।

স্বাতীর ক্রুদ্ধ নালিশ—এ তো আর তোমার মার স্মৃতিচিহ্ন নয় যে বুকে রেখে দিতে হবে।...নিত্যদিনের দরকারি জিনিস লেটার বক্সের চাবি। এটাকে কব্জার মধ্যে রেখে দেবার দরকার? সকলের তালা চাবি, তোমাদের আবার বেশী কায়দা, গা চাবি।...যেন টাকাকড়ি থাকবে।

এই ধিক্কার বাণীর মধ্যে যে সত্যটি প্রচ্ছন্ন থাকে সেটি বুঝতে কি আর অসুবিধে হয় উদয়শঙ্কর নামে লোকটার? সে কি আর অনুধাবন করতে পারেনা ওই গা চাবিটা অসুবিধাকর বলেই এতো বিরক্তি? 'তালাচাবির' সুবিধে এই, অনায়াসে একটাকে খতম করে দিয়ে অপর একটাকে পুনর্বিন্যাস করা যায়।

কিন্তু স্বাতীর উত্তেজিত প্রশ্নের মধ্যেই তো স্বাতীর প্রশ্নের উত্তরও নিহিত ছিল। উদয়শঙ্কর বলে ফেলেছে, তা সত্যি টাকাকড়ি তো নয়, মাত্রতো ডাকের চিঠি। তোমারই বা এই নিয়ে এতো রাগ কেন? নীচের তলায় গিয়ে চিঠি নিয়ে আসাওতো একটা খাটুনী! বাবা যখন তখন টুকটাক রাস্তায় বেরোন, চিঠি এসেছে দেখলেই নিয়ে চলে আসেন। এখনতো আর 'ডাক' আসারও সময়ের ঠিক নেই।

এরকম কথা প্রায়ই হয়, উদয় বলে, হঠাৎ বাবাকে গিয়ে বলবো চিঠির বাক্সর চাবিটা তোমার কাছে থাকার দরকার নেই, আমাদের দিয়ে দাও। এটা কী করে হয়? বাবার কাছে থাকলেই বা ক্ষতি কী?

স্বাতীকে অতএব চুপ করে যেতে হয়।

~ www.amarboi.com ~

কিন্তু আজকের পরিস্থিতি অন্য হয়ে গেল।

আজ স্বাতী বলে উঠল, যদি বলি, আছে ক্ষতি।

তার মানে?

তার মানে, উনি অন্যের চিঠি পড়ে নিয়ে তবে দেন। ইচ্ছে হলে, নাও দেন।

তার মানে?

তীব্র আর রুক্ষ এই প্রশ্নটা যেন তীরের মতই বেরিয়ে এল উদয়ের মুখ থেকে, কথা বলবার সময় একটু ভেবে চিন্তে বলো।

সন্দেহ নেই নিতান্তই বশংবদ স্বামী যে স্বাতীর, এবং বৌকে ভয় সমীহ যথেষ্টই করে, তবু বাপের সম্পর্কে এরকম অসম্মান বাণী হঠাৎই রক্তটা চড়াৎ করে চড়িয়ে দিল।

তা ঘলে কি স্বাতী নামের ওই ঠোঁটে লিপষ্টিক মাখা ভুরু আঁকা ফুলো গাল মেয়েটা ভয় পেলো? নাঃ তা পেলোনা। ঠোঁটে ব্যাঙ্গের রেখা এঁকে বললো, ভেবে চিন্তেই বলা হয়েছে। প্রমাণ না থাকলে বলতাম না।

এখন অপদস্থ হওয়ার পালা উদয়শঙ্করের।

ধৃষ্টতা কি এতোটা সীমাহীন হতে পারে? যা এমন একটা ভিত্তিহীন অভিযোগ নিয়ে লড়াইয়ে নামতে সাহস জোগায়!

অতএব অপদস্থ উদয়শঙ্কর বলে, ব্যাপারটা কী?

ব্যাপারটা কী? দেখাচ্ছি।

স্বাতী আগুনের মত মুখ করে একখানা খামে বন্ধ চিঠি এনে বরের সামনে ধরল। চিঠিটা বন্ধই, তবে তার দরজাটাকে যে সুকৌশলে একবার খুলে, আবার বন্ধ করা হয়েছে, তার চিহ্ন স্পষ্ট।...

কার চিঠি?

চিঠি যারই হোক, খুলে আবার জোড়া হয়েছে, তা দেখতে পাচ্ছো?

উদয়শঙ্কর একটু গুম্ হয়ে থেকে বলে, এমনওতো হতে পারে, যে লিখেছে, সে নিজেই আবার কিছু লিখতে—

বাজে বোকোনা।

স্বাতী তীব্রস্বরে বলে, গুরুজনকে সম্মান করতে ততক্ষণই পারা যায়, যতক্ষণ তিনি নিজে সম্মান রক্ষা করে চলতে পারেন।

স্বাতীর মুখে অবজ্ঞার ব্যঞ্জনা।

ঠিক সেই মুহূর্তেই উদয়ের মাথার মধ্যে আগুন জ্বলে উঠেছিল। সোজা বাপের ঘরের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছিল। আর তীব্র অভিযোগের গলায় বলে উঠেছিল, বাবা! লেটার বক্সের চাবিটা আপনার কাছে রাখার কোন মানে আছে?

*　　　*　　　*

গৌরীশঙ্কর অবাক হয়ে বললেন, 'মানে' মানে?

তারপর, ছেলের মুখ থেকে রায় বেরোবার পর আস্তে বললেন, বৌমার কাছেই দিয়ে

~ www.amarboi.com ~

রাখবো? বেশ! তা' এখনি নিয়ে যাও—পৈতেটা গেঞ্জির মধ্যে থেকে টেনে বার করলেন। চাবিটার কাছে হাত দিলেন।

এখন আবার একটু অপ্রতিভ হলো উদয়, বললো, এতো তাড়ার কিছু নেই দিয়ে দেবেন পরে।

না না, দাঁড়াও না একটু—

পৈতের চাবি, এ একটা সহজ ফাঁসের ব্যাপার।

কিন্তু কী যে হলো! সহজটা অসহজ হয়ে গিয়ে জটিলতার জট পাকিয়ে বসলো।...হয়তো কাঁপা কাঁপা হাতের দ্রুত চেষ্টাই এই জট পাকিয়ে তোলার কারণ। হয়তো অপ্রত্যাশিত অবমাননার উত্তেজনায় হাত পা কাঁপেই মানুষের। শুধু বুড়ো হলেই নয়।

বৃথা চেষ্টায় টানাটানি করতে গিয়ে মুখটা লাল হয়ে ওঠে গৌরীশঙ্করের। মুখ তুলে ছেলের দিকে তাকিয়ে বলেন, টেবিলে ছোট কাঁচিটা আছে দাও তো—

গলাটা কী গৌরীশঙ্করের?

উদয়ের মনে হলো যেন আর কার!

নিজে অস্বস্তির গলায় বললো, পৈতে কাটবেন?

উপায় কী? জট বেশী পাকিয়ে গেলে, কেটেই ঠিক করে নিতে হয়।

উদয়ের মনে হলো গলাটা আরো—অস্বাভাবিক। অতএব আরো অস্বস্তির গলায় বললো, তাড়া কী? দেখুন না ধীরে সুস্থে। পৈতে কাটা তো নিয়ম নয়।

চলে এলো তাড়াতাড়ি।

চেষ্টায় হাত দু'খানা হঠাৎ এলিয়ে গেল গৌরীশঙ্করের। পৈতেটা সুদ্ধ ধরে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকলেন একটু।

স্তব্ধ। কিন্তু মনের মধ্যে কথার ঢেউ। তোমাদের এ যুগে সবাই সব নিয়ম মেনে চলছে, কেমন? বাড়ির একটা মানুষ মরে গেলে, তার স্মৃতিকে একটু শ্রদ্ধা সমীহ দেওয়া যে নিয়ম, তা এ সংসার জানে? জানে, জীবনের আধখানা হারিয়ে ফেলা একটা মানুষকে একটু স্থান দেওয়া, একটু সহানুভূতির চোখে দেখা নিয়ম।

আবার চেষ্টা করতে লাগলেন জটটা খুলতে।

আশ্চর্য! পৃথিবীটা কী নিষ্ঠুর। হাতের মুঠি একটু শিথিল হয়ে এলেই, সমস্ত সভ্যতা সৌজন্য অন্তর্হিত। একদা যে সর্বস্বের অধিকারী ছিল, তার সবকিছু অধিকার ছিনিয়ে নেবার চেষ্টায় আপনজনেদেরও কী নির্লজ্জ অভিযান।

শুধুই কি একদার অধিকারী? আহরণকারী নয়?

ওই লেটার বক্সটা একটু বিশেষভাবে তৈরী করাতে কয়বার বিষ্টু ছুতোরের কাছে হাঁটাহাঁটি করতে হয়েছিল গৌরীশঙ্করকে? নিজে আলাদা করে ওই গা চাবির কলটা কিনে এনে দিয়েছিলেন, পাছে সস্তামার্কা একটা বসিয়ে দেয়।

কিন্তু কত অধিকারইতো আস্তে আস্তে হাত থেকে চলে যাচ্ছে, ক্রমশঃই তো সংসারে

~ www.amarboi.com ~

কী হচ্ছে না হচ্ছে টেরও পাচ্ছেন না আর। বাজারের ফর্দ কী রকম দেখতে, ভুলেই গেছেন যেন।

আর আগে?

কমলিনী রোজ সকালবেলা এক টুকরো কাগজ হাতে ধরিয়ে দিয়ে হেসে হেসে বলতো, এই নাও আমার প্রেমপত্র।

প্রেমপত্র! হায় ভগবান। এই উচ্ছে, কাঁচকলা, পটল, পার্শে মাছ, কাঁচালঙ্কা, পাতিলেবু, থোড়, বাঁধাকপি—

এখন ওই প্রেমপত্র।

তবে আর কি বুকে ভরে নিয়ে বেরিয়ে পড়ি বলে ফর্দটা পাঞ্জাবীর বুক পকেটে পুরে নিয়ে বেরিয়ে পড়তেন হাসতে হাসতে।

কমলিনী চলে যাবার কিছুদিন পরে, মনটা যখন বড্ড খাঁ খাঁ করতো, বেলার দিকে এমনিই একবার বাজারে ঘুরে আসতেন টুকটাক এটা-সেটা নিয়ে। কিন্তু সে অভ্যাস ত্যাগ করতে হয়েছে। 'লোভের বশে' যদি গৌরীশঙ্কর এই বয়েসে এইসব কতকগুলো জিনিস জড়ো করে আনেন, তাতে শুধু যে গৌরীশঙ্করেরই লিভারের ক্ষতি হবে তা তো নয় সংসারের ভাঁড়ারেরও ক্ষয়ক্ষতি হয়। উচ্চকিত এই মন্তব্য কানে আসার পর আর অবশ্যই সাধ যায় না বাজারের চেহারাটা একবার দেখে আসতে।

গৌরীশঙ্কর একজন গভর্নমেন্ট অফিসার ছিলেন তো বটে! এই সুরম্য ফ্ল্যাটটা তিনিই কিনেছিলেন তো বটে।

সংসারের মধ্যমণি ছিলেন, এখন ছেঁড়া পুঁতির মালা মত পড়ে আছেন একধারে। কুড়িয়ে নিয়ে আবার মালার সুতো পরিয়ে নেবে, এমন গরজ কার আছে?

অতএব গৌরীশঙ্কর নামের কেন্দ্রীয় সরকারের একটি পদস্থ অফিসার আজ আপন সংসারে কেন্দ্রচ্যুত হয়ে গিয়ে পড়ে আছেন। এই পরম শূন্যতার মধ্যে একটি ক্ষীণ যোগসূত্র ছিল ওই লেটার বক্সটা। চিঠিগুলো বার করে হাতে নিলে মনে হয় কিছু একটা পাওয়া গেল বুঝি।

সংসারের কোনো খবরই তো এখন আর জানার উপায় নেই। তবু এইভাবে আসা চিঠিপত্রগুলো কিছুটা জানিয়ে দিয়ে যায় গৌরীশঙ্করকে। কোথা থেকে চিঠি এলো, কোনটা বন্ধ খামে, কোনটা ইনল্যান্ড লেটারে, কোনটা বা পোষ্টকার্ডে।...এই থেকে তবু বুঝি কিছুটা আস্বাদ পাওয়া যায়, কিছুটা জানতে পারা যায়।...তা' এই একটা লোভ বোধ হয় গৌরীশঙ্কর নামের ভদ্র ব্যক্তিটিকে দিয়ে একটা গর্হিত কাজ করিয়ে নিয়ে ছাড়ে।

গৌরীশঙ্কর কি জানেন না পরের চিঠি পড়া, অপরের ঘরে আড়ি পাতার সামিল। তবু গৌরীশঙ্কর সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসতে আসতেই পোষ্টকার্ডের চিঠিগুলো পড়ে ফেলেন, এবং ইনল্যান্ডের আঠামারা ভাঁজের উঁকি দিয়ে দিয়ে ধরতে চেষ্টা করেন, হাতের লেখাটা কার, কোনো লাইন ওই সূক্ষ্ম পথেই পাঠোদ্ধার করতে পারা যাবে কি না।

* * *

~ www.amarboi.com ~

গর্হিত, খুবই গর্হিত। তবু গৌরীশঙ্কর কি এটাকে এমন কিছু গর্হিত মনে করেন? করেন না।...ওঁর ধারণা আরে বাবা কোনো নববিবাহিতা দম্পতীর প্রেমপত্র তো নয়। সবই তো প্রায় স্বাতীর বাপের বাড়ির দিকের চিঠি। সবাইকে চেনেন না গৌরীশঙ্কর। কাউকে কাউকে বুঝতে পারেন।...পোষ্টকার্ডগুলো তো অনুমানের অপেক্ষা রাখে না।...পড়তে পড়তে মনে মনে হসেন গৌরীশঙ্কর। আহা বৌমার এই মাসিটির কী হস্তাক্ষর।...আহা বৌমার এই কাকাটির চিঠি মানেই 'অভাব' জানানো।...আর বৌমার এই বড়দি। পোষ্টকার্ডের দামটা উসুল করেন বটে। চারখানা পোষ্টকার্ডের 'মাল' এই এক খানায়। তবে হ্যাঁ পড়তে ভাল লাগে। খবরে ঠাশা।...

আচ্ছা এই সব খবরের সঙ্গে গৌরীশঙ্করের জীবনের যোগ কী? যাদের খবর, তাদের অনেককে তো চেনেনই না তিনি।

তবু এই সংসারের জীবনের সঙ্গে তো যোগ আছে?...যে যোগসূত্রটা কমলিনী ছিঁড়ে দিয়ে চলে গেছে।

ওই ক্ষুদে ক্ষুদে অক্ষরে লেখা লাইনগুলো থেকেই তো গৌরীশঙ্কর জানতে পেরেছেন, বৌমার বড়দির মেয়ের বিয়ের ঠিক হয়েছে, পাত্র কী কী গুণসম্পন্ন, কতখানি খাঁই তাদের বৌমাকে যেতেও হবে সেই বিয়ে উপলক্ষে শিউড়িতে।

এই সব কথা কেউ বলতো গৌরীশঙ্করকে? কেউ বলতো বৌমার কাকার নামে যখন তখন মনিঅর্ডার যায়?

কিন্তু এ সবইতো পোষ্টকার্ডের ব্যাপার।

এটাকে না হয় কম গর্হিত বলে-মনে করা চলতে পারে। যে বাক্যাবলী একেবারে উদঘাটিত হয়েই শত শত মাইলের পথ অতিক্রম করে চলে আসছে, তার জানলায় চোখ ফেলা, এমন কী দোষের? একটু কৌতূহল চরিতার্থ মাত্র।

কিন্তু খামে বন্ধ চিঠি?

তাকে খুলে দেখবেন গৌরীশঙ্কর? এতো নির্লজ্জ আর অদম্য কৌতূহল?

কোনো ভদ্র ব্যক্তির পক্ষে এটা মার্জনীয় অপরাধ?

স্বাতী নামের মেয়েটা যদি এতে ঘৃণায় ঠোঁট বাঁকিয়ে বলে, গুরুজন নিজের সম্মান নিজে যদি রাখতে না জানেন, কে সমীহ্ সম্মান দিতে পারবে?—তো দোষ দেওয়া যায় কি তাকে? আর এতে যদি সে ক্ষিপ্ত হয়ে অধিকার কবলিত করতে চায়, তাও অন্যায় নয়।

কিন্তু গৌরীশঙ্কর নামের একজন প্রৌঢ় ভদ্র ব্যক্তির কেন এই অধঃপতন?

যদিই তাঁর ছেলের বৌয়ের নামে বারে বারেই টাইপকরে ঠিকানা লেখা খামে চিঠি আসে, তাঁর কী এসে যাচ্ছে? কী দরকার জানবার কে এই পত্র লেখক?

কেনই বা ক্রমশঃ ধরে নেবেন তিনি লোকটা হাতের লেখা প্রকাশ করতে চায়না, তাই এই টাইপ করার ফন্দী।

অনেকে তো অফিস টফিস থেকে চিঠি পাঠালে ঠিকানাটা টাইপ করে দেয়।...অফিস

~ www.amarboi.com ~

টফিস থেকে কোন কারণে চিঠি এলেও তাই হবার কথা...

তবে?

তবে তিনি জল দিয়ে খামের মুখ খুলে উদঘাটনের চেষ্টা করে বসলেন কেন আজ?

* * *

কিছু দিন আগে তো একবার অন্যায় কৌতূহলের জন্যে ধিক্কারই খেয়েছেন।

স্বাতী কি অবজ্ঞায় মুখ কুঁচকে বলেনি, কী অদ্ভুত আপনার কৌতূহলের মাত্রা। আমাকে কে ঘন ঘন টাইপ করা ঠিকানায় চিঠি দেয় তা' জেনে আপনার কোন দরকার আছে? একই লোক দেয় তাই বা ভাবছেন কেন? আর কোথাও কারো টাইপরাইটার নেই?

তবু কৌতূহল সামলাতে পারেননি হতভাগ্য গৌরীশঙ্কর।...কারণ তিনি ঠিকই বুঝেছিলেন একই লোক।...একদা তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের একজন পদস্থ অফিসার ছিলেন।

* * *

তবু সদ্য এসে পড়া বন্ধ চিঠিখানাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে উল্টে পাল্টে দেখে ভয়ানক একটা কৌতূহল আর কেমন একটা আশঙ্কা নিয়ে চিঠিখানা কাজকরা মেয়েটার হাত দিয়ে পাঠিয়েই দিতেন স্বাতীর কাছে।

শুধু আজই খুলে ফেলেছিলেন।

ফেলেছিলেন গতকাল স্বাতীর নামে একটা ইন্টারভিউ লেটার আসায়।...

আসানসোলের কোনো একটা স্কুল থেকে। অবিলম্বে শিক্ষিকা প্রয়োজন তাদের।

খামের উপর স্কুলের নাম ছাপা।

দেখে গৌরীশঙ্কর খুলে ফেলেছিলেন। স্কুল থেকে চিঠি কেন ভেবে। ছাপা চিঠি উদঘাটনে আর দোষ কী?

খুলে দেখে হাত পা কেঁপে গেল।

তলে তলে চাকরীর চেষ্টা করছে স্বাতী? সেক্রেটারী সমীর বোসের স্বাক্ষরিত চিঠিতে জানানো হয়েছে অবিলম্বে চলে আসুন। যাতায়াতের ব্যয়ভার স্কুল বহন করবে...

গৌরীশঙ্করের মধ্যে একটা আলোড়ন উঠেছিল আর স্থির সিদ্ধান্তে এসে গিয়েছিলেন, টাইপ করা খামের অন্তরালে সমীর বোস নামের কোন ব্যক্তির উপস্থিতি।...

সেই ইন্টারভ্যু লেটারটা গৌরীশঙ্কর দেন নি। সাদা বাংলায় যাকে বলে গেপে ফেলেছিলেন।

কিন্তু আজ যখন খামের অন্তরালে নিশ্চিত টের পেলেন সমীর বোসের উপস্থিতি, সে চিঠিটা কেন আর আঠায় মুড়ে বোকার মতো ঠিক জায়গায় পৌঁছে দিলেন?

স্বাতী আসানসোলে যাচ্ছে বলে সমীর বোসের উচ্ছ্বাস তো কম ছিলনা চিঠিতে।

বোকামি।

ভয়ঙ্কর বোকামি।

~ www.amarboi.com ~

সেই বোকামির খেসারৎ দিতে পৈতেটাকে কাঁচি দিয়েই কাটতে হল গৌরীশঙ্করকে। চাবিটা ছাড়িয়ে নিতে।...জটটা আর খুলতে পারলেন না।

শুধু চাবিটা যখন হাতে নিয়ে উদয়শঙ্করকে দিতে গেলেন, তখন সেই স্কুলের চিঠিটাও দিয়ে দিলেন তার হাতে।...

অস্ফুট গলায় বললেন 'আমি তোমায় বাঁচাতে চেয়েছিলাম।...আর কিছু নয়।'

ফিরে এলেন আস্তে আস্তে।...

...মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে রেখে তাঁর ছেলে বৌকে।

~ www.amarboi.com ~

নাম ভূমিকায়

এই বাজারে অহেতুক একটা লোককে পুষতে কারই বা ভাল লাগে। তনিমারও ভাল লাগছিল না। দেখতে দেখতে তো প্রায় মাস ছয়েক হয়ে গেল।

চাকরি কি এমনই একটা সহজ প্রাপ্য বস্তু, যে তার আশায় অনির্দিষ্ট কাল পরের বাড়িতে এসে বসে থাকা যায়? আবার ভাঁওতা কত, বলে কিনা দেশের জমি জমা বিক্রী করে দিয়ে এসেছে জ্ঞাতিদের কাছে, তারা টাকা পাঠাচ্ছে।

পাঠাচ্ছে!

সে টাকা আজও আসছে কালও আসছে। বন্ধুর বাড়ির বাড়া ভাতের থালাটি তো চলছে দিব্যি।

বন্ধুর ব্যাপারে এমনই মোহগ্রস্ত অসিত যে, এখনো পর্যন্ত বুঝতে পারছে না ওই টাকা আসাটা স্রেফ্ ভাঁওতা। আরো একটি ভাঁওতা দিয়ে রেখেছেন বুদ্ধিমান শিশিরবাবু, চাকরী হলে, অসিতের বাসাতেই পেয়িংগেস্ট থাকবেন। অসিত সেই আশাতেই—

এ যেন কুকুরের নাকের সামনে মাংসখণ্ড ঝুলিয়ে রেখে তাকে ছুট করানোর মতই হচ্ছে ব্যাপারটা।

তা প্রথমটায় তনিমাও মোহগ্রস্ত হয়েছিল বৈ কি!

'সত্যি' বলে বিশ্বাস করেছিল শিশিরের সেই কুণ্ঠিত চোখকে, অপ্রতিভ মুখকে। যেন নিতান্ত নিরুপায় হয়েই দূর সম্পর্কের এই মামাতো ভাইয়ের বাসায় এসে উঠতে হয়েছে তাকে।

কেবলমাত্র 'মামাতো ভাই' এই সূত্র ধরেই অবশ্য আসেনি শিশির, মামাতো ভাই তো তার আরো আছে, একেবারে আপন মামাতো দাদারা রয়েছে কাছাকাছিই, তবু অসিতের বাসাটাই বেছে নিয়েছিল, 'বন্ধুর বাড়ি' হিসেবে। চিরদিনের সহপাঠী—ওরা, শিশির আর অসিত।

পাঠ সাঙ্গ করে শিশির চলে গিয়েছিল বীরভূমের এক কলেজে পড়াতে, অসিত রয়ে গেল কলকাতায় এক সরকারি গোয়ালে। দু'জনের একজনও 'কেষ্ট বিষ্টু' হল না বলে ভাবটা রয়ে গেছে।

শৈশবে মাতৃহীন শিশিরের গৃহবন্ধনটা আলগাই ছিল, বাবার মৃত্যুতে শেষ সুতোটুকুও ছিঁড়েছে, তাই ছুটিতে কলকাতায় এসে অসিতের বাসায় ওঠাটাই অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে শিশিরের। কিন্তু সে তো শুধু ছুটিতে, চাকরি ঘুচিয়ে তো নয়?

এবারে যে সেই ভয়ঙ্করটা ঘটেছে। শিশির কুণ্ঠিত দৃষ্টি আর অপ্রতিভ মুখকে একটু হাসির আবরণ পরিয়ে এসে বলেছে, 'চাকরি ঘুচিয়ে বেকার হয়ে এসে ঢুকলাম তোর

~ www.amarboi.com ~

কাছে। এখন দেখি কতদিনে প্রহারেণ ধনঞ্জয়ঃ করিস।'

তখন তনিমা উদার ছিল।

তখন তনিমা স্বপ্নেও ভাবেনি অমন বুদ্ধিসুদ্ধিওলা মানুষটা সত্যি চাকরী ঘুচিয়ে এসে অনির্দিষ্ট কাল পরের বাড়িতে থাকতে পারে। তাই তনিমা হেসে উঠে বলেছিল, 'বন্ধুর প্রতি তো অগাধ আস্থা দেখছি!'

শিশির এবং অসিত, দুজনের মধ্যে কে বড় কে ছোট এটা কোনো দিনই সঠিক স্থির হয়নি। তবে দু'জনের মধ্যে দু'চার দিনের ব্যবধান, এইটুকু জানা। কাজেই শিশির অসিতের বৌকে 'বৌদি'ও বলে না 'ভাদ্রবৌ'ও ভাবে না। স্রেফ, বন্ধু পত্নী হিসেবে কৌতূকছলে বলে 'শ্রীমতী তনিমা!'

সেদিনও বলেছিল, 'বন্ধুর প্রতি আস্থা থাকলেই বা কি, বন্ধুপত্নী যদি সে ব্যবস্থা করেন? শ্রীমতী তনিমা হয়তো ক্রমশঃ অগ্নিসমা হয়ে—'

'চমৎকার! 'শ্রীমতী'দের প্রতি আপনাদের কী শ্রদ্ধা বোধ।'

'এটা মজ্জাগত!' শিশির হেসে উঠেছিল, 'শোনেন নি, 'মামা দিল দই সন্দেশ দোরে বসে খাই, মামী এল ঠ্যাঙা নিয়ে প্রাণ নিয়ে পালাই!'

'আমি আপনার—মামী নই।'

'ওইটাই যা ভরসা!' বলে আবার হেসেছিল শিশির। তবু অত হাসি খুসি দিয়েও ঢাকতে পারেনি সেই কুণ্ঠিত দৃষ্টি আর অপ্রতিভ মুখকে।

যতই বন্ধু হোক, চাকরি ঘুচিয়ে বাক্স বিছানা নিয়ে হঠাৎ এসে 'চড়াও' হওয়ার লজ্জা আছে বৈকি। নিজের বাড়ি হলেও লজ্জা থাকে। নিজের বাবার কাছে, দাদার কাছে।

তনিমা আর অসিত দু'জনে অতএব প্রাণপণে চেষ্টা করেছে সেই লজ্জার গ্লানি মুছিয়ে দিতে। অনবরত বুঝিয়েছে শিশির এসে থাকায় তাদের বহুবিধ সুবিধে হয়েছে। ধর যেমন আগে অসিত তনিমা কোথাও বেরোলেই ওদের বছর দুইয়ের মেয়েটাকে সর্বদা ঘাড়ে করে নিয়ে বেড়াতে হতো, এখন সে জ্বালা নেই। 'শামু' শিশিরের কাছে থাকে। সুখে আহ্লাদে থাকে।

'ছোটবড়'র সমস্যা সমাধান হয় নি বলে, শিশির শামুকে শিখিয়েছে 'জ্যেঠু-কাকু' বলে ডাকতে। শামু স্পষ্ট গলায় ঘোষণা করে 'তোমরা ছাই বিচ্ছিরি পচা। তোমরা পচা বেড়ানো বেড়াতে বেড়াতে যাও গে', আমি জ্যেঠুকাকুর কাছে থাকবো!'

এ ভার চাপানোর সুখ বড় সোজা সুখ নয়।

এ ছাড়াও বাড়ি চাবি দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার অসুবিধে কত! হয়তো গয়লা আসার সময়, হয়তো ঝি আসবার সময়, হয়তো ধোবা আসবার দিন! অঙ্ক কসে বেরোতে হয়। অজানিত অতিথির দিনও কত থাকে।

কতবার এমন হয়েছে তনিমার মা-ভাই এসে ফিরে গেছেন পাশের দোকানে খবরটা জানিয়ে রেখে! চাকর তো নেই তনিমাদের, শুধু ঝি।

এসব গল্প শিশিরের কাছে করেছে এরা এবং এখনকার 'সুবিধে' দিয়ে উপসংহার

~ www.amarboi.com ~

করেছে। কিন্তু সে তো প্রথম প্রথম। এখনো আর সে সুর বজায় রাখা যাবে না।

তৃতীয় এক ব্যক্তি বাড়ি আগলালে ভাল বটে, কিন্তু সারাক্ষণ যে তার উপস্থিতিটাও এদের দু'জনের অবাধ দাম্পত্য জীবনের মাঝখানে 'আগল' স্বরূপ। এখন রসালাপটা সাজিয়ে করতে হয়, এবং কলহালাপটা রাতের জন্যে মুলতুবি রাখতে হয়। সেও চাপা গলায় সারতে হবে। কারণ তখনও তো ওই 'উপস্থিতির' মধ্যে একখানামাত্র সস্তা কাঠের দরজার ব্যবধান!

তিল তিল করে অসহিষ্ণুতা জমছিল, সেটা ক্রমশ বাড়ছে অন্য একটা দিকের ছুতো ধরে। এই বাজারে অকারণ একটা লোক পোষা!

অবশ্য অসিতের অনুভূতি তনিমার মত তীক্ষ্ণ নয়, অসিত ওই দাম্পত্য আলাপের ক্ষেত্রে কদাচিৎ সাময়িক অসুবিধে বোধ করলেও, অসহিষ্ণুতা বোধ করে না। বরং শিশির যখন নিতান্তই হাত শূন্য হয়ে পড়ায় 'আমতা' লাইনে তার দেশের সামান্য জমিজমার ভাগটুকুও জ্ঞাতিদের কাছে বিক্রী করে এলো, তখন রীতিমত ক্ষুব্ধ হয়েছিল অসিত। বলেছিল, 'কেন আমার সিগারেট থেকে ভাগ নিতে এতই লজ্জা হচ্ছিল? আরে বাবা শ্রীমতী এমন ম্যানেজ করে নেয়, অসুবিধে টেরই পেতে দেয় না।'

শিশির সে-কথা মানে।

শিশির বলেছে সে কথা, 'আচ্ছা এই তো তোর বাড়িতে রয়েছি দিব্যিই আছি। তোফা খাওয়া, তোফা শোওয়া। আমাকে নিয়ে সাড়ে তিনজনের সংসার! অথচ দেখ—শিউড়িতে আমার একার সংসারে খরচ এর থেকে বেশী হয়ে যেত। একটা পয়সাও থাকত না মাসের শেষে। নচেৎ আর এমন অবস্থা ঘটে? ভাবছি চাকরি বাকরি একটা জুটে গেলেও তোর এখানেই পেয়িংগেস্ট হিসেবে থেকে যাবো! কিছু জমিয়ে ফেলা যাবে!'

তনিমা হেসে হেসে বলেছিল, 'নিশ্চয় বিয়ের জন্যে।'

'বিয়ের জন্যে!'

শিশির বলেছিল, 'ওটা তো পরিকল্পনায় ছিল না। আপনি জ্ঞানদৃষ্টি খুলে দিলেন।'

কিন্তু সে পরিবেশ আর থাকছে না।

ক্রমশই কথাবার্তা খাওয়া দাওয়ার সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকছে। অসিত যদি বা পুরনো চালে রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর—'কিরে ঘুমুলি নাকি?' বলে এ ঘরে এসে ঢোকে, তনিমা আদৌ না।

তাছাড়া—আজকাল বেড়াতে বেরোলেই—তনিমা 'শামু'কে জবরদস্তি করে ধরে নিয়ে যায়। শামু অরাজী হলে চড়টা চাপড়টা বসিয়ে দিতেও ছাড়ে না। শিশির কী ভাববে, সেকথা মোটেই যেন ভাবে না তনিমা!

মেয়ে নিয়ে এই টানাটানির সময় অসিত বরং বলে, 'থাক না থাক। নাই বা গেল।'

তনিমা জোর গলায় বলে, 'নাঃ সর্বদা বুড়োদের কাছে থেকে থেকে পাকা হয়ে যাচ্ছে।'

~ www.amarboi.com ~

কিন্তু তবুও তো রয়েই গেল শিশির। সেই কুণ্ঠিত কুণ্ঠিত চোখ, সেই অপ্রতিভ মুখ! দেশের সে টাকা আসেনি, জ্ঞাতিরা জমিজমা লিখিয়ে নিয়েছে। টাকাটা পাঠাবার কথা ভুলেছে। অথচ শিশিরের পক্ষে বারবার তাগাদাপত্র দেওয়া শক্ত।

কাজেই তনিমা এখন না বলে পারছে না। 'ভাঁওতা, সব ভাঁওতা।' বলছে, 'এবার অন্য কিছু একটা ব্যবস্থা করতে বল?'

কিন্তু অসিতকে তাতানো যাচ্ছে না।

অসিত বলছে, 'চেষ্টা তো করছে, চাকরি একটা গেলে কি আর সহজে মেলে?' তনিমা বলে, 'পকেট যার শূন্য, তার উচিত হয় না মেজাজ দেখিয়ে কাজ ছাড়া!' 'আহা, শোনোনি কর্তৃপক্ষ কী রকম অপমানটি করেছিল!'

'তা চাকরির ক্ষেত্রে অমন মান অপমান আছেই। তোমরাই বা অফিসে কী-এমন মান্যের ওপর আছো!'

'আছি' একথা অবশ্য বলতে পারে না অসিত, কিন্তু এতদিন পরে হঠাৎ নতুন করে বন্ধুকে উপদেশ দিতেও যেতে পারে না, 'চাকরির ক্ষেত্রে অমন 'মেজাজ', দেখাতে যাওয়া উচিত হয়নি তোমার!'

অসিত বলে, 'হয়ে যাবে এইবার। দেখছো তো কী রকম উঠে পড়ে লেগেছে। এক মিনিট বাড়ি থাকে না।'

তনিমা বেজার গলায় বলে, 'দেখছি বৈকি! যেটুকু উপকার পাওয়া যাচ্ছিল, তাও ঘুচেছে।' এই যে ঝিটা ছেড়ে গেল, যাবতীয় কাজ আমার ঘাড়ে, শুধু নিজের সংসারটি হলে আমি ইচ্ছে হলে রাঁধতাম। ইচ্ছে না হলো পাঁউরুটি খেতাম। তৃতীয় ব্যক্তি থাকলে সেটি হয়?'

অসিত ব্যস্ত গলায় বলে, 'তাতে কি? তাই হওয়াও না। শিশির তো আর পর নয়? আমরা যা খাবো, শিশিরও তাই খাবে!'

তনিমা এবার আরো বেজার গলায় বলে, 'হ্যাঁ বলতে তো আর পয়সা লাগে না। তাই—উদারতার অবতার হওয়া যায়। আমি কিপটে, আমি মন্দ! চালাতে তো আমাকেই হয়? বললে শুনতে খারাপ, আধ পাউন্ড পাঁউরুটিতে শামু শুদ্ধু আমাদের হয়ে যায়। কিন্তু শিশিরের তো একলারই এক পাউন্ড লাগে।'

কথাটা মিথ্যা নয়।

শিশিরের খাওয়া দাওয়া ভাল।

এত অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যেও খিদেটা ঠিকই প্রবল হয় তার, এবং খেয়েও নেয়। কিন্তু সেই কথাটা কি বলবার কথা? অন্তত পুরুষ মানুষ এমন নির্লজ্জ উদঘাটনে বিচলিত হয়। তাই অসিত তাড়াতাড়ি অন্য প্রসঙ্গ এনে ও প্রসঙ্গ চাপা দেয়।

কিন্তু একটা চাপা দিলে আর একটা ফুটে ওঠে।

তনিমা বলে, 'রাজ্যির লোকের পাতের এঁটো বাসন মাজতে মাজতে মারা গেলাম। বাপের বাড়িতে কখনো জল গড়িয়ে খাইনি।

~ www.amarboi.com ~

তনিমা মায়ের একমাত্র মেয়ে। আদুরে মেয়ে, জল গড়িয়ে খায়নি কখনো সত্যি। কিন্তু সে আক্ষেপ এতদিন ছিল না ওর, এখন চাগছে। চাকর বাকর না রেখে শুধু একটা ঝিয়ের সাহায্যে গুছিয়ে সংসারটি করে, অপচয় হতে দেয় না কোনো দিকে, এটাই ওর বিলাস।

তবে পাতের এঁটো শব্দটায় অসিতও বিচলিত হয়। তনিমার মধ্যে যে এ ক্ষোভ সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক, সেটা অনুভব করে অসিত। তাই নিতান্তই লজ্জার মাথা খেয়ে 'ঝি' খুঁজতে বেরোয় অসিত।

তা' চেষ্টার অসাধ্য কাজ নেই।

ঝি খুঁজে নিয়ে তবে বাড়ি ঢোকে অসিত। এ ধরনের ঝি পছন্দ করে না তনিমা, তা জানে অসিত, তবু নিরুপায় হয়েই ডেকে নিয়ে যায়, সেই আড়ে ডুরে শাড়ি পরা, আর কোমরে চাবির গোছা ঝোলানো মূর্তিকেই।

তনিমা বললো 'একে আনলে তুমি? ওই ডুরে পরা আর গুল পোকার টিপপরা ঝি? আমি ভালবাসি?'

'আহা নাই বা ভালবাসলে?' অসিত বলে, 'সবাইকে ভালবাসতে হবে এমন নির্দেশ তো দেয়নি কোনো দিন! ওর কাজ উঠোনে বসে বাসন মাজা! তুমি তো ওর সঙ্গে এক টেবিলে চা খেতে যাচ্ছ না?'

তা' অবশ্য যাচ্ছে না।

তা ছাড়া এক নাগাড়ে, অনেক দিন খেটে খেটে ভাল লাগছিল না আর।...

ঝি-টাকে রেখেই দিল তনিমা।

কিন্তু কে জানতো বিষধর সাপ এনে ধরে রাখলো তনিমা! কয়েকটা দিন যেতেই ধরা পড়লো।

ধরা পড়লো—ঝি কেবল সেই সময় বুঝে বুঝেই শিশিরের ঘরে যায় ঝাড়তে, মুছতে, যখন শিশির ঘরে থাকে।

শিশিরের জামা কাপড়গুলো ভাল করে ঝেড়ে ঝেড়ে শুকোতে দিতে ইচ্ছে করে ঝি নমিতার।...শিশিরের স্নানের জল তুলে রাখতে আলস্য হয় না।

এগুলো তনিমার অসিতকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে ইচ্ছে করে না।

তনিমা সংসারের গৃহিণী নয়? সংসারের কল্যাণ অকল্যাণ দেখা তনিমার কর্তব্য নয়!

অথচ ভবিষ্যতের অকল্যাণবাহী এতবড় একটা ঘটনাকেও কিনা উড়িয়ে দেয় অসিত। বলে, 'ব্যাচিলার-দের উপর স্নেহপ্রবণা মহিলাদের স্নেহ একটু বেশীই পড়ে।'

কিন্তু সে তো না হয় মহিলাদের?

পুরুষদের?

ব্যাচিলার পুরুষদের কি হয়? সেই 'জামাই আর শ্বশুর বাড়ির গল্পে'র জামাইয়ের অবস্থা হয় না ব্যাচিলার পুরুষের? সাধাসাধি করে কাঁঠাল খাওয়ানো যায় না তাকে, অথচ রাত্রে শ্বশুর বাড়ির সকলের ঘুমের অবসরে জামাই উঠে কাঁঠালের খোসা খেতে বসে।

তা এটাই বোধকরি স্বাভাবিক!

~ www.amarboi.com ~

নইলে আর গল্পে আশ্রয় পায় মানুষের এই দুর্বলতার হাস্যকর কাহিনী? এতদিন ধরা পড়েনি শিশিরের এই বিকৃতি, এখন পড়ছে। অলস মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা তো?

বিয়ের বয়সে বিয়ে করলেন না বাবু, ভারী অহঙ্কার 'বিয়ে করব না।'

অতঃপর? অতঃপর যে—

ছি ছি ছি!

আরক্ত মুখে বলে তনিমা, লজ্জায় মাথা কাটা যায় আমার! নমিতা বাসন মাজছে, শিশিরের ওই উঠোনের কলেই মুখ ধোওয়া চাই—।

অসিত অবাক হয়, 'কোথায় ধোবে তা হলে?'

কারণ ওইটাই এ বাসার প্রধানতম কল। অসিতও ওইখানেই ধুয়ে থাকে।

তনিমা রুদ্ধকণ্ঠে বলে, 'বুঝলাম ওই খানেই ধোবে, কিন্তু তার সময়ের একটা লিমিট আছে তো? তা নয় ধুচ্ছে তো ধুচ্ছেই। আর দৃষ্টি নমিতার দিকে। কী আর বলবো তোমাকে, ওটাও তো পাজী, ইচ্ছে করে মাথার কাপড় খুলে গা দুলিয়ে দুলিয়ে, ইস সে তোমাকে আমি খুলে বলতে পারব না।'

অসিত গম্ভীর হয়।

অসিত বলে, 'ওটাকে দূর করতে হবে।'

তনিমা হঠাৎ এমন ফার্স্ট ক্লাশ ফার্স্ট রেজাল্টের আশা করেনি। তাই থতমত খেয়ে বলে, 'দূর করার কথা বলিনি—'

'তুমি বলনি, আমি বলছি—' অসিত দৃঢ় গলায় বলে, 'ঝি আর মিলবে না শহরে?'

ঝি! ওঃ!

তনিমার আরক্ত মুখটা আরো আরক্ত হয়। আর সে মুখ কালো হয়ে যায় যখন পরদিনই অসিত কোথা থেকে একটা শুঁটকি বুড়ি ঝি এনে নমিতাকে বিদায় দেয়।

তা' তনিমার অভিযোগ যে পুরোপুরি সত্যি, সে কথা অসিতের চোখে এত দিনে ধরা পড়ে। যে শিশির ইদানীং গল্প করা প্রায় ছেড়েই দিয়েছে, রাতদিন ঘোরে আর পায়চারি করে, শামুর সঙ্গে গল্পও প্রায় নেই বললেই হয়, সেই শিশির কিনা নিজে থেকে ডেকে ব্যঙ্গ হাসি হেসে অসিতকে বলে, 'এই অপূর্ব 'মাল'টিকে আবার কোথা থেকে জোটালি অসিত? ও পারবে বাসন মাজতে?'

অসিত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি প্রসারিত করে বন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়ে, গম্ভীরভাবে বলে, 'বাসন মাজতে ঠিকই পারবে, ওই করে করে হাড় পাকা! তবে অন্য কিছু হবে না—ওর দ্বারা!'

শিশির অবোধ সাজে, শিশির ন্যাকা সাজে। শিশির বলে ওঠে, 'তা' আরও তো কাজ আছে? কয়লা ভাঙা মশলা পেষা, ঘর মোছা, সে সব তো তাহলে শ্রীমতীর ঘাড়ে পড়বে? কেন তোমার আগের লোকটা তো বেশ ভালই কাজ করতো? হঠাৎ ছাড়ালে কেন?'

অসিত এই নির্লজ্জতার দিকে তাকিয়ে অবাক হয়। অসিতের আর সন্দেহ থাকে না। অসিত তাই চিবিয়ে চিবিয়ে বলে, 'হ্যাঁ ছাড়ানোটা বড় হঠাৎ হয়ে গেছে দেখছি।'

~ www.amarboi.com ~

শিশির এই অভিব্যক্তির রহস্য ধরতে পারে না, চুপ করে যায়। ভাবে হয়তো তনিমার মুখে চোপা করেছিল ঝিটা, ওদের তো 'মুখ' খুব।

কিন্তু ডুবে পরা ঝি ছাড়িয়ে পাকাটির গোছা নিয়ে এসেই কি সংসারের পবিত্রতা রক্ষা করতে পেরে উঠবে অসিত?

অলস মস্তিষ্ক যে শয়তানের কারখানা!

যে মস্তিষ্ক প্রায় সাত মাস কাল অলস হয়ে বসে আছে, সে তো ঘোরতর 'কারখানা' হয়ে উঠবে।

অসিতের প্রাণের বন্ধু যে অসিতকে দেখিয়ে চাকরি খোঁজার ছুতোয় নটার সময় বেরিয়ে গিয়ে ভরদুপুরে ফিরে আসে, সেটার কী অর্থ করবে অসিত?

অসিত ভুরু কুঁচকে বলে, 'দুপুরে ফিরে আসে মানে? আমি ফেরার পর তো ফেরে দেখি। ধুঁকতে ধুঁকতে ফেরে!'

তনিমা বাঁকা হাস্যে বলে, 'বুদ্ধিমানেরাই ভাল অভিনেতা হয়, জানো না? দেশের জমি বিক্রী করে আসার অভিনয়টা তো দেখলে?'

তা' দেখেছে বৈ কি অসিত। সে টাকা আর এলো না।

অসিত চঞ্চল পায়ে পায়চারি করতে করতে রুক্ষস্বরে বলে, 'এসে কী করে?'

'করেন না কিছুই অবশ্য—তনিমা ভুরু তুলে বলে, 'নিজের ঘরেই থাকেন, তবে চোখ জোড়া দালানের জানলায় ফেলে রাখেন এই যা। অথচ আমি তো আর বলতে পারি না, জানলাটা তুমি বন্ধ করে দাও বাপু, এখানে এখন আমি খাচ্ছি টেবিল পরিষ্কার করছি কাজ করছি—'

'পারবে না কেন? বলবে!' অসিত কড়া গলায় বলে, 'তুমি না পারো আমাকেই বলতে হবে।'

'এই সেরেছে!' তনিমা বলে ওঠে, 'আমার একটু অস্বস্তির জন্যে তোমাদের বন্ধু বিচ্ছেদ হয় এ চাই না। নেহাৎ একা থাকি অস্বস্তি হয় তাই বলছিলাম। তুমি যেন ওই দুপুরে আসাটাসা নিয়ে কিছু বলতে যেও না বাপু, লজ্জায় মরে যাব আমি। ও যদি নিজের দ্যাওর হতো আমার, আর বেকার হতো, থাকতো তো দুপুরে বাড়িতে।'

অসিত তনিমার এই ব্যস্ত মুখের দিকে তাকিয়ে একবার ভুরুটা জড়ো করে। বলে, 'হুঁ'।'

সেই 'হুঁ'র পিছনে ঠিক কি আছে বুঝতে পারে না তনিমা। কেন কে জানে বুকটা কেঁপে ওঠে তার।

কিন্তু সেই বুক কাঁপার জের যে পরদিন দুপুরেও ধাক্কা দেবে, কে জানতো? নিস্তব্ধ আর নিঃশব্দ দুপুরে দরজার কড়া নড়লো।

বুকটা কেঁপে উঠল তনিমার।

তবু খুলতেই হল দরজা।

বাইরে তো দাঁড় করিয়ে রাখতে পারে না মানুষটাকে?

~ www.amarboi.com ~

কাঁপা হাতে দরজা খুলে দেয় তনিমা, আর সঙ্গে সঙ্গে এই ধারণাই তাকে শিথিল করে দেয়, অসিতের কাছে অপমানিত শিশির শোধ নিতে এসেছে।

হয়তো বলবে, 'কলঙ্ক নিয়েই যদি বিদায় নিতে হয়, মিথ্যে কলঙ্ক নিয়ে বেরোবো কেন?'

বাইরের দরজা খুলে দিয়ে তাই তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে এসে ঢুকে পড়ে তনিমা। ঘরের দরজাটাতে যদি দুম করে খিল লাগাতে পারতো।

কিন্তু সেটা পারা শক্ত।

অচেনার কাছ থেকে আত্মরক্ষা সহজ, নিতান্ত চেনার কাছ থেকে যে বিপদ আসে, তার থেকে রক্ষা পাওয়া—

হ্যাঁ নিতান্ত চেনা বলেই শিশির ওর ঘরের মধ্যেই এসে ঢোকে। বলে, 'হঠাৎ ভরদুপুরে ভূতের মত এসে উদয় হয়ে ভয় পাইয়ে দিলাম নাকি শ্রীমতী তনিমাকে? শুনুন—।

তনিমা অস্ফুট কণ্ঠে বলে, 'না না!'

'বাঃ প্রস্তাব পেশ হবার আগেই না? শুনুন—এতদিনে আমার দয়াময় জ্ঞাতি কাকারা সেই টাকা পাঠিয়েছেন। আটশো মত আছে, শ খানেক রাখছি নিজের কাছে, বাকিটা আপনাকে নিতে হবে।'

তনিমা আরো রুদ্ধকণ্ঠে বলে, 'না না আপনার পায়ে পড়ি—'

শিশির অবাক হয় বৈ কি।

এটা তো সে আশা করেনি। বরং ইদানীং তনিমার ভাবভঙ্গীতে এর বিপরীত ভাবই ফুটতে দেখেছে। সেটা কি তাহলে শিশিরের বোঝবার ভুল? নিজের মনের পাপ?

লজ্জায় মাথা কাটা যায় শিশিরের। ইদানীং ওই মহিলাটি সম্পর্কে কত কিই ভেবেছে শিশির। টাকাটার জন্যে তাই তাগাদার ওপর তাগাদা করেছে দেশে চিঠি লিখে লিখে অথচ সে ভাব ধরা ছোঁওয়া যায় না। তার উপর নির্ভর করে মান অভিমানের পালা গেয়ে চলে যাওয়াও কঠিন!

আশ্চর্য!

টাকার ব্যাপারে এত সঙ্কুচিত হচ্ছে তনিমা?

অতএব শিশিরকে বেশ উদাত্ত হতে হয়। কী মুস্কিল! মনে হচ্ছে যেন ফাঁসি কাঠে ঝোলাতে চাইছি আপনাকে।...নিন নিন ধরুন। দীর্ঘদিন তো আপনাদের অন্ন ধ্বংসালাম, পাঁচফোড়নের খরচাটা অন্ততঃ দিতে দিন। এর পরও কি ছাড়ান আছে না কি আপনার? আপনার হাতের রান্নার লোভে পাকাপাকি ব্যবস্থাই করতে হবে। সুখবরটা দিয়েই দিই, বিধি যেদিন মাপান, উপরি উপরি চাপান!...অবশেষে বিড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়লো—! পেয়ে গেলাম একটা গভীরতম এবং বিশ্বাসযোগ্য আশ্বাস! পর্শু ইন্টারভ্যু দিয়ে এসেছিলাম, আজই ফয়সালা হয়ে গেল। সামনের দশ তারিখ থেকে লেগে পড়তে হবে।...শিক্ষা বিভাগে রুচি নেই আর। স্রেফ কেরানীগিরি। তবে মাইনেটা খারাপ নয়।

~ www.amarboi.com ~

নিজের দরকার মত রেখে অসিতটার হেল্প স্বরূপ শ দুই মত দিয়েও বিয়ের জন্যে কিছু জমাতে পারা যাবে!

হা হা করে হেসে ওঠে শিশির।

কিন্তু এতক্ষণ ধরে কী বলে চললো শিশির নামের ওই সরল ছেলেটা? তনিমা কি কথাগুলোর মানে বুঝতে পেরেছে? তনিমার কানেই কি ঢুকেছে?

না কথাগুলো তনিমার কানে ঢোকেনি বোধহয়। শুধু মস্তিষ্কের স্নায়ুতে গিয়ে ধাক্কা দিয়েছে।...আর এখন ওই দরাজ হাসিটা যেন সেখানে ড্রাম পিটিয়ে দিল।

এই স্তব্ধ দুপুরে ও অমন করে হেসে উঠবে কেন বোকার মত? ওর চিরদিনের বন্ধু এসে হঠাৎ ওর ঘাড় ধরবে বলে?

হ্যাঁ ঘাড়ই ধরলো অসিত।

চিরদিন গলা ধরেছে। আজ ঘাড় ধরলো।

আচমকা পিছন থেকে এসে—নিশ্চিন্ত মানুষটার ঘাড়ে হাত দিয়ে রূঢ় ব্যঙ্গের গলায় বলে উঠলো 'বাঃ চমৎকার! তনিমা, এই জন্যেই বুঝি আগে থেকে সাফাই গেয়ে রেখেছিলে? খুব চালাক তো? কিন্তু একটু বোকামী করে ফেলেছ। রাস্তার দরজাটা কি খুলে ফেলে রাখে? খিল লাগাতে হয়। বুঝলে? খিল লাগাতে হয়!'

শিশির ঘাড়টা ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করে বলে, 'কী বকছিস পাগলের মত? দিনে দুপুরে হঠাৎ মদ খেয়ে এলি না কি?'

'সাট আপ! শয়তান!' অসিত আর একবার মোক্ষম করে চেপে ধরে গলাটা। বলে, 'এখুনি টিপে শেষ করে দিতে পারতাম, তবে দেব না। তোমার শ্রীমতী তনিমা কাঁদবে। তা কতদিন এ ব্যবসা চলছে তনিমা? টাকাটা তো বেশ মোটাই দেখছি।...

'অসভ্য বাঁদর!' শিশির ওর হাত থেকে আর একবার নিজেকে মুক্ত করে বলে, রাসকেল ছোটলোক, সত্যি নেশা করে এসেছিস নাকি? তোর মনের মধ্যে এত ক্লেদ? আর আমি নিশ্চিন্তে তোর ভাত গলা দিয়ে নামিয়েছি? আচ্ছা সুদে আসলে সেই ভাতের দাম তোকে দিয়ে যেতে চেষ্টা করবো। আচ্ছা গুড বাই!

দৃপ্ত পদক্ষেপে বেরিয়ে যায় শিশির হতচকিত অসিতের সামনে দিয়ে। নিষ্পাপ অগ্নিশিখার মত।

অভিনেতা বৈ কি! জাঁহাবাজ অভিনেতা। ও যদি নিষ্পাপ তো তনিমা অমন পাংশু মুখে জড়োসড়ো হয়ে বসে আছে কেন পাপের প্রতিমূর্তির মত?

~ www.amarboi.com ~

ঝাঁকুনি

'দাদা'!

রুষ্ট ক্ষুব্ধ তীব্র ডাকটা পিছনে আছড়ে পড়লো একটা চাবুকের আস্ফালনের মত।

শচীশ ফিরে তাকালো।

একজোড়া আগুন জ্বলা চোখের সঙ্গে চোখাচোখি হলো। তবু শচীশ বিচলিত হলো বলে মনে হলো না।

বললো, 'ডাকলি তো পিছু? দেখি আবার মোটর এ্যাকসিডেন্টে খতম হই কিনা।'

রত্না ক্রুদ্ধ স্বরে বলে, 'বালাই ষাট, খতম হতে যাবে কী দুঃখে? তোমার সুইট হার্টের এয়োতের জোর নেই?'

'ওইটাই যা ভরসা! নইলে তো তোর ইচ্ছা শক্তির জোরে এতদিন কবেই ফিনিস্ হতাম!'

'থামো! যাচ্ছই তা'হলে বড়লোক বন্ধুর মোটরে চেপে ধন্য হ'তে? লজ্জা বলে বস্তু কি তোমার শরীরে একেবারে নেই দাদা?'

শচীশ হাতের সৌখিন এ্যাটাচিটা দোলাতে দোলাতে বলে, 'ও বস্তুটা শরীরে থাকে, কি মনে থাকে, এখনো নির্ধারিত হয়নি।'

'চুপ করো! কথার কায়দা তোমার বন্ধুর বোনকে দেখিয়ে বাহবা নিয়ো, আমার কাছে বাহবা পাবে না। সোজা জবাব দাও, যাচ্ছ তা'হলে মোটরে রাঁচী?'

শচীশ অপ্রতিভতাটুকু ঢাকতে বেশী করে সপ্রতিভ হয়, 'হঠাৎ নতুন করে অবাক প্রশ্নের মানে? যাবারই তো ঠিক ছিল—।'

'কাল রাত্রের ঘটনার পরও সেই ঠিকটা ঠিকই থাকলো?'

কি মুস্কিল! রাত্রের ঘটনাটা শেষ অবধি তো কোনো অঘটন ঘটায়নি? সবই যখন আবার ঠিক হয়ে গেল, তখন আর প্রোগ্রামটা বেঠিক হয় কেন?'

'আবার যদি তেমন হয়?'

'হলে জানা ব্যাপারই হবে! বেশী ঘাবড়াতে হবে না। ডাক্তারবাবুকে বলে রেখে যাচ্ছি দুপুরে দেখে যেতে—।'

'ওঃ তা'হলে তো মস্ত কর্তব্য করে ফেলছো। কাল অঘটন ঘটেনি বলে যে আজও ঘটবেনা এমন গ্যারান্টি আছে?'

শচীশ হেসে ওঠে।

দস্তুর মত গলা ছেড়ে হাসে 'গ্যারান্টি? গ্যারান্টি কথাটার সত্যি কোনো মানে আছে?

~ www.amarboi.com ~

এই যে আমি বেরোচ্ছি, ফিরে আসবার কোনো গ্যারান্টি আছে?'

'দেখো দাদা—' রত্না উগ্র হয়, 'ওসব সস্তা সেন্টিমেন্ট দেখিয়ে মাকে কাবু করতে পারো, আমায় পারবে না! আমি বলছি তোমার আজ যাওয়া হবে না। চার চারটে দিন বাড়ী ছেড়ে থাকা চলবে না তোমার!'

'চার চারটে! ফোঃ। বছরের তিনশো পঁয়ষট্টি দিনের মধ্যে মাত্র চারটে দিন! অথবা জীবনের—'

'চুপ করো! কথার প্যাঁচ থামাও! আমি বলছি তোমার যাওয়া বন্ধ করতে হবে।'

'স্মরণে আসছেনা তুমি আমার গার্জেন কিনা। কাজেই—'

গার্জেন না হতে পারি, তবু এটুকু বলবার অধিকার আমার আছে। তুমি এতবড় ছেলে থাকতে, মা বাবার সব দায়িত্ব আমি নেব কেন?'

'তুমি' সব নিচ্ছ? চমৎকার! তা'হলে তো দেখছি রাঁচীই আমার পক্ষে শ্রেষ্ঠ জায়গা!'

'না না, বলা ভুল হয়েছে আমার—' রত্না বিদ্রূপের তিক্ত গলায় বলে, 'অনেক দায়িত্ব তুমি নাও বৈকি। বাড়ীতে থাকলে দয়া করে ডাক্তারকে ডাকতে যাও, মাঝরাত্রে বাপ হার্টফেল্ করতে বসলে, সুখনিদ্রা ছেড়ে উঠে এসে তাঁর মাথায় বাতাস দাও! কম কর না? কিন্তু ওতেই হয় না, বুঝলে? অন্য বিষয়ে এক তিল ভাবো? তোমার সাজের বাহার দেখলে কেউ বুঝতে পারবে, তোমার মা আজ দু'বছর প্যারালিসিস্ হয়ে পড়ে আছে, আর হার্টের রুগী বাপ যে কোন মুহূর্তে মরতে পারে?

'দেখ্ রত্না, বোকার মত কথা বলিস না। মা বাপের অসুখ করেছে বলেই 'কাছা' গলায় দিয়ে বেড়াতে হবে? না কি সাজের মাধ্যমে সবাইকে বুঝিয়ে বেড়ানোই খুব সম্মানের—ওগো দেখ আমি কি দুঃখী! আমি কি হতভাগ্য!'

'সাজের পিছনে পয়সাও কম যায় না। তোমার ওই ডেক্রনের সার্ট আর টেরিলিনের প্যান্ট দেখলে লোকে—'

'দেখলে লোকে মোহিত হয়ে যায় বুঝলি?'

'তা' যাবে বৈকি! কিন্তু আমি বলছি আমি এত দায়িত্ব নিতে পারব না! দু'দুটো মুমূর্ষু রোগী। আমি মেয়ে আমার ঘাড়ে সব চাপিয়ে দিয়ে তুমি পালাতে পাবে না। তোমার তো সম্পূর্ণ দায়িত্ব নেওয়া উচিত।

শচীশ এবার কৌতুকের গলা ত্যাগ করে। কঠোর গলায় বলে, 'কেন? সম্পূর্ণ দায়িত্ব নেওয়া আমার উচিত কেন? এ যুগের আইন তো-তা' বলে না? মেয়ে ছেলের তো সমান অধিকার! তা' সমান অধিকারটা বুঝি কেবল বিষয় সম্পত্তির বেলায়? দায়িত্বের বেলায় নয়?'

'বিষ—য় সম্প—ত্তি!'

রত্না তাচ্ছিল্যের সুরে কেটে কেটে বলে, 'উঃ কত বিষয় সম্পত্তি! সম্পত্তি বলতে তো এই তোমার ভাঙা ইঁটের খাঁচা খানা!'

'ওহো হো! তাতে' কি?' শচীশ আর একদফা হেসে নেয়, 'আইন ইজ্ আইন!

~ www.amarboi.com ~

একখানা ইঁট নিয়েও হাইকোর্টে মামলা চলে: সম্পত্তি বেশী নেই বলে নিয়ম কিছু রদ হবে নাকি?'

রত্না হাত জোড় করে বলে, 'দোহাই তোমার দাদা তোমার এই ভাঙা ইঁটের ওপর এক বিন্দু মোহ নেই আমার, ও নিয়ে হাইকোর্টে মামলা করতে যাব না। তুমি দয়া করে সংসারের ভার নাও, আমি বিদায় হয়ে যাব।'

'হ্যাঁ, ওসব লম্বা কথা রাখ্! কাকাও তো বরাবর বলতো, 'আমার ছেলে নেই, আমার যা কিছু শচীশ তোকে দিয়ে যাবো!' দি'ল? শালার ছেলেকে দিয়ে দিলে, তবু—।

'সবাইকে একরকম ভেবো না দাদা! তা' ছাড়া যেমন তুমি গুণের ভাইপো! রাতদিন মুখের ওপর চোটপাট, রাতদিন ব্যঙ্গবিদ্রূপ।

'তা রাতদিন তোয়াজ করবো নাকি, উনি মরণকালে আমায় ওঁর ভাগের সেই ভাঙা ইঁট ক'খানা দিয়ে যাবেন, এই নির্লজ্জ আশায়? ছিঃ।

'ছি! ও বাবা! আবার ছি!' রত্না বিদ্রূপের গলায় ব'লে, 'তোমার মুখে ও শব্দটা ভূতের মুখে রাম নামের মত শোনালো দাদা। শুনতে পাই 'মেরি'র দাদার কাছে না কি তোমার আকণ্ঠ ধার? তবু ওদের সঙ্গে গলাগলি কর'তে ঘেন্না করে না তোমার?'

'দেখ রত্না, লজ্জা, ঘেন্না, বিবেক, পাপ ওসব শব্দগুলো বড় সেকেলে হয়ে গেছে! একেবারে আউট অফ্ ফ্যাশ্যন!'

'বটে না কি! কিন্তু জেনো দাদা, যতই তুমি অঙ্গে হাল ফ্যাশ্যনের ছাপ মারতে যাও, তোমার ওই ফ্যাসানি 'বুলবুল' তোমায় বিয়ে করবে না!'

'বিয়ে? বুলবুল?' শচীশ হো হো করে হেসে ওঠে, 'বিয়ের-স্বপ্ন আবার কে দেখছে? ওকে বিবাহ করিবে যে, গোকুলে বাড়িছে সে! ওর 'ভাবী বর তো আমেরিকায়—জানিসনা?

'দাদা!'

আবার একটা চাবুক পড়ে।

'এই কথা জেনে শুনে হ্যাংলার মত তার ছায়ায় ছায়ায় ঘুরছো? তার সঙ্গে একটু বেড়াতে যাবার জন্যে মুমূর্ষু মা বাপকে ফেলে ডেক্রনের সার্ট উড়িয়ে বেরিয়ে যাচ্ছ!'

শচীশ এবার কৌতুকাভিনয় ত্যাগ করে সিরিয়াস হয়। তীব্র কঠোর গলায় বলে, 'তা' সেটা না করে ছিন্ন বসন আর মলিন গেঞ্জি পরে বাড়ীতে বসে থাকলেই মা বাপ সেরে উঠতেন? বাড়ী বসে থাকা মানেই তো বসে বসে হাঁপানির নিঃশ্বাস গোনা আর কাৎরানি শোনা? কর্তব্যের ওই পুণ্য স্বর্গে আমার কিছুমাত্র লোভ নেই ভগ্নি, তুমিই বসে বসে স্বর্গের সিঁড়ি গাঁথো—'

ঘড়িপরা হাতটা চোখের সামনে তুলে ধরে শচীশ, চমকানোর ভান করে, লাফিয়ে দালান থেকে উঠোনে নামে, বলে 'আচ্ছা! আবার সেই বুধবারে—'

রত্নার মুখটা আগুনের মত হয়ে ওঠে।

রত্না আশা করেছিল হয়তো দাদাকে লজ্জা দিয়ে ধিক্কার দিয়ে যাওয়াটা স্থগিত রাখতে

~ www.amarboi.com ~

পারবে, হল না দেখে রত্না ফেটে পড়ল।

রত্না নিতান্ত কটু স্বরে বলে উঠলো 'ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করবো এসে যেন তুমি মা বাপের মরামুখ দেখো!'

বলে ফেলেই চমকে উঠল রত্না, নিজের জিভ আর নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারল না। কিন্তু উপায় কি? বলা কথাকে তো আর ফেরানো যায় না?

শচীশ অবশ্য ওর অভিসম্পাতে বিচলিত হল না, গলা ছেড়ে হেসে উঠে বললো, 'ওর থেকে আরো উচ্চাঙ্গের প্রার্থনা করতে পারতিস! বলতে পারতিস সত্যিই মোটর এ্যাকসিডেন্ট হোক, দাদা যেন মরামুখ নিয়ে মুখ দেখাতে আসে—'

হাসতে হাসতে বেরিয়ে যায়, বাইরের দরজাটা সজোরে বন্ধ করে দিয়ে।

আর এতক্ষণ পরে রত্নার সব আগুন ফুটন্ত জল হয়ে বেরিয়ে আসে!

কী কুকথাই বেরোলো তার মুখ দিয়ে!

যদি সত্যিই তেমন ঘটে?

এই তো কাল রাতেই তো বাবার প্রায় নাড়ি ছেড়ে গিয়েছিল, শ্বাস উঠেছিল। কোনমতে সামলে গেলেন তাই! আবারও সে অবস্থা আসতে পারে।

আর যদি সত্যিই মৃত্যু আসে? গভীর রাত্রের সুযোগে! অসতর্কতার ছিদ্র পথে?

একা রত্না কী করবে?

বাবার কিছু হলে মাই কি বাঁচবেন আর? হয়তো খাটথেকে লাফিয়ে নামতে যাবেন, হয়তো সেই চেষ্টায় হুমড়িখেয়ে পড়ে যাবেন।

আর পড়ে গেলে কি আর উঠবেন?

রত্নার মনে হয় সত্যিই বুঝি সেই সব ভয়ঙ্কর ঘটনাগুলো ঘটছে, ঘটলো। তারপর? তারপর একা রত্না দুটো মৃতদেহ আগলে—

কপালটা ঠাঁই ঠাঁই করে দেওয়ালে ঠুকতে ইচ্ছে করলো রত্নার।

কিন্তু ইচ্ছেটা কাজে পরিণত করবার অবকাশ কোথায়? ঘরের ভিতর থেকে ভীষণভাবে কাসির শব্দ আসছে।

তার মানে হেমলাল কাসছেন!

মরণান্তক সেই কাসি।

যে কাসি থেকে চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসার ভয়।

ছুটে ঘরের মধ্যে গেল রত্না।

দেখল বাবা বুকে বালিশ দিয়ে বসবার চেষ্টা করছেন।

'বাবা তুমি নিজে বসছো? কী আশ্চর্য্য! বলবে তো—'

হেমলাল খিঁচিয়ে ওঠেন, 'বলবো? কাকে বলবো? দেওয়ালকে?'

'বাঃ এই একটু আগেই তো ছিলাম এখানে—'

'ছিলে! এখন আর নেই! পাজীটা গেল কোথায়?'

রত্না গম্ভীর ভাবে বলে 'জানিনা'।

'জানোনা? তুমি জানোনা?.আমার সঙ্গে চালাকি? ছেলে ভুলোচ্ছো?'

~ www.amarboi.com ~

'বাঃ আমি কি করে জানবো? তোমাদের বলেনি, আমায় বলবে?'

'আমাদের? আমাদের বলবে?' হেমলাল যেন তেতো ছিটিয়ে দেন সারা ঘরটাতেই।' আমরা আবার মানুষ? আমরা তো দুটো আপদ বালাই গলগ্রহ। চোর হয়ে পড়ে আছি, জিগ্যেস করবার সাহস পর্য্যন্ত হয় না সাহেব আপনি যাচ্ছেন কোথায়? 'রাঁচী রাঁচী' শুনলাম মনে হল?'

'আমিও শুনেছি মনে হচ্ছে—' রত্না গম্ভীর গলায় বলে, 'বন্ধুর সঙ্গে মোটরে রাঁচী যাচ্ছে!'

'বাঃ বাঃ! চমৎকার!'

হেমলাল ঘৃণায় যেন বমি করে দেবেন, 'একেই তো বলে শিক্ষা! একেই তো বলে সভ্যতা! মা বাপ দু'দুটো প্রাণী মরতে বসেছে, আর বাবু চললেন প্রমোদ ভ্রমণে! ছেলে আমার গ্র্যাজুয়েট গো! শিক্ষিত ছেলে!'

ওপাশের দেয়ালের ধারে শুয়ে থাকা গিরিবালাও মুখটা বিকৃত করে বলেন, 'ভগবান! কবে নেবে আমাকে।'

রত্না ওষুধ ঢালতে যাচ্ছিল, হঠাৎ ওই ঘৃণায় কুৎসিত দু'খানা মুখের দিকে তাকিয়ে থমকে দাঁড়ায়। আর অদ্ভুত একটা কথা বলে বসে!

আশ্চর্য্য, এ কথাটা কি রত্নার মুখ দিয়ে বেরোবার কথা? এই কিছুক্ষণ আগে ভাইয়ের সঙ্গে যে তর্কাতর্কি করছিল রত্না, তার সঙ্গে কি এখনকার কথার কোনো মিল আছে?

অথচ মিল থাকাই তো উচিত ছিল! মা বাপের সঙ্গে গলা মিলিয়ে রত্নারও তো ভাইয়ের কর্তব্যজ্ঞানের নিন্দে করবার কথা! ছিছিক্কার করবার কথা স্বার্থপর হৃদয়হীন দাদাকে!

কিন্তু যা হবার কথা তা হল না।

রত্না বলে উঠলো, 'তোমাদেরই বলি বাবা, 'চমৎকার!' সে একটা মানুষ তো? রক্ত মাংসের মানুষ! কত আর পারবে রোগীর সঙ্গে রোগী বনে থাকতে? বাড়ি থেকে পালাই পালাই করবে না? আছে কি বাড়িতে? মানুষের টিঁকবার মত? দম আটকে আসে না? প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে না? তাও তো ঘরের পয়সা খরচ করে যাচ্ছে না, পরের পয়সার ওপর দিয়ে শখ মেটানো। এ তো বরং একদিক থেকে লাভই! গেরস্তর চারদিনের রেশনটা বাঁচবে!'

হেমলাল থতমত খান।

হেমলাল এই উল্‌টো বাতাসের থই পাননা। অবিশ্বাস্য বিস্ময়ে শুধু বলেন, 'রেশন বাঁচবে?'

'বাঁচবেই তো! তাই বা কী কম লাভ?'

হেমলাল 'কিংকর্তব্যবিমূঢ়' অবস্থায় মিনিট খানেক তাকিয়ে বলেন, 'তা'হলে—তা তুমিই বা এই দম আটকানো বাতাসে পড়ে আছ কেন? যাও বন্ধুর মোটরে হাওয়া খেতে! রেশন বাঁচাও—'

'আমার কথা বাদ দাও'—বলে ওষুধের শিশিটা জোরে জোরে ঝাঁকাতে থাকে রত্না। ঝাঁকুনি খেয়ে তলার 'সার' টুকু ওপরে উঠে আসে ফেনা হয়ে।

~ www.amarboi.com ~

প্রতারক প্রতারণা

খানিক আগে, অথবা অনেক খানিকটা আগে যার মৃত্যু ঘটে গেছে তার হিম অঙ্গের শীতলতা অনুভব করতে গিয়ে নিজের হাতের আঙুল ক'টায় কোনো সাড় খুঁজে পেলো না বারীন! অনুভব করতে গিয়ে শুধু অসাড় হাতটা কেঁপে উঠল থরথরিয়ে।

এই কাঁপাটা হাহাকারের নয়, ভয়ের।

অথচ এই ভয়ঙ্কর মুহূর্তে হাহাকারই তো আসবার কথা। অথবা কথা নয়, মৃত্যুর ঘটনার সঙ্গে সঙ্গেই যে অনুভূতিটা বুক হিম করে দেয়, সেটা ওই ভয়ই। ভয়! ভয়ের পরে—কী ঘটে গেল ভাবতে গিয়ে হাহাকার, তারপরে শোক। তার অনেক পরে! দিনে দিনে তিলে তিলে।

কিন্তু এখন বারীন, ওই প্রথমটার কবলেই পড়ল। দুরন্ত একটা ভয়ে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল তার।

চিত্রা মরে গেল!

চিত্রা আজকের দিনে তাকে এই উপহার দিল! চিত্রা সেই একটা তুচ্ছ কারণকে এতবড় করে তুলল!...

চিত্রা আত্মহত্যা করল!

এ কী অবিশ্বাস্য একটা ঘটনা!

ওই খাটের উপর পাণ্ডুর বিবর্ণ মুখে যে মেয়েটা এলোমেলো ভাবে পড়ে রয়েছে, ও কি সত্যিই চিত্রা?

এই বাড়ি, বাড়ির এই ঘর, এসব বারীনের! ঘরের মাঝখানে যে লোকটা দাঁড়িয়ে রয়েছে, নিঃশঙ্ক চিত্তে এসে 'চিত্রা' 'চিত্রা' ক'রে ডাকতে ডাকতে, হঠাৎ ভয়ের থাবার মধ্যে পড়ে গিয়ে হিম হয়ে গেছে, সে কি বারীন?

পাশের দেয়ালের দিক থেকে বারীনদের বিয়ের সময়ে পাওয়া ড্রেসিং টেবিলটা যে বারীনকে দুর্নিবার আকর্ষণে টানছে, তবু বারীন সাহস করে তাকাচ্ছে না। তাকালে যদি দেখা যায় সত্যিই ও বারীন! ওরে বাবা!

বারীন জোর করে ওই আকর্ষণ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে, বারীন এ দিকের দেয়ালে তাকিয়ে থাকে। যে দেয়ালে একটা ক্যালেন্ডার ঝুলছে।

কিন্তু ক্যালেন্ডারের মধ্যেও যে ভয়ের বাসা!

ওর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতেও তো মাথা ঝিমঝম্ করে আসছে।

আজকের তারিখটা কি?

~ www.amarboi.com ~

বারীন কি স্মৃতিশক্তি হারিয়ে ফেলবে? বারীন কি শুনতে ভুলে যাবে? শুনতে ভুলে না গেলে, স্মৃতিশক্তি হারিয়ে না ফেললে, তক্ষুনি তো ধরা পড়ে যাবে, আজ এগারোই আগস্ট, আজ বারীন আর চিত্রার বিয়ের তারিখ!

কিন্তু তারপর!

তারপর কী বলবে ওই ক্যালেন্ডারটা?

কী বলবে তা জেনে ফেলেছে বারীন। বারীন জানে ওই ক্যালেন্ডারের পাতাটা বাতাসে দুলে দুলে অবলীলায় উচ্চারণ করবে, আজ চিত্রার মৃত্যু তারিখ।

আর—বারীনের আর চিত্রার উভয়কুলের সমস্ত আত্মীয় বন্ধু আর পরিচিত জনেরা অবিশ্বাস্য বিস্ময়ে ফিসফিস করে বলবে, 'শুনেছ? চিত্রা তাদের বিয়ের তারিখে বিষ খেয়ে মরেছে।'

হঠাৎ ভয় ছাপিয়ে ভয়ঙ্কর একটা অপমানবোধ আসে বারীনের!

অপমানই!

চিত্রা আক্রোশ করে বারীনকে এই অপমানটা করল?

চিত্রা এইভাবে বারীনের মুখে কালি লেপে দিল? চিত্রা এইভাবে বিশ্বের দরবারে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে রেখে গেল বারীনকে?

কেন? কেন?

এমন কি অপরাধ করেছিল বারীন?

এমন কি দুর্ব্যবহার করেছিল চিত্রার সঙ্গে?

কিছু না, এমন কিছুই না!

চিত্রা বলেছিল, ওদের এই বিবাহ-বার্ষিকী উপলক্ষে চিত্রার বাপের বাড়ির সবাইকে চায়ের নেমন্তন্ন করতে। বলেছিল, 'বলা তো হয় না সাতজন্মে, এই একটা উপলক্ষ্যে বরং—'

যদি চিত্রা গতকাল রাত্রে বারীনের মুড বুঝে গুছিয়ে বলত, 'বড্ড ইচ্ছে করছে ওদের একবার—' তা হলে হয়তো এতক্ষণে বারীনের এই ঘরটা কল-কাকলীতে ভরে যেত, আর সারা বাড়ির বাতাসটা ভরে যেতো চপ ভাজার গন্ধে।

কারণ প্রধানতঃ ওই নামটাই করেছিল চিত্রা। 'চায়ের সঙ্গে একটু চপ টপ—'

কিন্তু চিত্রা গতরাত্রে কিচ্ছুটি বলে নি। তার মানে চিত্রা বারীনের সময়, অসময়, 'মুড্' কিছুর কথাই চিন্তা করে নি? দুম করে সকাল বেলা বাজার যাবার সময় মাংসের কিমার কথা বলে বসেছিল। আর বলেছিল, 'সাতজন্মে তো বলা হয় না।'

ওই, ওই 'সাতজন্ম' শব্দটা!

ওতেই যেন হঠাৎ পা থেকে মাথা পর্যন্ত চড়াৎ করে একটা বিদ্যুতের শিখা খেলে গেল বারীনের।

বারীন উপলক্ষ্যটা ভুলে গেল, আজকের তারিখটার কথা ভুলে গেল! বারীনের মুখ ফস্‌কে বেরিয়ে গেল, 'তোমাদের ওই রাবণের গুষ্টিকে চা চপ খাওয়াবার পয়সা আমার

~ www.amarboi.com ~

নেই!'

হ্যাঁ, বলেছিল একথা বারীন। অস্বীকার করা যায় না, খুবই গর্হিত কাজই করে ফেলেছিল একটা, কিন্তু মিথ্যে কথা তো নয়! চিত্রার মা বাবা, আইবুড়ো ভাই-বোন, স-স্বামী আর স-সন্তান দুই দিদি, এবং দাদা বৌদি, সব মিলিয়ে ষোলো আঠারো জন লোক। আর আজকালকার এই অগ্নিমূল্য বাজার!

তাই মুখ ফস্‌কে গিয়েছিল।

কিন্তু তারপর তো বারীন সন্ধি করতে গিয়েছিল! বলেছিল তো, 'ঠিক আছে, তুমি বলাটা সেরে ফেল। আমি একটু সকাল করে এসে—'

চিত্রা বলেছিল, 'না।'

চিত্রার সেই অনমনীয় মানসিক গঠনভঙ্গী, যেন ছুরি কেটে নুন দিয়েছিল বারীনকে। জানা ছিল, বরাবরই জানা আছে, চিত্রা একবার বিগড়ে গেলে আর কারুর কথা রাখে না।

তবু বলেছিল বারীন, 'বাড়িতে কিছু তৈরী-ফৈরির হাঙ্গামা করে কাজ নেই, তুমি চা-টা করো, আমি বরং একটু সকাল করে অফিস থেকে বেরিয়ে একেবারে গ্রেট ইস্টার্ন থেকে—'

চিত্রা আবারও বলেছিল, 'না।'

বারীন বুঝেছিল আর হবে না।

চিরকালের জেদী!

তা সত্ত্বেও, তখন তারিখটার কথা ভেবে অনুতপ্ত হয়েছিল বলেই, বারীন ওর জেদটাকে উড়িয়ে দিয়ে বলেছিল, 'বাবাঃ, এক কথাতেই রাগ? ঠাট্টা বোঝে না এ আচ্ছা লোক!...তুমি ভুবনকে দিয়ে বলে পাঠাও একটা চিঠি দিয়ে, আমি গুছিয়ে ব্যবস্থা করে—'

চিত্রা বলেছিল, 'মিথ্যে এনো না, আনলে ফেলা যাবে। আমি কাউকে কিছু বলে পাঠাচ্ছি না। হয়তো আমি থাকবোই না।'

থাকবোই না। আমি থাকবোই না।

তার মানেটা তা হলে এই।

চিত্রা ধর্মের কাছে খাঁটি রইল। চিত্রা মৃত্যু সংকল্পটি বলে গেছে তার স্বামীকে।

কিন্তু চিত্রা?

এতখানি প্রতিহিংসা-পরায়ণতা ছিল তার মধ্যে? এত মারাত্মক নিষ্ঠুরতা?

অথচ—

চোখ দুটো জ্বালা করে ওঠে বারীনের, অথচ আজ চিত্রা বারীনকেই 'নিষ্ঠুর' বলে অভিহিত করেছে।

কিন্তু এমন ঘটনা কি আর কখনো ঘটেনি ওদের মধ্যে?

কত কতবারই তো হয়েছে।

হয়েছে, দু'চারটে দিন কথা বন্ধর মতও হয়েছে, আবার মিটেও গেছে। কিন্তু আজ?

~ www.amarboi.com ~

আজ চিত্রা চিরদিনের মত কথা বন্ধ করে দিয়ে গেল, ইহজীবনে সে পালা মেটবার আর পথ রইলো না।

ড্রেসিং টেবিলের প্রকাণ্ড আর্শীটা যেন একটা শরীর হয়ে বারীনের দিকে তাকিয়ে আছে। বারীন অনুভব করছে সেই দৃষ্টি। বারীন ওদিকে না তাকিয়েও বুঝতে পারছে ওই আর্শীর মধ্যেও একটা খাটের ওপর এলেমেলো হয়ে বিবর্ণ মুখে শুয়ে পড়ে আছে চিত্রা নামের একটা মেয়ে, আর খাটের থেকে খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে আছে একটা মার খাওয়া কুকুরের মত লোক, যার নাম বারীন বোস।

যে নামটা কাল সকালে কাগজে কাগজে ছাপা হবে। আর 'প্রথম দর্শকে'র ভূমিকা নিয়ে যাকে অজস্রবার বলে চলতে হবে, 'অফিস থেকে দুপুরবেলাই ছুটি নিয়ে চলে এসেছিলাম, শরীরটা ভালো ছিল না, (এই কারণটা বানিয়েই অফিস থেকে চলে এসেছিল যে) দরজা খোলাবার জন্যে চাকরটাকে আর ডাকাডাকি না করে নিজের পকেটের 'ল্যাচকী'টা দিয়েই ফ্ল্যাটের দরজা খুলে ঢুকে পড়েছিলাম। ভেবেছিলাম চিত্রাকে ডিসটার্ব না করে, এসেই শুয়ে পড়বো। কিন্তু ঘরে ঢুকে দেখলাম চিত্রা—হ্যাঁ, চিত্রা এই ভাবে পড়ে আছে। ঠিক এইভাবে। আমি অনেকবার ডাকলাম। 'চিত্রা চিত্রা', কোনো সাড়া দিল না। তখন গায়ে হাত দিয়ে দেখলাম—।

গ্রামোফোন রেকর্ডের মত একই কথা বলে চলতে হবে নির্ভুলভাবে। ডাক্তারের কাছে, আত্মীয়দের কাছে, পড়শীদের কাছে পুলিশের কাছে।

তারপর বলতে হবে, 'না না, ঝগড়াটগড়া কিছুই না। আমাদের এই আট বছরের বিবাহিত জীবনে একদিনের জন্যেও সে রকম ঝগড়া-ঝাঁটি হয়নি কখনো। তবে ভুবনটা লাগিয়ে দিতে পারে। ভুবনটা হয়তো বলে বসবে, 'সকাল বেলা তো তুলকালাম কাণ্ড! দাদাবাবু ভাত না খেয়ে চলে গেল—'

প্রথম দর্শকের ভূমিকা নিতে হলে তার উত্তরও ঠিক করে রাখতে হবে।...

হায় ভগবান, কেন মরতে বারীন ছুটি নিয়ে দুপুরবেলা বাড়ি চলে এলো?

যদি না আসতো!

যদি না আসতো ওই ভূমিকাটা ভুবনটারই থাকতো। ভুবনই দিবানিদ্রার বহরটা যতটা সম্ভব দীর্ঘ বিলম্বিত করেও যখন দেখতো ডাক পড়ছে না, তখন নিজেই উঠে পড়ে 'বৌদি' বলে ডাক দিতে যেতো!

ডাকতো, ডাকের ওপর ডাক, যেমন ডেকেছিল বারীন। তারপর—বারীনের মতই ভয়ে হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে আসতো তার, তখন হাঁউমাউ করে পাশের ফ্ল্যাটের অরুণাকে ডেকে আনতো। অরুণাই সর্বদা আসে, অরুণাই এ পাড়ায় চিত্রার একমাত্র বন্ধু। অরুণা শুনেই ছুটে ফুটে চলে আসতো।

তারপর অরুণাই বলতো, 'শীগগির তোর বৌদির বাপের বাড়িতে খবর দিতে যা—'

মিনিট দশেকের রাস্তায় চিত্রার বাপের বাড়ি, তাঁরাও তখুনি ছুটে আসতেন।

বারীনের অফিসে ফোন যেতো, 'শীগগির চলে এসো—চিত্রা হঠাৎ—'

~ www.amarboi.com ~

বারীন উদ্ভ্রান্তের মতো চলে এসে দেখতো বাড়ি লোকে লোকারণ্য। ডাক্তার, পুলিশ, প্রথম দর্শকের এজাহার চলছে।

আচ্ছা, এখনও ঠিক সেই ঘটনাই ঘটানো যায় না? এই নির্জন দুপুরে সব ফ্ল্যাটেই যে যার আপনার নিয়ে ব্যস্ত। একতলার তিন নম্বর ফ্ল্যাটের বারীনবাবু কখন এসেছে, কখন বেরিয়ে গেছে, কে দেখতে গেছে?

না, কেউ না।

কারুর সঙ্গে মুখোমুখি হয়নি বারীনের।

আস্তে আস্তে পিছু হাঁটতে থাকে বারীন। পিছিয়ে পিছিয়ে চলে আসে ঘর থেকে বাইরে।...চলে আসে প্যাসেজে।...ছোট্ট পায়রার খোপের মতো সার্ভেন্টরুমটার দরজা বন্ধ, তার মানে ভুবন আরামে ঘুমোবার তালে দোর বন্ধ করে শুয়েছে।

ভগবানের অশেষ করুণা!

হ্যাঁ, এখন বারীন ভগবানের অশেষ করুণা দেখতে পাচ্ছে।

বারীন ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে আসে।

দরজাটা চেপে বন্ধ করে দেয় যেমন ছিল। বিকেল বেলা ঝি এসে বেল্ বাজালে ভুবন খুলে দেবে। অন্যদিন চিত্রা দেয়, রেগে রেগে বলে, 'ভুবনবাবু ঘুমোবেন, আমি উঠে দরজা খুলতে যাবো!'

আজ আর বলবে না।

আজ আর উঠবে না। ঝিয়ের অসহিষ্ণু ডাকে অস্থির হয়ে ভুবনই—

রাস্তায় পা ফেলে বারীন।

মাথাটা নীচু করে ঘাড় গুঁজে গটগটিয়ে বেরিয়ে যায়, যাতে চট করে কেউ দেখতে না পায়। অনেকটা দূরে এসে খোলা রাস্তায় নিঃশ্বাস নেয় বারীন। যেন ভয়ঙ্কর একটা বিপদমুক্তির স্বস্তি বোধ করে। বারীনের মনে পড়ে না বারীনের শোবার ঘরে খাটের উপর বিপদটা বসানো রয়েছে, বারীন আবার ঢোকামাত্রই বারীনের ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্যে।

বারীন দুপুরের ঝাঁ ঝাঁ রোদের বাতাসও বুকভরে টেনে নেয়। বারীন যেন নতুন জীবন পায়।

তারপর আশ্চর্য নিপুণতায় একটা পাকা খুনীর মতো চিন্তা করতে থাকে বারীন!...

আমি অফিস থেকে বেরিয়ে এসেছি ঠিক দেড়টার সময়, সেখানে সবাই জানে। অতএব ও প্রমাণটা মুছে ফেলা যাবে না। তার পরের ঘটনাগুলোই নির্ভুল সাজিয়ে ফেলতে হবে।

বারীনের শরীর খারাপ লাগছিল, অতএব বারীন নিজের বাসা পর্যন্ত যেয়ে উঠতে পারেনি। বারীন তাই অফিস পাড়ার কাছাকাছি তার মামাতো বোন রমাদির বাড়ির কাছে বাস থেকে নেমে পড়বে, ঢুকে পড়বে। বলবে, 'ভয়ঙ্কর শরীর খারাপ লাগছে, তাই মনে

~ www.amarboi.com ~

হলো তোমার এখানেই একটু বিশ্রাম করে নিয়ে—ভীষণ মাথার যন্ত্রণা, ঘুমের বড়ি-টড়ি কিছু আছে তোমার? মেয়েদের তো থাকেই। চিত্রা তো—'

বারীন আবার অফিস পাড়ার দিকে যাবার জন্যে ফিরতি বাসে চড়ে বসলো।

এগারোই আগস্ট, তবু এক ফোঁটা বৃষ্টির নাম নেই। মেঘ বৃষ্টি এগুলো তবু যেন একটা আচ্ছাদন। এই ঝাঁ ঝাঁ করা দুপুরের তীব্র তীক্ষ্ণ চোখটা যেন বারীনের সর্বাঙ্গে ছুরির ডগার মত বিঁধছে।...কে জানে কে কোন্‌খান থেকে দেখছে! হয়তো কেউ দেখে ফেলেছে, বারীন ওর বাসার কাছ থেকে বাসে উঠছে। হয়তো কত কেউ দেখে ফেলবে বারীন উল্টোমুখো বাসে চড়ে আবার অফিস পাড়ায় ফিরে যাচ্ছে।

মেয়েদের মতো যদি কোন একরকম ঘোমটার ব্যবস্থা থাকতো পুরুষদের!

রমাদির বাড়িটা হচ্ছে বড়লোকের বাড়ি। শান্তিস্নিগ্ধ বিশ্রামের উপকরণে বাড়ি ঠাসা। ফ্রীজের জলের শরবৎ, ছায়াছায়া পর্দা ঢাকা হল্‌, এয়ার কন্ডিশানড ঘর, ডানলোপিলোর বিছানা, কী চাও বল। ঘুমের বড়ি? সে তো আছেই। থাকবেই। বড়লোকের গিন্নীর ঘুম কি অমনি শুলেই এসেই হাজির হয়?...বলে চিত্রারই আসতে চায় না। তবু তো সে শুধু কেরানীর বৌ।

হয়তো সেইটাই জ্বালা!

হয়তো অহরহই যে অমন উত্তপ্তস্নায়ু হয়ে থাকে চিত্রা! তার কারণই ওই।

তবু কবে ভাবতে পেরেছিল বারীন চিত্রা এতবড় বিশ্বাসঘাতকতা করবে তার সঙ্গে।

রমাদি বললো, 'ওমা তাই বুঝি? তা খুব বুদ্ধির কাজ করেছিস! এটুকু যে মাথায় খেলিয়েছিস এই ঢের।'

তারপর রমাদি তার পিসতুতো ছোটভাইয়ের বিশ্রামের আয়োজনে তৎপর হয়ে ওঠে।

স্নেহ তো আছেই, তাছাড়া তার যে কতটা আয়োজনের ক্ষমতা আছে, সেটুকুও তো দেখাবার জিনিস।

ডাক্তারকে কল্‌ দিতে টেলিফোন 'ডায়াল' করতেও যাচ্ছিল, নেহাৎ বারীন হাঁ হাঁ করে ওঠায় থেমে গেল।

নিজের ঘরটা ছেড়ে দিল রমাদি। শুইয়ে রেখে গেল বারীনকে।

হিমশীতল ঘরটা সম্পর্কে যথেষ্ট আপত্তি ছিল বারীনের। একে তো ফ্রীজের জল। তার ওপর এই! অথচ বারীনের সর্দির ধাত।...কিন্তু রমাদির নির্বেদে শুতেই হল।

যখন একা হল বারীন, তখন আর একবার ভাবতে চেষ্টা করলো সেই ছেড়ে আসা দৃশ্যটা। আবার একবার ভয়ের ঝাপটায় চিন্তাশক্তি ঘুলিয়ে গেল। আপ্রাণ চিন্তায় ভাবতে চেষ্টা করতে লাগলো বারীন নামের কোনো লোক মনোহর পুকুরের ধারে কাছেও যায় নি একটু আগে। অফিসে বসে মাথা ধরেছিল বলে, ছুটি নিয়ে চলে এসে তার বড়লোক

~ www.amarboi.com ~

দিদি জামাইবাবুর বাড়িতে ঢুকে পড়ে শুয়ে পড়েছে।

ক্রমশই যেন সর্দি হয়ে আসছে।

তা আসুক, সেটা বারীনের অনুকূলই। জ্বর আসে তো আরো ভাল হয়।

কিন্তু পৃথিবীটা এমন নিঃশব্দ হয়ে গেছে কেন? কোনো খান থেকে কোনো বার্তা আসছে না কেন? প্রতি মুহূর্তে তো সেই বার্তার পায়ের শব্দ শোনবার জন্যে কান খাড়া করে রয়েছে বারীন, ঘুমের ওষুধ খেয়েও তো ঘুম হচ্ছে না।

কিন্তু এখানেই বা খবর আসবে কেন? বারীন যে হঠাৎ এখানে এসে হিম-শীতল ঘরের অন্ধকারে ডানলোপিলোর বিছানায় শুয়ে শুয়ে মিনিট গুনছে, কে জানে সে কথা।

ওরা নিশ্চয় বারীনের অফিসেই ফোন করবে। তো তখন তো শুনেই ফেলবে বারীনের শরীর খারাপ তাই—

আঃ প্রবল একটা জ্বর আসে বারীনের। তিন-চার দিন অঘোর অচৈতন্য হয়ে থাকতে হয়। তা হলে ওই সব ভয়ঙ্কর যন্ত্রণাগুলো সমস্ত মিটে যায়। কে সেই অচৈতন্য রোগীকে জেরা করতে আসবে? কে তাকে এ অনুরোধ করবে, 'যাও বাপু শ্মশানে যাও। গিয়ে চিত্রার সেই মুখটায় আগুনের মশাল বুলিয়ে দাও গে।'

কি জানি স্বাভাবিক ভাবে জ্বর হবে কিনা। না হওয়াই সম্ভব। কিন্তু বারীনের প্রবল জ্বর আসছে। বারীনের পক্ষে সম্ভব নয় ওসব কিছু পোহানো। যা করবার বারীনের শালা করবে। খুব করিৎকর্মা আছে।

তিন দিন কেন, আরো অনেক বেশী দিন—আরো অনেক দিন জ্বরে পড়ে থাকুক বারীন, বারীনের শ্বশুরবাড়ির গুষ্টির শোকের তীব্রতাটা একটু প্রশমিত হোক, বারীনের নিজের গুষ্টির কৌতূহল!

সকলের সহানুভূতিটা বারীনের ওপর এসে পড়ুক। সকলে ভাবতে শুরু করুক, ভগবানের কি খেলা! চিত্রা যখন চলে যাচ্ছে, তখন কিনা বারীনও বিছানায় পড়ে রয়েছে।

ভগবান বলে যদি কেউ থাকে, বারীনকে শুধু প্রবল একটা জ্বর দাও। একশো চার পাঁচ ছয়!

ভগবান বলে কেউ আছে বৈকি। না থাকলে কোনো চেনা লোকের সঙ্গে মুখোমুখি না হয়ে গিয়ে এতটা পথ অতিক্রম করে আসতে পারতো বারীন?

রমাদি কি বারীন ঢোকবার সঙ্গে সঙ্গে ঘড়ি দেখেছে?...নিশ্চয়ই নয়। পরে যদি দেখেও থাকে গোঁজামিল করে চালিয়ে দিতে পারবে বারীন!...

কিন্তু চিত্রা মারা গেল, অথচ বারীনের ভয়ঙ্কর একটা কষ্ট হচ্ছে না কেন? চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কাঁদতে ইচ্ছে করছে না কেন বারীনের?

বারীন কেন কোন বিপদ মুক্তির স্বস্তির নিশ্বাস ফেলছে!

বারীন কি তা হলে খুব একটা পাষণ্ড?

তা পাষণ্ডই বৈকি!

নইলে বারীন পড়ন্ত বেলায় 'ঘুম' থেকে উঠে এসে রমাদিদের চায়ের টেবিলে এসে

~ www.amarboi.com ~

বসে? বহুবিধ উপকরণ দিয়ে শেষ করে সেই চা পর্ব? আর আশ্চর্য যে, খেতে খেতে অনুভব করে খিদেও খুব পেয়েছিল তার।

আচ্ছা, অভিনয় করতে বসলে কি নিজের সত্তাটা হারিয়ে যায়? নইলে কী করে বারীন তার দিদির সঙ্গে হাসি গল্প করতে পারল? আর দিদি যখন বললো, 'না বাপু, তোর আর বাসে ট্রামে গিয়ে কাজ নেই, মহাদেবকে বলছি গাড়ি বার করে রেখে আসুক তোকে—',তখন কি করে গাড়ি চড়ে বাড়ি ফেরার কল্পনায় বেশ একটা আহ্লাদ বোধ করল!

ভালই!

অভিনয়টা তা হলে সর্বাঙ্গসুন্দরই হবে।

আর প্রমাণও থাকবে বারীনের খুব শরীর খারাপ হয়েছিল, তাই নিজের বাসা পর্যন্ত আসতে পারেনি।

কিন্তু বারীন যে কতটা পাষণ্ড সে খবর কি বারীন নিজেই জানতো?

জানতে পারলো যখন গাড়ি থেকে নামতে গিয়ে দেখলো ফ্ল্যাটের সামনেটা একেবারে নিত্যদিনের মত যথাযথ। সামনে ছোট ছেলেরা খোলা করছে, বারীনের দরজায় কোন গাড়ি দাঁড়িয়ে নেই, আর ঘরের সামনের গ্রীল ঢাকা বারান্দাটায় চিত্রা দাঁড়িয়ে রয়েছে চুল বেঁধে রঙিন শাড়ি পরে!

দেখে বারীনের পা থেকে মাথা পর্যন্ত একটা বিদ্যুতের জ্বালা চড়াৎ করে উঠলো! মনে হল চিত্রা যেন তাকে হাতে পেয়ে বাঁদরনাচ নাচিয়েছে! ভয়ানক রকমের একটা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। নিদারুণ ঠকিয়েছে।

তাই, তাই বারীনের একটুও যন্ত্রণা বোধ হয়নি। চিত্রা তো মরেইনি।

অনেক আয়োজন করে, ঈশান কোণে অনেক মেঘ জড়ো করে, আকাশটা হঠাৎ আবার ফাঁকা হয়ে গেলে সবটাই যেমন বিস্বাদ লাগে, তেমনি বিস্বাদ মন নিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেল বারীন।

তার মানে ঘুমের বড়ি খেয়ে অজ্ঞান হয়ে ঘুমোনো হচ্ছিল। একটা মানুষ ডেকে মরে গেলেও যে ঘুম ভাঙে না! ছিঃ!

~ www.amarboi.com ~

পাতাচাপা

'পৃথিবীর ওঁচা পাপী হচ্ছে এই বড়লোকগুলো'—বড়লোক সম্পর্কে কথা উঠলেই আমাদের জম্বুদা এই তীব্র তীক্ষ্ণ মন্তব্যটি নিক্ষেপ করে থাকেন, 'ওরা হচ্ছে আমাদের শত্রু, দেশের শত্রু, মানব জাতির শত্রু। আমার হাতে যদি 'পাওয়ার' থাকতো একধার থেকে ওই 'মিলিওনেয়ার'গুলোকে ফাঁসিতে লটকাতাম, বুঝলি? জেল নয় জরিমানা নয়, স্রেফ ফাঁসি! ধরো আর ঝুলিয়ে দাও, ব্যস! জগতের জঞ্জাল দূর হয়ে যাক।'

বড়লোকদের খুব একটা সুচক্ষে অবশ্য আমিও দেখি না, একখানি প্রার্থিত বাস-এর জন্যে পঁয়তাল্লিশ মিনিট রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে যখন চোখের সামনে দিয়ে তেলপিছলানো আর আলো পিছলানো গাড়ির শোভাযাত্রা দেখি, তখন মিথ্যে বলব না, রাগে ব্রহ্মাণ্ড জ্বলে যায়, তবু ওই ফাঁসিতে ঝোলানোর সপক্ষে রায় দিতে বাধে।

যতই পাপী পাতকী হোক, লোকগুলোর স্ত্রী-পুত্র পরিবার আছে। সুখ দুঃখ আশা আনন্দ আছে, মানে মানুষের যা যা থাকে সবই আছে। শুধু—

জম্বুদা এ সেন্টিমেন্টের মর্যাদা রাখেন না।

জোর গলায় বলেন, 'কিছু না, কিছু না! কিছু নেই ওদের। স্ত্রী নেই, পুত্র নেই, ভদ্রতা নেই, সভ্যতা নেই, চক্ষুলজ্জা নেই, কর্তব্যবোধ নেই, আছে শুধু আকাঙ্ক্ষা আর অহঙ্কার।'

কথা বাড়াবার ভয়ে চুপ করে থাকলেও কখনো কখনো মৃদু প্রতিবাদ করতে গেছি, 'তা ভাল বড়লোকও তো আছে জম্বুদা!'

জম্বুদা তীব্র হয়েছেন, 'ভাল বড়লোক? ভাল বড়লোক মানে? তুই যে সোনার পাথর বাটির গল্প ফাঁদতে এলি রে! বড়লোক আবার ভাল হবে কি? 'বড়লোক' শব্দটার অর্থই তো হচ্ছে নির্লজ্জ প্রবঞ্চক। আরে বাবা, শাদা চোখেই দ্যাখ না, অনেকের প্রাপ্য বস্তু একা নিজের কাছে জড় করেই তো বড়লোক হওয়া? অন্যে খেতে পাচ্ছে না, তুমি পুঁজি করছো। নীচতা নয়? ক্রিমিন্যাল নয় তারা?'

ভয়ে ভয়ে হয়তো বলেছি, মানে আগে আগে বলেছি, এখন আর বলি না, বড় বেশী রগচটা হয়ে গেছেন আজকাল জম্বুদা। আগে বলেছি, 'না, মানে ওরা তো খেটে খুটেই করেছে এসব—'

জম্বুদা এ ক্ষেত্রে কথা শেষ করতে দেননি। বাঘের মত গর্জে উঠেছেন, 'খেটেছে তা কি? এ পৃথিবীতে কে না খাটছে। খেটে খেতেই এসেছে সবাই, বসে খেতে নয়। তা বলে—দেশের লোক খেতে পাবে না। আর তুমি মোটর চড়বে? দেশের লোকের

~ www.amarboi.com ~

জৈষ্ঠ্যের দুপুরে মাথায় একটা ছাতা জুটবে না,—আর তুমি 'এয়ার কন্ডিশান্‌ড্‌' ঘরে বসে আইসক্রীম খাবে? দেশের লোক শীতে জমে মারা যাবে আর তুমি বাহান্নটা গরম স্যুট তোমার ওয়ার্ডরোবে পচাবে? বল্‌ বল্‌ এসব অমানবিকতা কি না?'

অবশ্যই স্বীকার করতে হয়, অমানবিকতা।

এবং মাঝে মাঝে যে অন্তরের অন্তস্থলে ওই অ-মানবিক ইচ্ছেগুলো উঁকি মারে সেটার জন্যে মরমে মরে যাই।

তা' আমরা তো তবু মাঝে মাঝে শুনি, বেচারী জম্বু বৌদিকে রাতদিনই শুনতে হয় এ সব!

'বিলাসিতা? বিলাসিতার সাধ তোমার? জানো ওটা চরিত্রহীনতার চেয়েও খারাপ। মেয়ে জাতটা পুতুল নয় যে হাতে মুখে রং মেখে বেড়াবে, ঘরের আসবাব নয় যে শাটিন মখমলে নিজেকে মুড়ে ঘরের শোভা বর্ধন করবে, গহনার দোকান নয় যে সর্বাঙ্গে বিজ্ঞাপন এঁটে বসে থাকবে। মানুষ মানুষের মতন হওয়া চাই।'

বৌদি অবশ্য কথায় কোনোদিনই স্বামীর সঙ্গে পেরে ওঠেন না, তবু ক্ষীণ প্রতিবাদ করেন, 'সাজতে গুজতে কে চাইছে? তবু সংসারের সুবিধে অসুবিধের জন্যে—'

দাদা আবার উদ্দীপ্ত হন, অসুবিধে সুবিধে মানে? 'সুবিধে গ্রহণ' মানেই তো যন্ত্রের দাসত্ব করা? কেন তুমি যন্ত্রের দাস হবে? যেখানে দেশের লোকের দু'মুঠো ভাত ফোটাতে কাঠ জোটে না, সেখানে কেন তুমি ইলেকট্রিক জ্বেলে পঞ্চব্যঞ্জন রাঁধবার সাধ করবে? যে দেশে লোকের তেষ্টার জল জোটে না, সেখানে তুমি ফ্রিজের ঠাণ্ডা শরবৎ খাবে? পাতক হবে না? মহাপাতক?'

তা' মহাপাতকের ভয়ে হোক না থাক, জম্বুদার প্রবল শাসনেই এসব মেনে নিতে হয় বৌদিকে। তা' ছাড়া জম্বুদার গলার জোরের সঙ্গে পকেটের জোরের তফাৎ আছে।

তাই বৌদি শুধু স-ঝঙ্কার মন্তব্য করেন, 'তোমার সংসারে এসে পড়াই তো মস্ত এক মহাপাতক হয়েছে আমার, আর কত হবে?' বলেই পলায়ন দিতেন। ভদ্রমহিলা স্বামীকে ভয় করেন বিলক্ষণ।

কিন্তু সহসা পট পরিবর্তন হলো! জম্বু বৌদির ভাগ্যে ঘটে গেল এক অপ্রত্যাশিত অলৌকিক ঘটনা।

অলৌকিকই বলবো, কারণ কে কবে শুনেছে কোনো মহিলা তাঁর মাসতুতো মামার সম্পত্তি পেয়েছেন।

আমি তো শুনিনি।

অথচ জম্বু বৌদি পেলেন তাই।

কোথায় কোনখানে ছিলেন এক বিরাট ধনী ব্যাচিলার মামা মানে মাসতুতো মামা. তিনি মৃত্যুকালে তাঁর যথাসর্বস্ব দিয়ে গেলেন ওই ভাগ্নীটিকে।

আশ্চর্য! সেই ভদ্রলোকের কি ত্রিভুবনে আর কেউ ছিল না? ভাইপো? ভাইয়ের শালাপো? শালীপো? ভাগ্নে। কিছু না?

~ www.amarboi.com ~

কিংবা ছিল হয়তো শুধু তাদের ওপর রাগ করেই এইটি করে গেছেন।

সে যাক আসল কথা হচ্ছে জম্বু বৌদির লাক্

একেই বলে পাতাচাপা কপাল!

অবশ্য প্রবাদটা সেকেলে কিন্তু ওই সেকেলে প্রবাদগুলোর মত এমন লাগসই বচন তো একেলে অভিধানে খুঁজে পাই না।

পাতাচাপা কপাল।

কতটুকুর মধ্যে কতখানি অভিব্যক্তি!

বিন্দুর মধ্যে সিন্ধু, হাতের মুঠোয় হাতী।

কিন্তু প্রকাশভঙ্গীর আধুনিকতা পৌরাণিকতা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি না আমি, মাথা ঘামছে মানে সর্বশরীরই ঘামছে জম্বু বৌদির কপালের খবরে। মাতুল বিয়োগ রূপ একটি দমকা হাওয়ায় যার ওপরকার ঢাকা পাতাটুকু হুস করে উড়ে গেছে।

ঈর্ষা আমি করছি না, তবে কি না আমাদের মত এই পাথর-চাপা কপালেদের কানে এহেন অভূতপূর্ব খবর এলে বুকটা একটু পাথর পাথর হয়ে ওঠে বৈকি।

অন্তত এটুকু তো মনে হবেই আমাদের তিনকূলে কোথাও কোনোখানে এমন একটি বিবেচক আত্মীয় তো দেখলাম না কখনো। আমাদের কোনো আত্মীয় যদি মৃত্যুকালে তার যথাসর্বস্ব দিয়ে যান আমাদের তো সেই যথাসর্বস্বটি হবে বিধবা স্ত্রী, নাবালক সন্তান, পর্বত প্রমাণ ঋণ!

কিন্তু ঈর্ষাকাতর হবো না তাই খবরটা শুনেই আনন্দ জানাতে গেলাম। তবে ভয় একটু ছিল জম্বুদা সম্পর্কে।

দেখলাম আশঙ্কা অমূলকও নয়। জম্বুদা বাঁকা ঠোঁট আরো বাঁকিয়ে বলে উঠলেন 'শুনেছিস খবর? তোর বৌদি তো এবার রীতিমত একটি ধনবতী মহিলা হয়ে উঠলেন রে।'

শুনে আনন্দ প্রকাশ করবো না আক্ষেপ সেটা নির্বাচন করতে না পেরে সর্ব-ভাব-ব্যঞ্জক হাসির স্মরণ নিলাম?

জম্বুদা বললেন, 'আর এই বঁড়শে বেহালার বাসায় এসে তোদের বৌদির দেখা মিলবে না রে, দেখতে বাসনা হলো থিয়েটার রোডে যেতে হবে। দেউড়ির দ্বারোয়ানকে সেলাম জানিয়ে এত্তালা পাঠাতে হবে!'

বৌদি এবার ক্রুদ্ধ হলেন।

আর যে তিনি জম্বুদার শাসনের নীচে থাকবেন না তার আভাস পাওয়া গেল যেন সেই ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বরে 'এত্তালা পাঠাতে হবে? হতো তাই মামার কাছে যেতে?'

দাদা উদাস কণ্ঠে বলেন কি জানি হতো কিনা। যাইনি তো কখনো তোমার মামার দেউড়িতে ধর্না দিতে?

কথাটা সত্যি।

বৌদির আক্ষেপোক্তি থেকেই শুনেছি মাঝে মাঝে মামা এত ভালবাসেন, কিন্তু জম্বুদা

~ www.amarboi.com ~

জীবনে ওমুখো হন না, এবং বৌদিকে পারতপক্ষে যেতে দেন না। আর মামা নিজে বেড়াতে এলে মুখের সামনে খবরের কাগজ ধরে বসে থাকেন জম্বুদা।

অতবড় একটা মান্যমান লোক—' বৌদি দুঃখ করে বলেছেন, তাঁকে এত অগ্রাহ্য!'

কিন্তু সত্যিই তো এত অগ্রাহ্য কেন?

কারণটা কি?

মামা কি মাতাল দাঁতাল?

নাকি খারাপ চরিত্তির?

অথবা দুর্মুখ রগচটা অহঙ্কারী?

উঁহু ওসব কিছুই না।

ওই একটিই কারণ।

বড়লোক।

অগাধ বড়লোক!

যারা নাকি পৃথিবীর পরমতম পাপী তাদেরই একটি নমুনা মামা!

বুঝলাম এইবার একটি দাম্পত্য বিচ্ছেদের দর্শক হবার জন্যে প্রস্তুত হতে হবে আমাদের। এ নাটকাভিনয়ের টিকিট কেটে দিয়ে গেছেন জম্বুদার মাসতুতো মামাশ্বশুর।

বৌদি যে আর জম্বুদার ওই কম্বুকণ্ঠের নীচে চাপা পড়ে থাকবেন না তাতে সন্দেহ নাস্তি। তিনি মামালব্ধ বিষয়ে আরাম আয়েস বিলাসিতা করতে চাইবেন, এবং জম্বুদা তাতে বাঁকা কটাক্ষের ছুরি হানবেন অতএব অঙ্কফল বিচ্ছেদ।

একটা নিঃশ্বাস পড়লো।

বেশ ছিল সংসারটি।

দু'দণ্ড বেড়াতে এসে সুখ ছিল।

যাক কি আর করা। সেদিনকার মত সন্দেশ খেয়ে চলে এলাম। যদিও বৌদি মামার নাম করে চোখ মুছতে মুছতেই সন্দেশ ধরে দিলেন।

কিছুকাল আর যাওয়া হয়ে উঠল না।

নানা কাজে পড়লাম, কলকাতার বাইরে চলে গেলাম, অসুখ করলো ইত্যাদি ইত্যাদি।

ঝাড়িয়ে কাটিয়ে অনেকদিন পরে একদিন যাত্রা করলাম। ভাবতে ভাবতে যাচ্ছি কি পরিস্থিতিতে পড়ি। সত্যিই বৌদি সেই থিয়েটার রোডের বাড়িতে চলে যান নি তো?

নাকি অতটা নয়। শুধু কর্তা-গিন্নীতে বাক্যালাপ বন্ধ আর আমি যাওয়া মাত্রই দুজনে দুশো দফা নালিশ নিয়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়বেন। কাকে রাখবো। কাকে ফেলবো?

মনের অগোচরে পাপ নেই। মানসিক সহানুভূতিটুকু বৌদির দিকেই। কথায় বলে লক্ষ্মী, লক্ষ্মী যদি যেচে আসেন, ঠেলে ফেলে দেবে মানুষ?

কিন্তু আমার মানবিক সত্তা?

তাকে তো জম্বুদার দিক থেকে হঠিয়ে আনতে পারি না! দ্বিধা দ্বন্দ্বে দুলতে দুলতে জম্বুদার সেই বঁড়শে বেহালায় বাসায় গিয়ে দেখি বাসার দরজায় একটি তালা ঝুলছে।

~ www.amarboi.com ~

তার মানে হয়ে গেছে সর্বনাশ?

নির্ঘাৎ বৌদি মেয়েটাকে নিয়ে সেই মত মামার বাড়ি জাঁকিয়ে বসেছেন আর জম্বুদাকে হাত পুড়িয়ে খেতে হচ্ছে আর বাড়ি থেকে বেরোতে হলেই তালা ঝুলিয়ে চলে যেতে হচ্ছে।

ইস!

একেই বলে অর্থমনর্থম্!

কিন্তু কতক্ষণ আর বন্ধ দরজার বাইরে ঘোরাঘুরি করবো? কতক্ষণ গেছেন জম্বুদা কোথায় গেছেন কিছুই তো জানা নেই।

সহসা দোতলার বারান্দা থেকে একটি উদাত্ত প্রশ্ন আছড়ে এসে মাটিতে পড়লো 'কাকে চান?'

কাকে চাই?

সর্বনাশ!

জম্বুদার ভাল নামটা তো কিছুতেই মনে পড়ছে না।

তাকিয়ে দেখলাম স্বয়ং বাড়িওলা।

হাতে ক্ষমতা থাকলে জম্বুদা যাঁকে ফাঁসিতে লটকাতেন, ক্ষমতা নেই বলেই এতাবৎকাল শিরোধার্য করে বসে আছেন।

ঊর্ধ্বমুখে বললাম, 'এখানে যে ভদ্রলোক থাকেন—'

আবার সেই গলা আছড়ে এসে নীচে পড়লো 'থাকেন নয় থাকতেন?'

থাকতেন?

তার মানে জম্বুদাও চলে গেছেন!

কিন্তু কোথায়?

সেই কথাই জিগ্যেস করি।

সুকণ্ঠ ভদ্রলোক সুতিক্ত স্বরে বলেন কোথায় গেছেন তা কি করে জানবো মশাই? ভদ্রলোক এমন কিছু মাইডিয়ার ছিলেন না আমার যে তাঁর পাত্তা জানতে চাইতে যাব? নাকের ওপর দুমাসের বাকি ভাড়া ছুঁড়ে দিয়ে মসমসিয়ে বেরিয়ে গেলেন, জিনিসপত্রগুলো সুদ্ধু নিয়ে গেলেন না। বললেন জাহান্নামে যাক ওসব! আমার কি, কুলি ডেকে টান মেরে রাস্তায় ফেলে দিয়ে নতুন ভাড়াটে বসাবো।

চলে এলাম।

বুঝতে পারলাম ব্যাপার।

ভাড়া বাকি পড়েছিল, তার জন্যে জম্বুদাকে উৎখাত করেছিল লোকটা তাতেই জম্বুদা নাকের ওপর ভাড়া ছুঁড়ে দিয়ে—

কে জানে ওইটাই জম্বুদার হাতে শেষ টাকাটি ছিল কিনা। গরীব হতে পারে লোকটা মানী তো! তার ওপরে বৌদির বিরহ! বৌদির প্রতি অভিমান!

ইস একটা সংসার এমন ছন্নছাড়া হয়ে গেল।

~ www.amarboi.com ~

আসা উচিত ছিল, আরো আগেই আসা উচিত ছিল।

সঙ্কট সময়ে যদি রক্ষা না করবে তো কিসের আত্মীয়? কিসের শুভানুধ্যায়ী? যে আগুন ওঁরা দুজনে জ্বেলেছিলেন, সময়ে তাতে বরফজল পড়লে হয়তো অবস্থা এতো ঘোরালো হত না।

যাক বৌদির পাত্তাটা বৌদির মামার সেই থিয়েটার রোডের বাড়িতেই পাওয়া যাবে নিশ্চয়।

সে বাড়ি দেখেছি।

একদিন ওইখান দিয়ে কোথায় যেন যাচ্ছিলাম বৌদি চেঁচিয়ে উঠেছিলেন, 'এই এই এই আমার সেই অনাদি মামার বাড়ি—'

তা কথা শেষ করতে দেননি জম্বুদা, বলেছিলেন 'দেখেছিস হীনমন্যতা? কে না কে এক মাসতুতো মামা, তার বাড়ির ছায়াটা দেখেও উল্লাস! যেহেতু তিনি বড়লোক।'

'আহা বড়লোক বলেই বুঝি—'বৌদি ক্ষুব্ধ গলায় বলেছিলেন, 'ভালবাসেন বলেই—'

থামো! বড়লোকের আবার ভালবাসা! ভালবাসার কথা তুলো না। ভালবাসা মানে কি? টাকা আছে সেটা দেখাবার জায়গা চাই এইতো? তুমি হচ্ছ সেই জায়গা। বিকাশের ক্ষেত্র! বিশ টাকার মিষ্টি নিয়ে পঞ্চাশ টাকার শাড়ি নিয়ে দেখতে এলেন তোমায়। তুমি বিগলিত হলে, মামা আমায় কি ভালবাসেন! এসব লোকের শাস্তি হয় না?'

বৌদি রাগ করে বলেছিলেন। তা তুমি শাস্তিটা কম করনি। এত অগ্রাহ্য দেখিয়েছ যে ইদানীং আর আমাকে দেখতে আসা ছেড়েই দিয়েছিলেন।'

সারা রাস্তা ওই নিয়ে তর্ক চলেছিল কর্তা গিন্নীতে!

কিন্তু সে যাক্ বাড়িটা যে আমার চেনা হয়ে গিয়েছিল সেটাই হচ্ছে সুখের কথা।

থিয়েটার রোডের সেই বাড়ির দেউড়িতে এসে দাঁড়ালাম, দ্বারোয়ান সেলাম করলো। বললাম, তোমাদের দিদিমণি আছেন এখানে?'

জী হাঁ। চলা যাইয়ে।'

যাক এত্তালাটা দিতে হল না।

চলে এলাম। তবু জানি না 'দিদিমণি' বলতে কি বুঝলো ও।

গাড়ি বারান্দার নীচে দাঁড়ালাম আর একটা পাজামা গেঞ্জিপরা হাফ দ্বারোয়ান অর্থাৎ চাকর জিগ্যেস করলো, কাকে চান?'

দুর্গা বলে জম্বুদার মেয়ে মিঠুর নাম করলাম। 'ও আচ্ছা'—বলে ভিতরের পথ দেখিয়ে দিল।

হায়! জম্বুদার সেই বেহালার বাসা!

দরজার কড়া নাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই দু তিনটি হাস্যোৎফুল্ল মুখের মুখোমুখি হওয়া! মিঠুর সেই আমার হাত ধরে ঝুলে পড়া!

যাক ও নিয়ে ভেবে লাভ নেই, দরকার এখন খবরের। ঢুকে পড়লাম ড্রইংরুমে।

~ www.amarboi.com ~

কিন্তু এ কী!

চোখ কি বিভ্রম দেখছে?

ড্রইংরুমে সোফায় হেলান দিয়ে বসে কে?

জম্বুদা না জম্বুদার প্রেতাত্মা জম্বু বৌদির ইচ্ছার পুতুলের মূর্তি ধরে—

ভগবান জানেন কি! কারণ আমায় দেখে জম্বুদা কণ্ঠে সেই কম্বুনিনাদ আমদানী করে বলে উঠলেন না, 'আরে আয় আয়! বহুকাল পরে! তোর তো দেখাই পাওয়া যায় না।'

জম্বুদা শুধু হাতের খবরের কাগজ খানা নামিয়ে গায়ে চাপানো গায়ে, বড় ড্রেসিং গাউনের কোমরে বাঁধা রেশমী দড়ির ঝোলানো থোপনাটা আস্তে আস্তে লোফালুফি করতে করতে বললেন, 'ওঃ তুই? আয় বোস। এমন হতচ্ছাড়া পোশাক পরে এসেছিস কেন রে?'

তা' মিথ্যে বলবো না, স্বর্গত অনাদি মামার এই সুসজ্জিত ড্রইংরুমের মূল্যবান সোফায় বসতে গিয়ে নিজেকে হতচ্ছাড়া হতচ্ছাড়াই লাগলো।

জম্বুদা বললেন, 'এ বাড়ির কর্ত্রীটিও হচ্ছেন এইরকম! সাজ-সজ্জাটা যে সভ্যতা সংস্কৃতির অন্তর্গত, সে খেয়াল নেই।'

তারপর আর কথা নেই, জম্বুদা আস্তে আস্তে একটি পাইপ ধরালেন, ধীরে সুস্থে একটু কসরৎ করেই সেটিকে ঠোঁটের এককোণে আলতোভাবে ঝোলালেন তারপর আবার কাগজটা হাতে তুলে নিলেন।

বিস্ময়াহত আমি একটুক্ষণ উস্‌খুস্ করে বলেই ফেললাম, 'বৌদি কোথায়?'

জম্বুদা পাইপের ফাঁক থেকে কথা বলতে অসমর্থ হয়েই সেটাকে নামিয়ে আঙুলের ফাঁকে রেখে বললেন 'বৌদি! ওঃ ললিতার কথা বলছিস? আছেন বোধহয় ভিতরে। না কি মার্কেটিঙে গেছেন বলতে পারছি না।'

ভাবছিলাম কোনো কিছুতেই চমকাবো না, তবু চমকে না উঠে পারলাম না। কানটাই বিশ্বাসঘাতকতা করলো। জম্বুদার মুখে ললিতা!' জম্বুদার মুখে স্ত্রী সম্পর্কে সসম্মান উক্তি!

তোদের বৌদি? আছে কোথাও! দেখগে যা একগাদা রাঁধছে বোধহয় বসে বসে।' এই তো ছিল মন্তব্যের ভঙ্গী। কান তাতেই অভ্যস্ত।

যাক্ চমকানি খেতে খেতেই তো আমাদের জীবনের পথচলা। তাই সামলে নিয়ে বলি' আচ্ছা দেখে আসি—'

'দেখে? ওঃ। আচ্ছা দাঁড়া—' বলে জম্বুদা মধ্যযুগীয় জমিদারের ভঙ্গীতে অলস দরাজ গলায় ডাক দেন, 'ওরে কে আছিস? দেখ তো তোদের দিদিমণি আছেন কিনা? বলবি, একজন ভদ্রলোক এসেছেন দেখা করতে চান।'

দেখা করতে আর চাইছিলাম না, আচ্ছা আজ না হয় যাক, আসবো আর একদিন বলে উঠেই পড়ছিলাম, হঠাৎ এক বিপর্যয় ঘটলো।

বাড়ির ভিতরে ভয়ঙ্কর এক আর্তনাদ, তার সঙ্গে একটা কুকুরের হিংস্র 'ঘেউ ঘেউ' তার সঙ্গে একটা অ-তাত গলার ব্যঙ্গ হাসি!

~ www.amarboi.com ~

মানে কি এর?

জম্বুদার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করতে গিয়ে দেখি সেখানেও ঘটে গেছে খণ্ড প্রলয়! সোফা খালি, পাশের টিপয়টা উলোনো, একটা ফুলদানী মেঝের কার্পেট ভিজিয়ে গড়াগড়ি খাচ্ছে, আর তারই পাশে খবরের কাগজখানা তামাকের পাইপটা বুকে নিয়ে কিঞ্চিৎ ধূম উদ্‌গিরণ করছে।

মুহূর্তেই ঘটে গেছে এসব, শুধু মেঝের পাতা কার্পেটটা অতিরিক্ত পুরু বলেই শব্দ হয়নি।

কিন্তু জম্বুদা?

এর উত্তর দিলেন বৌদি।

আলুথালু কেশবাসে প্রায় ছুটে এসে ধপাস করে বসে পড়ে বলেন, এত করে বলি বেঁধে রাখবি কুকুরটাকে তা কিছুতেই যদি কথা শোনে। খালি হাসবে আর বলবে, কিছু করবে না, কিছু করবে না। কামড়ে দিলে তোরা বাঁচাবি? আর এই যে হয়েছেন তোমাদের দাদা, ঢুকেছেন তো গিয়ে খিল বন্ধ ঘরে। অথচ কুকুর রাখবার শখটি বিলক্ষণ! বলছি, অমূল্য মামার ছেলেটা মরছে কুকুরটার জন্যে দিয়ে দাও তাকে তা দেবেন না। বলে এ রকম একটা বাঘের কুকুর থাকা নাকি আভিজাত্য? অথচ দেখলে ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপবে। কোথাও ঘেউ করেছে তো ঘরে খিল দিয়েছে! আশ্চর্য, পুরুষ মানুষের এত ভয়!'

হঠাৎ পাশের ঘর থেকে জম্বুদা বেরিয়ে আসেন। গম্ভীর গলায় বলেন। 'ভয় মানে? বাথরুমে যেতে হল হঠাৎ, তাই...এ কী এগুলো এভাবে পড়লো কি করে?'

আমি তাড়াতাড়ি তুলতে যাচ্ছিলাম, জম্বুদা নিবৃত্ত করলেন। বললেন, তুমি কেন? আশ্চর্য! তারপর আবার হাঁক পাড়লেন গুরুদয়াল! গুরুদয়াল!'

সেই গেঞ্জিপাজামা পরা ছোকরা এসে দাঁড়ালো, জম্বুদা অকারণ ক্রুদ্ধস্বরে বলে উঠলেন 'ইসকো উঠায় লেও, ঠিকঠাক করকে দেও।'

ছোকরা একটু মুচকি হেসে সব ঠিক করে দিয়ে ভাল বাঙালীর গলায় বলে 'চা লাগবে দিদিমণি?'

জম্বুদা তীব্র স্বরে বলেন। 'জরুর লাগেগা!'

আর বৌদি এতক্ষণে হাঁফ ফেলে বলেন। 'উঁ। হার্টফেল করবার দাখিল। তুমি কতক্ষণ?'

'এই খানিকক্ষণ!'

'বেশ করেছ ভাই, রোজই ভাবি তোমাদের কথা' তা বাড়ি চিনলে কি করে?

জম্বুদা বোধকরি আর সেই আভিজাত্যের নির্লিপ্ত আত্মস্থ মুখোশটা মুখে সেঁটে রাখতে পারেন না চেঁচিয়ে বলে ওঠেন, বোকার মত কথা বোলো না ললিতা। এ কে মল্লিকের নাম কলকাতা শহরে কে না জানে? টেলিফোন গাইডেই পেয়েছে।

বৌদি অবশ্যই সেই অনেকদিন আগের কথা ভুলে গেছেন, আমিও আর তুললাম না, সেই সবজবহর গজসিংহ হাসির শরণাপন্ন হলাম।

~ www.amarboi.com ~

বৌদি বললেন, তারপর তোমাদের খবর কি?'

হাসলাম আমাদের খবর কি? খবর তো তোমাদেরই। কি বল জম্বুদা?'

জম্বুদা এবার একটু উচ্চাঙ্গের হাসি হাসেন, দেখ, জম্বুদা ছাড়াও পিতৃদত্ত নাম একটা আমার ছিল 'জনরঞ্জন' নামটাও এমন কিছু দুরুচ্চার্য নয়। সে যাক, খবর আমারও কিছু নেই—এক ধনবতী মহিলার বশংবদ স্বামী সেজে পড়ে আছি এই পর্যন্ত। বাকি সব খবরই মহিলাটির।'

স্বামী সেজে!

বৌদি হাঁস ফাঁসিয়ে ওঠেন, 'স্বামী সেজে বসে আছ তুমি।? সাজা স্বামী?'

আহা ওই হল! চটছো কেন?...বুঝলি—তোদের এই ললিতা দেবী—'

'বুড়ো বয়সে সকলের সামনে ললিতা ললিতা কোরো না বাবু' বৌদি বিরক্ত গলায় বলেন, ভাল লাগে না।'

দাদা মৃদু হাসির সঙ্গে বলেন, তা ভাল না লাগলেই বা চলবে কেন গো? এখন সর্বদাই তো ললিতা দেবী। মোটা মোটা চেক সই করবেন ললিতা দেবী, সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউর দু'হাজার টাকা বাড়ি ভাড়ার রসিদ দেবেন ললিতা দেবী, অতএব—'

দাদার সেই ব্যঙ্গ তীক্ষ্ণ কথাগুলি আছে ঠিকই দেখছি, কিন্তু মুখের ভাবটি তার অনুগামী কোথায়? জম্বুদার সেই সদা উত্তেজিত পেশী-কঠিন মুখের রেখায় রেখায় এখন যেন মাখনের অনুলেপন।

সেই মসৃণ মধুর মুখে আবার বলেন, চল্ না দেখবি বুড়োর সংসারের সমারোহের বহর? ঘরে ঘরে কি সাজ সজ্জা, ঘরে ঘরে এটাচড বাথ, সব ঘর এয়ার কন্ডিশন্ড গ্যাস' ইলেকট্রিক চুল্লি দু দুটো ফ্রীজ সে একেবারে এলাহী ব্যাপার। বুড়োর গিন্নী ছিল না শখ ছিল প্রচুর। তবে ওই আর কি, পছন্দের প্যাটার্নটা ওল্ডটাইপের! দেখ না এই ড্রইংরুম সেটটা মনে হচ্ছে না ঊনবিংশ শতাব্দীর? একধার থেকে বদলে ফেলবো সব!'

'ফের ওই কথা বলছো—'বৌদি ফোঁস করে ওঠেন 'মামার সাজানো সংসারে এসেই বলছেন এটা সেকেলে ওটা সেকেল বাতিল করে দেব, বদলে দেব। কেন বলতো ভাই?'

আমি কিছু বলার আগেই জম্বুদা বলেন, 'এই দেখ, কেন আবার কি? থাকতে হলে একটু ভালভাবেই থাকতে হয়। তা নয় তো সেই ক্লাইভের আমলের ফার্নিচার! বুড়োর পয়সাই ছিল রুচি ছিল না। তা রুচির কথাই বা কি বলবো? ললিতা দেবী তো বেহালার বাসার সেই তৈজসপত্রাদি ফেলে আসার দুঃখে কেঁদে ভাসালেন? জেলেনির আঁশ চুপড়ির গল্প আর কি!'

'তা' বলে তুমি মামার সব কিছু চিহ্ন মুছে দেবে? দেখ ভাই, মামা কিছু লোককে মাসে মাসে সাহায্য করতেন, সে বেচারাদের উনি—'

কিছু কিছু?'

জম্বুদা উদ্দীপ্ত হন।

জম্বুদার মুখ থেকে পাইপটা খসে পড়ে। এই এতবড় লিস্ট! কোন না গোটা পঞ্চাশ

~ www.amarboi.com ~

হবে। শুধু শুধু যেন খাজনা আদায় করতে এসে দাঁড়ালো! কিসের খাজনা? না দারিদ্র্যের খাজনা। যেহেতু তাঁরা অকৃতী, অক্ষম অলস, বেকার সেই হেতু তাঁরা তার ট্যাক্স নেবেন।'

বৌদি ক্ষুব্ধ গলায় বলেন 'ওরা তো বেশী চায় না, পাঁচ দশ পনেরো—এই তো! কত টাকা মামার—'

'টাকার কথা হচ্ছে না', জম্বুদা পুরনোকালের উত্তেজনার গলায় বলেন', তোমার টাকা তুমি ইচ্ছে করলে ডাস্টবীনে ফেলে দিতে পারো। কিন্তু পাপকে তুমি প্রশ্রয় দেবে কেন? দারিদ্র্য একটা ঘৃণ্য পাপ তা জানো? কারণ অলসতা থেকে তার জন্ম। অলসতা, শ্রম বিমুখতা, তাকে তুমি প্রশ্রয় দেবে?'

বৌদি অসন্তুষ্ট গলায় বলেন নিজেই তো বলতে—'ভাগ করে খেতে হবে সকলের সাথে অন্নপান—'

জম্বুদা অতীত কথায় বিচলিত হন না, বরং আরো উদ্দীপ্ত হন, চমৎকার! সেটা আর এটা এক হল? এ তুমি কি করছো? কতকগুলো অলস লোককে ভিক্ষাবৃত্তির সুযোগ দিচ্ছ! যারা দেশের শত্রু সমাজের শত্রু!.. কী আর বলবো, আমার হাতে যদি পাওয়ার থাকতো এই লোকগুলোকে জ্যান্ত গোর দিতাম! স্রেফ জ্যান্ত গোর।

পাইপটা তুলে নিলেন আবার।

তেষ্টা পাচ্ছিল ফ্রিজের জল খাবার ভয়ে জল চাইতে পারছি না, আমার আবার ঠাণ্ডা জলে এলার্জি! বলি 'আচ্ছা উঠি আজ!'

'তার মানে? উঠি মানে?' জম্বুদা রে রে করে ওঠেন, চা খেয়ে যাবি না? চায়ের কি হল বলতো ললিতা? তোমার এই মামার চাকরগুলি হচ্ছে একের নম্বর কুঁড়ে। একধার থেকে সবকটাকে বিদেয় করবো। স্রেফ ঝেঁটিয়ে সাফ করে দেব! একটু চা আনতে এত দেরী!'

বৌদি উঠে পড়ে বলেন, 'আমি দেখছি—'

দাদা ধমক দেন 'না। তুমি দেখবে না। এটা ওদের অস্কারা দেওয়া। ডাকছি আমি—'

ব্যস্ত হয়ে বলি, 'আজ থাক জম্বুদা, আর একদিন হবে। আচ্ছা মিঠুকে দেখলাম না?'

'মিঠু?'

বৌদি ছলছল চোখে বলেন, 'তাকে তো কনভেন্টে দিয়ে দিয়েছেন।'

কনভেন্টে!

বিস্মিত হব না প্রতিজ্ঞা করেও বিস্মিত হই, আর জম্বুদা বিস্মিত হন আমার বিস্ময়ে, 'তা' অমন আকাশ থেকে পড়ছিস কেন? অনাদি মল্লিকের ভাবী উত্তরাধিকারিণী হিসেবে মানুষ করে তুলতে হবে তো? বেহালা বালিকা বিদ্যালয়ে পড়ে পড়ে তো পরকাল ঝরঝরে হয়ে যাচ্ছিল মেয়ের। শ্রীমতী ললিতাদেবীর পাতা চাপা কপালের পাতাটা যখন উড়েই গেছে—আরে উঠে পড়লি? ওই তো চা এসে গেছে।

'তোমরা খাও।'

বলে তাড়াতাড়ি ছেঁড়া চটিটাকে পায়ে গলিয়ে দরজার বাইরে বেরিয়ে আসি।

~ www.amarboi.com ~

ঋণশোধ

'হ্যাঁ ওঁর সম্পর্কেই চিন্তা করা দরকার—' বললেন, কমিটি মিটিঙে সবাই একজোট হয়ে 'বাস্তবিকই, দেশের মুক্তি সংগ্রামে ওঁর যথেষ্ট অবদান রয়েছে।'

এ কমিটিতে বেশ কয়েকজন পণ্ডিতজন রয়েছেন, 'অনাহারি পোস্টে' যেমন থাকে। এঁরা বিশুদ্ধ বাংলায় কথা বলতে পছন্দ করেন, বিশ্বাস করেন সেটাই জাতীয়তা। বিশেষ করে কমিটির চেয়ারম্যান মৃগাঙ্ক পালিত। তাঁর সামনেই এই মুক্তিঋণ পরিশোধ কমিটির কাগজপত্র বিছানো, তিনি সেগুলোকে ওলটাতে ওলটাতে বলেন, 'তাহলে আপনারা সবাই একমত?'

বাকি ক'জনাই একবাক্যে বলে ওঠেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, ও আর এদিক ওদিক করার দরকার নেই। ওই গোবিন্দ বিশ্বাসকেই—'

মৃগাঙ্ক পালিত আবেগের গলায় বলেন, 'হ্যাঁ, এই গোবিন্দ বিশ্বাসই এ জেলার যথার্থ দাবিদার। কে না জানে ইনি সত্যাগ্রহ করেছেন, লবণ আইন ভঙ্গ করেছেন, পুলিশের মার খেয়েছেন, বহুবার জেল খেটেছেন। তাছাড়া—বীরভূম জেলা সংযোগ পরিষদ থেকেও এই নামই প্রস্তাবিত হয়ে এসেছে।'

এই নামই এসেছে সেটা সকলেরই জানা ছিল, এবং প্রস্তাবের ব্যাপার নিয়ে এতক্ষণ সামান্য কিছু বিতর্কও হচ্ছিল, এখন সকলে একমত হলেন। গোবিন্দ বিশ্বাসকেই—

বিতর্কটা অবশ্য অন্য কিছু নিয়ে নয়, দু'-একজন বলছিলেন, টাকাটা খোদ গোবিন্দ বিশ্বাসের হাতেই দেওয়া হোক। কিন্তু সে প্রস্তাব নাকচ হয়ে গেল। মৃগাঙ্ক পালিত এ প্রস্তাবের যৌক্তিকতা স্বীকার করলেও, তার অসুবিধের কণ্টকিত ছবিটি সকলের সামনে তুলে ধরলেন, ভদ্রলোকের বয়েস তো শুনছি আশী-পঁচাশী, তাঁকে ওই গণ্ডগ্রাম থেকে কলকাতায় আনা, সভায় উপস্থাপিত করা সোজা রিস্ক? আর ব্রজেনবাবু যা বলছেন, 'পরিশোধ কমিটির তরফ থেকে কেউ সেখানে গিয়ে তাঁর বাড়িতেই একটা সম্বর্ধনা মত করে টাকাটা হাতে তুলে দেওয়া! সেটাও বহুৎ ঝুট ঝামেলার ব্যাপার!'

বিশুদ্ধ বাংলার মধ্যেও 'ঝুট ঝামেলা' 'মোকাবিলা' 'জওয়ান' প্রভৃতি শব্দগুলি ব্যবহার করে থাকেন মৃগাঙ্ক পালিত। কে জানে শব্দগুলির প্রাণশক্তির মোহে, না ওগুলিও বিশুদ্ধ বাংলার অঙ্গীভূত হয়ে যাওয়ার আহ্লাদে। কিসের জন্যে, ভগবান অথবা তিনি নিজে জানেন। তবে ব্যবহার যে করে থাকেন সর্বদা সেটা আর সবাই জানে। এখনও করলেন।

বললেন, বহুৎ ঝুট্‌ঝামেলার ব্যাপার। 'কেউ একজন গেলে তো চলবে না, অন্ততঃ তিনজনকে যেতেই হবে। সংযোগ কমিটির সেক্রেটারী এবং অপর দু'জন, বিশিষ্ট ব্যক্তি।

~ www.amarboi.com ~

মানে আর কি, টাকাটা আমরাই ক'জনে ভাগ বাঁটোয়ারা করে পকেটে পুরে ফেলছি কিনা তার সাক্ষী রাখতে—'

হাসলেন মৃগাঙ্ক পালিত।

একটি পরম অসম্ভব কথা নিয়ে লোকে যেমন মসৃণ কৌতুকের হাসি হাসে, তেমনি হাসি।

তারপর আবার বললেন, 'এ বাবা কোনো গোলমাল নেই, গোবিন্দ বিশ্বাসের ছেলে স্বয়ং জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের সার্টিফিকেট নিয়ে নিজে এলো, সভা ডেকে অনেক লোকের সামনে তার হাতে তুলে দেওয়া হলো, দায়িত্ব রইল না কিছু।'

এ কথার যৌক্তিকতা অপর সদস্যরা স্বীকার করলেন, এবং সেই মতো ব্যবস্থাতেই সম্মতি দিলেন।

মুক্তি ঋণ পরিশোধ কমিটির ব্যাপারটা হচ্ছে এই—বিবেক পরিশুদ্ধ চৈতন্যশীল জাতীয় সরকার বহুবিধ পরিশীলিত পরিকল্পনায় দিকে-বিদিকে যেমন বহু 'ভাণ্ডার' গঠিত করেছেন, এটি তেমনি একটি ভাণ্ডার।

দেশের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে একদা যাঁরা বহু ত্যাগ বহু ক্লেশ, এবং বহু শ্রমের স্বাক্ষর রেখেছিলেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই আজ জীবিত থেকেও মৃত। হয়তো কোনও গভীর গণ্ডগ্রামে রোগশীর্ণ এবং বার্ধক্য জীর্ণ শরীর নিয়ে চরম দারিদ্র্যের মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে পড়ে আছেন। এঁদের অনুসন্ধান করে বার করে করে ভাণ্ডার থেকে নগদ পাঁচ হাজার টাকা দান করা হবে। কিন্তু 'দান' শব্দটা সম্মানজনক নয় বলেই বলা হয়েছে 'ঋণ পরিশোধ'।

মুক্তি সংগ্রামের সৈনিক তোমরা একদা দেশের দুর্দিনে দেশকে যে কর্ম ঘর্ম ও মর্ম দান করেছো, আজ দেশের জাগ্রত সরকার সেই ঋণ পরিশোধ করছেন! 'মুক্তিঋণ'! তবে যে যেখানে আছে সবাইকে দেওয়া তো সম্ভব নয়। তাই প্রতিটি জেলায় এক এক জনকে দেওয়া হবে।

বিশিষ্ট কয়েকজন পণ্ডিত ও সমাজসেবীর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে 'যোগ্য' জনকে খুঁজে বার করবার ভার।

বীরভূম জেলা থেকে খুঁজে বার করা হয়েছে মুক্তিযোদ্ধা গোবিন্দ বিশ্বাসকে।

'জেলা পরিষদ সংযোগ কমিটি' থেকে এই নাম ও পরিচিতি প্রস্তাবিত হয়ে এসেছে।

কিন্তু ভদ্রলোকের বয়েস আশী-পঁচাশী। মুস্কিল এইখানেই।

কঙ্কালীতলা না কপালীতলা কোন যেন একটা গণ্ডগ্রামে থাকেন, তাঁকে কলকাতায় আনার হুজ্জুত পোহায় কে?

'কে বলতে পারে ঋণশোধ নিতে এসে টেঁসে যাবেন কিনা বুড়ো ভদ্রলোক—' বললেন অজিতবাবু। ওই ছেলেই! ছেলেই ভালো। সৎলোকের ছেলে, সৎই হবে নিশ্চয়। বাবাকে শেষ বয়সে একটু সুখে স্বচ্ছন্দে রাখতে পেয়ে কৃতার্থ হবে।'

'নিজের ব্যাঙ্কে মজুত করেও প্রীত হতে পারে—' বললেন ব্রজেনবাবু মুচকি হেসে। যিনি নাকি সেই বীর যোদ্ধার বাড়িতে গিয়ে একেবারে তাঁরই হাতে টাকাটা তুলে দেবার

~ www.amarboi.com ~

পক্ষপাতী ছিলেন।

'তা করলে আর আমাদের কী করবার আছে?' বললেন মৃগাঙ্ক পালিত, 'পঁচাশী বছরের বৃদ্ধ তো টাকাটা নিজের মাথায় বালিশের তলায় নিয়ে শুয়ে থাকবেন না? ছেলের হাতেই দিতে হবে তাঁকে।'

'তা অবশ্য! অতএব ওই কপালীতলার গোবিন্দ বিশ্বাসকেই—'

সমস্বরে রায় দিলেন সবাই।

বিল পাশ হয়ে গেল।

অর্থ তো মঞ্জুর আছেই।

যথা-নির্দিষ্ট দিনে সভা ডাকা হলো।

'জনসভা'-না হলেও ভিড় মন্দ হয়নি। অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ পত্র দেওয়া হয়েছে।

জনৈক পুরাতন দেশকর্মীকেই সভাপতি নির্বাচন করা হয়েছে, যিনি তাঁর ভাগ্যের দাক্ষিণ্যে আজ কোনো অখ্যাত অবজ্ঞাত গণ্ড গ্রামে পড়ে নেই। এই শহর কলকাতায় বাড়ি গাড়ি টাকাকড়ি পদপ্রতিষ্ঠা নিয়ে সুখেই আছেন। অর্থাৎ যাঁদের কর্মের এবং ঘর্মের ঋণ প্রথম মওকাতেই পরিশোধ হয়ে গিয়েছে, ইনি তাঁদেরই একজন।

গোবিন্দ বিশ্বাসের পুত্র অনন্ত বিশ্বাসকে সভাপতির পাশে বসিয়ে রাখা হয়েছে, এবং সভাপতির সঙ্গে সঙ্গে তারও মাফলার জড়ানো গলায় একগাছি মালা পরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

অবশ্য তাকে কেন মালা দেওয়া হলো, দর্শকগণ ঠিক বুঝে উঠতে পারেন নি, তবে ফিসফিস করে একজন পাশের বন্ধুকে বললেন, 'বাপের পুণ্যে তরে গেল আর কি! নিজে হয়তো ও মহাজনী কারবারী অথবা কালোবাজারী!'

'চেহারা দেখে তো—হ'য়ে আসছে—'

'গ্রামে থাকলে চেহারা বা সাজ-সজ্জার এমন অদ্ভুত একটা ছাপ পড়ে—'

কথাগুলোয় ড্যাশ টেনেই ছেড়ে দিতে হচ্ছে। কারণ 'গ্রাম নিন্দা' না হয়ে পড়ে, সেদিকে সচেতন থাকা দরকার।

অথচ ওই ধূতি শার্টের উপর পুরোহাতা সুতি সোয়েটার এবং তার উপর তিন প্যাঁচমারা মাফলার পরা আধাবয়সী লোকটিকে ঠিক 'উনি' 'তিনি'ও আসছে না যেন।

কিন্তু কী আর করা।

মানুষের যখন অবস্থা খারাপ হয়ে পড়ে তখন তার সূক্ষ্ম রুচিবোধগুলি যে ভোঁতা আর অসাড় হয়ে যায়, এটা বিদিত সত্য। গোবিন্দ বিশ্বাসের আজ অবস্থা খারাপ। তাঁর ছেলে অতএব ধুতির সঙ্গে গলায় তিন প্যাঁচ মাফলার জড়াবে এটা স্বাভাবিক।

সভাপতির হাতে লিখিত ভাষণ ছিল।

তাতে মুক্তি সংগ্রামে গোবিন্দ বিশ্বাসের অবদান সংক্রান্ত অনেক তথ্য ছিল ভাবময়ী ভাষায়।

~ www.amarboi.com ~

সভাপতির কণ্ঠে ভার আছে, ঝঙ্কার আছে, সভাপতির হৃদয়ে আবেগ আছে, সমবেদনা আছে, সভাপতির চিন্তায় দার্শনিকতা আছে, গভীরতা আছে, অতএব সভা জমে উঠতে দেরি হল না। উদাত্ত স্বরে তিনি পড়ে যেতে লাগলেন, কী ভাবে এই গোবিন্দ বিশ্বাস তদানীন্তন কালের পুলিশী লাঞ্ছনা অম্লান মুখে সহ্য করেও এতটুকু নিষ্ঠাচ্যুত হননি, কেমন করে তিনি বারবার হাসিমুখে কারাবরণ করেছেন, আপন স্বার্থের দিকে ফিরেও তাকান নি, 'না...মুক্তিসেনার জন্যে আরামের শয্যাতন নয়, তাকে বাঁধতে পারে না শিশুর হাস্য, মাতার হাহাকার প্রিয়ার অশ্রুজল।'

দণ্ডায়মান সভাপতি সস্নেহ সমীহে পার্শ্বে উপবিষ্ট অনন্ত বিশ্বাসের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করে বলেন, 'এই সেই শিশু। দেখেছি নিজের চোখে, 'বাবা বাবা' করে দরজায় ছুটে এসেছে, বীর সন্ন্যাসী নির্ভীক বক্ষে এগিয়ে গিয়েছেন পুলিশের বেটনে'র সামনে—'

হ্যাঁ, সভাপতি নিজের চোখেই দেখেছেন বৈ কি। একদা তিনিও তো ছিলেন ওই বীর সন্ন্যাসীদের একজন। হয়তো বা তাদের পুরোধা। সেই নিজের চোখে দেখার সূত্র ধরে চলে আসেন তিনি নিজের কথায়। নিজের স্মৃতি সাগরে ঝাঁপ দিয়ে বসেন। সেই সাগরেরই বহু তরঙ্গে হাবু-ডুবু খেতে থাকেন।

কখনো কম্পিত, কখনো উদাত্ত, কখনো কোমল, কখনো দৃপ্ত। চোখের সামনে বিশিষ্ট শ্রোতারা, মুখের সামনে শক্তিশালী মাইক এমন শুভ সুযোগকে অবহেলা করতে পারে?

ওদিকে গোবিন্দ বিশ্বাসের পুত্র অনন্ত বিশ্বাসের মধ্যে যেন একটা অস্থিরতা দেখা দিচ্ছে, যেন কি বলে উঠতে চাইবেন, যেন দাঁড়িয়ে উঠবেন, যেন কিছু একটা করবেন। অন্ততঃ ভঙ্গীতে সেই চাঞ্চল্য।

আবার একটু যেন বোধহীন অসহায়তাও।

যেন ওই সভাপতির ভাষণ শেষ হলেই নিষ্কৃতি পান।

গলার মালাটা অনেকক্ষণ পরেছিলেন তিনি, এখন খুলে ফেলেছেন, মাফলারটাকে বারবার খুলছেন এবং জড়াচ্ছেন, কোঁচার খুঁটেটা তুলে মোচড় দিচ্ছেন, এবং সোয়েটারের অস্তিনটা গোটাচ্ছেন আর টেনে নামাচ্ছেন।

সকলেই অবশ্য ওঁর দিকে তাকিয়ে ছিল না। যারা ছিল, তারা ভাবছিল—

থাক, কী ভাবছিল সে কথা না বলাই ভালো। তবে আসনের সারির দু'চারজন বিশিষ্ট ব্যক্তি, যাঁদের চোখে বড্ডই ফুটছিল দৃশ্যটা, তাঁরা করুণার সঙ্গে ভাবতে চেষ্টা করছিলেন, হয়তো এইটাই স্বাভাবিক। উনি, ওঁর বাবার কথাই বেশি করে বলা হোক এটাই চাইছিলেন। কিন্তু সভাপতি নিজের কথাই সাতকাহণ করছেন, ধান ভানতে শিবের গীত গাইছেন। আমাদের অভিধান থেকে 'মাত্রাজ্ঞান' শব্দটা যেন উবে গেছে।

যাক—এক সময় শিবের গীত শেষ হলো।

সভাপতির সমাপ্তির সুরে বললেন 'আজ আমরা নিজেরাই ধন্য হচ্ছি—এই রকম একজন সংগ্রামী বীরের, দেশমাতার এক সন্ন্যাসী সন্তানের সুযোগ্য পুত্রের হাতে এই পাঁচ হাজার টাকা তুলে দিয়ে তাঁর সেই অপরিশোধ্য ঋণের কিছুটা শোধ করতে পেরে।'

~ www.amarboi.com ~

একটা ছ্যাবলা গোছের ছোকরা নিচু গলায় তার পার্শ্ববর্তীকে বললো, 'সন্ন্যাসীর আবার পুত্র কেন বাবা!'

পার্শ্ববর্তী বললো, 'থাম্! কর্তারা ভাবের ঘোরে অমন অনেক কথা বলেন।'

কিন্তু ওসব তো নিচু গলায়। স্টেজের নীচে।

নিচুতলা থেকে নিচুগলায় অমন কতো কথা বলাবলি হয়, স্টেজ পর্যন্ত কি পৌঁছয় সে কথা? পৌঁছয় না। নিচুদের গলা তো আবার অ-মাইক।

গণ্যমান্যরাই এখানে বেশি সংখ্যার। তাঁদের সহর্ষ করতালিতে হল ফেটে পড়বার উপক্রম।

অতঃপর অনন্ত বিশ্বাসকে মাইকের সামনে দাঁড় করানো হলো, তাঁর হাতে সেই ঋণশোধের টাকার তোড়াটি তুলে দেওয়া হলো. আবার করতালিতে ঘর ফাটলো। মুহূর্মুহু ক্যামেরা ক্লিক্ করলো। দেওয়া টাকাটা ফিরিয়ে নিয়ে আর একবার দেওয়ার ভঙ্গীতে একটি স্পষ্ট ছবি তোলা হলো কিছুটা সময় নিয়ে, তারপর ঘোষণা করা হলো 'এবার শ্রীঅনন্ত বিশ্বাস কিছু বলবেন।'

অনন্ত বিশ্বাসের দিকে মাইকটি এগিয়ে দেওয়া হলো। আর ভাব দেখে মনে হলো, এইটিরই প্রতীক্ষা করছিলেন তিনি। মাইকের ডাণ্ডাটা বলিষ্ঠ মুষ্ঠিতে চেপে ধরে তিনি একেবারে মাইকে মুখ ঠেকিয়ে গাঁক গাঁক করে বলে উঠলেন 'সকল জনাকে প্রণামান্তে নিবেদন—দয়ালু গরমেন্ট আমার বাবার নাম করে যে পাঁচ হাজার টাকা দিলেন এটি উত্তম। একদা আমার বাবা শ্রীযুক্ত গোবিন্দ বিশ্বাস অনেক ফসল ফলিয়েছেন একথা সত্যি, কিন্তু নিবেদন এই—বর্তমান বৎসরে কপালীতলা গ্রামের যে বাইশ মণ ওজনের কুমড়োটি বাবুমশাইরা একজিবিশনে দেখেছেন, সেটি এই অধমেরই! তাছাড়া—'

সভার মধ্যে একটা গুঞ্জরণ উঠলো।

এটা কী হলো!

এ কী ব্যাপার!

এর মানে কি?

সেই গুঞ্জরণ মৃদু থেকে মৃদঙ্গে পৌঁছতো কিনা কে জানে, কিন্তু হঠাৎ আর একটা ঘটনা ঘটলো, মাইকটা যেন হঠাৎ একটা টান খেয়ে আর টাল খেয়ে আছড়ে পড়লো স্টেজের ওপর, এবং ভিতরে রোল উঠলো, 'পড়ে গেছেন, পড়ে গেছেন।...ডাক্তার...ডাক্তার!'

যবনিকা পড়ে গেল সভামঞ্চে। মৃদঙ্গে পৌঁছবার আগেই কৌতূহলীদের কৌতূহল অন্য প্রশ্নে উদগ্র হয়ে উঠলো, 'কে পড়ে গেলো?...কে পড়ে গেলো?'

যে সে কেউ নয়, স্বয়ং কমিটির চেয়ারম্যান।

কী করে?

মাইকের দড়ি পায়ে বেধে—

ও তাই মাইকটা হঠাৎ অমন আছড়ে পড়ে গেল। কিন্তু উনি তো এই এতক্ষণ সভার

~ www.amarboi.com ~

মধ্যেই ছিলেন। হঠাৎ কখন—

অসুস্থতা বোধ করে ভিতরে ঢুকে যাচ্ছিলেন, পায়ের কাছে দড়িটা বেধে—প্রেসার আছে তো ; হাইপ্রেসার—

সর্বনাশ! হাই-প্রেসারের রোগীর পড়ে যাওয়া—

সভাভঙ্গ হয়ে গেল।

ভিড় ছত্রভঙ্গ হলো।

এই রকম পড়ে যাওয়া থেকে কী কী হয়ে যাওয়া সম্ভব, সেই আলোচনায় সকলেই স্ব স্ব অভিজ্ঞতার ফিরিস্তি পেশ করতে করতে হল থেকে বেরিয়ে পড়লেন, একটা ছন্দপতনের বেখাপ্পা স্মৃতি বিস্মৃত হয়ে। এরপরে হয়তো স্মৃতিটা একটা জিজ্ঞাসার চিহ্ন হয়ে ফুটতে থাকবে, কিন্তু এখন নাটকে বযনিকা পড়ে গেছে।

চেয়ারম্যানের পতনে ছন্দপতনের গুঞ্জরণটায় বাঁধ পড়েছে।

কিন্তু যবনিকার ওদিকে তখন বাঁধ ভেঙেছে। চেয়ারম্যান মৃগাঙ্ক পালিত টেবিলে ঘুসি মেরে চাপা অথচ তীব্র গর্জন করছেন, 'আমি জানতে ছাই ওই বাইশমনী কুমড়োটিকে এখানে আনলো কে?

সংযোগ কমিটির সেক্রেটারী অনিল দাসের মুখে কথা নেই।

চারিদিকে এর ওর তার ভিড় ছিল, তাদের সরিয়ে দেওয়া হয়েছে, শুধু দুজনে মুখোমুখি।

মৃগাঙ্ক ওই নির্বাক নতনেত্রের পানে এক নজর চেয়ে ফের টেবিলে ঘুসি বসান, চুপ করে থাকলে চলবে না। বলুন—এই আবিষ্কারের গৌরবটি কার? বলুন।'

অনিল দাস ওই রুদ্র প্রশ্নে নার্ভাস হয়ে গিয়ে বাকযন্ত্রকে সহজে আয়ত্তে আনতে পারেন না, তাই পুনঃ পুনঃ প্রশ্নবানে বিদ্ধ হতে থাকেন।—কে গিয়েছিল সেখানে? কে? কে আবিষ্কার করছিল এই কুমড়োকে? অনিলবাবু আপনিই গিয়েছিলেন না বীরভুমে?'

অনিলবাবু এবার মাথা চুলকে বলে ফেলতে বাধ্য হন, না মানে, ঠিক আমি নিজে নয়—।

নিজে নয়? বাঘের মত গর্জে ওঠেন মৃগাঙ্ক পালিত, 'এখন একথা বলছেন? আপনিই রিপোর্ট দেননি নিজে গিয়েছিলেন? বলেননি অশীতিপর বৃদ্ধের মধ্যেও এখনও কী তেজ কী দীপ্তি? বলুন বলেছিলেন কিনা?'

অনিল দাস কাতর গলায় বলেন, 'স্বীকার করছি বলেছিলাম স্যার, ভাগ্নের কথায় বলেছিলাম। জেলা পরিষদের সংবাদদাতা আমার নিজের ভাগ্নে। সে যে আমাকে এমন করে ডোবাবে, তা কেমন করে জানবো বলুন?'

'আপনি ডুবতে যাবেন কেন?' মৃগাঙ্ক রূঢ় গলায় বলেন, 'ডুবলে আমিই ডুববো। ছি ছি! তবু তো ঝপ্ করে মাইকটা টেনে নিয়ে পড়ে যাওয়ার রব তুলে কেলেঙ্কারীটাকে বেশীদূর গড়াতে দিলাম না। কিন্তু না গড়াবে কি? ভাবতে পারছেন পরিণামটা?'

~ www.amarboi.com ~

অনিল দাস কাঁদো কাঁদো সুরে বলে, 'অথচ ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের কাছ থেকে আইডেন্টিটি সার্টিফিকেট নিয়ে এসেছে—'

'তার মানে ম্যাজিস্ট্রেটও আপনার মতো ভাগ্নে দিয়ে কাজ চালিয়েছেন? কিন্তু আমি জানতে চাই আপনি নিজে গেলেন না কেন? কেন?'

অনিল দাস মরমে মরেন, ভুল হয়েছিল স্যার, বুঝতে পাচ্ছি। ভাগ্নে চিঠি লিখলো 'বড় দুর্গম জায়গা মামা, সাইকেল রিক্সা পর্যন্ত যায় না, চার মাইল পথ ধানের ক্ষেত দিয়ে হাঁটতে হয়—'

'তাই গেলেন না। কেমন?' অনিল দাসকে ভস্ম করে ফেলেন যেন মৃগাঙ্ক পালিত, 'অথচ টি-এ বিলটি ঠিক কাটলেন। আশ্চর্য! আপনাদের মতো লোকের জন্যেই—'

মৃগাঙ্ক দম নেন, ইত্যবসরে অনিল দাস 'কিছু বলতে চেষ্টা করেন। কিন্তু মৃগাঙ্ক মুহূর্তে চাঙ্গা হয়ে ওঠেন, বলবার সুযোগ দেন না।

ফের টেবিলে ঘুসি বসান, জানতে চাই ওই কুমড়োটি কে?'

'বোঝাই তো যাচ্ছে স্যার, বাজে একটা গোলা লোক। কোনো রকম গোলমাল ঘটেছে—'

'গোলমালটা আপনার মাথার মধ্যেই ঘটেছে।' মৃগাঙ্ক উদ্দাম হন। এ রকম একটা মারাত্মক গোলমাল কীভাবে হতে পারে? বলুন? বলুন?'

অনিল দাস এবার ভয়-ভাঙ্গা, গলায় তড়বড়িয়ে ওঠেন, 'গ্রামের নামের সাদৃশ্যেই এইটি হয়েছে স্যার। আমাদের কপালে একই জেলায় 'কপালি' 'কঙ্কালী' দু দুটো তলা থাকবে, তা খেয়াল করা হয়নি। এখন শুনছি পলিটিক্যাল সাফারায় গোবিন্দ বিশ্বাস যেখানে থাকেন, সেটা হচ্ছে কঙ্কালীতলা—'

'এখন শুনছেন! ওঃ! তা কোথা থেকে শুনছেন?'

আজ্ঞে বীরভূমের একটি ছেলে এসেছে, সেই বলছিল—'

'বলছিল! আগে বলতে পারেনি?'

'না, মানে এই গণ্ডগোল দেখেই—'

'তাহলে এই অনন্ত বিশ্বাস একটি ধাপ্পাবাজ?'

'তাও ঠিক নয় স্যার! ওর বাবার নামও গোবিন্দ বিশ্বাস—সেও আশী-পঁচাশী বছরের—'

'আপনি কি আমায় হাইকোর্ট দেখাতে এসেছেন অনিলবাবু? পাশাপাশি দুই গ্রামে দুই অশীতিপর গোবিন্দ বিশ্বাস?'

'হয় স্যার!' অনিলবাবু কণ্ঠে শক্তি ফিরে পেয়েছেন, 'গ্রামের লোকের কল্পনা শক্তি তো বেশী নয়—ওই রেখেছিল ছেলের একটা ঠাকুর দেবতার নাম। গোপাল গোবিন্দয় তো আমাদের দেশ ভর্তি স্যার!'

'আপনি থামুন!' মৃগাঙ্ক পালিতের ঘুসিতে টেবিল থরথরিয়ে ওঠে, 'আমি ওই কুমড়ো আর তার ম্যাজিস্ট্রেটের নামে কেস করবো—ওকে আমি জেলে দিয়ে ছাড়বো।'

~ www.amarboi.com ~

'জিততে পারবেন না স্যার! ওর বাবার নামও যখন সত্যিই গোবিন্দ বিশ্বাস। তাছাড়া—লোকটা ম্যাজিস্ট্রেট-জানিত লোক, জেলা প্রদর্শনীতে ওর বাগানের কুমড়ো।

'ফের কুমড়ো!' মৃগাঙ্ক পালিত টগবগ করে ওঠেন, 'আপনি কুমড়ো থামাবেন, উঃ! অসহ্য! আপনি কি বলতে চান আমাদের গ্রামগুলি শুধু যে গোপাল গোবিন্দতেই ভরা নয়, আগাগোড়া অনন্তময়ও? দুই গোবিন্দর ছেলের নামও অনন্ত?'

অনিল দাস কাছে সরে আসেন, খুব নিচু গলায় বলেন, 'সেখানেও এক কেলেঙ্কারী হয়ে গেছে স্যার, আসল গোবিন্দ বিশ্বাসের ছেলের নামে কোনো প্রশ্নই নেই। উনি হচ্ছেন অকৃতদার। মানে আর কি—ব্যাচিলার। ওই জেলে যেতে যেতে বিয়ে-টিয়ে করবার ফুরসৎই পাননি ভদ্রলোক।'

'চমৎকার!'

মৃগাঙ্ক পালিত বসে পড়েন, ঠাণ্ডা মেরে যান।

স্তিমিত গলায় বলেন, 'তার মানে এর ফয়সালা করতে গিয়ে নিজেদের গালে-মুখে চুন কালি মাখতে হবে।'

'ফয়সালা!'

অনিল দাসের মুখে একটি বরাভয়ের হাসি ফুটে ওঠে, তিনি আন্তরিক গলায় মন্ত্রণাদাতার ভঙ্গীতে বলেন, 'অমন কাজও করতে যাবেন না স্যার, চেপে যান।'

'চেপে যাব?'

চিঁ-চিঁ শোনায় মৃগাঙ্কর গলা।

'নিশ্চয়। চেপে যাওয়াই মঙ্গল। চেপে যাওয়াই হচ্ছে শ্রেষ্ঠনীতি।'

'তাহলে আসল গোবিন্দ বিশ্বাসের কি হচ্ছে?'

'চেপে যান!'

মৃগাঙ্ক চেয়ারের পিঠে ঘাড় ঠেকিয়ে শিথিল গলায় বলেন, 'কুমড়া চলে গেছে?'

'আজ্ঞে না। একটু আগে দেখে এসেছি, চা সন্দেশ খাচ্ছে, আর অসন্তোষ করছে।'

'অসন্তোষ করছে?'

'হ্যাঁ স্যার! বলছে, 'আমাদের চোদ্দ-পুরুষে কেউ কখনো পুলিশের মার খায়নি, জেল হাজতের দরজা চোখে দেখেনি, বাবার নামে এ-সব কি কথা!' মানে দেশ থেকে দু-একজন বন্ধু-বান্ধবকে সঙ্গে এনেছে তো, তারাই ওস্কাচ্ছে। ঈর্ষার ফল আর কি! বন্ধু মুফতে অতগুলো টাকা পেয়ে গেল—তাছাড়া চা সন্দেশ—।

মৃগাঙ্ক উদ্বিগ্ন গলায় বলেন, 'কাদের সামনে বলছে?'

'সে কিছু না, ওই ছেলে-ছোকরাদের সামনে—'

'ছেলে ছোকরা!' মৃগাঙ্ক চেয়ারে ঘাড় হেলিয়ে বলেন, 'ওদের আপনি অগ্রাহ্য করছেন? যান, শীগ্‌গির চলে যান, যারা এসেছে, সবাইকে চা সন্দেশ খাইয়ে ট্রেন ভাড়া দিয়ে পাঠিয়ে দিন। আর শুনুন—সভা সাজাতে যে সব ফুলের তোড়া-ফোড়া এসেছিল, সব ওদের সঙ্গে দিয়ে দেবেন।'

~ www.amarboi.com ~

সৌরভ সার

নিত্য অভ্যাসের নৈপুণ্যে সাজটা ত্রুটিহীন হলেও বিতৃষ্ণায় ভরা মন নিয়েই প্রসাধনপর্ব সমাপ্ত করছিল অলকা ত্রিপাঠী। কিন্তু সে প্রসাধনে শেষটান দিতে সুর্মাদানীটা হাতে নিয়েই মনটা তার হঠাৎ তীব্র বিরক্তিতে বিদ্রোহী হয়ে বুনো ঘোড়ার মত ঘাড় বাঁকিয়ে দাঁড়ালো।

সুর্মাদানীটা ঠেলে রাখলো অলকা ত্রিপাঠী, আর্শির সামনে থেকে সরে এসে সোফায় বসে পড়ে প্রায় উচ্চারণের মত করে ভাবতে লাগলো, কেন? কেন? কেন আমি এসব করছি? কেন করি? কেন করবো? কেন আমি ওর ইচ্ছের পুতুল হয়ে পুতুলের মত রূপসজ্জা করে 'হাসুনে পুতুলের মুখ' নিয়ে ওর সেই পেটমোটা বন্ধুদের সঙ্গে (হ্যাঁ, ও ওদের কথা উল্লেখ করতে 'বন্ধু'ই বলে) পার্টিতে পার্টিতে ঘুরবো, তাদেরকে নিজের বাড়িতে ডেকে ডেকে পার্টি দেব? তাদের খানাপিনার 'খানা'গুলো বাড়ির রাঁধুনীকে দিয়ে বানিয়ে আর ভালো হোটেল থেকে আনিয়ে পাতে পরিবেশন করতে করতে আদুরে গলায় বলবো, 'ফেলতে পাবেন না কিছু। সারাদিন কষ্ট করে বানিয়েছি আপনাদের জন্যে। ফেললে বুঝবো নেহাৎ অখাদ্য হয়েছে বলেই—'

তার মানে ভাববো বোকা বানাচ্ছি তাদের।

আর তারা আমাদের বোকা বানিয়ে প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে তারিয়ে তাঁরিয়ে খাবে, আর বলবে 'বাস্তবিক মিস্টার ত্রিপাঠী, আপনি রীতিমত ভাগ্যবান!'

আমি জানি আমার স্বামী বোকা বনেন, তাই ওরা চলে গেলে হেসে হেসে বলেন, 'দেখলে তো ধরতেই পারলো না! আর বাড়ির রান্না বলে কী খুশি হয়ে খেলো। পেট আর মাথা দুটোই সমান মোটা তো ওদের! খুব বোকা বানানো গেল!'

আমি আমার স্বামীর আত্মপ্রসাদ আর আত্মবুদ্ধির অহমিকার স্বপ্ন ভেঙে দিতে পারি না, তাই সেই হাসির সঙ্গে হাসির যোগ দিই। কিন্তু আমি বুঝতে পারি বোকা আমরা ওদের বানাতে পারি নি ওরাই আমাদের বানিয়ে গেল। ওরা ওই রন্ধনরহস্য সম্বন্ধে অনুমানসিদ্ধ হয়েই আমাদের প্লীজ্ করেছে।

মাথামোটা হলে ওরা এই তামাম বিজনেস হাট'টাকে মুঠোয় পুরে ফেলতে পারতো না। মাথামোটা হলে, আমার স্বামীর মত মাথাসরু বিদ্বানরা ওদের পায়ে পায়ে ঘুরে বেড়াতো না। ওদের গদিতে চাকর হয়ে থাকতো না। মাথামোটার ভান করে গোটা দুনিয়াটাকে স্টাডি করে ফেলেছে ওরা, আর অবিরত তাকে কুক্ষিগত করে চলেছে।

কিন্তু আমার স্বামী ধূর্জটি ত্রিপাঠী ভাবেন ওরা মাথামোটা তাই ওদেরকে ঘিরে ঘিরে সূক্ষ্ম বুদ্ধির জাল রচনা করতে বসেন। সে জালের 'টানা'টা হচ্ছে তাঁর সুন্দরী বিদুষী

~ www.amarboi.com ~

আর নৃত্যগীতপটীয়সী স্ত্রী, আর 'পোড়েন'টা হচ্ছে তাঁর নিজের নির্লজ্জ চাটুকারিতা।

কিন্তু কেন? কেন বরাবর এই নোংরামীটা চলতে থাকবে? ক্ষুব্ধ আক্রোশে ভাবতে থাকে অলকা ত্রিপাঠী, কেন আমি আমার স্বামীর হাতের ওই লাটাইয়ের সুতো হয়েই থাকবো? কেন আমি নিত্য সন্ধ্যায় খারাপ মেয়েমানুষের মত নিজেকে সাজসজ্জায় চটকদার করে তুলে ওর উদ্দেশ্য সিদ্ধির সাধনে ওই অমার্জিত পুরুষগুলোর লুব্ধ দৃষ্টির সামনে গিয়ে ডানা মেলবো?

আমার স্বামী ধূর্জটি ত্রিপাঠী জানেন সেটা। জানেন আমি তাঁর একটি শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার। তবু ন্যাকামী করে বলেন, 'এটা তোমার বাড়াবাড়ি, এটা তোমার চিন্তার বিকৃতি, আমরা একে মনোরঞ্জন বলি না, বলি আপ্যায়ন।'

আমি এই ন্যাকামীকে ঘৃণা করি।

আমি ওকেও ঘৃণা করি।

শুধু ওর ওই বড়লোক হবার বাসনায় উন্মত্ত দীনচিত্তটাকে করুণা করেই—হ্যাঁ, করুণা করেই ওর ইচ্ছের পুতুল হয়ে পুতুল সাজি।

তা বড়লোক ও হচ্ছে বৈ কি।

ওর ওই অর্ডার সাপ্লাইয়ের বিজনেস দিনে দিনে কণায় কণায় বাড়ছে। ওর হাভাতে ঘরে লক্ষ্মীর পদপাতের চিহ্ন ঝলমলিয়ে উঠছে বেশি থেকে বেশি!

আর ও আবেগে উৎসাহে আমায় জড়িয়ে ধরে বলছে, 'তুমি, তুমিই আমার লক্ষ্মী! তোমার জন্যেই আমার সব।' বলছে 'যা নাচ দেখিয়েছ, ভোঁদড় বাবাজীদের মুণ্ডু ঘুরিয়ে দিয়েছ একেবারে!...সত্যি, তোমার এই নাচটা আমার এত কাজে লাগছে! নাচিয়ে-গাইয়ে মেয়ে বিয়ে করাটা সার্থক হয়েছে বলতে হবে। নইলে বেশির ভাগ মেয়েই তো বিয়ের পরে স্রেফ্ গুব্‌লেট হয়ে যায়। নাচতে জানতো কি গাইতে পারতো ভুলেই মেরে দেয়। আমাদের লতুকেই দেখো। তোমার চেয়ে ছোট বৈ বড় নয়, কিন্তু স্রেফ্ একখানা বুড়ি বনে বসে আছে। কে বলবে গানে ওর গীতশ্রী উপাধি ছিল, আর নাচের মেডেল আছে বাক্সভর্তি।'

লতু ধূর্জটির মামাতো বোন।

অলকার সহপাঠিনী।

গানের স্কুলেও একসঙ্গে শিখেছে।

কিন্তু এখন?

এখন একটা সুর তুলতে 'বাই জন্মে' যায় তার, অথচ তার জন্যে দুঃখের বালাই নেই। হেসে হেসে বলে, 'আমার আর ফসল গোলায় উঠবে কি, রাতদিন তো গরুতে মুড়োচ্ছে। দু-দুটো ডাকাত নিয়ে মল্লযুদ্ধু চালাচ্ছি রাতদিন। ওদের সঙ্গে চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে গলা একেবারে ভাঙা কাঁসর হয়ে গেছে। অলকা বৌদি আছে ভাল।'

আছে ভাল!

~ www.amarboi.com ~

কারণ অলকার ঘরে ডাকাতের উৎপাত নেই। অলকার বর ধূর্জটি ত্রিপাঠী বুদ্ধিমান লোক, ও ওর দেউড়ী শক্ত রেখেছে যাতে না ডাকাত-টাকাত ঢুকে পড়ে। ও আগে ঘর গুছিয়ে নেবে, তারপর দেউড়ী খোলার কথা চিন্তা করবে।

কিন্তু আর কত ঘর গোছাবে ধূর্জটি?

আর কত ভাঙাবে অলকাকে?

অলকা আর পারবে না, পারবে না, পারবে না! পারবে না ধূর্জটির 'ডীলার'দের মনোরঞ্জনার্থে নাচতে, গান গাইতে।

কিন্তু 'পারবো না' কথাটা কি শুধু আজই বলছে অলকা? আজ ওই সুর্মাদানীটা ঠেলে ফেলে রেখে? প্রথম থেকেই কি প্রতিবাদে মুখর হয় নি সে? বলে নি কি—'আমি পারবো না, আমি পারবো না, আমার ভয় করে!'

'ভয় করে!'

হেসেছে ধূর্জটি, কত ফাংশানে নেচে এসেছো, কত বাহাবা কুড়িয়েছে—

'সে তো ভালো জায়গা—'

'এই বা কী এত খারাপ জায়গা? একটা গণ্যমান্য লোকেদের পার্টি। ভদ্র সম্ভ্রান্ত সব লোকেরা আসেন—'

'আমার বিচ্ছিরী লাগে!'

'ভয়' শব্দটা ছেড়ে ক্রমশ 'বিচ্ছিরী' শব্দটা ধরেছিল অলকা।

'আমি পারবো না, আমার বিচ্ছিরী লাগে।'

ধূর্জটি তখন আকাশ থেকে পড়েছে। চোখ কপালে তুলে বলেছে, 'সে কি? তবে যে শুনেছিলাম নাচগানই তোমার ধ্যানজ্ঞান। লতু বলেছিল তুমি—'

'সে আমি আমার নিজের খুশির কথায় বলেছি। কিন্তু তুমি আমার নাচটা কাজে লাগাচ্ছো! তুমি তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে নাচাচ্ছো। আমি পারবো না।'

ধূর্জটি রেগে ওঠে নি, ধূর্জটি জোর জবরদস্তি করে নি, ধূর্জটি তবু পারিয়ে ছেড়েছে। ধূর্জটি তুতিয়েছে পাতিয়েছে, যুক্তি দেখিয়েছে।

পিঠে হাত বোলানোর ভঙ্গীতে বলেছে, 'এতবড় একটা বিদ্যে তোমার আয়ত্তে রয়েছে, শিখেছ খেটেখুটে, বাপের পয়সা খরচা করে, সেটা কাজে লাগাবে না? না লাগানোটা বোকামী, না লাগানোটা জড়তা। আর তুমি তো কিছু খারাপ কাজ করেছো না। তোমার স্বামীর উন্নতিকল্পে নিজের শক্তিটা একটু কাজে লাগাচ্ছো—'

অলকা তখন লাল লাল মুখ করে বলতো, 'আমার মনে হয় খারাপ! আমি যখন তোমার ওই পার্টি সেরে একা হই, মনে হয় খারাপ কিছু করে এলাম! মনে হয় কতকগুলো নোংরা চোখ যেন আমার গায়ে বিঁধে রয়েছে। আমি আর কোনোদিন যাব না।'

'সেরেছে!'

ধূর্জটি হা হা করে হেসে উঠতো। বলতো, ওটা হচ্ছে তোমার নার্ভাসনেস! শিল্পীদের

~ www.amarboi.com ~

প্রথম স্টেজে ওটা থাকে। মনে হয় সবাই আমাকেই দেখছে। ওটাকে কাটিয়ে উঠতে না পারলে যথার্থ শিল্পী হওয়া যায় না। কাটিয়ে উঠতে হবে। মনে করতে হবে পৃথিবীতে কোথাও কোনো চোখ নেই, শুধু আমি আছি, আর আমার আনন্দ আছে।'

'মনে করলেই তো হয় না?'

'হয়! চেষ্টা করলেই হয়। সে চেষ্টা করতে হবে।'

অলকা একথায় রেগে উঠতো।

বলতো, 'কেন? কেন তা করতে হবে? আমি কি নাচওয়ালী হতে যাবো?'

ধূর্জটি আবার হাসতো।

বলতো, নাচওয়ালী শব্দটা প্রয়োগ বিধির দোষেই খারাপে দাঁড়িয়েছে। ধর যদি বলি—'নৃত্যশিল্পী', দোষ খুঁজে পাবে তার মধ্যে?'

'জানি না, আমার ভাল লাগে না, আমি পারবো না!'

কিন্তু আগে 'নাচ নাচ' করে পাগল হতে। তোমার বাবার মুখেই শুনেছি, শুধু তোমার দুর্দান্ত ঝোঁকেই তাঁদের সনাতন পরিবারে এই আধুনিকতা ঢুকেছিল।'

'সে আলাদা।'

আলাদা কিসে আমায় বোঝাও। তবে যদি বল তোমার বিদ্যেটা আমার একটু কাজে লাগছে, সেটাতেই আপত্তি, তবে অবশ্য নাচার। আসলে ওদের একটু খাইয়ে মাখিয়ে, এন্টারটেন করে কিছু কাজ বাগিয়ে নেওয়া, এই তো!'

'তা তুমি যদি আমার সঙ্গে সহযোগিতা না করতে চাও—।' ধূর্জটি মুখটা করুণ করে ফেলতো।

'বাঃ তা কেন?' অলকাকে কিঞ্চিৎ নরম হতে হয় তখন।

'তাইই তো! যেটা তোমার সব চেয়ে প্রিয়, যেটা তোমার ধ্যানজ্ঞান, যেটাতে তোমার আনন্দ, সেটাই যেই আমার কাজে লাগবার প্রশ্ন উঠছে—'

'বাঃ এরকম ভাবছো কেন? জিনিসটা অবশ্যই আমার আনন্দের। একটা সুরকে গলায় না তুলে সর্বাঙ্গ দিয়ে তুলছি, তুলতে পারছি, এ যে কি আনন্দ তোমায় বলে বোঝাতে পারবো না। মনে হয় সত্যিই যেন আমার 'সকল দেহে আকুল রবে, মন্ত্রহারা কাহার স্তবে' আরতির শিখা জ্বলে ওঠে।...হেসো না, একটু কবিত্ব করলাম। কিন্তু সত্যি বলছি, সেই আনন্দ আর আনন্দ থাকে না যখন ভাবি আমি আমার দেহভঙ্গী দেখিয়ে কোনো উদ্দেশ্য সাধন করছি—'

ধূর্জটি ওর এই আপত্তি নস্যাৎ করে দিয়েছে। বলেছে, 'এ আর কিছুই নয়, এ হচ্ছে তোমার মজ্জাগত কুসংস্কারের প্রতিক্রিয়া। প্রপিতামহীর রক্তের ঋণের জের। নৃত্য একটা উচ্চাঙ্গের কলা, সর্বদেশে, সর্বকালে এ আছে, এবং এর সমাদর আছে। শুধু—'

অলকা তর্ক তুলতো।

বলতো 'সমাদর আছে, মর্যাদা নেই।'

'তাও আছে।'

~ www.amarboi.com ~

ধূর্জটিও তর্ক তুলতো, 'সত্যিকার কলাশাস্ত্রসম্মত লয়ের নিশ্চয়ই মর্যাদা আছে। আমাদের প্রাচীন ভারতেও ছিল। ভারতের অন্যান্য প্রদেশে আজও আছে। শুধু এই বাংলাদেশেই নানা কারণে নৃত্যকলার পতন ঘটেছিল, ভদ্রসমাজ থেকে স্খলিত হয়ে চলে গিয়েছিল অন্যশ্রেণীর ঘরে। নৃত্যশিল্পীদের ঠাঁই হয়েছিল সম্ভ্রান্ত পাড়ার বাইরে, নাম হয়েছিল, 'নটুয়া'। যেমন পটশিল্পীদের নাম হয়েছিল 'পটুয়া', ঠাঁই হয়েছিল অন্ত্যজ পাড়ায়। কিন্তু এ যুগে তো আর তা নেই।'

অলকা তখন হেসে ফেলতো।

কারণ তখনও অলকা ধূর্জটি ত্রিপাঠীর ভিতরের চক্ষুলজ্জাহীন অর্থপিপাসু মূর্তিটাকে স্পষ্ট দেখতে পায় নি। তখনও তার উপর আশা রাখতো, বিশ্বাস রাখতো, ভালবাসা রাখতো। সেই ভালবাসাটা ঘৃণা আর করুণায় পর্যবসিত হয় নি তখনও।

তাই অলকা তখন হেসে ফেলতো।

বলতো, 'ব্যবসা-বাণিজ্যের লাইনে না গিয়ে তুমি জ্ঞানচর্চা করলে না কেন? 'সমাজ বিবর্তনের ইতিহাসে নৃত্যশিল্প ও নৃত্যশিল্পী' টাইটেল দিয়ে 'থিসিস্' লিখে ডক্টরেট পেয়ে যেতে!'

ধূর্জটি তখন অন্য কৌশলে তর্কের এবং তার্কিকার মুখ বন্ধ করে দিতো। অলকা বিগলিত হতো।

তারপর ধূর্জটির সঙ্গে গিয়ে ওই তার বিজনেসম্যান বন্ধুদের পার্টিতে নেচেও আসতে হতো অলকাকে, আর সে, নাচ ভাল উৎরোলে, ত্রিপাঠীর বন্ধুরা ত্রিপাঠীর সৌভাগ্যে 'দশানন' হলে, কিঞ্চিৎ আত্মপ্রসাদও যে লাভ না করতো তা নয়।

কিন্তু বারে বারে ভাগ লাগে না, যখন তখন ভাল লাগে না।

অলকা বেঁকে বসেছে, 'পালিয়ে গিয়ে বসে থাকবো, দেখবে মজা--' বলে ভয় দেখিয়েছে, বলেছে 'পারবো না, পারছি না'। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ধূর্জটির অধ্যবসায়েরই জয় হয়েছে। আর এই একটা কৃত্রিম জীবনের মধ্যে আবর্তিত হতে হতেই হচ্ছে তাদের সংসার করা। ধূর্জটি ত্রিপাঠী আর অলকা ত্রিপাঠীর!

এ সংসারের রং হচ্ছে শুধু শিকার সন্ধান, রস হচ্ছে সেই শিকারের সাফল্য, আর রূপ হচ্ছে নিত্য-নতুন ঐশ্বর্যের প্রকাশ নিত্য-নতুন আসবাবের আগমন।

অলকা ভাবতে থাকে, এই কি জীবনের রূপ? এই কি সংসারের চেহারা?

লতু মাঝে মাঝেই বেড়াতে আসে এবাড়িতে, কারণ সে গৃহকর্তার বোন, গৃহিণীর বান্ধবী। এসে বলে, 'বাবা, তোদের এই ছবির মত বাড়িতে এই নন্দীভৃঙ্গী দুটোকে আনতে ভয় করে! চলে যাবার পর দেখিস্ অনেক কিছু 'আস্ত' করে দিয়ে গেছে।'

তারপর বলে, 'দিব্যি আছিস বাবা, সব সময় ফিটফাট্। ছবির মত বাড়ি, ছবির মত গিন্নী! আর আমায়? আমায় যদি বাড়িতে দেখিস্, স্রেফ্ একটি দানবদলনী রণরঙ্গিণী!'

বলে, 'বেশ আছো জটাদা! কোনো জ্বালা নেই!'

তারপর যতক্ষণ বসে থাকে, তারিয়ে তারিয়ে নিজের 'জ্বালা'র গল্প করে।

~ www.amarboi.com ~

অলকা নস্যাৎ হয়ে যায় যেন সেই 'জ্বালা'র মহিমায়।

কিন্তু অলকার?

অলকার যা জ্বালা সে কারো কাছে গল্প করবার নয়। সে জ্বালা শুধু অহরহ অলকাকে ভিতরে ভিতরে দগ্ধ করে।

অলকার সমস্ত নার্ভগুলো যেন সর্বদা বলে চলে, 'পারছি না, পারবো না।'

আজ অলকা প্রতিজ্ঞা করে আজ বলবোই। বলবো, 'তোমার বিজনেসের সুবিধের জন্যে আর আমি পুতুল সাজতে পারবো না, আমায় রেহাই দাও।'

বসে রইল সোফায়, প্রসাধনে শেষটান দিল না। বাকি রইলো সমাপ্তিরেখা।

কিন্তু আজ ধূর্জটি আর এক নতুন ঢেউ নিয়ে বাড়ি ঢুকলো। এল যেন লাফাতে লাফাতে কথা বললো হৈ-চৈ করে।

'এই শুনছো, একটা ব্যাপার হয়েছে। বলিই তাহলে তোমায় সব। মানে আর কি, না বললেও বুঝতে পারবে। ইনকাম্ ট্যাক্সের ব্যাপার! জানোই তো সব টাকাই সাদা টাকা নয়! আমি সৎ থাকবো বললেও আমার 'ডীলার'দের সুবিধের জন্যেই কালোটাকা নিতে হয়। তা সেই এখন মুস্কিল হচ্ছে—ওই কালোগুলো ধরা পড়লে দু'পক্ষেরই ফ্যাসাদ! তা' আমার উকিল বলছে, আমাদের এই কেসটা যে অফিসারের হাতে পড়েছে, তার সঙ্গে একবার দেখা করতে পারলে সুবিধে হতে পারে। লোকটা নাকি খুব ভদ্র আর সজ্জন, আর—' ধূর্জটি একটু রহস্যের হাসি হাসে, 'লোকটা না কি ব্যাচিলার!'

অলকা ত্রিপাঠী তার স্বামীর ওই ধূর্ত হাসিমাখা মুখটার দিকে তাকায়। তারপর ইস্পাতের গলায় বলে, 'তাতে কি হচ্ছে? ইন্‌কাম ট্যাক্স অফিসার ব্যাচিলার হলে কালোটাকার হিসেব মকুব হয়ে যায়?'

ধূর্জটি মৃদু হেসে বলে, 'ক্ষেত্র-বিশেষে যায়। ব্যাচিলারদের 'মহিলা' সম্পর্কে একটু দুর্বলতা থাকে এটা তো জানা কথা? সিভ্যালরি জ্ঞান তাদের একটু বেশিমাত্রায় প্রবল। কাজেই তুমি যদি একবার—মানে আমরা যদি দুজনে তার বাড়িতে গিয়ে দেখা করে ব্যাপারটা মিটিয়ে নেবার জন্যে অনুরোধ করি—'

অলকা স্থির দৃষ্টিতে তার স্বামীর চোখের দিকে তাকিয়ে বলে, 'তার বাড়ি গিয়ে? ওঃ! তারপর বোধহয় তোমার হঠাৎ একটা জরুরী দরকার পড়বে? তোমাকে 'আধ ঘণ্টার জন্যে ঘুরে আসতে' বেরিয়ে যেতে হবে?'

ধূর্জটির মুখটা অপমানে কালি হয়ে ওঠে, তবু ধূর্জটির পক্ষে সম্ভব হয় না রাগ করবার, প্রতিবাদ করবার। কারণ ধূর্জটি একাধিকবার এমন ঘটনার নায়ক হয়েছে। তাই ধূর্জটি সেই কালিবর্ণ মুখে বলে, 'তা' কেন?'

অলকা গম্ভীর মুখে বলে, 'নয় কেন? ব্যাচিলার লোকেদের যখন স্ত্রীলোক মাত্রেই দুর্বলতা তখন সুন্দরী এবং তরুণী স্ত্রীলোক দেখলে কি আর রক্ষে আছে? সে সুযোগটা অবশ্যই নেবে তুমি!'

~ www.amarboi.com ~

ধূর্জটি বোঝে বাতাস একেবারে উল্টো, তাই ধূর্জটি পাকা অভিনেতার মত অভিনয় করে বলে, 'বুঝতে পারছি অলকা, তুমি আমায় ঘৃণা করছো।... করবেই, সেটাই আমার পাওনা। কিন্তু অলকা আমি রক্তমাংসের মানুষ! আর আমি মানুষের মত বাঁচতে চাই। দুঃখে দারিদ্র্যে অভাবে অভিযোগে পীড়িত জীবনকে আমি ভয় করি, ঘৃণা করি। তাই—সেই আমার তুচ্ছ চাকরিটাকে ফেলে দিয়ে হাত বাড়িয়ে ধরতে চেয়েছি লক্ষ্মীর ঝাঁপির কোণ। আর সেটা পেরেছি তোমারই সাহায্যে! বুঝতে পারছি সেটা তোমার পক্ষে কষ্টকর হয়েছে। আর তোমায় জ্বালাতন করবো না, কথা দিচ্ছি, আর তোমাকে আমার এই কাজের জীবনের সঙ্গে জড়াব না, শুধু এবারটার মত আমায় উদ্ধার করো। কারণ উকিলকে আমি কথা দিয়েছি যাবো—'

'আমায় নিয়ে যাবে সে কথাও দিয়েছ?'

স্থির প্রশ্ন করে অলকা।

ধূর্জটি গোঁজামিল দেয়।

ধূর্জটি বলে, 'না তা ঠিক নয়, মানে কথা হচ্ছে আমিই বলছিলাম, সন্ধ্যেবেলা তো বেড়াতে বেরোই দু'জনে, যাওয়া যাবে। ঠিকানা-টিকানা নিয়ে নিলাম।'

'ঠিকানাটা কি?'

'ঠিকানা? এই তো—'

ধূর্জটি প্রসঙ্গকে অন্যখাতে আনতে পেরে বর্তে যায়। পকেট থেকে একটা টুকরো কাগজ বার করে বাড়িয়ে দিয়ে বলে, 'এই তো কাছেই। মানে খুব একটা দূর নয়।'

অলকা কাগজটায় চোখ বুলোয়। অনেকক্ষণ ধরে বুলোয়। তারপর ধূর্জটির হাতে ফিরিয়ে দেয়। মিনিটখানেক স্তব্ধ হয়ে বসে থেকে, হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে বলে, 'ঠিক আছে যাচ্ছি চল।'

ধূর্জটি জানতো।

ধূর্জটি জানে।

ধূর্জটি বরাবর দেখে আসছে, রাগে হোক, দুঃখে হোক, ক্ষোভে হোক, শেষ পর্যন্ত রাজী হয়ে যায় অলকা। শেষ অবধি ডোবায় না। তাই ধূর্জটি উৎফুল্ল গলায় বলে, 'চল তবে। দেখো ভালই লাগবে। এ তো তোমার গিয়ে হোটেলও নয়, পার্টিও নয়, একটা ভদ্রলাকের বাড়ি। গিয়ে ড্রইংরুমে বসবে—'

'শুধু বসবো?'

বিষের তীরের মত একটু হাসে অলকা বলে, নাচ দেখাতে হবে না তোমার ইনকাম ট্যাক্স অফিসারকে? তোমার স্ত্রীর ওপর ট্যাক্স বসিয়ে যাতে তোমার ওপর চাপানো-ট্যাক্সের ভার কমিয়ে দিতে পারে?'

'তুমি আমায় আজকের মত যা ইচ্ছে বলে নাও—' ধূর্জটি হতাশা-করুণ গলায় বলে, তবে এই শেষ!'

কিন্তু অলকা কি 'এই শেষ' কথাটায় ভুলবে? অলকা কি আরো বহুবার এই 'শেষের

~ www.amarboi.com ~

রাগিণী' শোনে নি?

'তুমি তো তৈরি হয়েই রয়েছ? আর কিছু করবে না কি?'

অলকা গম্ভীর গলায় বলে, 'যদি এই সিল্কের শাড়িটা ছেড়ে বেনারসী পরতে বল তো পরবো।'

ধূর্জটির এখন উদ্দেশ্য সফল হয়ে গেছে, তাই ধূর্জটি ছ্যাবলা হয়। হ্যা হ্যা করে হেসে বলে, 'পাগল! তুমি যদি একখানা বল্কল পরেও যাও, তাহলেও অসামান্য!'

'ঠিক আছে' বলে সুর্মাদানীটা হাতে তুলে নিল অলকা। প্রসাধনে সমাপ্তি-রেখা দিল।

সেই 'অসামান্যা' স্ত্রীটিকে নিয়ে ভবানীপুরের একটা পুরনো রাস্তায় একখানা পুরনো বড় বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ায় ধূর্জটি, তারপর অলকার দিকে তাকিয়ে ওর সেই বহুবার উচ্চারিত পচা পুরনো কথাটাই আবার উচ্চারণ করে—'মুখটা বেশ হাসি হাসি রেখো কিন্তু, আর কথাবার্তায় স্মার্টনেস্ দেখিয়ে—তোমায় আর কি শেখাবো?' একটু তোয়াজের হাসি হেসে গেট ঠেলে ভেতরে ঢুকে যায় ধূর্জটি স্ত্রীকে পশ্চাতে করে।

অফিসার ভদ্রলোক বাস্তবিকই ভদ্র।

তাই এদের এই অকারণ আবির্ভাবে না করেন বিরক্তি প্রকাশ, না বা বিস্ময় প্রকাশ। শুধু শান্ত নম্র স্থিরভাবে দুজনকে দেখে নিয়ে বলেন, 'বসুন! বলুন আপনাদের জন্যে কী করতে পারি?'

অলকা তার স্বামীর কথা রাখলো।

অলকা স্মার্ট হলো।

অলকা ধূর্জটির আগেই কথা বলে উঠলো, 'কি করতে পারবেন তা জানবার আগে, আমরা কে সেটা তো জানা দরকার আপনার? পরিচয় তো পান নি এখনো।'

বলার সময় অলকা তার সুর্মাটানা চোখ দুটো সমানে নিবদ্ধ করে রাখলো ইনকাম ট্যাক্স অফিসার জয়ন্ত মুখার্জির চোখের দিকে।

কিন্তু ধূর্জটি অস্বস্তি বোধ করলো। ধূর্জটি তার স্ত্রীর কথাবার্তায় চট করে ঠিক এ ধরনের স্মার্টনেস্ আশা করে নি। তাই তাড়াতাড়ি বললো, এটা কি বলছো? আগেই তো আমার ভিজিটিং কার্ড পাঠিয়ে দিয়েছি।'

অলকা অন্যায় রকমের বাচাল হাসি হেসে বলে, 'বাঃ সে তো তোমার! অর্ডার সাপ্লায়ার ডি পি ত্রিপাঠীর। আমার পরিচয়টা তো দরকার!'

জয়ন্ত মুখার্জি তেমনি শান্তভাবে মৃদু হেসে বলেন, 'দরকার হবে না।'

'হবে না! তার মানে আমি গৌণ?'

অলকার কণ্ঠে হতাশা।

ধূর্জটি আবার বাধা দেয়, 'কী আশ্চর্য, উনি কি বুঝতে পারছেন না?'

'পারছেন?' অলকা আবার তার সেই লিপস্টিকে রক্তিম ঠোঁটের ভঙ্গিমা করে হেসে ওঠে, 'তা হলে তো ভালই। তা' হলে মিস্টার মুখার্জি, যে সব কালোটাকাওলারা ইনকাম ট্যাক্স ফাঁকি দেবার জন্যে আপনার কাছে ধর্ণা দিতে আসে, তারা তাদের মিসেসকেও

~ www.amarboi.com ~

নিয়ে আসে? অভ্যাস আছে আপনার এটা দেখা?'

ধূর্জটি শঙ্কিত হয়।

ধূর্জটি স্তম্ভিত হয়।

এ কী!

অলকা কি হঠাৎ অপ্রকৃতিস্থ হয়ে গেল? না অলকা ইচ্ছে করে তার স্বামীকে জব্দ করার জন্যে এই অপদস্থটা করে বসলো!

তাই, তাই!

তাই তখন অমন চট করে রাজী হয়ে গিয়েছিল, তাই অমন ব্যঙ্গ করে বলে উঠেছিল, 'বেনারসী শাড়ি পরতে হবে?' আর তাই এখন—

কী লজ্জা, কী লজ্জা!

অলকার মনে আরো কি আছে কে জানে ধূর্জটির ওই নিষ্ঠুর হৃদয়হীন স্ত্রীর। ধূর্জটি মুখ তুলতে পারে না, ধূর্জটি ঘামতে থাকে।

কিন্তু দেখা যাচ্ছে নিষ্পর ভদ্রলোকেরও প্রাণে মমতা রয়েছে ধূর্জটির জন্যে। তাই তিনি তাড়াতাড়ি বলেন, 'দাঁড়ান, কথা পরে হবে, আগে আপনাদের জন্যে একটু চা বলে আসি।'

ভেতরের দরজার পর্দা সরিয়ে ঢুকে যান বাড়ির মধ্যে। তার মানে ধূর্জটিকে অবকাশ দিয়ে যান স্ত্রীকে শাসন করবার। নচেৎ ব্যাচিলার মানুষ বাড়ির মধ্যে গিয়ে আবার কাকে চায়ের কথা বলতে যাবেন? চাকরকে ডেকে বলে দিলেই তো কাজ মিটে যেত।

জয়ন্ত মুখার্জি অদৃশ্য হতেই ধূর্জটি চাপা ক্রুদ্ধ গলায় বলে, 'এটা কি হল?'

অলকা অবিচলিত গলায় প্রতিপ্রশ্ন করে, 'কোন্‌টা?'

'কোন্‌টা?' জিগ্যেস করছো? এইভাবে আমায় অপদস্থ করে আমার গালে চুনকালি দিয়ে কী লাভ হল তোমার?'

অলকা খোলা গলায় হেসে উঠে বলে, 'কিছু না! লাভও নেই লোকসানও নেই, শুধু একবার টেস্ট করে দেখছি ভূমিকার বদল হলে কেমন লাগে! ও কাজটা তো তুমিই করে এসেছো এ যাবৎ, একবার না হয় আমি—'

'আমি! আমি তোমার গালে চুনকালি—'

ক্ষুব্ধ উত্তেজিত স্বরকে গিলে ফেলতে হয় ধূর্জটির। গৃহকর্তা আবার পর্দা উল্টে ঘরে ঢোকেন।

বলেন, 'কফিতে আপত্তি নেই তো আপনাদের?'

অলকা আবার হেসে ওঠে।

কারণ অলকা প্রতিজ্ঞা করেছে আজ ভূমিকার বদল করবে। তাই হেসে বলে ওঠে, 'না না, কিচ্ছু না। কোনো পানীয়তেই আপত্তি থাকে না আমাদের। আপত্তি রাখলে চলে না। বোঝেনই তো বিজনেসের ব্যাপার। সুবিধে আদায় করতে বিশ বাঁও জলেও নামা যায়।'

~ www.amarboi.com ~

হঠাৎ জয়ন্ত মুখার্জিও হেসে ওঠেন।

বলেন, 'এগুলো কিন্তু আপনাদের ব্যক্তিগত কথা!'

এতক্ষণে ধূর্জটি কথা বলবার সুযোগ পায়। ধূর্জটি ভদ্রলোকের প্রতি কৃতজ্ঞ হয়। লোকটার সেন্স আছে, দয়ামায়া আছে।

ধূর্জটি এখন দেঁতো হাসি হেসে বলে, 'আমাকে চটানো আর কি! ভীষণ নাকি মাথা ধরেছিল, আমিই টেনে আনলাম, ভাবলাম, হাওয়ায় বেরোলে মাথা ধরা ছাড়বে। তা' সেই থেকে রেগে আছেন—'

জয়ন্ত মুখার্জি ওই কুপিতার মুখের দিকে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলেন, 'রেগে আছেন তা তো দেখতেই পাচ্ছি। তবে আশা করছি এটা সাময়িক!'

অলকা আর কিছু বলে না।

অলকা হঠাৎ উঠে পড়ে। ঘরটা ঘুরে বেড়ায়, ঘরের দেয়ালের কাছে কাছে ঘুরে ঘুরে দেয়ালে ঝোলানো ফটোগুলো দেখতে শুরু করে।

এও এক অস্বস্তি।

তুমি গিয়েছ একটা ভদ্রমহিলা। তুমি গাঁইয়ার মত লোকের বাড়ি গিয়ে ঘুরে ঘুরে তার ঘর দেখবে, ফুলদানী দেখবে, জানলার পর্দা দেখবে, দেয়ালের ছবি দেখবে?

তবে ধূর্জটি এই সময় কথা বলার সুযোগ পাচ্ছে, তাই ধূর্জটি হাতের সিগারেট কেসটা বাড়িয়ে ধরে। বলে, 'নিলে ধন্য হবো।'

মুখার্জি হেসে ওঠেন, 'আপনাকে ধন্য করা আমার ভাগ্যে নেই। খেতে পারি না। শখ করে চেষ্টা করে দেখেছি, ভীষণ কাশি আসে।'

বাঃ বেশ সরল সাদাসিধে ছেলেমানুষের মত কথাবার্তা তো!

ধূর্জটি মোহিত হয়।

ধূর্জটি এখন ভাল করে চোখ তুলে তাকিয়ে দেখে। প্রথমটা ঘরে ঢুকেই যে রকম ভারিক্কি আর গম্ভীর লেগেছিল, তেমন আর লাগছে না এখন। বয়েসও নেহাৎ কম, ধূর্জটির থেকে বয়েস ছোট হবে তো বড় হবে না। রং ফর্সা নয়, কিন্তু চমৎকার একটি সুকুমার মার্জিত শ্রী আছে। কথাবার্তা অতি মার্জিত সভ্য।

এই লোকের সামনেই অলকার এত বাচালতা করবার ইচ্ছে হলো, আশ্চর্য!

আর কিছু নয়, ধূর্জটির কপাল!

যাক্ ধূর্জটি যতটা যা পারে তা' করুক। ধূর্জটি বলে ওঠে, 'তাই না কি? আপনি তো তা' হলে দেখছি নেহাৎ ছেলেমানুষ! আমাদের তো ফার্স্ট ইয়ারে কাশি হতো।'

তাড়াতাড়ি আবার প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে নিলো। মনে হলো তুলনা করাটা ভাল হয় নি। তাই বললো, 'আপনার বাড়িটি চমৎকার!'

বলাটার মধ্যে অবশ্য তোয়াজী আবেগ ছাড়া আর কিছু প্রকাশ পেল না।

জয়ন্ত মুখার্জি সবিনয়ে বললেন, 'চমৎকার আর কি! সেকেলে বাড়ি! ঠাকুর্দার আমলের ব্যাপার।'

~ www.amarboi.com ~

'তা হোক! সেকেলে মানেই বনেদী! বনেদীর আলাদা মূল্য।'

কথা দিয়েই মাল গছায়। তাই আবারও বলে, 'ওই যে মোটা মোটা থাম দেওয়া গাড়িবারান্দা, এই ঘরের মধ্যে সিলিঙের নিচে চওড়া কার্নিশ, এ সবের সৌন্দর্যের ধারেকাছেও লাগে না আধুনিক প্যাটার্নের কংক্রীট গাঁথুনি খাড়া দেওয়ালের বাড়ি।'

জয়ন্ত মুখার্জি হাসেন, 'যা বলেন! তবে ঠাকুর্দা একটা মাথা গোঁজার আশ্রয় রেখে গেছেন তাই নির্ভাবনায় আছি। নইলে—'

অলকা দেয়ালের কাছ থেকে ফিরে আসে, অলকা সোফায় বসে পড়ে ব্যঙ্গের গলায় বলে ওঠে, 'নইলে কি? ফুটপাথে গিয়ে দাঁড়াতে হতো? বাঃ আপনার তো বেশ বিনয়!...কেন, আপনি যাদের ট্যাক্স মকুব করে দেন, তারা আপনাকে ঘুষ দেয় না? তাতে তো শুনেছি মোটা মোটা টাকা পাওয়া যায়।'

ধূর্জটির মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে।

ধূর্জটির এখন সন্দেহ হয়, সত্যিই হয়তো অলকা প্রকৃতিস্থ নেই।

কিছুদিন থেকেই যেন নেই।

হঠাৎ হঠাৎ কেমন যেন হাসে।

আর আজও তখন কেমন করে যেন বসেছিল। আমি এখানে আসার কথা তুলতে কি রকম ঝট্ করে উঠে পড়লো!

ভয়ে হাত-পা এলিয়ে আসে ধূর্জটির।

'পাগলে কী না কয়!'

কে জানে কী বলবে! নিয়ে সরে পড়তে পারলেই ভালো হতো। কিন্তু এমনি চলে যাবে, না ইসারায় মুখার্জিকে জানিয়ে দিয়ে যাবে মিসেসের মাথার গোলমাল। ওটা একবার জানিয়ে ফেলতে পারলে অবশ্য সাত খুন মাপ!

আড়চোখে মুখার্জির দিকে তাকায়।

আশ্চর্য! সেখানে প্রত্যাশিত রাগটা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। বরং যেন কৌতুকের ছাপ। ওকি তা'হলে বুঝে ফেলেছে?

তাই সম্ভব।

বুদ্ধিমান লোক, কথাবার্তা শুনেই বুঝে ফেলেছে, মহিলাটি অপ্রকৃতিস্থ। যাক্ তাও ভাল। ইসারায় সেটাই আরো পাকা করে দেওয়া যাবে। তবু আলগাভাবে বলে, 'অলকা তোমার বোধহয় আজ শরীরটা মোটেই ভাল নেই, এবার তা'হলে ওঠা যাক্।'

'ওমা!' অলকা যেন বিস্ময়ে হতবাক। এক্ষুণি ওঠা যাক কি গো? আমাদের আসল কাজটাই তো হয় নি এখনো! তুমি কি শুধুই বেড়াতে এসেছিলে? না কি বলতে লজ্জা করছে? তা আমিই না হয় তোমার হয়ে বলে দিই—'

অলকা এ সোফা থেকে উঠে গিয়ে জয়ন্ত মুখার্জির কাছাকাছি একটা সোফায় বসে। খুব যেন গভীর কথা বলছে এইভাবে বলে, 'ব্যাপারটা তাহলে শুনুন, কেন আমরা এসেছি। আমার স্বামী এই মিস্টার ত্রিপাঠীর কিছু ব্যবসা-বাণিজ্য আছে বুঝলেন? তা'

~ www.amarboi.com ~

জানেনেই তো 'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী!' অতএব লক্ষ্মী এসেছেন। কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে ওই সরকারি খাজনা। জ্বালাতনের ব্যাপার! মানুষ যে খেটেখুটে, মানে হাত-পা খাটিয়ে, কি বুদ্ধি খাটিয়ে, দুটো পয়সা ঘরে এনে স্বস্তি পাবে তা নয়। বসে বসে পাই পয়সার হিসেব দাও, সে পয়সা কখন পেলে, কেন পেলে, কিসে পেলে, কে দিলো! কত যে বায়নাক্কা! দু' ড্রয়ারে দু'খানা খাতা রেখেও স্বস্তি নেই, নাড়ী-নক্ষত্র টেনে বার করবে। মানে আপনারাই করবেন।'

ওঃ বদমাইসী!

ধূর্জটি ছটফটিয়ে ওঠে।

ধূর্জটির আর সংশয় থাকে না, পাগলামী টাগলামী কিছু নয়, স্রেফ বদমাইসী! ধূর্জটিকে ডোবাবে বলেই আজ পণ করে এসেছে ও।

যে রকম দেখা যাচ্ছে, তাতে ও যে সহজে উঠবে তাও মনে হয় না। কে জানে আরো কী কী ফাঁস করবে! কে বলতে পারে তার বড় বড় ডীলারদের কালোটাকার কথাও বলে দেবে কি না। দেখে মনে হচ্ছে ও সব করতে পারে!

বসেছে দেখো কাছ ঘেঁসে।

যেন সাতজন্মের চেনা!

অথচ আমি যখন কারো সঙ্গে এক সোফায় বসতে বলি? মানের কোণ্ খসে যায় একেবারে।

কিন্তু ধূর্জটি এখন করে কি!

ধূর্জটি কি এখন চেঁচিয়ে বলে উঠবে, 'মিস্টার মুখার্জি, আমার স্ত্রীর মাথাটা খারাপ। মাঝে মাঝে একটু ভালো থাকেন, কিন্তু মাঝে মাঝে—'

ধূর্জটি বসে থাকতে পারে না, দাঁড়িয়ে ওঠে।

ইত্যবসরে তরুণ অফিসার জয়ন্ত মুখার্জি হেসে বলে ওঠেন, 'তা' আমাদের তো চাকরীই তাই। উপায় কি?'

'আহা বুঝছেন না' অলকা অন্তরঙ্গ সুরে বলে, 'উপায় একটা বাৎলাতে পারলেই তো আপনারও দু'পয়সা উপায় হয়, আর এনারও উপায়ের কড়ি বাঘে খায় না। বুঝতেই পারছেন বোধহয় এতক্ষণে, মিস্টার ত্রিপাঠী বেশ কয়েক হাজার টাকার হিসেব চেপে ফেলতে চান, তার বদলে আপনাকে কিছু নজরানা দেবেন। মানে সবই তো আপনার হাতে। ওর কেসটা আপনার কাছেই পড়েছে কি না! তা' দিন মশাই, দিন, কাতর হয়ে ছুটে এসেছেন ভদ্রলোক, ওঁর ওই কাতরতার একটা বিহিত করুন।'

জয়ন্ত মুখার্জি সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়ান, বলেন, 'মিস্টার ত্রিপাঠী, আপনার স্ত্রী বোধহয় অসুস্থ।'

মিস্টার ত্রিপাঠী কথাটা লুফে নেয়। তাড়াতাড়ি বলে, 'আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার! তবে সব সময় থাকে না। এখানে এসেই হঠাৎ দেখছি—'

কথা শেষ করতে দেয় না অলকা, হি হি করে হেসে উঠে বলে, 'বাঃ বাঃ, বেশ তো!

~ www.amarboi.com ~

দুটো পুরুষমানুষ মিলে আমাকে স্রেফ পাগল বানিয়ে দিচ্ছো! চমৎকার! মিস্টার মুখার্জি, আপনার দয়ামায়ার কথা আমার মনে থাকবে। তা সেই দয়ামায়ার কাছেই নিবেদন, এই হতভাগ্য ত্রিপাঠী সাহেবের খাজনা কিছু মাপ করে দিন। নইলে এমন অভিযানটাই নিষ্ফলা।'

ধূর্জটি এবার গম্ভীর হয়।

বলে, 'অলকা, ওঠো! এবার তোমার বাড়ি যাওয়া দরকার। তোমার যে আজ শরীর বেশি খারাপ এটা জানালে মিস্টার মুখার্জিকে এভাবে ব্যস্ত করতে হতো না! যা খুশি তাই বলে তুমি ওঁকেও বিরক্ত করলে, আমাকেও—যাক্ এখন চলো—'

কিন্তু বেহায়া অলকা তবু ওঠে না।

বলে, 'ওমা এক্ষুণি উঠে যাবো? মিস্টার মুখার্জিকে তোমার স্ত্রীর নাচ-টাচ একটু দেখাবে না? নিদেনপক্ষে একটা গানও শোনাবে তো? ঘুষের টাকাও দিলে না, এদিক থেকেও ফাঁকি দেবে? বেচারা ব্যাচিলার মানুষকে ভালমানুষ পেয়ে—'

ধূর্জটি এবার করযোড়ে বলে, 'মিস্টার মুখার্জি, আপনি বোধহয় ব্যাপারটা সম্পূর্ণ বুঝে ফেলেছেন। কাজেই আর আমার বলবার কিছু নেই। অনেক বিরক্ত করা গেল আপনাকে, এবার বিদায়। অলকা আমি নামছি—'

ধূর্জটি সত্যিই ঘরের দরজা থেকে তার সামনের সিঁড়িটায় নামে।

অলকা নিশ্চিন্ত গলায় বলে, 'গাড়িটা তো ওই মোড়ে পার্ক করেছ? সেই ছুতোয় খানিকটা দেরি করবে নিশ্চয়?...নয়তো 'হতভাগা গাড়িটা হঠাৎ কিছুতেই স্টার্ট নিচ্ছিল না' বলে আরো খানিকটা?...সিগারেট কিনতেও যেতে পারো! মানে যা যা করে থাকো তুমি! তা আমিও সেটুকুর মধ্যেই ম্যানেজ করে ফেলতে পারবো। মানে যেমন পেরে থাকি।'

ধূর্জটির চোখ দিয়ে জল এসে যায়।

ধূর্জটি বুঝতে পারে না, কেবলমাত্র স্বামীকে জব্দ করতে এতটা নির্লজ্জ কি করে হতে পারলো অলকা। সম্পূর্ণ একটা অপরিচিত সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের সামনে এভাবে—এ তো শুধু ধূর্জটির গালেই চুনকালি দেওয়া নয়, নিজের গালে-মুখেও যে—

কিন্তু ধূর্জটির ভুল ভাঙে।

ইন্‌কাম ট্যাক্স অফিসার জয়ন্ত মুখার্জি সম্পূর্ণ পরিচিতের ভঙ্গীতে অলকাকে প্রায় ধমক দিয়েই বলে ওঠেন, 'সব কিছুরই একটা সীমা আছে অলকা! মিস্টার ত্রিপাঠীকে যেভাবে উৎপাত করছো তুমি, তা সহ্য করার জন্যে বাহাদুরী দিচ্ছি ওঁকে।'

ধূর্জটির চোখের সামনে থেকে একটা পর্দা সরে যায়।

ধূর্জটি অলকার সমস্ত বাচালতা আর সমস্ত অসভ্যতার অর্থ খুঁজে পায়।

পরিচিত।

পূর্বপরিচিত।

আর 'বিশেষ ধরনে'রই পরিচিত। নচেৎ যার তার সামনে অলকা এভাবে বাচালতা

~ www.amarboi.com ~

করতে পারতো না।

পর্দা আরো সরে যাচ্ছে।...ওঃ তাই অলকা নাম ঠিকানা দেখেই এককথায় রাজী হয়েছিল। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলে ওঠে নি, 'আমি পারবো না! আমি পারছি না।'

পুরনো প্রেমিক।

তার সামনে দেখিয়ে মজা পেলে দ্যাখো আমি আমার স্বামীটাকে কী রকম বাঁদর নাচ নাচাই।

ধূর্জটি এবার তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের হাসি হেসে বলে, 'ওঃ পূর্বপরিচিত! তা' আমাকে সেটা জানালেও কোনো ক্ষতি ছিল না অলকা!'

হ্যাঁ, অলকাকে উদ্দেশ করেই বলে।

মিস্টার মুখার্জিকেও বলে উঠতে পারতো, 'খুব তো ভদ্রতা, খুব তো পালিশ! বলি মশাই, এই সত্য গোপনটা কি খুব পলিশড্ ভদ্রলোকের কাজ হয়েছে?'

বললো না, কারণ এখনো ওই পাজীটার কাছেই ধূর্জটি ত্রিপাঠীর টিকি বাঁধা। ওকে চটালে 'দাঁড়িয়ে মৃত্যু'!

তাই স্ত্রীকেই বলে—ধারালো ব্যঙ্গের ছুরি বিঁধে বিঁধে! 'না কোনো ক্ষতিই ছিল না। বরং আমার একটু কাজ বাঁচতো আমাকে আসতেই হতো না। তুমি নিজেই এসে তোমার স্বামীর অসুবিধের ব্যাপার ম্যানেজ করে নিতে পারতে। মিস্টার মুখার্জি, মিথ্যে বলবো না, বাস্তবিক আমি আপনার কাছে একটু সুবিধের চেষ্টাতেই এসেছিলাম। কিন্তু যদি জানা থাকতো এত সুবিধে রয়েছে, আপনি আমার স্ত্রীর বাল্যবন্ধু, তা' হলে তো নাকে তেল দিয়ে ঘুমোতাম!...আমি ভেবে মরছি অলকার হঠাৎ মাথাটাই বেশি বিগড়ে গেল না কি স্রেফ ঠাট্টা-তামাসার ব্যাপার চলছিল বুঝতেই পারি না। খুব ঠকালেন আমাকে দুই বন্ধুতে মিলে। আচ্ছা অলকা, তুমি যদি চাও আরো কিছুক্ষণ গল্পসল্প করতে পারো, আমি বরং—'

জয়ন্ত মুখার্জি তাড়াতাড়ি বলে ওঠেন, 'আমি কিন্তু ওই এসে যাওয়া চা-টার সদ্ব্যবহারটা চাইছি। পালালে চলবে না।...এই—ওঃ চা নয়, কফি এনেছিস বুঝি। তাই হবে। কফি-বাহক চাকরটার দিকে তাকিয়ে ভদ্রলোক বলেন, 'রাখ্ নামিয়ে রাখ্। 'কাজু' এনেছিস? ঠিক আছে। আসুন মিস্টার ত্রিপাঠী—'

তিনজনে মুখোমুখি বসে গোল টেবিল ঘিরে।

অলকা সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ।

হাসুনে পুতুলের মুখে আদুরে গলায় বলে, তুমি কিন্তু ভারি ইয়ে জয়ন্ত, কেমন মজার একটি নাটক ফেঁদেছিলাম, নায়িকাকে পাগলিনী করে দিব্যি জমিয়েও এনেছিলাম, মাঝখান থেকে তুমি স্রেফ 'উইংস'টাই ছিঁড়ে বসলে। ভেতরের সব কিছু দৃশ্যমান হয়ে গেলে কি আর নাটক জমে?

জয়ন্ত আস্তে বলে, 'তোমার মজাটা একটু বেশি ভারী হয়ে যাচ্ছিল অলকা, পরিপাক করা শক্ত হচ্ছিল।'

~ www.amarboi.com ~

'শক্ত হচ্ছিল? ও—' অলকা টানা চোখ তুলে টানা টানা গলায় বলে, কার পাকযন্ত্রের পক্ষে? তোমার? না মিস্টার ত্রিপাঠীর?'

জয়ন্ত দৃঢ় গলায় বলে, 'উভয়ের পক্ষেই। কারণ নির্যাতিত পুরুষ হিসেবে আমরা দুজনেই স্বজাতি।'

অলকা সোফার পিঠে এলিয়ে পড়ে।

অলকা করুণ করুণ গলায় বলে, স্ব-জাতি। তবে তো আমার কোথাও কিছু ভরসা রইল না। যাক্ গে মরুক গে, আমার আবার ভরসা! বরং তোমার কথা শুনি, বল এতদিন কী করলে?'

ধূর্জটি চোখ কোঁচকায়।

ধূর্জটি মনে মনে ব্যঙ্গের হাসি হাসে। ওঃ, 'এতদিনের মধ্যে একদিনও দেখা সাক্ষাৎ ঘটে নি, সেটাই আমার কাছে প্রমাণিত করতে চাইছো?

জয়ন্ত শান্ত গলায় উত্তর দেয়, 'কী করলাম, কী করছি, সে তো দেখতেই পাচ্ছো।'

'আহা এটা তো চাকরীর ব্যাপার। বাড়ির খবর কি? মা বাবা ফুলটুশি—'

মা কাশীতে, বাবা নেই, ফুলটুশি শ্বশুরবাড়ি।'

'ওরে ব্যস্! কী চটপটে জবাব! যেন মিলিটারী।' অলকা হেসে ওঠে, 'তা আর একটা খবর? ব্যাচিলার কেন?'

'কেন? এটাও যদি একটা প্রশ্ন হয় তো বলতে হয় বিয়ে করি নি বলে।'

অলকা কৃত্রিম আক্ষেপের গলায় বলে, বানিয়ে বানিয়েও তো বলতে পারতে ব্যাচিলার রয়ে গেলাম তোমার জন্যে!' তাহলে বরের কাছে আমার মুখটা একটু উজ্জ্বল হতো!'

জয়ন্ত এবার সত্যি গম্ভীর হয়।

বলে, অলকা, উনি তোমার স্বামী, এঁকে তুমি তোমার নিজের এলাকায় মারতে পারো কাটতে পারো। কিন্তু ওঁর কাছে আমি এবং আমার কাছে উনি, একবারে এই দণ্ডে পরিচিত দুই ভদ্রলোক মাত্র। কিন্তু তুমি কিছুতেই সেটা মনে রাখছো না।'

'মনে রাখছি না? বল কি গো? খুব মনে রাখছি। নইলে হয়তো—তোমরা দু'জনে মিলে আমায় পাগল বানিয়েছো বলে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কেঁদে ফেলতাম!...যাক্ তা' হলে উঠি। ত্রিপাঠী চল, কফি কাজু সব তো খাওয়া হলো।'

অলকা উঠে পড়ে, অলকা চৌকাঠের বাইরে নেমে আসে। ত্রিপাঠীকে বলে, 'আরে, তোমার গাড়িটাকে সত্যিই মোড়ের মাথায় রেখে এসেছো? ইচ্ছে করেই বোধহয়? যাতে সেই অবকাশটুকু অন্তত নিতে পারা যেতো, এই তো?...কিন্তু দেখছো তো লোকটা কি চড়া? বাল্যবান্ধবীকে পর্যন্ত দেখে বিচলিত হলো না। তার মানে দুর্বলতাশূন্য, তার মানে আশা নেই। তবু এত তোড়জোড় করে আসাটা তোমার বিফলে যাবে ত্রিপাঠী।...দেখো জয়ন্ত, যদি লোকটার জন্যে কিছু করতে পারো? দেখছো তো—বেচারী কী দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, কী ম্লান? দেখো বাপু বলে দিচ্ছি বলে যেন ক্ষেপে যেও না।...অনেক দিন পরে—দেখা

~ www.amarboi.com ~

হয়ে খুব ভালো লাগলো জয়ন্ত! একদিন এসো না, একসঙ্গে চা খাওয়া যাবে।'

ধূর্জটি নেমে গেছে। এগিয়ে যাচ্ছে।

জয়ন্ত সেদিকে তাকিয়ে শান্ত গলায় বলে, 'শোধ দিতে চাইছো? কফির শোধ?'

'শোধ?' অলকার সুর্মাটা কখন মুছে গেছে কে জানে। অলকা তার সুর্মাহীন শুধু চোখ দুটো উঁচু করে বলে, 'নাঃ শোধ আর দিতে পারলাম কৈ? কাউকেই পারলাম না।'

নেমে যায়।

এগিয়ে যায় ধূর্জটির ছায়া ধরে।

অনেকক্ষণ গাড়ি চালাবার পর ধূর্জটি বলে ওঠে, 'আমার মত একটা মশা-মাছিকে মারতে এতটা আয়োজন না করলেও চলতো। এ যেন মশা মারতে কামান দাগা হলো।'

আশ্চর্য মুখরা অলকা, বাচাল অলকা, বিদ্রোহী অলকা হঠাৎ একেবারে শান্ত হয়ে গেল কী করে?

অলকা ধূর্জটির কথার উত্তর দিল না, বসে রইল জানালার বাইরের দিকে তাকিয়ে।

অলকা কি ভাবছে, সত্যিই এতটা প্রয়োজন ছিল না।

না কি ভাবছে, ছিল, ছিল প্রয়োজন। কামানটা না দাগলে বোঝা যেত না উইঢিবির নিচে বাল্মীকি টিকে থেকে রাম-নাম জপ করছে কি না।

তা' মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে না।

হয়তো অলকা অতীতে হারিয়ে গেছে। হয়তো অলকা সেই অতীতের সিন্দুক থেকে একটির পর একটি ছবি তুলে তুলে দেখছে।

চলন্ত গাড়ি থেকে এমন নির্জনভূমি আর কোথায় আছে?

ধূর্জটি আবার এক সময় বলে ওঠে, 'দেখালে বটে একখানা! কোনো স্ত্রী যে শুধু স্বামীকে জব্দ করতে এমন জঘন্যভাবে পাগলামীর ভান করতে পারে, সেটা কেবল আমার কেন, বোধহয় সকলের কাছেই কল্পনার অতীত!'

অলকা এতক্ষণে কথা বলে।

বলে', তাই ভাবছি। আবার ভাবছি ভান কি না।'

'থাক্। শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টাটা শুধু হাস্যকরই অলকা!'

'হাস্যকর? থাক্ তবে দেখাব না।'

আবার চলতে থাকে গাড়ি।

অলকা ত্রিপাঠীর বহুবিধ প্রসাধনের সৌরভ গাড়ির মধ্যেকার বাতাসকে ভারী করে তোলে। অলকা ত্রিপাঠীর কবরী জড়ানো যুঁইয়ের মালাটা যে গাড়িতে ওঠার সময় রাস্তায় পড়ে গিয়েছিল, তা বোঝাও যাচ্ছে না, তার শাড়িতে জামাতে সর্বাঙ্গে যুঁইয়ের গন্ধটা এত লেগে আছে।

কে জানে মালাটা সেখানেই পড়ে আছে কি না এখনো, অথবা কেউ অবাক হয়ে কুড়িয়ে নিয়েছে। না কি বহু লোকের পায়ে পায়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে সে মালা।

আশ্চর্য, পড়ে গেল কি করে!

~ www.amarboi.com ~

অলকা যে কত সময় নৃত্যভঙ্গিমায় নিজেকে রেণু রেণু করে উড়িয়ে দেয়, কই খোঁপার মালা তো খসে পড়ে না?

হয় না বলেই হয়তো এতদিন টের পায় নি অলকা খসে পড়লেও সৌরভটা থেকে যায়।

কিন্তু ধূর্জটি ত্রিপাঠীর চেতনায় এখন কোনো সৌরভ সার মোহ বিস্তার করছে না। ধূর্জটি ত্রিপাঠীর কাছে সমস্ত ঘটনা সমেত এই সন্ধ্যাটা যেন একটা পাথরের ভার হয়ে চেপে বসছে।

অনেকক্ষণ পরে আবার কথা কয়ে ওঠে ধূর্জটি। বলে, 'ধেৎ, সমস্ত জিনিসটাই 'ম্যাসাকার' হয়ে গেল! এ যা দেখছি, খাল কেটে কুমীর আনা হলো! ট্যাক্স অফিসার চায়ের নেমন্তন্ন খেতে এসে, বাড়ির মাল-মশলা আর আসবাবপত্তরের হিসেব কষতে বসবে, আর তারপর আদাজল খেয়ে লাগবে! সম্পর্কটি তো ভালই বেরোলো! তুমিও অবিশ্যি দু'ড্রয়ারের দু'টো খাতাই তাকে দেখিয়ে দেবার তালে থাকবে।'

'এই দ্যাখো—' অলকা হঠাৎ আগের মত হেসে ওঠে। 'আমি তো তবু সাজা পাগল, তুমি যে দেখছি সত্যি পাগলের মত কথা বলছো। মেয়েমানুষ কখনো তার বাড়ি গাড়ি, টাকাকড়ি, প্রতিষ্ঠা পরিচয়, স্বামী সংসারের মোহ ত্যাগ করে সব কিছু তছনছ করতে পারে? ওই সামলাতে সামলাতেই তো জীবন গেল তার। দেখো সময় বুঝে ঠিকই খাতা সামলাবো।'

'আর সামলানো!'

ধূর্জটি মুখ বাঁকিয়ে বলে, 'সে যা করবে তা বুঝতেই পারছি। দেবে সর্বস্বান্ত করে।'

অলকা আবার হেসে ওঠে, 'মাথা খারাপ! দেখো ওদের কবল থেকে জলের মত বেরিয়ে আসবে তুমি। আমার যাওয়াটা কি বানের জলে ভেসে যাবে।...একেই তো ব্যাচিলারদের সুন্দরী তরুণীদের প্রতি দুর্বলতা! তার ওপর আবার বাল্যবান্ধবী!'

'ওঃ তাই নাকি? এত বিশ্বাস?'

ধূর্জটির কণ্ঠে তিক্ত অবিশ্বাস।

কিন্তু অলকার কণ্ঠ মধুর। অলকার কণ্ঠ গভীর আশ্বাসবাহী। 'দেখো!'

হ্যাঁ, অলকা দেখেছে। দেখেছে মালাটা খসে পড়লেও সৌরভটা লেগে থাকে।

~ www.amarboi.com ~

চোখের চামড়া

তেলচিটে একখানা এক টাকার নোট এগিয়ে ধরে সুমতি পিসি অকারণেই গলার স্বর খাটো করে বলেন, 'তা' হলে এই ধর মা! মাপ তো তুই জানিস? সে বারে এনে দিয়েছিলি? এর ওপর দু' এক আনা যাদি লাগে তো দিয়ে দিস্ পরে দিয়ে দেব। জিনিষটা যেন একটু ভালো হয়।'

স্বপ্না ওই তেলচিটে আর প্রায় ছেঁড়া নোট খানার দিকে তাকিয়ে দেখে, সভয়ে দালানের পাশের দিকে ঘরের দরজাটার দিকে তাকিয়ে দেখে। এবং তারপর নোটখানা তাড়াতাড়ি হাত ব্যাগে পুরে ফেলে মৃদুস্বরে বলে, 'আচ্ছা'।

ওর এখন ট্রেনের টাইম, তবু সুমতি পিসি গলার স্বর আরো নামান। 'কী বলবো মা স্বপ্না, মানুষটা শত ছিদ্দির গেঞ্জি গায়ে দিয়ে বেড়াচ্ছে, তা আমার ভাই ভাজের যদি একটু 'হায়া' আছে! যতই হোক বাড়ির জামাই তো বটে! বাবা ওর হাঁটু ধরে কন্যে সম্প্রদান করেছিল তো বটে? তা সে বাবা যে শুধু একা আমারই বাবা নয়, তোরও বাবা, আছে সে আক্কেল?"

'আমি যাই পিসি—' স্বপ্না ব্যস্ত গলায় বলে, 'রাধু কাকার বাড়ি একবার ঘুরে যেতে হবে। বড়জ্যেঠিও ডেকেছিলেন একবার—'

সুমতি পিসি বিরক্ত গলায় বলেন, 'কেন ব্যাগার খাটতে? তোকেও বলি বাছা, এই তোর কাজের ভীড়, তার ওপর রেল গাড়ীর সেই ভীড়। মেয়েমানুষ হয়ে "ডেলি প্যাসেঞ্জারী" করছিস, নিজের জ্বালাতেই হাড় পিষছে। আবার তোর ইচ্ছে করে দেশসুদ্ধ লোকের ব্যাগার খাটতে? কেন, ওদের তিন কুলে কেউ কলকেতা যায় না?"

সুমতি পিসির ময়লা নোট খানা চোখে ভেসে ওঠে স্বপ্নার। তবু স্বপ্না সে কথা বলে না। স্বপ্না লজ্জিত গলায় বলে, 'না না তাতে আমার কিছু না! শেয়ালদার কাছেই তো কতো বাজার দোকান! ঘুরতে তো হয় না।"

দালানের পাশের যে দরজাটার দিকে সভয়ে দৃষ্টিপাত করছিল স্বপ্না, সেই দিকে যেন একটা ছায়ার আভাস। স্বপ্না সে দিকে তাকায় না। স্বপ্না তাড়াতাড়ি বলে, 'আচ্ছা পিসি, ঠিক আছে। তুমি আর কষ্ট করে নিতে এসোনা, আমিই ফেরার সময়—"

সুমতি পিসি হাঁ হাঁ করে ওঠেন, 'না না তোকে যেতে হবে না। আমিই আসবো বিকেলের দিকে, বেড়াতে আসার ছুতো করে। তুই গেলেই আবার সাত সতেরে কৈফিয়ৎ। 'কেন, কী বিত্তান্ত"! ওতে কাজ নেই। যাই, মোচা সেদ্ধ করতে দিয়ে এসেছি

পিসি চলে যান।

ভাগ্যিস মেয়েটা ছিল!

~ www.amarboi.com ~

স্বপ্না নীচু হয়ে পায়ে পরা জুতোটাই একটু বুরুশ করে নেয়। কলকাতার বাসের ভীড়ে একদিন একখানা চটি পদচ্যুত হয়ে গিয়েছিল, তদবধি স্বপ্না এই স্ট্র্যাপ বাঁধা জুতোই বহাল করেছে। চটিকে বুরুশ করতে হয় না, একে মাঝে মাঝে করতে হয়।

স্বপ্নার মাথাটা নীচু করে থাকার সময়টা যেন একটু বেশীক্ষণ হয়ে যায়। মনে হয় স্বপ্না বুঝি ওই ছায়াটার সঙ্গে চোখাচোখি হতে ভয় খাচ্ছে।

কিন্তু ভয় খেলেই বা কী?

মুর্ত্তিটা তো কথা বলবে বলেই ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে।

অতএব সে বলেই ওঠে, 'মার্ভেলাস! নমস্কার দিদি তোর চক্ষুলজ্জার ক্ষুরে!' "আবার তুই ওই বুড়ির 'অর্ডার' নিলি?"

বয়েস বেশী হয়নি কিন্তু মাথায় লম্বা হয়ে গেছে পেল্লায়। স্বপ্না বুঝি তাই ওকে সমীহ করছে। অথবা ওর ধারালো মন্তব্যকে।

তাই স্বপ্না বলে, 'তা' কী করবো বল? বাড়ি বয়ে দিতে এলেন? বললেন 'সুমতি পিসে' ছেঁড়া গেঞ্জি পরে বেড়াচ্ছেন!

'বেড়াচ্ছেন তো বেড়াচ্ছেন—' সতু ব্যঙ্গের গলায় বলে, 'আমি তো অন্তত জন্মাবধিই ওঁকে ছেঁড়া গেঞ্জি পরতে দেখছি। তা ছাড়া দেশে কতো লোক ছেঁড়া গেঞ্জি পরে কাটাচ্ছে জানিস তুই?'

'তোর সঙ্গে আমি তর্ক করতে পারি না'—স্বপ্না অবহেলার গলায় বলে, 'সামান্য একটা কাজ। তাই নিয়ে এতো কী!'

সতু আরো ব্যঙ্গের গলায় বলে, "কাজটা যৎসামান্য কিন্তু আশা করছি পরবর্ত্তী প্রতিক্রিয়াটা অসামান্য হবে! এবং শুধু পিসির ক্ষেত্রেই নয়, কাকা-জ্যেঠা বৌদি ঠানদি সকলের ক্ষেত্রেই হবে।"

'আহা কী যে বলিস!" স্বপ্না হেসে হেসে বলে, 'তুই বড় হিংসুটে। কারুর এতটুকু উপকার করা দেখতে পারিস না।"

স্বপ্না উঠোনে নামে।

গ্রামের বাড়ি, উঠোনে যথারীতি গাছপালা, তুলসী মন্দির, ইত্যাদি। স্বপ্না টুক্ করে ওই মন্দিরটিকে একবার নমস্কার করে নেয়, তারপর বেড়ার দরজার দিকে এগোয়।

সতু বলে, 'আমি যদি তুই হতাম, কক্ষণো ওই বাড়ি বাড়ি ঘুরে বাজারের টাকা সংগ্রহ করে বাজার করে দিতাম না।"

'খুব ভালো! খুব মহৎ প্রাণ তুই—স্বপ্না হাসতে হাসতে বেড়ার দরজাটা খোলে। 'ওদেরই টাকায় ওদের করছি। মানুষের দেহে এটুকুও মনুষ্যত্ব থাকবে না?'

'মনুষ্যত্ব না হাতী!' 'সতুও নেমে আসে উঠোনে। বলে, 'করিস তো স্রেফ চক্ষুলজ্জায়! আমি বাবা ওসব চক্ষুলজ্জা টজ্জার ধার ধারি না। কই আমাদের কেউ কিছু করে দিচ্ছে?

'বাঃ আমাদের আবার কী করবে?' বলে এগিয়ে যায় স্বপ্না।

~ www.amarboi.com ~

সতুর এবার বোধ হয় কাজের কথা মনে পড়ে যায়। চেঁচিয়ে বলে, 'স্কুল থেকে এসে কী খাবো?'

স্বপ্না ঈষৎ পিছিয়ে আসে।

বলে, 'ওমা বললাম যে, কলার বড়া আর আলুর পরোটা করে কৌটোয় রেখে গেলাম—'

'ও আচ্ছা!'

দেরী হয়ে গেছে।

স্বপ্না দ্রুত এগোতে থাকে।

রোজই দেরী হয়, রোজই ছুটতে হয়।

মাতৃহীন সংসারে নিজের 'টাইমের' মধ্যে রেঁধে খেয়ে 'তৈরী' হয়ে ছোট ভাইটার ভাত ঢেকে রেখে, স্কুলের টিফিন গুছিয়ে, বিকেলের জলখাবার কৌটায় রেখে—তবে তো বেরোনো।

তবু রোজই কোনো না কোনো আত্মীয়র বাড়িতে ঘুরে যেতে হয়। কারণ প্রতিদিনই কারুর কিছু না কিছু 'ধরতি' থাকে।

শেয়ালদা দিয়েই যাওয়া আসা স্বপ্নার, আর শেয়ালদার আশে পাশেই জগতের যাবতীয় বস্তু ছড়ানো। আর ওখানে যেমন—'গেরস্থ পোষা' দামটি, তেমনটি আর কোথায়?

তবে?

এটুকু উপকার করবে না স্বপ্না তার গেরস্থ আত্মীয়দের? কতো কষ্ট হওয়া সম্ভব অফিস ফেরৎ একখানা বিছানার চাদর কি একজোড়া থান ধুতি কিনতে? কতো সময় লাগে দুটো ছিটের ফ্রক, কি একটা অ্যালুমিনিয়মের সস্প্যান সওদা করতে? কী এমন ঝঞ্ঝাট, বাচ্চাদের যে ফুড্টা এই গ্রামের দোকানে পাওয়া যায় না, সেটা কলকাতার দোকান থেকে জোগাড় করে আনতে?

আর হয়ও যদি কষ্ট, লাগেও যদি সময়, মেনে নেবে না সেটুকু? কেবলমাত্র—'আপনারে লয়ে বিব্রত' থাকাতেই কি এই অবনীতে এসেছে স্বপ্না?

পাড়ার আরো অনেক পুরুষ ছেলে ডেলি প্যাসেঞ্জারী করে। তাদেরও শেয়ালদা দিয়েই যাওয়া আসা।

তা সে চিন্তায় স্বপ্নার দরকার কি? সতু বলে বলে? দূর সতু আবার একটা মানুষ?

সতু মনুষ্য পদবাচ্য নয়।

তবু সতুর ওই কথাটা যেন মাথার মধ্যে ধাক্কা দিতে থাকে স্বপ্নার।

'মনুষ্যত্ব না হাতী! করিসতো স্রেফ্ চক্ষুলজ্জায়।'

সতুর কথাটাই কি সত্যি?

স্বপ্নার এই কাজের মধ্যে 'পরোপকার' নামক মহৎবৃত্তির চিহ্ন নেই? আছে শুধু দুর্বল চিত্তের 'চক্ষুলজ্জা?'

~ www.amarboi.com ~

স্বপ্না নিজেকে বোঝাতে চেষ্টা করে, 'আহা তা' কেন! ওঁদের উপকার হয় বলেই—

কিন্তু ঠিক তাই কি?

তা'হলে পরে মনটা—অমন বেজার হয়ে ওঠে কেন? কেন মনে হয় 'দূর ছাই আর এঁদের পাল্লায় পড়ছি না।'

মনে হওয়ার কারণ অবশ্যই অনেক আছে। জিনিস কিনে আনার পর স্বপ্নার গেরস্থ আত্মীয়দের ওই 'দাম'টা কিছুতেই 'গেরস্থ পোষা' মনে হয় না, এবং জিনিসের রং গড়ন মাপ সব কিছুই যেন তাঁদের ধারণার অনুরূপ হয় না।

স্বপ্না যে সাড়ে ছটার ট্রেনটা 'মিস্' করবার ভয়েই তাড়াহুড়ো করে 'দায় সারে', এ সন্দেহ তারা যে শুধু মনেই পোষণ করেন তা নয়, মুখেও ব্যক্ত করতে ছাড়েন না। এবং এ কথাও মনে করিয়ে দেন, সন্ধ্যার দিকে তো এ দিকে আসবার ট্রেন ঘণ্টায় ঘণ্টায়।

কতো সময় স্বপ্না ওই 'দাম'টা পছন্দ করাতে, নিজের ব্যাগ থেকেই চার আনা আট আনা গর্চ্চা দেয়, কিন্তু রেজাল্ট একই থাকে। স্বপ্নাকে বসে বসে শুনতেই হয়, ঠিক ওই রকম জিনিসটি কে যেন শিয়ালদার বাজার থেকে আরো কতো কম দামে কিনে এনেছে এই মাত্র সে দিন।

স্বপ্না তো বলতে পারে—বেশ তো, তাকেই আনতে দিলে পারতেন।

কিন্তু পারে না।

ওই বলাটা সোজা ক্ষমতার কাজ নয়।

স্বপ্নার সে ক্ষমতা নেই।

এই তো ওই গেঞ্জি নিয়েই সেবার কী লজ্জা, কী লজ্জা!

সুমতি পিসি ঠিক আজকের মতই তাঁর 'পাগল ছাগল' স্বামীর জন্যে একটি গেঞ্জি এনে দিতে বলেছিলেন। এবং একটা জামাই মানুষ শত ছিদ্দির গেঞ্জি গায়ে দিয়ে বেড়ায়, অথচ তার শালার দেখে হায়া হয় না, এ বলে দুঃখ প্রকাশও করেছিলেন। তফাতের মধ্যে সে দিন পিসি একটি মোচড়ানো দোমড়ানো, গোলাপী রং কালচে হয়ে যাওয়া দু' টাকার নোট বাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

যে মানুষ শার্ট পরে না, কোট পরে না শুধু একটা গেঞ্জি, স্বপ্না তার জন্যে একটা ভাল দেখে গেঞ্জি কিনবে না? স্বপ্না এনে দিয়েছিল তাই। ভেবেছিল পিসি পুলকিত হবেন।

কিন্তু গেঞ্জির প্যাকেট খোলার আগেই পিসি 'ফেরত' টাকাটার জন্যে হাত বাড়ান।

স্বপ্না অতএব বেজায় কুণ্ঠিত হলো।

যেন স্বপ্না নিজের প্রয়োজনেই খরচ করে বসে আছে, এই ভাবে জানালো, দুটাকাই লেগেছে।

শুনে পিসি আকাশ থেকে পড়লেন। পিসি জানালেন, একটা গেঞ্জির দাম যে দু'টাকা হতে পারে একথা নাকি তিনি বাবার জন্মে শোনেন নি।

তারপর চিবিয়ে চিবিয়ে অনেকক্ষণ ধরে বললেন, তার সারমর্ম এই—'পরের পয়সা'

~ www.amarboi.com ~

বলেই যে হাতে পেয়ে সে পয়সাকে খোলাম কুচি জ্ঞান করতে হবে তার কোনো কারণ নেই। এ টাকা পিসির বহু পরিশ্রম লব্ধ। লোকের বাড়ি বাড়ি—বড়ি দিয়ে কাঁথা সেলাই করে দিয়ে, উপার্জন তাঁর। ভাইঝি আপন ভেবেই তাকে এই উপকারটি করে দিতে বলেছিলেন। কিন্তু সুমতি বামনীর কপালে আপনও পর হলো। ইত্যাদি ইত্যাদি আরো অনেক।

স্বপ্না মাথা হেঁট করে চলে এসেছিল। স্বপ্নার ইচ্ছে হয়েছিল দুটো-টাকাই ফেরৎ দিয়ে বলে, 'গেঞ্জিটা পিসেমশাইকে আমি উপহার দিলাম—' কিন্তু সে সাহস হয়নি স্বপ্নার। স্বপ্নার বুক কেঁপেছিল।

স্বপ্না তাই মাথা হেঁট করে চলে এসেছিল। তারপর স্বপ্না শুনতে পেলো সুমতি পিসি নাকি পাড়ায় রটিয়ে বেড়াচ্ছেন—আপিসে চাকরী করে, পুরুষের মতন 'ডেলি প্যাসেঞ্জারী' করে স্বপ্নার নজর একেবারে তালগাছে ঠেকেছে, গরীবের—গরীব খানায় সে নাক কোঁচকায়।

খবরটা সতুই এনে দিয়েছিল। আর সেটা খুব বেশী দিন আগেও নয়। অর্থাৎ ভুলে যাবার সময় আসেনি।

কিন্তু মনে হচ্ছে সুমতি পিসি ভুলেছেন। অথবা ভোলেননি। এক টাকার নোট খানাই তার প্রমাণ।

তবু সেটা হাত পেতে নিতে হলো স্বপ্নাকে। না, মানবিকতায় নয়, সতু যা বলেছে তাই।

মানবিকতায় হলে পাগলছাগল পিসেটার শতছিদ্র গেঞ্জির খবরে নিশ্চয় তার চোখে জল আসতো। পিসির তো এসেছিল। দেখেও আসতে পারতো।

জল আসেনি, এসেছিল আগুন, কিন্তু সে আগুনকে চেপে ফেলতে হয়েছে স্বপ্নাকে।

এবং স্বপ্নাকে ট্রেন ফেল হবো হবো সময়েও তার রাধুকাকা এক বোতল টনিক আনতে দিলেন, এবং করুণ মিনতি জানালেন, দামটা তিনি মাসকাবারে দেবেন। কারণ ছেলের কাছ থেকে মনি অর্ডার আসবে তবে।

বড়জ্যেঠি তাঁর ছোট নাতির জন্যে একটা গ্ল্যাক্সো কিনতে দিলেন, টাকাটা অবশ্য দিলেন পুরো, তবে বার বার জানালেন, অনেক দোকান 'ব্ল্যাক' করে। সে সম্পর্কে যেন অবহিত থাকে স্বপ্না।

মাস কাবার স্বপ্নারও।

হোক দুটি ভাইবোনের সংসার। তবু সে সংসার তাকেই চালাতে হয়। তা ছাড়া ট্রেনের মান্থলী টিকিট আছে, আফিসের টিফিন আছে জামাজুতো ওষুধ ডাক্তার। সতুর স্কুলের মাইনে বইখাতা কি নেই?

স্বপ্নাকে অতএব দশটি টাকা অফিসের দ্বারোয়ানের কাছ থেকে চড়া সুদে ধার করতে হলো।

অবশ্য এতে লজ্জার কিছু নেই।

~ www.amarboi.com ~

মাসের শেষে অনেকেই এ কাজ করে থাকে। দ্বারোয়ান এই কেরাণীকুলের পরিত্রাতা 'মহাজন।'

ওষুধটা চট করেই পাওয়া গেল, কিন্তু ফুডটা নয়।

যে সব দোকানে গ্ল্যাক্সোর টিনের লাইন দেখা যেত, সে সব দোকান থেকে হঠাৎ শেষ টিনটিও উধাও।

স্বপ্না এই পৃথিবীকে অহরহ দেখছে, তবু স্বপ্না অবাক হয়।

স্বপ্না ভাবে শিশুর খাদ্য নিয়ে এই যে কুটিল পাপচক্র চলে, এই যে হতভাগ্য অভিভাবক একটি কৌটোর জন্যে মাথা খুঁড়ে মরে, ছুটোছুটি করে বেড়ায় এ পাতকের শাস্তি কি কোনখান থেকে আসে না?

না রাজ্য শাসক না বিশ্ব শাসক, কেউ তোলে না তার দণ্ড।

যাক ওসব বড় বড় চিন্তা, এখন চিন্তা পাওয়া না পাওয়া। অনেক দোকান ঘুরে—অবশেষে একটি দোকানে পাওয়া গেল।

তাদের নাকি ওই একটি মাত্রই ভিতরের ষ্টক তোলা ছিল কোনো বিশেষ খদ্দেরের জন্যে। নেহাৎ স্বপ্নার ব্যাকুলতা দেখেই ছেড়ে দিতে বাধ্য হচ্ছে। তবে দাম তো লাগবেই বেশী।

দুষ্প্রাপ্যকে লাভ করতে হলেই বেশী দিতে হয়।

ধারের দরুণ দেড়টা টাকা হাতে ছিল রাধু কাকার টনিক কেনার পর, সেইটার সঙ্গে আরও আনা আষ্টেক জুড়ে ওই বাড়তিটা ম্যানেজ করা গেল, কিন্তু সাড়ে ছটার ট্রেনটা আর ম্যানেজ করা গেল না।

বারবার হাত ঘড়িটা চোখের কাছে তুলে ধরে ধরেও সময়টাকে হাতের মধ্যে রাখতে পারলোনা বেচারা। এর পরেই পৌনে আটটা। সে গাড়ী আবার টিকিয়ে টিকিয়ে চলে। বাড়ি পৌঁছোতে রাত সাড়ে দশটা বেজে যাবে।

অথচ বড় জ্যেঠি বলে দিয়েছেন, 'এক গুঁড়ো নেই মা, ফুড্‌টা আসবে, তবে বাছা খেয়ে ঘুমোবে।'

কথাটা মনে পড়ে নিজেকে যেন মারতে ইচ্ছে করলো স্বপ্নার। কিন্তু করবে কি? ওদিকে সতুটার জন্যেও মনটা ছটফট করছে।

বাবু মাথায় মস্ত লম্বাই হোক, আর লম্বা লম্বা কথাই শিখুক, সন্ধ্যে হলেই স্রেফ্ 'খোকা'।

খেতে একটু রাত্তির হলেই ঘুমিয়ে গড়াগড়ি যাবে। তাকে জাগিয়ে খাওয়ানো একটা মজুরের খাটুনি।

স্টেশনে নেমে দ্রুতপায়ে আসতে থাকে স্বপ্না। যদিও অনেক পাড়াতুত দাদা কাকা এই ট্রেনেও আসেন, কিন্তু তবু কেমন যেন অস্বস্তি হয়।

রাত হলেও বড় জ্যেঠির বাড়ি ঘুরে যেতে হবে। তারপর বাড়ি ফিরে রান্না।

শরীর ভেঙে আসছে। বারে বারে মনে হচ্ছে জগতে তারা কী সুখী, যারা খেটে খুটে

~ www.amarboi.com ~

বাড়ি ফিরে বাড়া ভাত পায়।

জ্যেঠি হাত বাড়িয়ে ফুড্‌টা নিয়ে অপ্রসন্ন গলায় বলেন, 'আর এখন পাওয়াও যা, সকালে পাওয়াও তা।' বাছা কেঁদে কেঁদে হত্যে হয়ে শেষে একটু 'দুধে জলে' খেয়ে ঘুমোলো।'

স্বপ্না ক্ষীণ কণ্ঠে বলে, 'কোনো দোকানে পাচ্ছিলাম না—'

জ্যেঠি আর সে কথার কান দিলেন না। ঘরে উঠে গেলেন।

স্বপ্না নির্জন রাস্তায় আবার দ্রুত হাঁটতে লাগলো।

টনিকটা আর গেঞ্জিটা রয়েছে ব্যাগে।

থাক্ কাল যাবার পথে দিলেই হবে।

ওঁরা কিছু আর ওর জন্যে কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়ছেন না।

~ www.amarboi.com ~

আলো আগুন ছায়া

সানাই বাজছিল বহু পরিচিত একটা সুরকে বাতাসে আছড়ে আছড়ে। দূর থেকে শোনা যাচ্ছিল সেটা।

নীল লাল আলোর মালা পরানো হয়েছিল বাড়িটাকে ঘিরে, বাঁশের তোরণে শালু মুড়ে তার গায়ে গায়ে দেবদারু পাতার কারুকার্য করা হয়েছিল, এবং তার মাথায় একটা বহুশক্তিসম্পন্ন কড়া সাদা আলো জ্বেলে দেওয়া হয়েছিল। ডেকরেটারের শিল্পকলার নমুন আরো ছিল এদিকে ওদিকে। সবটা মিলিয়ে বাড়িখানাকেই যেন বিয়ে বাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে আসা একটি সালঙ্কারা মহিলার মত দেখাচ্ছিল।

বাড়িটাকে একটা বড়লোকের বসত বাড়ি বলে মনে হলেও তা নয়। এটা একটা ভাড়াটে বিয়ে বাড়ি। তবে বিয়ে বাড়ি হিসেবেই বেশ নামকরা।

এবাড়ির 'হল্'টাতেই নাকি পাঁচশো লোককে একত্রে খেতে বসিয়ে দেওয়ার মত জায়গা আছে, এবং রান্নার জায়গায় হাজার লোকের উপযুক্ত বড় বড় গোটা তিন-চার উনুন পাতা আছে। তা'ছাড়া মাছ কোটানো থেকে সুরু করে কলাতলা সাজানো পর্যন্ত সব ব্যাপারের জন্যেই যথোপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত করা আছে।

অতএব এবাড়ির ভিতরের একটা দেওয়াল জুড়ে ঘৃতসিক্ত বসুধারার নামাবলী এবং সিঁড়ির দেওয়াল জুড়ে পানের পিকের রক্তধারার চিত্রাবলী।

'লগন্সা'র সময় এবাড়ি এক ঘণ্টার জন্যে খালি থাকতে পায় না।

যারা বিয়ে দিতে আসে, তারা ঘর বাঁচিয়ে বসুধারা দেবে, অথবা যারা নেমন্তন্ন খেতে আসে তারা দেওয়াল বাঁচিয়ে পিক ফেলবে এতটা তো আশা করা যায় না? রীতি অনুসারে যা যা হবার হবেই। হতেই হবে।

নিমন্ত্রণ কর্তার বড়লোক আত্মীয়রা দামী-দামী উপহার হাতে নিয়ে এসে ঐশ্বর্যের আর আহ্লাদের ছটা বিকীর্ণ করে উৎসবকে উপভোগ করে যাবে, গরীব আত্মীয়রা আপন উপহার বস্তুর অকিঞ্চিৎকরতায় মানসিক বিকারগ্রস্ত হয়ে সারাক্ষণ নিজেকে অবহেলিতজ্ঞানে মর্মপীড়া ভোগ করবে, ডাক্তারের কড়াকড়িতে বিড়ম্বিতপ্রাণ ডায়াবিটিস আর ব্লাডপেসারের রোগীরা গিন্নীর শিথিলতার সুযোগে এদিক ওদিক থেকে বেশ কিছু মিষ্টি খেয়ে নেবে, এবং গার্জেনের কড়া দৃষ্টির শৃঙ্খলে বিড়ম্বিত প্রাণ তরুণ তরুণীরা গার্জেনদের সাময়িক শিথিলতার সুযোগে এদিক ওদিক থেকে খানিকটা মিষ্টরস আহরণের তাল খুঁজে বেড়াবে। এসব হবেই।

তা'ছাড়া রাঁধুনীরা চুরি করবে, চাকররা কাজে ফাঁকি দেবে, ঝিয়েরা নিজ নিজ মনিববাড়ির আক্কেলের নিন্দাবাদ করবে, বাচ্ছারা অকারণ চেঁচাবে, দু'একজন অন্ততঃ

~ www.amarboi.com ~

আছাড় খাবে, আলোটা এক আধবার ফিউজ্ হবে, মাটির গ্লাসের অর্ধেকই ফুটো বেরোবে এসবও অবধারিত।

কিন্তু গায়ত্রীর মেয়ের বিয়েতে যে ঘটনাগুলো ঘটলো সেগুলো অভাবিত। হয়তো গায়ত্রীরই হতচ্ছাড়া কপাল এর জন্যে দায়ী। আড়ালে আড়ালে বললোও সবাই একথা। বললো, ভাগ্যকে ডিঙোবো বললেই কি ডিঙোনো যায়? আজ ছেলে কৃতী হয়ে দুটো পয়সা ঘরে আনছে বলেই কিছু আর গায়ত্রীর পোড়া কপাল জোড়া লাগেনি। ছেলে রোজগার করছে ছেলের ভাগ্যে। সেই টাকা মেয়ের বিয়েতে জলের মত খরচ করতে বসাই বা কেন?

গায়ত্রী প্রাণপণ করে ছেলেকে মানুষ করে তুলেছিল।

সে কথা আলাদা!

চেষ্টা তো করেই থাকে মা বাপে।

বাপ নেই মা করেছে। কিন্তু চেষ্টা করলেই কি মানুষ হয়? ওরকম পরিবেশে তো ছেলের ভূত বাঁদর হওয়াই স্বাভাবিক ছিল। খুব ভাল ছেলে প্রদ্যোত তাই চেষ্টা সফল করিয়েছে, আবার তার উপর মায়ের হাতে সর্বস্ব তুলে দিচ্ছে।

প্রদ্যোতের মত একটি সুপাত্রের উপর যাদের নজর আছে, বিশেষ করে তাদের গাটা করকর করছিল গায়ত্রীর এই ছেলের পয়সাগুলো দু'হাতে উড়িয়ে নষ্ট করা দেখে।

কেন, এত ঘটা করে মেয়ের বিয়ে না দিলে চলত না? বরপক্ষ মহত্ত্ব দেখিয়েছে, পিতৃহীন মেয়ে বলে দয়া ধর্ম দেখিয়েছে, দাবি-দাওয়া করেনি, তুমি মহিলাটি, তাদের সামনে জাঁক-জমক দেখাতে গেলে কোন্ লজ্জায়? রইল জাঁক-জমক? লাগল না সেই জাঁক-জমকে আগুন?

যারা গায়ত্রীকে করুণা করে এসেছিল এযাবৎ এবং হঠাৎ তার ছেলেটা কেষ্ট বিষ্টু আর মেয়েটা সুন্দরী বিদূষী হয়ে ওঠায় আর করুণা করার সুযোগ পাচ্ছিল না, তারা আবার করুণায় বিগলিত হয়ে বলতে লাগল, "আহা কী কপাল! কী কপাল! সেই হল সবই, কিন্তু যেন 'ছ্রকোট'!

ভয়ানক একটা অমঙ্গলের আশঙ্কাতেও থর থর করে কাঁপছিল গায়ত্রীর আত্মীয়রা! গায়ত্রীর তো ওই ভাঙা কপাল, মেয়েটারও না জানি কী হয়!

'যাই বল, বলতে লাগলেন গায়ত্রীর বড় ভাজ, লোকটাকে অতটা অমন করা ঠিক হয়নি ঠাকুরঝির! কথাতেই আছে 'মনস্তাপে যদি চণ্ডালে শাপে, এড়াতে পারে না ব্রাহ্মণের বাপে।' মুখের খাদ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে চলে গেল লোকটা, দিয়েছে শাপমন্যি! তা নইলে কোনোখানে কিছু নেই—'

কিন্তু গায়ত্রীর বড়ভাজের মন্তব্যটা কি ঠিক? চোর ছ্যাঁচোড়-ঠগ-বদমাসও যদি উদ্দেশ্য সিদ্ধি করতে না পেরে শাপ দিয়ে যায়, ফলবে সেটা?

অবিশ্যি নিষ্ঠুরতাটা যেন একটু বেশীই হয়ে গিয়েছিল গায়ত্রীর, কিন্তু উপায় কি? প্রদ্যোত যে ভালমানুষের রাজা, কাউকে তো কিছু বলতে পারে না। ও যদি ঘাড় ধরে

~ www.amarboi.com ~

বার করে দিত লোকটাকে, গায়ত্রীকে যেতে হত না দূর দূর করতে।

'আহা' বলে ছেড়েই বা দেওয়া যায় কি করে? লোকটা যে মাত্রা ছাড়িয়েছিল। গরীব দুঃখীর মত যদি চাইতিস কিছু, নিশ্চয়ই গায়ত্রী ঢেলে মেলে দিতো। অগাধ আয়োজন হয়েছে, কত ফেলাছড়া যাবে। কিন্তু লোকটা কিনা গায়ত্রীর সবচেয়ে মান্যগণ্য অতিথিদের সঙ্গে ভোজের টেবিলে এসে বসে গেছে দিব্যি! বরযাত্রীরা যদি ওই ঘেয়ো কুকুরের মত লোকটাকে গায়ত্রীর আত্মীয় ভেবে বসতো? ফর্সা পাঞ্জাবী গায়ে দিয়ে এলেই যদি লোকের চোখে ধুলো দেওয়া যেত! সে পাঞ্জাবীও তো জরাজীর্ণ। একনজরেই ধরা পড়ে যায়। বোধকরি ওই পাঞ্জাবীটা ভাঙিয়েই এই ব্যবসা চালিয়ে আসছে পাজীটা! শুধুই কি খেতো? কে জানে কিছু হাতাতোও কিনা বিয়ে বাড়ির অসতর্কতায়।

গায়ত্রীর অনুমান কিন্তু ভুলও নয়।

ওই পেশা লোকটার।

কাজের বাড়িতে ভীড়ে মিশে ঢুকে পড়ে চর্ব্যচোষ্য একপেট খেয়ে নেওয়া, পকেট বোঝাই করে পান সিগারেট দেশলাই সন্দেশ নিয়ে নেওয়া আর তেমন সুযোগ মিলে গেলে বড় কিছু হাতানো। কত ভুলো লোক গায়ের দামী শালখানা চেয়ারের পিঠে রেখে খেতে চলে যায়। কত ভাল ভাল জুতো ডাঁই করে পড়ে থাকে সিঁড়ির তলায়, সিঁড়ির ধারে, কত অতি আহ্লাদে মা বাচ্ছা ছেলে মেয়ের গলার হার হাতে বালা পরিয়ে বাহার দেওয়ায়, সেগুলোর সুযোগ জুটে যায় বৈকি মাঝে মাঝে।

ধরাও যে কখনো পড়ে যেতে হয় না তা নয়, তবে আজকের মত এমন ভয়ঙ্কর মুহূর্তে নয়। হয়তো খেয়ে সরে পড়বার সময় জেরার মুখে পড়ে দু'ঘা রদ্দা খেতে হল, হয়তো বা ঢোকবার মুখে ধরা পড়ে ধমক টমকের সঙ্গে সঙ্গে ভিখিরির মত পাতায় করে দুখানা লুচি-মাছ জুটলো!

এতটা নিষ্ঠুর বড় একটা হয় না মানুষ! বিশেষ করে মেয়েমানুষ! এই বাড়িতেই একবার একটা বিয়েতে বাড়ির পুরুষরা 'মার মার' করে ভাগিয়ে দিয়েছিল তাকে আর পিছনের দরজা থেকে ঝিকে দিয়ে ডাকিয়ে বাড়ির একটি বৌ রাশীকৃত খাবার দিয়েছিল। বলেছিল, 'কত খাবার বাড়বে তার ঠিক নেই, তবু এমন করল এরা!'

এদেরও হয়তো বাড়বে।

হয়তো যে পাতাটা থেকে উঠিয়ে দিল তাকে, সেই পাতাটা সরাসরি ডাস্টবীনে যাবে! কতই তো দেখেছে সে। কত রকম! এই বাড়িটাতেই কতবার বিয়ে দেখল, ঢুকে পড়ল। পড়তে পায় না তো বাড়িটা। নতুন ভাড়াটে এলেই লক্ষ্য রাখে সে।

এবারও ডেকরেটাররা বাঁশের বোঝা এনে ফেলার সময় থেকেই লক্ষ্য রেখেছিল। ঘুর ঘুর করছিল সেই পর্শু সন্ধ্যা থেকে। আর জিরজিরে ধুতি পাঞ্জাবীটাকে সাবান কেচে ইস্ত্রী করে ফেলেছিল। ওই ধুতি পাঞ্জাবীটিই তার এই ব্যবসার মূলধন। আরও একটা মূলধন আছে, ছোট্ট একটি আতরের শিশি! একটু আতর মাখা ভাল, তাতে বেশ একটু

~ www.amarboi.com ~

অভিজাত ভাব আসে, নিজের প্রতি আস্থা জন্মায়।

আজ সন্ধ্যার আগে থেকে হাড় জিরজিরে দেহে সেই জিরজিরে ধুতি পাঞ্জাবীটি চড়িয়ে ওৎ পেতে বসেছিল রাস্তার ওপারের একটা বাড়ির রোয়াকে, অন্ধকার কোণ ঘেঁসে। যখন বরযাত্রী ভর্তি রিজার্ভকরা বিরাট বাসটা এসে ওই শালুমোড়া তোরণের সামনে নিজেকে উজাড় করে দিতে বসলো, তখনই ঢুকে পড়ল চোরটা। বসল ওদের দলে।

তা ওইটিই কাল হল।

বরযাত্রীরা খেতে বসেছিল বলেই না অত অবহিত হয়ে তদারক করতে এসেছিল গায়ত্রী। আর অত তাড়াতাড়ি ধরে ফেলেছিল জোচ্চোরটাকে।

টেবিলের ধারে ঘুরে ঘুরে সৌজন্য করে বেড়াচ্ছিল গায়ত্রী, হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। বরের দাদা বরকর্তাকে তীক্ষ্ণ প্রশ্ন করে উঠল, ইনি আপনাদের সঙ্গে এসেছেন?'

বরকর্তা ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'আজ্ঞে না তো!'

'চেনেন না এঁকে?'

'আজ্ঞে না।'

'ভাল করে দেখুন দিকি কখনো দেখেছেন কি না?'

'আজ্ঞে না কখনো দেখেছি বলে তো মনে পড়ছে না। বোধহয় এদিকের কেউ—'

'না এদিকের কেউ নয়—' গায়ত্রী তীব্র আদেশের সুরে বলেছিল, 'প্রদ্যোত, উঠিয়ে, দাও একে এখান থেকে।'

বিরাট হলের ওপ্রান্ত থেকে প্রদ্যোত চলে এসেছিল, থমকে দাঁড়িয়েছিল, মায়ের কঠোর কঠিন মুখের দিকে তাকিয়ে আস্তে বলেছিল, 'খেতে বসেছেন, খাওয়াটা হয়ে গেলে—'

'খাওয়াটা হয়ে গেলে? আশ্চর্য! আমার এইসব কুটুম্বের সঙ্গে এক টেবিলে খাবে এই রাস্তার লোকটা?'

গায়ত্রী যেন ছেলের আহাম্মুকী দেখে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে যাচ্ছিল।

আশ্চর্য, কিন্তু লোকটা ধরা পড়েও পালাবার চেষ্টা করছিল না। হয়তো ওই বহুবিধ দুর্লভ সুখাদ্যে ভরা পাতটা তাকে সর্ববিধ লাঞ্ছনা সহ্য করবার সংকল্প এনে দিচ্ছিল, তাই মাথাটা ঝুঁকিয়ে প্রায় টেবিলে ঠেকিয়ে ফেলে একটা চপ ভেঙে মুখে পোরবার চেষ্টা করছিল।

চেষ্টা সফল হল না।

গায়ত্রীর ভালমানুষের রাজা ছেলে যখন অস্ফুটে বলল, 'খেতে যখন বসেই গেছেন, পাতটা তো'—

গায়ত্রী ছেলের দিকে আগুন-জ্বলা চোখ নিয়ে তাকালো, তারপর দৃঢ়স্বরে বললে, 'পাতের জন্যে নয়। আমার আদরের কুটুম্বদের সঙ্গে রাস্তার একটা লোক এসে খেতে বসবে, এ আমি বরদাস্ত করতে পারব না।...উঠে যান, উঠে যান আপনি। এই দণ্ডে উঠে

~ www.amarboi.com ~

যান!'

অবাক কাণ্ড, তবু লোকটা পাতার সঙ্গে প্রায় মুখ ঠেকিয়ে বসেই রইল।

অন্যান্যদের মধ্যে থেকে একটা হাঁ হাঁ করা ভাব উঠল, যে ভাবটা গায়ত্রীর সমর্থক নয়, চোরেরই সমর্থক! অর্থাৎ 'যাক গে মরুক গে ছেড়ে দিন! খাচ্ছে খেয়ে নিক!'

গায়ত্রী আরো দৃঢ়স্বরে বললো, 'না এখানে দয়া ধর্মের কথা নয়। দেখছেন চেহারাটা? কে বলতে পারে টি, বি, রোগী কি না? আরো কোনো রোগ থাকাও অসম্ভব নয়—'

মুহূর্তে 'হাঁ হাঁ'র সুরটা পাল্টে গেল। দু'তিনশো লোকের প্রায় সকলেই সঙ্কুচিত হয়ে বসলো ছোঁয়াচ বাঁচাতে।

গায়ত্রী আর একবার কড়া স্বরে হুকুম দিলো, 'উঠে যান! এতেও না হলে অগত্যাই চাকর বাকরকে ডাকতে হবে!'

প্রদ্যোত সরে গেল।

এবার আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালো লোকটা। ঘাড় নীচু করে বেরিয়ে গেল। আর ঘাড়টা অত নীচু করলো বলেই পাঞ্জাবীর ঘাড়ের ছ্যাঁদাগুলো অত করে চোখে পড়ল। ওই শতছিদ্রের ইতিহাস নিয়ে এই গেটে মাথা গলাল কি করে! আশ্চর্য!

মুখের গ্রাসটা ফেলে চলে গেল!

নিশ্বাস পড়ল অবশ্যই।

তাই বলে সেই নিশ্বাসের এত জোর হবে যে, পরমুহূর্তেই বিয়ের বাসরে আগুন লেগে যাবে?

দস্তুরমত আগুন।

যে আগুনে পুড়ে ধ্বংস হয়ে গেল বাসর ঘরের সাজসজ্জা, ডেকরেটারদের শিল্পরুচির অনবদ্য নমুনা। সারা ঘরটা জুড়ে জানলা দরজায় লেসের পর্দা ঝুলিয়েছিল তারা, দেওয়াল জুড়ে লেসের ঝালর। যাচ্ছেতাই হয়ে গেল সব।

নিশ্বাসে কি বারুদভরা ছিল ওর?

ছড়িয়ে দিয়ে গেল সেটা জ্বালিয়ে দিয়ে?

'লেবু দেয়নি, ওমা!' লোকটা চলে যেতে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে অভ্যাগতদের দিকে তাকিয়েছিল গায়ত্রী, দেখেছিল লেবু দেওয়া হয়নি। ব্যস্ত হয়ে ছুটল। বলে গেল, 'খান, খান আপনারা! কাজকর্মের বাড়িতে এধরনের লোকগুলো এসে এমন ঝামেলা করে! কোথায় রাখা হয়েছে লেবু?'

কিন্তু পোলাউতে লেবু জুটলো কই বরযাত্রীদের? গায়ত্রীর তো ফিরে আসা হল না। একটুক্ষণের মধ্যেই ওই 'আগুন আগুন' রবটা সারা বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিল।

যারা খেতে বসেছিল তারা হাত থামিয়ে উদগ্রীব উৎকর্ণ হয়ে নড়া-চড়া করতে লাগল, বাকী সবাই দুদ্দাড়িয়ে ছুটল আগুনের সন্ধানে।

~ www.amarboi.com ~

ধোঁয়া আসছে ঘুরে ঘুরে তার সঙ্গে ন্যাকড়াপোড়া গন্ধ!

কোথায় তার উৎসস্থল? ভিতর বাড়িতেই মনে হচ্ছে।

যারা খাচ্ছে তারা তো আর এখন পরিবেশকের টিকি দেখতে পাবে না, তবে বসে থেকে কি করবে? চেয়ারে বসে বসে অগ্নিদগ্ধ হবার প্রতীক্ষা করবে!

একে একে দুইয়ে উঠে উঠে দরজায় দাঁড়াতে লাগল। আর সকলের মধ্যে মধ্যেই একটা কথা ধ্বনিত হতে লাগল 'শাপ দিয়ে গেল লোকটা।'

কনের মা'টি সোজা নয়!

জাঁহাবাজ মেয়েমানুষ!

দেখতে অমন পাতলা সাতলা সভ্য, শাদা ধবধবে থানে মহিমময়ী মহিমময়ী ভাব, কিন্তু সামান্যেই কি মেজাজ রে বাবা!

চোখে যেন আগুন!

গলার স্বর একেবারে অমানুষিক কঠোর!

আলোচনাটা বইছিল ফল্গুধারার মত। আর মন্তব্য উঠছিল, 'খুব নেমন্তন্ন খেতে আসা হয়েছিল বাবা!'

'আগুন' শব্দের সঙ্গে সঙ্গেই কনের মামা দমকলে খবর দিতে ছুটলেন, কনের কাকা 'জল জল' চীৎকার জুড়লেন। ক্যাওড়া সুবাসিত জলের ড্রামটার মধ্যে মগ ডুবিয়ে ডুবিয়ে এলোমেলো ছোটাছুটি সুরু হল। নির্ঘাৎ বামুনঠাকুরদের ঘিয়ের কড়া জ্বলে গেছে। তাছাড়া আর কি! অতএব আর রক্ষার প্রশ্ন নেই। মুহূর্তে ভস্মীভূত হয়ে যাবে এই আগাগোড়া রঙিন কাপড়ে মোড়া রঙিন আলো দোলানো বাড়ি। ইলেকট্রিকের তার একবার জ্বলে গেলে তো—

অসংখ্য কণ্ঠের কলরোলে আর অসংখ্য লোকের ছুটোছুটিতে বোঝা যাচ্ছিল না কোথায় ঘটেছে বিপদ, আগুন যখন নিজেকে বিস্তার করে ফেলল তখন ধরা পড়ল।

বাসরের দরজার পর্দায় আগুন লেগেছিল, দরজা থেকে জানলায়, জানলা থেকে এখানে, ওখানে, আনলায় ঝোলানো শাড়ীতে, ট্রাঙ্কের উপর রাখা সকলের ছাড়া-জামার স্তূপে।

এইভাবেই তো আগুন নিজেকে ছড়ায়।

এক থেকে আর এক পৌঁছতে পৌঁছতে ধ্বংস করে দেয় সব।

তবু রক্ষে যে 'চেক্' হয়ে গেল।

বিয়ে বাড়িতে যেখানে যতজন ছিল সব এসে পড়ল এখানে। নিভতেই হল আগুনকে। দমকল যখন এল তখন আগুন নেই, শুধু ধোঁয়া আর ধোঁয়ার গন্ধ বাতাসে ঘুলোচ্ছে। আর দগ্ধাবশেষ 'বাসর বাহার' ভিজে লেপটে থেকে দেওয়ালটাকে বীভৎস করে তুলেছে।...সে তো হল, কিন্তু আগুনটা লাগল কি করে? ধারে কাছে যার আগুনতাতের পর্যন্ত সংস্পর্শ নেই, সেখানে অসতর্কতার অবকাশ কোথায়?

~ www.amarboi.com ~

মেয়ে মহলে নিশ্চয়ই সিগারেট খায়নি কেউ যে, ছুঁড়ে ফেলেছে এদিকে সেদিকে। তবে?

ধূপ জ্বেলেছিল কেউ? ছেলের দুধ গরম করতে স্টোভ? ছোটদের হাতে মোমবাতি পড়েনি তো? তার সঙ্গে দেশলাই?

না?

ওসব কিছু না?

তা'হলে?

তা'হলে তো আরও ভাবনার কথা।

অসাবধানের নয় মানেই, ইচ্ছের। তার মানেই বিপদ সাংঘাতিক। অসাবধানের আগুন বড়জোর ঘরবাড়ি পোড়ায়, ইচ্ছের আগুন যে ভাগ্যকে পোড়ায়। অনিষ্ট করবার ইচ্ছে নিয়ে বাসরের দোরে আগুন লাগানো মানেই তো তুকতাক! তুকতাকই করেছে কেউ তবে।

বাসরের দোরে আগুন লাগা কি সোজা অমঙ্গলের চিহ্ন?

আগুন নিভে যাবার পর শঙ্কিত হলেন কনের মার পিসি। যার সঙ্গে চোখোচোখি হতে লাগল তার কাছেই আক্ষেপ প্রকাশ করতে লাগলেন 'সর্বনেশে কাণ্ড! সর্বনেশে বিপদ! মা-টার জীবন তো ছারে গোল্লায় গেল, চিরযুগ ধরে দুঃখের পাথারে ভাসল, কে জানে কে কি তুকতাক করেছিল! এখন যদি বা অনেক দুঃখে ঝাড়িয়ে কাটিয়ে উঠেছিল, আবার কোন্ শত্রু মেয়েটাকে নিয়ে পড়ল গো! অ মা গাঈত্রী, এক্ষুণি মেয়ের গলায় ঠাকুরের ফুল বেঁধে দাও। আর বাসরের বিছানা বদলে অন্যঘরে করে দাও। দোরপোড়া ঘরে যেন বাসর না হয়।'

কনের মার পিসি অকল্যাণের ভয়ে সাবধান বাণী উচ্চারণ করলেন। তবে না করলেও বাসর বদলাতেই হোত। কারণ অসংখ্য পদ তাড়নায় মখমলের বিছানাটা বিধ্বস্ত যুদ্ধক্ষেত্রের মত হয়ে উঠেছিল, আর ঘরের মেঝেয় এক জালা ক্যাওড়া জল থই থই করছিল কাদাজলের মূর্তিতে। দেখে কে বলবে একটু আগেই ওই সাজানো বাসর আলো করে বসেছিল রঙে রসে উচ্ছল তরুণীর দল।

হ্যাঁ তারাই বসেছিল। কনের বন্ধুরা আর আত্মীয় তরুণীরা! কনে বসেছিল পাশের ঘরে চণ্ডীপুঁথি কোলে নিয়ে আলপনার পিঁড়িতে আসন্ন বিয়ের প্রতীক্ষায়। তচ্ নচ্ হয়ে গেছে সে সব দৃশ্য, হাস্যমুখর তরুণীরা ভয়ার্ত কলরবে ঠেলাঠেলি করে ঘর থেকে পালিয়েছে, এবং কনে বিধিনিষেধ ভুলে চণ্ডীর পুঁথি মাটিতে নামিয়ে ভয়ার্ত মুখে এঘরের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে।

এতক্ষণ আগুনের ভয়েই উচাটন হচ্ছিল উজ্জয়িনী,—এখন আগুন নিভে যাবার পর ওই সাবধান বাণীতে শিউরে স্তব্ধ হয়ে গেল। তার জীবনেও তার মায়ের ভাগ্যের পুনরাবৃত্তির অশুভ ছায়া এসে নিশ্বাস ফেলবে?

কিন্তু কে সেই শত্রু? যে উজ্জয়িনীর বাসরের দরজায় আগুন ধরিয়ে দিয়ে তার

~ www.amarboi.com ~

ভবিষ্যৎকে দগ্ধ করতে চায়?

মা বা গেলেন কোথায়?

চারিদিকে তাকাল, দেখতে পেল না। কই একবারও তো দেখতে পাওয়া যায়নি তখন থেকে। নির্ঘাৎ গোলমালের বহর দেখে ভাঁড়ার সামলাতে গেছেন। এই মহামুহূর্তে মা উজ্জয়িনীর কথা না ভেবে ভাঁড়ার সামলাতে যেতে পারলেন!

দুই চোখ ভরে জল এল!

জল তো আসবেই।

একেই তো তার ভাবী শ্বশুরবাড়ি থেকে যে মহিলাকুল নেমন্তন্নে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন কৌতূহলী প্রশ্নের ঠ্যালায় চোখে অন্ধকার দেখিয়ে দিচ্ছিলেন উজ্জয়িনীকে। সেই অন্ধকার চোখে ও দিশেহারা হয়ে মায়ের মুখ খুঁজছিল, তার উপর এই!

লোকের কৌতূহলও কি এত বেশী!

উজ্জয়িনীর বাবার নিরুদ্দেশের পর বারো বছর পার করে মা বৈধব্য নিয়েছেন, না আগেই? সত্যিই কি জেলে যাবার ভয়ে পালিয়ে ছিলেন উজ্জয়িনীর বাবা, না ওটা বাজে লোকের রটনা? সত্যি যদি তো কী বাবদ? স্বদেশী করে? না অন্য দোষ করে? এইসব অর্থহীন প্রশ্ন।

উজ্জয়িনী কিছু জানে না শুনে রেগে উঠলেন মহিলা, বললেন, 'বাপের কথা কেউ কিছু কখনো শোনায়নি তোমায়? আশ্চর্য তো? কতটুকু ছিলে তুমি তখন? আট বছরের? ওমা! অতবড় মেয়ে মনে নেই কিছু? আমার তো তিন বছর বয়সের কথাও মনে আছে।'

উজ্জয়িনীরই কি নেই মনে?

সেই হঠাৎ একদিন বাবার হারিয়ে যাওয়ার মর্মান্তিক দুঃখ, দীর্ঘদিন ধরে কি তার কচি মনকে নির্জীব করে রাখেনি?

এক একদিন বলতো, 'দাদা তোর কষ্ট হয় না?'

প্রদ্যোত কড়া গলায় বলতো, 'না হয় না।'

তারপর বড় হয়েছে উজ্জয়িনী, কানাঘুষোয় অনেক কিছু শুনেছে, তার বিধবা ছোটমাসীকেও মামার বাড়িতে আর কোনদিন দেখতে না পেয়ে কতদিন শ্বশুরবাড়ি থাকবে ছোটমাসী' বলে আগে আগে যে ব্যাকুল প্রশ্ন করতো, সে প্রশ্ন থামিয়েছে। আর কতদিন যেন আগে ঘুম থেকে উঠে গলার হারটা কেন খুঁজে পায়নি উজ্জয়িনী, আর না পেয়ে কেঁদে ফেলার সময় মা কেন তার গালে ঠাশ করে একটা চড় বসিয়ে দিয়েছিল, তার উত্তর পেয়েছে নিজের কাছেই।

কিন্তু সে সব কথা এতদিন পরে কেন? কী দরকার ওদের উজ্জয়িনীর বাবার হারিয়ে যাওয়ার অতীত খবরে?

মা দাদা উজ্জয়িনী!

এই ছোট্ট তিনকোণা সংসারটির একটা কোণ ভেঙে নিয়ে যাচ্ছ তোমরা, জানোই তো এটা। আরো বেশী বেশী জানবার ইচ্ছে কেন?

~ www.amarboi.com ~

উজ্জয়িনীর যে কত ইচ্ছে হতো কত কী জানবার, প্রশ্ন করেছে কখনো কাউকে?

কিন্তু আজ তার মনের মধ্যে আকুল প্রশ্ন উত্তাল হয়ে উঠেছে, কী হবে? কী হবে? কতখানি অশুভ? কতখানি অমঙ্গল?

বিয়ের লগ্ন রাত দুপুরে, কেউ এখন তাকে খুঁজছে না। তার বান্ধবীরা সকলেই প্রায় এলোমেলো করে খেয়ে বিদায় নিয়েছে। আস্তে নীচে নেমে এল উজ্জয়িনী।... এদিক ওদিক খুঁজল, দেখল মিষ্টির ভাঁড়ারে মাটিতে বসে আছে মা দেওয়ালে ঠেশ দিয়ে।

এই রস, এই পিঁপড়ে তার মধ্যে মাটিতে।

বকতে যাচ্ছিল, থতমত খেল।

আগুন তো নিভে গেছে অনেকক্ষণ, তবে মার চোখের তারায় তার লাল ছায়া কেন? মুখটা পাথরের মত কেন?

অভিমানের আদুরে গলা ফুটল না, আস্তে ভীরু গলায় বলল, 'মা কী হবে?'

গায়ত্রী চমকে তাকালো, বললো, 'এ কী তুই এখানে কেন?'

উজ্জয়িনী রুদ্ধ গলায় বললো, 'তোমায়' খুঁজে পাচ্ছিলাম না।'

'আমি তো এখানেই আছি।'

'আগুনের সময় দেখতে পেলাম না তোমায়। কোথায় ছিলে?'

গায়ত্রী হাসির মত করে বলে, 'আগুনের মধ্যেই ছিলাম।'

'দাদা? দাদাকেও তো—'

'দাদা?' গায়ত্রী আর একবার তেমনিভাবেই বলে, 'এই তো এতক্ষণ এখানেই ছিল। আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে বিচার করছিল আমার।'

উজ্জয়িনী একথার মানে বুঝতে পারে না। উজ্জয়িনী ভয়ে ভয়ে মার মুখের দিকে তাকায়। মার অনেক সাধ বাসনার এই উৎসব রাত এমন করে বিধ্বস্ত হয়ে যাওয়ায় কি মার মানসিক অসুস্থতা দেখা দিয়েছে?

আস্তে আস্তে সরে গেল।

গায়ত্রী তাকিয়ে দেখল না।

গায়ত্রী আবার দেওয়ালে ঠেশ দিয়ে বসে পড়ল। হয়তো ওইভাবে বসে থাকতে থাকতে ক্লান্তিতে ঘুমিয়েই পড়বে, আর ঘুমিয়ে হাজারটা এলোমেলো স্বপ্ন দেখবে। দেখবে বড় একটা থালায় বহুবিধ সুখাদ্য বোঝাই করে রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলেছে সে, গলি গলি অন্ধকার রাস্তা। যেন অনন্তকাল চলেছে। ফুরোচ্ছে না চলা।

কিন্তু লক্ষ্যটা কী?

খুঁজে পাচ্ছে না তো কই? গায়ত্রী কি তার মেয়ের বিয়ের খাবার অনেক বাড়তি হয়েছে বলে রাস্তার কুকুর খুঁজে বেড়াচ্ছে?

যে কুকুরকে লোকে দূর দূর করে তাড়ায়?

কিন্তু আশ্চর্য রাস্তার কুকুরও এত দুর্লভ? এত অহঙ্কার তার? এক ঘা লাথি খেয়েছে বলে চিরকালের মত হারিয়ে যাবে? আশেপাশে কোথাও ঘুর ঘুর করবে না? গায়ত্রী

~ www.amarboi.com ~

তাই চলতেই থাকবে?

ওই অনন্তকালের যাত্রী থেকে ফিরিয়ে আনলো কে গায়ত্রীকে? পিছন থেকে আকর্ষণ করে?

গায়ত্রীর ছেলে? গায়ত্রীর চিরবন্ধু চির আশ্রয়!

তবে তার মুখটা অমন শত্রুর মত দেখতে লাগছে কেন গায়ত্রীর? সেই মুখে কী বলছে ও 'আগুন আগুন' করে? এ গলা কি গায়ত্রীর ছেলের?

'এছাড়া আর কোনো উপায় তোমার মাথায় এল না মা? আরো তো কত অন্য ঘর ছিল।'

গায়ত্রী বলছে 'অন্য ঘরের দিকে কি সবাই তাকায়?'

বলছে আর নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে চাইছে। কিন্তু গায়ত্রীর ছেলে ছাড়ছে না। রুক্ষগলায় বলছে 'পাগলামী কোরো না! জুতো মেরে গরুদানটা বড্ড হাসির কথা।...কিন্তু ভাবতে পাচ্ছি না মা, পারলে কী করে? কী করে পারলে?'

গায়ত্রীর ছেলের চোখ দিয়ে জল পড়ছে।

গায়ত্রীর সব উল্টোপাল্টা হয়ে যাচ্ছে...সব দুলছে...গায়ত্রীর ছেলের গোলগাল মুখটার আড়াল থেকে একটা কুকুরের মুখের ছাঁচ উঁকি মারছে।...গায়ত্রী ভয় পাচ্ছে, ভয়ানক ভয় পাচ্ছে। গায়ত্রী... দেখতে পাচ্ছে সব কিছুতে আগুন ধরে যাবে। এই আলো, এই হাসি, এই সমারোহ সবকিছুতে। আগুন ধরে যাবে গায়ত্রীর সম্ভ্রমে, গায়ত্রীর মেয়ের ভাগ্যে।

গায়ত্রী তবে ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠবে না কেন?

কিন্তু গায়ত্রীর ছেলে মার ভয় পাওয়াকে করুণা করছে না, করুণা করছে রাস্তায় একটা কুকুরকে। সেই করুণায় চোখ দিয়ে জল পড়ছে ওর।

গায়ত্রীকে প্রশ্ন করছে 'পারলে কী করে?'

এর পরও কেন তবে বেঁচে থাকবে গায়ত্রী?

কেন মরে যাবে না?

নষ্ট হয়ে যাবে এই আয়োজন? তচনচ হয়ে যাবে উজ্জয়িনী নামের মেয়েটার বিয়ে? আর প্রদ্যোত নামের ওই ছেলেটার মুখে চুণকালি পড়বে?

পড়ুক না।

গায়ত্রীর তাতে কী?

ওরা কে? ওরা কি গায়ত্রীর ছেলে মেয়ে? বেশ করবে গায়ত্রী ওদের সব ধ্বংস করে দেবে।... স্বপ্নের জটিল গভীর অরণ্যে ঘুরে ঘুরে এই রকম উল্টোপাল্টা পথ ধরবে হয়তো গায়ত্রী।

অথচ তখনও বাড়িটাকে ঘিরে জ্বলতে থাকবে নীল লাল আলোর মালা। আর তোরণের মাথায় জ্বলতে থাকবে ওই কড়া সাদা আলোটা।

~ www.amarboi.com ~

অক্ষয়ঘট

মুঠোয় চাপা কাগজখানা প্রথমে হাতের উত্তাপে তপ্ত হয়ে উঠেছিল, ক্রমশঃ ভিজতে শুরু করেছে। হঠাৎ আগুন হয়ে ওঠা মাথার রক্তটা এখন ঘাম হয়ে চুঁইয়ে হাতের তালুতে নেমে আসছে স্নায়ু শিরার পথ বেয়ে।

অথচ এই কাগজের টুকরোটা কোনো অকারণ লোকসানের দলিল নয়, অন্যায় শাস্তির নোটিশ নয়, সুন্দর সুদৃশ্য মূল্যবান একখানি নিমন্ত্রণপত্র। পত্রের মাথার উপর শাঁখের ছাপ আছে, প্রজাপতিকে প্রণাম আছে।

এ চিঠি বিরামের মাথার রক্তে আগুন ধরিয়ে দিল কেন? কেউ আগ্রহের মুখ নিয়ে বাড়ি এসে নিমন্ত্রণ করে যায় নি বলে? পোস্টে পাঠিয়ে দায় সেরেছে বলে? নিমন্ত্রণ তাই অপমানের মূর্তিতে দেখা দিয়েছে?

কিন্তু চিঠির নীচে বিনীত নিমন্ত্রণ-কর্তার এই নামটা কার নাম? যিনি সবিনয়ে 'পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণের ত্রুটি মার্জনা' করবার অনুরোধ জানিয়েছেন? এতো বিরাম সেনেরই নাম।

হ্যাঁ, যে বিরাম সেন ওই সুদৃশ্য চিঠিটাকে মুঠোয় চেপে পিষে কুদৃশ্য করে ফেলেছে। তারই নাম রয়েছে তলায়। আগামী কোনো একটি তারিখে তাঁর কন্যা কল্যাণীয়া শুভার শুভ পরিণয় উপলক্ষ্যে সকলকে সবান্ধবে আসবার আমন্ত্রণ জানিয়েছে ভদ্রলোক চূড়ান্ত বিনয়ের ভাষায়।

নিমন্ত্রণ-কর্তার হাত দিয়েও আসে নি, পোস্টেও আসে নি, চিঠিটা এসেছে এক বন্ধুর দ্বারা বাহিত হয়ে। তা' 'বন্ধু'ই বলতে হবে বৈকি। বিরাম সেনের অজ্ঞাতসারে শত্রুপক্ষ তার নাম ভাঙিয়ে খাচ্ছে, এ খবরটা জ্ঞাত করতে হবে না তাকে? যে লোক সে কাজের ভার নিয়েছে, অবশ্যই তাকে বন্ধু বলা উচিত।

সেই নাম ভাঙানোর খবর পেয়ে, বিরামের যদি মাথার রক্ত আগুন হয়ে ওঠে, আর ক্রমশঃ সে রক্ত ঘাম হয়ে চুঁইয়ে নেমে আসে স্নায়ু শিরার পথে, তার জন্যে বন্ধু দায়ী নয়!

বন্ধু থাকেওনি প্রতিক্রিয়াটা দেখতে। সে শুধু ওই খামখানা বিরামের চৌকীর উপর ফেলে দিয়ে বলেছিল, 'একখানা নেমন্তন্নর চিঠি হাতে এল, বুঝতে পারলাম না তুমি জানো কিনা? জানিয়েছিলেন তোমায় অজন্তা সেন?'

বিরাম চিঠিখানার দিকে তাকিয়ে দেখেছিল, সঙ্গে সঙ্গে থার্মোমিটারে জ্বর ওঠার মতো চড়াৎ করে দেহের সব রক্ত মাথায় পৌঁছে গিয়েছিল তার। আর তারপর ভয়ঙ্কর একটা অভদ্রতা করে বসেছিল বিরাম। বলেছিল, 'শৈলেন তুমি এখন যাও! আমাকে একটু একটা থাকতে দাও!'

~ www.amarboi.com ~

একা থাকতে চাইলো বিরাম?

কিন্তু একাই তো থাকে সে।

তার নিঃসঙ্গ জীবনের শূন্যতার মাঝখানে বন্ধু দু'চারজন যারা আসে, বিরাম জানে তারা করুণার মন নিয়ে আসে। করুণা দিয়ে ভরাট করতে চেষ্টা করে বিরামের অনন্ত শূন্যতাকে। বুঝতে পারে না সেই করুণা যন্ত্রণা হয়ে এসে দেখা দেয় বিরামের কাছে। ওরা কেউ এলেই বিরামের বলতে ইচ্ছে করে, 'তোমারা এখন যাও ভাই, আমাকে একটু একা থাকতে দাও।'

তবু বলতে পারে না।

যতই হোক চিরদিনের সামাজিক মন ও-কথা বলতে কুণ্ঠিত হয়, চিরদিনের ভালোবাসার মন ও-কথা উচ্চারণ করতে ব্যথা পায়।

কিন্তু আজ বললো বিরাম তার সবচেয়ে বড় বন্ধুকে, 'তুমি এখন যাও ভাই।'

শৈলেন ওর দিকে করুণা আর মমতায় ভরা যে দৃষ্টিপাত করে গেল, সে দৃষ্টি বিরাম দেখতে পায় নি, বিরাম তখন অতীতের একটা নাটকীয় দৃশ্যে নিমজ্জিত হয়ে গিয়েছিল। সে দৃশ্যে একটা দুর্বিনীত স্ত্রী তার স্বামীকে বলছে, 'কেন? কেন? আমি একটা নির্লজ্জ দারিদ্র্যের মূর্তি নিয়ে তোমার এই ফুটো নৌকোয় বসে তলিয়ে যাবার অপেক্ষায় দিন গুনবো? আমি কি খারাপ হতে যাচ্ছি? আমার মধ্যে যে ক্ষমতা রয়েছে, সে-ক্ষমতাকে ব্যবহার করে তলিয়ে যাবার হাত থেকে রক্ষা পেতে চাইছি শুধু। তাতে তো শুধু আমিই রক্ষা পাবো না, তুমিও পাবে।'

নাটকের নায়ক হেসে উঠলো।

নিষ্ঠুর ব্যঙ্গের হাসি।

'লোভ দেখাতে এসেছ? ঘুষ দিতে চাইছ? ঘুষ যদি নিতে পারতাম, এই ফুটো নৌকো ভরা জাহাজ হয়ে উঠতো বুঝলে? যেখানে বসে কাজ করি, তার চারিদিকে টাকা ছড়ানো—'

নায়িকাও ওর মতোই ব্যঙ্গ হাসি হাসছে, 'ও, তাই নাকি? তা আমায় কিছুদিন তোমার জায়গায় বসতে দাও না গো? দু'দশ মুঠো কুড়িয়ে নিয়ে এসে জোড়া কতক শাড়ি কিনে নিই, গোটা কতক ব্লাউস! জোড়া দুই চটি। মণ কতক চাল ডালও কিনে রাখি ভাঁড়ারে—'

নায়ক উষ্ণ হচ্ছে।

নায়ক তীব্র হচ্ছে। বলছে, 'সে ভাঁড়ারের মাল অবশ্য একা তোমারই ভোগে লাগবে।'

দুর্বিনীতা আবারও হাসছে, কটু কুৎসিত নির্লজ্জ। বলছে, 'ওহো হো, তুমি যে আবার নীতিবাগীশ মহাপুরুষ! স্ত্রীর সৎ উপার্জনের টাকা খেতেই তোমার মাথা কাটা যায়, তা আবার ঘুষের টাকা।'

নায়ক দৃঢ় গলায় উত্তর দিল, 'স্ত্রীর সৎ উপার্জনের টাকা হলে মাথা কাটা যেতনা, দেহ-'ভঙ্গী' দেখিয়ে যে উপার্জন, আমি তাকে অসৎ বলি ; ঘৃণা করি।'

~ www.amarboi.com ~

'দেহ-ভঙ্গী! দেহ বিক্রী তো নয়।' অসভ্য নির্লজ্জ নায়িকা তার মুক্তোর মতো দাঁতে হায়েনার হাসি হেসে বলে, 'তাতেই এত শুচিবাই? বেশ তো তুমি নিও না ও টাকা, আমি আর শুভা শুধু, শুভাকে আমি বাঁচাতে চাই! তোমার ওই শুচিবাইকে আমি পাপ মনে করি। একটা সন্তানকে উচিতমতো খেতে পরতে দেবার ক্ষমতা যে বাপের নেই, তার অত পুণ্যের বিলাসিতা শোভা পায় না।'

বিরাম দেখতে পাচ্ছে নায়ক গর্জন করছে, 'ও সব শেখা বুলি ছাড়ো। আমার মেয়ে না খেতে পেয়ে মরে তাও ভালো, মার থিয়েটার করা টাকায় বাঁচার দরকার নেই তার।'

'কী? কী বললে?'

'ওইতো বললাম, থিয়েটার করা হবে না তোমার।'

'আর আমি যদি বলি আমি করবই!'

'তাহলে আমি স্বামীর অধিকার প্রয়োগ করতে বাধ্য হবো। যেখানে কন্ট্রাক্ট করে এসেছো, সেখানে গিয়ে বলে আসবো দুটো রিক্রিয়েশন ক্লাবে শখ করে যোগ দিয়েছে বলে—পেশাদার অভিনেত্রী নয় অজন্তা সেন। আমি তার স্বামী আমার এতে আপত্তি আছে। আপনারা ভুলিয়ে ভালিয়ে কন্ট্রাক্টে সই করিয়ে নিয়েছেন বলে নালিশ তুলব আমি।'

নায়িকা যেন একটা কৌতুককাহিনী শুনছিল ধৈর্য ধরে হেসে ফেটে পড়বার অপেক্ষায়। এবার ফেটে পড়লো। বললো, 'ভুলিয়ে ভালিয়ে? ভুলিয়ে-ভালিয়ে?' তারপর কঠিন হলো। বললো, 'তোমরা ভাবো কি বলতো? আমাদের কোনো সম্মান নেই, মর্যাদা নেই, অধিকার নেই? মনে রেখো স্বামীর আপত্তি তখনই শোভা পায়, যখন স্বামী স্বামীর কর্তব্য পালন করতে পারে। আটকে রাখার মতো মজবুত ঘর দিতে পারলে, তবে ঘরে আটকে রাখার কথা মুখে আনা শোভন। বাজে প্রেজুডিস নিয়ে মাথা ঘামিও না। অভিনয় করলেই খারাপ হয়ে যায় এই ভুল ধারণাটা ছাড়ো।'

নায়কের রগের শির দপদপ করছে। তবু নায়ক এবার শান্ত দৃঢ় গলায় বলল, 'তার থেকে তুমিই বরং এই কুঁড়ে ঘরটাকে ছাড়ো। এখানে যখন আটকে রাখার মত কংক্রীটের দেওয়াল নেই, তখন আর সেই হাস্যকর কথা তুলব না।'

দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে চলে যাচ্ছে বিরাম। দেখছে নায়ক তার স্ত্রীকে ছাড়লো, তবু কুসংস্কারকে ছাড়লো না। ভাবতে পারলো না, 'হলেই বা! করছে তো আজকাল অনেকেই।' ভাবলো না 'সত্যিই তো, নৌকো তো ডুবতে বসেছে। দেখিনা একবার দু'জনে মিলে লগি ঠেলে।'

ও সেই তার বোকাটে আর সেকেলে কুসংস্কারের জেদ নিয়ে বললো, 'থিয়েটার করলে খারাপ হয়ে যায় এ ধারণাকে ভুল বলে মনে করি না আমি। ইতিমধ্যেই হয়েছো কিনা তাই বা কে জানে। কোনো সতী স্ত্রীলোক এভাবে অধঃপাতের পথে যাবার জন্যে কোমর বেঁধে ঝগড়া করতে পারে কিনা এটা সন্দেহের বিষয়।'

~ www.amarboi.com ~

নায়িকা সেইদিন ঘর ছাড়লো।

অবশ্য ব্যাপার সহজে মিটলো না।

চার বছরের মেয়েটাকে নিয়ে কাড়াকাড়ির লড়াই চললো কিছুদিন। কিন্তু কোর্ট মেয়েটাকে মায়ের হাতেই সমর্পণ করলো। কারণ নায়িকা কোর্টে দাঁড়িয়ে বললো, 'ও মেয়ে যে বিরাম সেনের, প্রমাণ করুক বিরাম সেন সে কথা। সামান্য একটু মতান্তরে কেউ স্ত্রী ত্যাগ করে কিনা, তাই ভাবুন মাননীয় বিচারক।'

হ্যাঁ, এমনি করেই নিজেই মুখে চুণ কালি মাখিয়েছিল ওই উদ্ধত অসভ্য নায়িকা।

তারপর সে নাটকে যবনিকা পড়েছিল। বিরাম সেন প্রমাণ করতে যায়নি মেয়েটা ওর নিজের কিনা। চেষ্টাই করেনি। চলে এসেছিল।

প্রথমে এক দূর সম্পর্কের বিধবা দিদির বাড়িতে থেকেছে অজন্তা, তারপর পালা বদল হয়েছে। সেই বিধবা দিদিটিই এখন অজন্তার বাড়িতে থাকেন। অনেক পয়সা হয়েছে এখন অজন্তার, বাড়ি একখানা কিনে ফেলে নিজেই গুছিয়ে বসেছে সেই বাড়িতে।

অজন্তার নিজের ভাই ভাজ অজন্তাকে ত্যাগ দিয়েছে কিন্তু অন্য আত্মীয়রা তা দেয়নি। কৌতূহলে পড়ে যাওয়া আসা করে কেউ কেউ, কেউ বা থিয়েটারের পাশ পাবার আশায় যোগাযোগটা রেখেছে। শুধু থিয়েটারই বা কেন, সিনেমারও।

মঞ্চাভিনেত্রী অজন্তা দেবীর তো এখন পর্দাতেও প্রবল চাহিদা। হ্যাঁ, অজন্তা আর সেন নেই, দেবী হয়ে গেছে।

কিন্তু অজন্তা কি সত্যিই 'ভালো' আছে এখনও? তার প্রাক্তন স্বামী বিরাম সেনের ধারণা সত্যিই ভুল? তা' যদি হয় তবে ওর বাড়িতে ওই রূপবান পুরুষটি কে? যে নাকি অজন্তা দেবীর সংসারের কর্ণধার। ঐশ্বর্য মানেই তো ঝঞ্ঝাট। অজন্তার ঐশ্বর্য হয়েছে কাজেই ঝঞ্ঝাটও অনেক হয়েছে। সবই তো দেখে শোনে ওই ভদ্রলোক।

কেন?

কিসের দায়ে?

বিনা দায়ে কে কার করে? আর প্রেমের দায়ের বড়ো দায় আর কি আছে?

অজন্তা কি তবে বিরাম সেনের উপর প্রতিশোধ নিয়েছে? ভেবেছে কলঙ্কই যদি কিনতে হলো তবে আর সেটা 'অকারণ' রাখবো কেন? ভেবেছে মাননীয় সমাজ যদি আমায় বিনাদোষেই ত্যাগ করে, আমি তবে আর সমাজের পা জড়িয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকবো কেন?

জীবনকে তাই আবার নতুন ছকে সাজিয়েছে অজন্তা?

অজন্তার কথা অজন্তাই জানে।

তবে লোকে জানে অজন্তার বাড়িতে যে রূপবান পুরুষটি বাস করে, সে অজন্তার আত্মীয় সমাজের কেউ নয়। যারা অজন্তার সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছে তারা তো জানেই, যারা যোগাযোগ রাখেনি তারাই কি জানে না?

~ www.amarboi.com ~

যদি না জানবে, তবে আর বিরাম সেনের মাথার রক্ত ঘাম হয়ে গলে গলে নেমে আসছে কেন দেহের প্রতিটি স্নায়ু শিরার পথ বেয়ে?

কেন? কেন? কেন অজন্তা দেবী তার মেয়ের বিয়ের নিমন্ত্রণ পত্রে মেয়ের বাপের পরিচয়ে বিরাম সেনের নাম ব্যবহার করেছে! কোন্ স্পর্ধায়? কোন্ দুঃসাহসে?

বিরাম সেন নামের লোকটা তার কন্যা কল্যাণীয়া শুভার শুভবিবাহে' বন্ধু কুটুম্ব আত্মীয়দের আহ্বান করছে অজন্তা দেবীর নিউ আলিপুরের বাড়িতে!

কেস করবো আমি ওর নামে!

জেল খাটাবো ওকে।

সম্মানহানির অভিযোগ আনবো!

ওর মেয়ের বিয়ের ঘটা ঘুচিয়ে দেব!

ওকে আমি দেখে নেব।

পাগলের মতো অনেক কিছু ভাবতে থাকে বিরাম দ্রুত পায়চারি করতে করতে। অজন্তার ধৃষ্টতার পরিমাপ করতে পারছে না বিরাম, তাই ব্যালেন্স হারাচ্ছে।

কী করে এত সাহস হলো ওর?

কী করে?

পয়সার জোরে?

পয়সার জোরে বুকের পাটা এত বাড়ে মানুষের? ভয়ঙ্কর এই দুঃসহ স্পর্ধার কাছে এখুনি ছুটে যেতে ইচ্ছে করে বিরামের। বিরাম কি এ্যাসিড্ বাল্ব নিয়ে যাবে পকেটে ভরে? ছুঁড়ে মারবে সুন্দরী অভিনেত্রী অজন্তা দেবীর কমলদল সদৃশ মুখের উপর? চিরদিনের মত অহঙ্কার ঘুচে যায় যাতে!

খুনই চাপে বিরামের।

তবু নিজেকে সামলায়। না, এখুনি যাওয়া হবে না। যেতে হবে সেই বিবাহ রজনীর রাজকীয় সমারোহের আসরে। অজন্তা দেবীর গণ্যমান্য অতিথিদের সামনে কৈফিয়ৎ তলব করবে 'কোন্ স্পর্ধায় তুমি তোমার ওই কৃমি কীট অবৈধ কন্যার পিতার নাম হিসেবে আমার নাম ব্যবহার করেছ? কৈফিয়ৎ দাও।'

বেশ একখানা 'সিন' হবে।

হিংস্র একটা হাসি ফুটে ওঠে বিরামের মুখে। সেই ঠিক হবে। উৎসব করা ঘুচে যাবে শ্রীমতী অজন্তাদেবীর। সমারোহ করছেন বৈকি। খুবই করছেন। এই নিমন্ত্রণ পত্রটাতেই যা খচর হয়েছে কোননা বিরাম সেনের এক মাসের মাইনে।

যত ভাবে খুন আরো চেপে ওঠে। এখুনি গিয়ে ভয়ঙ্কর বীভৎস কিছু করে ফেলতে ইচ্ছে করে। তবু ধৈর্য ধরতে হবে। একটা 'সিন' এর প্রলোভন ত্যাগ করতে পারে না বিরাম।

কতক্ষণ ধরতে হবে ধৈর্য?

~ www.amarboi.com ~

গুলি পাকানো কাগজটা আবার খুলে ধরে বিরাম! তখন তো তারিখ দেখেনি। দেখতে পায় নি। এখন তারিখটা মিলিয়ে দেখে। দেখল আগামী কালই সন্ধ্যায় শেষ হবে ধৈর্যের পরীক্ষা।

পরদিন আবার এল বন্ধু শৈলেন।

বলল, 'তারপর? মেয়ের বিয়ের বরকর্তা হয়ে যাচ্ছ তাহলে?'

বিরাম একটা অদ্ভুত হাসি হেসে বলল, 'যাচ্ছি।'

শৈলেন অবশ্য ব্যঙ্গ করেই বলেছিল, অতএব উত্তরটাও ব্যঙ্গই ভাবলো। এরপর করুণায় কোমল হলো সে। বললো, 'বাস্তবিক কাল থেকে শুধু এই কথাটাই ভাবছি। পয়সা হলে দুঃসাহস কত বাড়তে পারে মানুষের। মিসেসকেও খুব শুনিয়ে দিলাম। বললাম তোমরা মেয়েমানুষরা না পারো এমন কাজ নেই।'

হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ালো বিরাম, আর ওর সবচেয়ে নিকট বন্ধুকে ভয়ানক একটা বিস্ময়ের ইঁট মারলো। বললো, 'পয়সা না হলেও দুঃসাহস বাড়তে পারে শৈলেন। আমার পয়সা হয়নি, তবু দেখ দুঃসাহস করে বলছি—তুমি আমার সামনে থেকে চলে যাও। তোমাকে দেখতে আমার খারাপ লাগছে, তোমার কথা শুনতে ঘেন্না করছে।'

বন্ধু এই ইঁটের ঘা টায় প্রথমে থতমত খেল, তারপর শুধু বললো, 'ওঃ।'

তারপর তীরবেগে বেরিয়ে গেল।

বিরাম একটা উল্লাসের হাসি হাসলো। শিকার করে শিকারী যে হাসি হাসে, সেই হাসি। মহলা দেওয়া হল। আঘাত দিতে পারে কিনা বিরাম, আর কতটা পারে তার পরীক্ষা হলো কিছু।

এখন শুধু ঘণ্টা মিনিট সেকেণ্ডের গণনা।

অবশেষে এল সেই প্রতীক্ষিত সন্ধ্যা।

ঘাড় ছেঁড়া একটা টুইল সার্ট পরে নিল বিরাম। আধময়লা একটা ধুতি।

এই তার যুদ্ধসাজ।

এ্যাসিড বাল্‌ব?

না, সেটা আর হয়ে উঠল না। বিরাম জানে না কোথায় পাওয়া যায় সে বস্তু। বিরামরা কেউ কি জানে? ওরা জানে রক্তে যখন আগুন ধরে যায় তখন বিষের জ্বালা মাখানো কথা দিয়ে সে আগুনকে ঠাণ্ডা করতে হয়।

তাই ওর স্ত্রী যখন ওর প্রাণটা ছিঁড়ে প্রাণের পুতুল মেয়েটাকে কেড়ে নিয়ে চলে গেল কেবলমাত্র অসভ্যতার জোরে, তখন শুধু জলন্ত ভাষায় গাল পাড়ল তাকে। খুঁজতে গেল না কোন দোকানে এ্যাসিড বাল্‌ব পাওয়া যায়। কোন দোকানে মানুষ খুন করে ফেলতে পারার মত ছোরা।

~ www.amarboi.com ~

কাগজে কাগজে অজন্তা দেবীর ছবি বেরোয়। তাই বাড়িতে কোনো কাগজ আনে না বিরাম। দৈবাৎ যদি কোনো পথ ধরে এসে যায় সে ছবি, দোকানের ঠোঙা হয়ে, কি অমনি আরো কিছু হয়ে, মাটিতে ফেলে জুতোর তলায় পেষে বিরাম। কাদামাখা জুতো ঘষে ঘষে মুখটা ক্লেদাক্ত করে দেয়, এর বেশি ক্ষমতা নেই বিরাম সেনের। সরকারি দপ্তরখানার ক্ষুদ্রতম একটি চেয়ারে বসে জীবন কাটাতে কাটাতে আর সব ক্ষমতাই হারিয়েছে বিরাম সেন।

শুধু জিভ আছে।

যাদের কিছু থাকে না, তাদেরই ওটা বেশিমাত্রায় থাকে। বিরামেরও আছে। সে জিভে কাঁটা আছে, বিষ আছে, আগুন আছে।

সেই জিভকে শানিয়ে নিয়েই অজন্তা দেবীর নিউ আলিপুরের বাড়ির ঠিকানার উদ্দেশ্যে যাত্রা করল বিরাম।

বিয়ে তখন হয়ে গেছে। বরকনে বাসরে বসেছে।

গোধূলি লগ্নে বিয়ে, এটা চিঠিতে উল্লেখ ছিল না। তাহলে হয়তো আরো আগে আসতো বিরাম। বরকর্তার সামনে গিয়ে জিভের সেই বিষ আগুন কাঁটা সব অস্ত্রগুলো বার করতো। দেখা যেত মেয়ের বিয়ে দিয়ে কেমন করে মেয়ে জামাই ঘরে তুলতেন অজন্তা দেবী।

চুপি চুপি মোটা টাকার ঘুষ খেয়ে অনেক বরকর্তা নীতি হারাতে পারে কিন্তু এতগুলো লোকের সামনে যদি কেউ গিয়ে বলে ওঠে, 'কী মশাই, আপনার ভাবী পুত্রবধূর এই বিনয়াবনত পিতাটি কে? এই বিরাম সেন? সঠিক জানেন আপনি ওর পিতৃরহস্য? অজন্তা দেবী যেটিকে তাঁর প্রাক্তন স্বামীর সম্পত্তি বলে ছাপার হরফে ঘোষণা করেছেন, বাজিয়ে নিয়েছেন সেটিকে?' তখন? তখন লোকলজ্জায় সেই লোক নিশ্চয়ই রাগ দেখাবে। বলবে 'সে কি? জানতাম না তো?' নিশ্চয়ই বলবে 'বর উঠিয়ে নিয়ে যাব।'

বিয়েটা গোধূলি লগ্নে হয়ে গিয়ে সেই 'সিন'টা থেকে বঞ্চিত হলো বিরাম।

আসর থেকে 'সিন করে' বিদায় নিলে হয়তো অজন্তা দেবীর সঙ্গে দেখা হতো না। বাসরে ঢুকলে সেটা হবে। বিষবাণ ছুঁড়ে আসবার সুযোগ পাওয়া যাবে।

বাসরেই ঢুকে এল বিরাম। সমারোহটা সত্যিই রাজকীয় হচ্ছে।

যত আলো তত বাহার, তত লোক। দামী দামী লোক তবু বাসরে চলে আসবার অনুমতি পেয়ে গেল সে। ছেঁড়া টুইল সার্টের যুদ্ধসাজ নিয়েও। কেউ যদি বলে, 'বরকনেকে একটু আশীর্বাদ করবো—' কে আর বারণ করবে বয়স্ক একটা ভদ্রলোককে? বড়লোকের বিয়ের আসরে এক আধটা এমন গরীব আত্মীয় আসে বৈকি। ক্ষ্যামা ঘেন্না করে মেনেই নিতে হয় তাকে। বিরামকেও নিল।

~ www.amarboi.com ~

একটা হাস্যে লাস্যে ললিতা মেয়ে মুচকে হেসে বললো, 'চলুন দোতলায়।'

তার পিছু পিছু উঠলো বিরাম।

দরজার দিকে মুখ করে বসানো হয়েছে বরকনেকে। চিরন্তন সজ্জায়। কান্তিমান মাল্যচন্দন শোভিত তরুণ। বরের বামে লাল বেনারসী মোড়া কিশোরী কনে। আপাদ মস্তক ঝলমলে ঝকঝকে!

স্বর্গের দ্যুতিমাখা ওই সুখের অধিকারিণীর নাম শুভা?

যে শুভা একদা একটা ছোট্ট মেয়ের মূর্তি ধরে ছেঁড়া ফ্রক পরে বিরামের ঘরে ঘুরে বেড়াতো? বিরামের গায়ে হাত চাপড়ে চাপড়ে ডাকতো 'বাবা বাবা।' কথা শিখে বলতো, 'বাবা তুমি রোজ রোজ অফিস যাও কেন? তুমি না থাকলে আমার বিচ্ছিরি লাগে।'

কতক্ষণ বিহ্বল হয়ে তাকিয়ে ছিল বিরাম?

যে মেয়েটা সঙ্গে এসেছিল, সে যে অস্বস্তি বোধ করছে তা কি মনে পড়ছে না ওর? বুঝতে পারছে না বর আর কনে দু'জনের দু'জোড়া চোখ কেমন একটা বিস্ময় দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছে দরজায় স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ওই পাথরের মতো মানুষটার দিকে।

কিন্তু দু'জনের দৃষ্টি কি একই বিস্ময়ের?

হঠাৎ একটা ভীত বিস্মিত কণ্ঠ বেজে উঠল পাশের দরজায়, 'কে? কে আবার ওপরে উঠে এসেছে? কি, বলছে কি? না জেনে শুনে কেন যে তোরা—'

তারপর সে কণ্ঠ থেমে গেল। সমস্ত মানুষটা এক জোড়া চোখ হয়ে গেল শুধু। তারপর অস্ফুট গলায় বললো, 'তুমি!'

অনন্তকাল পার হয়ে গেল।

সেই চোখ আবার কথা কয়ে উঠলো, 'তুমি এসেছো তোমার শুভাকে আশীর্বাদ করতে?'

বিরাম সেনের সেই জিভ কি হারিয়ে গেল?

মহামুহূর্তে কর্ণের যেমন রথের চাকা বসে গিয়েছিল? অর্জুনের গাণ্ডীব তূণ শূন্য হয়ে গিয়েছিল?

তাই বিরাম সেন শুধু বললো, 'এলাম।'

'তবে এসো।'

পথ ছেড়ে দিল অনেকগুলো বিস্মিত বিহ্বল মেয়ে। ছেঁড়া টুইল শার্ট পরা বিরাম সেন বর-কনের সামনে রাখা ধান দুর্বোর রেকাবী থেকে তুলে নিল দু'কণা ধান-দুর্বো কাঁপা কাঁপা হাতে। সেই হাতটা রাখলো কনের আনত মাথায় মুকুট ছাড়িয়ে চুলের উপর। হাতটা আরো বেশি কাঁপতে লাগলো, তার সঙ্গে রোগা রোগা পা দুটো।

~ www.amarboi.com ~

দৃষ্টিভঙ্গী

কী গো মা, তোমার সেই মহান রাঙাদাদার চিঠি এলো?
সোমা চুল আঁচড়াচ্ছিল, চিরুণীটা আরো জোরে জোরে চালিয়ে একটু ব্যাঙ্গ হাসি হেসে বলল, জানতাম! 'সিওর' ছিলাম আসবে না।

মুখটা ফিরিয়ে বলল, দাদা দেখলি?

বিভু জানলার ধারে দাঁড়িয়ে। মুখটা শুকনো, চুলটা অগোছালো, চোখ দুটোয় একটা তীব্রতা। গালে বোধহয় দু'দিনের না কামানো দাড়ির কালচে ছাপ।

জানলার বাইরের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে উদাস গলায় বলল, দেখলাম।

অমলা মলিন মলিন মুখে বলল, কি জানি, চিঠিটা ঠিকমত পৌঁছলো কিনা!

কেন? ঠিকমত না পৌঁছবে কেন?

সোমার প্রশ্নের ভঙ্গী তীক্ষ্ণ, পাছে ভুল হয় বলে নিজে ধরে ধরে মুক্তোর অক্ষরে ঠিকানাটি তো লিখলে মা জননী!

কথাটা সত্যি। সেইভাবেই অমলা তাঁর 'রাঙাদা'কে লেখা চিঠিটায় নিজে ঠিকানা লিখেছিল। চিঠি লেখার পাট খুব বেশী নেই অমলার, তবু যা লেখেটেখে, তাতে ঠিকানাটা সোমা কি বিভু লিখে দেয়।

অমলার এ সম্পর্কে উক্তি, বরং দশখানা চিঠি লিখতে পারি, ঠিকানা লেখা বাবা আমার বাঘ। কিন্তু এই স্পেশাল চিঠিটি অমলা বাঘের ভয় তুচ্ছ করে নিজে ঠিকানা লিখেছে। ওদের হাতে দিতে সাহস করেনি। সোমার সব বিষয়েই কাজে যা তাচ্ছিল্য, হয়তো এমন হড়বড়িয়ে লিখবে যে, পিয়ন ঠিক মত পড়তেই পারবে না। কোন্ বাড়িতে দিতে কোন্ বাড়িতে দিয়ে বসবে। বিভুও সোমার থেকে খুব একটা উঁচুদরের নয়, তাচ্ছিল্য না থাক্ স্বভাবটাই অগোছালো। হয়তো কোনো একটা অংশ লিখতেই ভুলে গেল।

অতএব নিজেই ধরে ধরে সুন্দর করে লিখেছিল। আর লেখার পর একটু গর্ব গর্ব হাসি হেসে বলেছিল, খামটা হাতে নেওয়া মাত্রই রাঙাদা ধরতে পারবে, কার চিঠি। বলতে গেলে এ লেখা তো রাঙাদার কাছেই শেখা। হাতের লেখা সুন্দর হবার ব্যাপারে ভারী ঝোঁক ছিল রাঙাদার। যখনই মামার বাড়ি যেতাম, দিদিকে আর আমাকে নিয়ে পড়তো। এই যে 'জ্যোতির্ময়ের' 'জে', এ আমার একেবারে ধীরে ধীরে পরিপাটি করতে শিখিয়েছে রাঙাদা।

অতঃপর চিঠি পোষ্ট করে দেবার পর রাঙাদার অনেক গল্পই করতে লেগেছিল অমলা। ...রাঙাদার তাসের ম্যাজিক দেখানো, রাঙাদার হাত দেখে ভূত ভবিষ্যৎ বলার

~ www.amarboi.com ~

ক্ষমতা, মজাদার সব গল্প বলা ইংরিজি বই থেকে, আর তার সঙ্গে সেই অল্প বয়েস থেকেই রাঙাদার দয়াদাক্ষিণ্য, মহানুভবতা, সহানুভূতিপ্রবণ মন, ইত্যাদির নানা কাহিনী শুনিয়েছে ছেলেমেয়েকে।

তারা মন দিয়ে শুনছে কি না, খেয়ালও করে নি।

আসল কথা ছেলেবেলার স্মৃতি একবার উথলে উঠলে তাকে সামলানো শক্ত। ঢেউয়ের মত একটার পর একটা এসে ধাক্কা মারে।...

অতঃপর দিন গোনা উত্তরের প্রতীক্ষায়।

প্রথমে অবশ্য কলকাতা থেকে রাঁচীতে চিঠি পৌঁছনোর আর তার উত্তর আসার একটা সহজ হিসেব কষে, উল্লসিত প্রতীক্ষা। তারপর শক্ত হিসেবে এসে পড়তে হয়েছে...এখানে, আর সেখানের চিঠি এখানে আসতে যেতে দেরী হওয়ার কী কী কারণ ঘটতে পারে, অর্থাৎ ঘটা সম্ভব, তার একটা আনুমানিক হিসেবের খশড়া ধরে দেয় অমলা ছেলেমেয়েদের কাছে। আর তারও পরে ভাবার পালা থাকে প্রাপকের স্বাস্থ্য তবিয়ৎ ঠিক আছে কি না।

কিন্তু এতোটা গুরুত্ব পাচ্ছে—কিসের এই চিঠি!

তা'হলে সেই সেদিনের কথাটা বলতে হয়। বি.ই. পাশ করেও বেশ কিছুদিন বেকার বসে থাকা বিভুর বহু দরখাস্তর বিপরীতে হঠাৎ একটা বিশেষ লোভনীয় অফার এসে গেছে ব্যাঙালোর থেকে। কিন্তু একটি তীক্ষ্ণ কাঁটা সমেত। চাকরী 'ভবিষ্যৎ যুক্ত' শুধু নগদ পাঁচটি হাজার ডিপজিট রাখতে হবে।

তার মানে যাকে বলে ভাগ্যের পরিহাস।

পাঁচশো টাকা বার করাই যে সংসারে আকাশ কুসুম স্বপ্নের অগোচর, সে সংসারে পাঁচহাজারের প্রশ্ন।

ইনটারভিউ লেটারটা ছিঁড়ে ফেলতে যাচ্ছিল বিভু, অমলা হাঁ হাঁ করে নিবৃত্ত করল।

ওরা যখন ভাড়া দিচ্ছে, তখন 'ইনটারভিউটা' দিবি না কেন? না হয় পরের পয়সায় বেড়িয়েই এলি ব্যাঙালোর?

ছেঁড়েনি অবশ্য বিভু, তবে বিরক্ত হয়ে বলেছিল, আর যদি অ্যাপয়ন্টমেন্ট লেটার দিয়ে দেয়? তখন? তখন কী বলব?

হ্যাঁ, অমনি ইনটারভিউ দিলেই চাকরী হয়ে যাবে!

অমলার দুর্বল প্রতিবাদ।

বিভু বলেছিল, হবার চান্স নাইন্‌টি পারসেন্ট।...ওরা যে কোয়ালিফিকেশান চেয়েছে, তোমার ছেলে তার থেকে অনেক বেশী কোয়ালিফায়েড, বুঝলে মা?

সেই সময় হঠাৎ দুম করে বলে বসেছিল অমলা, আচ্ছা, যদি চাকরীটা হয়েই যায় আমি তোকে ওই জমা দেবার টাকাটা জোগাড় করে দেব।

তুমি?

~ www.amarboi.com ~

হো হো করে হেসে উঠেছিল বিভু। সঙ্গে সঙ্গে সোমাও। বলেছিল, মা বুঝি লুকিয়ে লটারীর টিকিট কিনেছিলে? ফার্স্ট প্রাইজ উঠেছে তোমার নামে? সেই বলে বলীয়ান হয়ে—এতোখানি প্রমিস?

বলেছিল আরো অনেক মজা করে করে।

ওরে দাদা, তা হলে বোধহয় মা'র বিবাহপণে বাবার দেওয়া গহনা কিছু স্টকে আছে।

অমলা নিশ্বাস ফেলেছিল।

তা যদি রাখতে পারা যেত!

অনেক না হলেও, সেকালের রীতিতে 'গা সাজানো' গহনা তো দিয়েছিলেন বাবা। তার কিছুই তো অবশিষ্ট নেই।

অসময়ে স্বামী গেছেন, ছেলেকে এঞ্জিনীয়ারিং পড়াবার দুরূহ দায় মাথায় নিয়ে লড়াই করে গেছে অমলা। আপনজনেদের কাছে সাহায্যের জন্য হাত পাতাও চলে না। বিভুর হিতৈষী মামা কাকা যেমন-তেমন একটা চাকরী জুটিয়ে দিতে চেয়েছিল হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ করা ছেলেটাকে। আর অমলাকে সুপরামর্শ দিতে এসেছিল, বামন হয়ে চাঁদে হাত দেবার চেষ্টা না করতে। অমলা তো নেয়নি সেই হিতকথা। তবে?

এখন অমলার মনটা হায় হায় করে।

বত্রিশভরি সোনা দিয়েছিলেন বাবা, তার থেকে একজোড়া বালা শুধু রেখেছিল সোমার বিয়ের কথা ভেবে, তাও গেছে। তখন অবশ্য ভেবেছিল, ষাট টাকা ভরির সোনা তিনশো টাকায় বেচছি, কম লাভ নয়। ওটাই সান্ত্বনা।...কিন্তু এখন মনে হলো—ইস্, সেই সাড়ে চার ভরির 'কঙ্কণ' ডিজাইনের বালাটাও যদি এতোদিন পর্যন্ত রক্ষা করে আসতে পারতো অনায়াসেই বর্তমানের এই সমস্যাটার সহজ সমাধান হয়ে যেতো।

একা একা অনেক সময় উধাও হয়ে যাওয়া জিনিসগুলোর বর্তমানের দাম ধরে হিসেব কষে। সেই বত্রিশভরি সোনা থাকলে এখন কত দাম হতে পারতো।

তা ওটা তো ছেলেমানুষি পাগলামি। অন্যের অগোচরে। এখনকার এই পাগলামিটা তো ছেলেমেয়েদের গোচরীভূত করতেই হলো।

পাঁচ হাজার টাকা জোগাড়ের ভার অমলা নিচ্ছে।

না, লটারী নয়, অমলা তার রাঙাদাকে পরিস্থিতি জানিয়ে লিখবে, 'চাকরীটার দারুণ ভবিষ্যৎ, কিন্তু সামান্য এই টাকাটার জন্যে হয়তো সে ভবিষ্যৎ হারাতে হবে। রাঙাদা যদি এখন এই টাকাটা ধার দেয়।'

তা এও একরকম লটারী বৈকি! অথবা জুয়া খেলা। অমলা তার আজীবনের মান সম্মান বাজি ধরে এই খেলায় নামবে। অবশ্য জয়টা অবধারিত জেনেই।

নেমেছিল তাই।

কিন্তু এখন?

এখন মেয়ে বলছে হেসে হেসে, কী গো মা, তোমার মহান রাঙাদার চিঠি এলো? জানতাম!

~ www.amarboi.com ~

বিভুর অবশ্য হাসির মনোভাব নেই আর। যদিও সে মাকে অনেক বারণ করেছিল আত্মীয়ের কাছে ছোট হতে। বলেছিল, অনেক অসুবিধের দিনরাত পার করে এলে মা, এখন আমার জন্যে? না না, এ আমি চাইনা।

...তবু মনের গভীরে একটু আশাপোষণ করছিল বৈকি।

অমলা বলেছে, তোর জন্যে নয় বিভু, আমারই জন্যে। চিরকাল আমার একটু বেড়াতে যাবার সাধ কখনো মেটেনি। তোর ওখানে কাজ হলে, বেশ ব্যাঙালোরে গিয়ে থাকবো, ওখান থেকে দক্ষিণ ভারত দেখবো। আমি তো আর সাহায্য চাইছি না। ধার চাইছি। এমন কি নেয় না লোকে?

সোমা বলেছে, বড়লোক হয়ে যাওয়া আত্মীয়ের কাছে নেয় না।

রাঙাদা তেমন নয় রে।

তোমার সেই ছোটবেলার ইমেজটা নিয়ে চিন্তা করছো। এতোই যদি তো, বাবা যাবার পর তোমার এতো অসুবিধে ঘটেছিল কেন?

বাঃ। রাঙাদা কি ছিল তখন দেশে? কতো কতো বছরই তো জার্মানীতে কাটিয়েছে। এই তো কটা বছর—

কিন্তু এখন অমলা বড্ড কোণঠাসা হয়ে পড়েছে।

রাঁচীতে চিঠি যাওয়া আসার এই দেরীর সর্ববিধ সম্ভাব্য 'কারণ' নির্ণয় করার দিনও পার হয়ে যাচ্ছে।

বিভু বলল, জবাব দেবার আজই শেষ দিন। তাহলে বলে দিচ্ছি, আমার দ্বারা অতটা অঙ্কের ডিপজিট দেওয়া সম্ভব হবে না!

অমলা ফ্যাকাশে মুখে বলল, আজই শেষ দিন?

হ্যাঁ।

বিভুর মুখের চেহারায় আশাভঙ্গের গভীর রেখা। মুখে প্রকাশ না করলেও, তারও মায়ের মতই ক্ষীণ আশাটা মরেও মরছিল না। মনে হচ্ছিল, সত্যিই হয়তো কোনো কারণে ডাকের গণ্ডগোলে সেই পরমপ্রার্থিত আশ্বাস বাণীটি এসে পৌঁছতে দেরী ঘটছে। এমনও হতে পারে, হয়তো আজই—হ্যাঁ, হয়তো আজই এসে যাবে।

কিন্তু আর মিথ্যা মোহে স্বপ্ন দেখার দরকার নেই।

অমলা আর কী বলবে?

টাকা ধার দেওয়ার ভয়ে রাঙাদা অমলার চিঠির একটা উত্তর পর্যন্ত দিল না?

এ যে বিশ্বাস হয়েও হচ্ছে না।

মনে হচ্ছে, নাঃ! কোথাও কোনো গণ্ডগোল ঘটেছে। কিন্তু আর সে কথা বলবে কী করে ওদের সামনে?

তবু সমুদ্রে তৃণখণ্ড ধরে অমলা।

বলে, আজ 'শনিবার'। আজ আর নাই দিলি।

রিফিউজ করছি, তার আবার তোমার শনি মঙ্গল। যতোসব বাজে কুসংস্কার। ঠিক

~ www.amarboi.com ~

আছে, কালতো রবিবার, যাচ্ছে না তো—

অন্তর্যামী হাসেন বৈ কি!

বাজে কুসংস্কারের পিন্‌টা অতি আধুনিক চিত্তেও একটু ছিদ্র করে ফেলেছে।

আচ্ছা বেরোচ্ছি একটু।

বলে চলে যাচ্ছে, সোমা এলো ব্যঙ্গের ভঙ্গীতে লাফাতে লাফাতে, ওমা! মাতৃদেবী! তোমার মহান রাঙাদার চিঠি এসেছে গো। দ্যাখো কোন অপূর্ব মনোরম সাহিত্যিক ভাষায় অক্ষমতা জানিয়ে দিয়েছেন! পড় পড় শুনি।

বুকটা থরথর করে অমলার।

জানিনা কি অপমান তোলা আছে ছেলেমেয়ের সামনে।

বলে, তুইই খোল না।

বাঃ, তোমার চিঠি, আমি কেন?

অমলা বলল, তা হোক না। আমি তো বলছি। চশমাটা ভাঁড়ার ঘরের তাকে পড়ে রয়েছে—

সোমার অবশ্য ধৈর্য্য ধরছে না, তবু বলল, না না তুমিই 'পাঠ' করো। আমরা শুনি।

বিভুর চলে যাওয়া হয়নি। বলল, যাক গে, শুনেই যাই তোমার রাঙাদার বাকচাতুর্য। মার মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হেনে দাঁড়িয়ে থাকে।

মুখের লেখা পাঠ করলেই বোঝা যাবে কী বার্তা।

হুঁ।

একটু শিহরণ, একটু কালো ছায়া।

অমলা বলে ওঠে, যা ভেবেছি তাই। একটা কিছু ঘটেছে। এই দ্যাখ লিখেছে—

'ঠ্যাঙ ভেঙে তিন সপ্তাহ নার্সিং হোমে পড়েছিলাম, আজ খাটিয়ার মড়ার মত বাড়িতে এনে ফেলেছে—'

সোমা মাঝখানেই হেসে ওঠে, ও দাদা! ট্রিক্‌সটা একবার দ্যাখ। ধার দেবার ভয়ে 'খোঁড়া' হতেও আপত্তি নেই, 'মড়া' হতেও পেছপা নেই। ইস্‌ বড়লোকেরা যে কী হয়!

অমলা একটু ধমক দিয়ে বলল, সবটা না শুনেই মন্তব্য করছিস কেন?...

লিখেছে, 'বাড়ি এসেই অনেক জমানো চিঠির সঙ্গে তোর চিঠিটা দেখলাম।... এটা আমার ওখানে দিয়ে না আসার জন্যে, তোর বৌদির সঙ্গে হয়ে গেল এক চোট্‌।...তুই যে তোর সেই 'মনে করো মা যেন বিদেশ ঘুরে, তোমায় নিয়ে যাচ্ছি অ-নেক দূরে' ছেলেটা, তাকে যে তুই এতোখানি লায়েক করে তুলেছিস, এর জন্যে তোকে অভিনন্দন জানাচ্ছি—'।

দাদা, দেখছিস্‌ ধানাই-পানাই—

সোমার স্বর এখন নীচু খাদে।

অমলার 'পাঠ' নিরত কণ্ঠ তার উপর দিয়ে ভেসে যায়,...'যাক আশা রাখছি এখনো সময় আছে। কালই 'এম, ও,' করে পাঁচ হাজার টাকা পাঠিয়ে দিচ্ছি। আজই পাঠাতাম,

~ www.amarboi.com ~

তো আজই ছাই ব্যাঙ্কের ছুটি।...

আশা করি ভাল আছিস সবাই।

এখানেও মোটামুটি ভাল, শুধু আমার ঠ্যাংটা বাদে। অবশ্য ওই সুবাদেই বেশ রাজকীয় আরামে কাল কাটাতে পাচ্ছি। কতোদিন যে তোমাদের সঙ্গে দেখা হয়নি। ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ভাগ নিস শুভেচ্ছা ও ভালবাসা।

আর একটা কথা, বিভু যেন রাঙামামার ধারশোধের জন্যে উঠে পড়ে না লাগে। ওর থেকে দু'হাজার মাইল ভাগ্নের ভাল করে পাশকরা বাবদ প্রাইজ ; বাকি তিন—যতোদিনে পারে। আমার কোনো তাড়া নেই। রাঙাদা।'

সোমা বাঁকা হাসি হেসে বলল, চিঠিটা এসে গেল, এম. ও. এসে পৌঁছল না, দাদা?

শুনে বিভু একটু লজ্জা পেয়ে বলল, ওরকম হয় রে। চিঠির পরে টেলিগ্রামের পৌঁছনো খবরটি আসে।

ওই আনন্দেই থাক।

বলল সোমা। তারপর বলে উঠল, আচ্ছা তাই। তবে মা, তোমার অগাধ বড়লোক রাঙাদার বদান্যতাকে প্রশংসা করা যাচ্ছে না। 'দু'হাজার প্রাইজ স্বরূপ', বাকি তিন হাজার যখন হোক দিলেই হবে। আমার তাড়া নেই।' কেন, সবটা প্রাইজ বলে দেওয়া যেত না?

বিভু বলল, বাঃ! মা তো ধারই চেয়েছিল।

মা তো তাই চাইবে। ভিক্ষে চাইবে কি? অবশ্য উনি ভিক্ষে দেওয়ার ভঙ্গীতেই দিচ্ছেন। আদৌ যদি আসে।

অমলা এখন রেগে না উঠে পারে না। কোথায় এরা আহ্লাদে বিগলিত হবে, এতোদিনের সন্দেহের জন্য লজ্জিত হবে, আর মামার পা ভেঙে যাওয়ার খবরে দুঃখিত হবে, তা নয়, এখনো কূট কচালি কথা! বলে উঠল, 'ভিক্ষে দেওয়ার ভঙ্গী' মানে?

মানে তুমি কি আর বুঝবে? তুমি তো রাঙাদার মহত্বে 'বায়াসড্' হয়েই আছো। 'আমার কোনো তাড়া নেই, উঠে পড়ে লাগার দরকার নেই' তার মানে আমার ও টাকার জন্যে কিছু এসে যাবেনা, আমি অভাবগ্রস্থ নই—এটাই বোঝানো।...হ্যাঁ সভ্যতা বলতে পারতাম, যদি সবটাই উপহার দিতেন। ওঁর যা শুনি, পাঁচ হাজার তো পাঁচ পয়সা। তা নয়, বুঝিয়ে ছাড়া, অমলি, তুই দুঃখী গরীব, আমি বড়লোক।

অমলা রাগের গলায় বলে, কখন ও কথা লিখেছে?

স্পষ্ট করে কি আর লিখতে হয় মা? তবে হ্যাঁ, আমি যদি তোমার রাঙাদা হতাম, নিশ্চয়ই 'নিঘিন্নের' মত বলতাম না, দুহাজার নিস্ তিন হাজার ফেরৎ দিস্!

টাকাটা এখনো অবয়বে নিয়ে ধরা দেয়নি, অথচ বিভুর এটা চিঠি দেবার শেষ দিন। বিভু তাই হঠাৎ সোমার কথার যৌক্তিকতা ধরতে পারে। তাই বলে, তা সত্যি। মার এতো মহানুভব রাঙাদা পুরোপুরি উদারতাটা দেখাতে পারতেন।

অমলা বলল, হ্যাঁ। তখন হয়তো বলতিস, বড়লোকের অহঙ্কার দেখানো।

~ www.amarboi.com ~

রাগ করে উঠে গেল অমলা।

অতঃপর দুই আধুনিকে মিলে আলোচনা সাপেক্ষে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হল, বড়লোকেদের মধ্যে স্নেহ ভালবাসা উদারতা মানবিকতা কিছুই থাকে না, থাকে শুধুই শো।

রাঙামামাও তার ব্যতিক্রম নয়।

আসলে চালবাজ হৃদয়হীন, ছোটলোক।

কে জানে, এম. ও. টাও ভাঁওতা কিনা!

অমলা শুনতে পেল সবই।

অবাক হয়ে ভাবল, এযুগের ধর্মই কি তাহলে কিছুতেই কাউকে শ্রদ্ধা সম্মান দেখাব না। আর 'চিন্তা' হচ্ছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ মানেই 'ছোট' হওয়া!...নিজেরা তো হবে না কৃতজ্ঞ, দেবে না শ্রদ্ধা সম্মান ভালবাসা ; অন্য আর কারুর মধ্যে সে সদ্‌গুণগুলো দেখতে পেলে ব্যঙ্গ হাসি হাসবে।

ওদের কথার জের ফুরোবার আগেই অবশ্য 'মনি অর্ডারটা' এসে প্রমাণ করে, সবটা ভাঁওতা নয়। কিন্তু অমলার আর হাসিহাসি মুখ করে বলতে ইচ্ছে হয় না, 'কী রে? ভাঁওতা নয় তাহলে?'

বিভুও গুম্ হয়ে আছে। তার হঠাৎ মনে হচ্ছে, মার রাঙাদা যেন বিভুর ঘাড়ে তিন তিন হাজার টাকার ধার চাপিয়ে দিয়ে জব্দ করলেন।...

~ www.amarboi.com ~

বুভুক্ষু

'না না এ অন্যায়, রীতিমত অন্যায়!' গলায় বাঁধা ফাঁসটা টেনে খুলতে খুলতে কমলেশ অপ্রসন্ন গলায় বলে, 'এটা দয়া নয়, পাপ!'

বিনতা অবশ্য এ ধিক্কারটুকুতে বিচলিত হয় না। বরং বাঁকা ভ্রূ আরো বাঁকিয়ে ব্যঙ্গের গলায় বলে, 'শুধু পাপ? বল মহাপাপ!'

কমলেশের এ ভঙ্গীর সঙ্গে পরিচয় আছে, তবু 'অসহ্য' বস্তুটা অসহ্যই। পরিচিত হলেও অসহ্য।

তাই উত্তেজিত গলায় বলে, 'হ্যাঁ তাই। মহাপাপই। ওই হতভাগা মেয়েটার বুদ্ধিহীনতার সুযোগ নিয়ে তুমি—'

'কি আমি?' বিনতা আরো তীক্ষ্ণ গলায় বলে, 'বলতে বলতে থেমে গেলে কেন? বলতে পারতে, বুদ্ধিহীনতার সুযোগ নিয়ে তুমি ওকে বিষ খাওয়াচ্ছ! বল না, বলতে বাধা কি?'

'বাধা!' কমলেশ গম্ভীর হয়ে যায়। বলে, 'বাধা আর কিছুই নয়, তোমার মেজাজটাই বাধা। স্পষ্ট কথা শোনবার ক্ষমতা তো নেই তোমার!'

বিনতা আর একটু ব্যঙ্গ তীক্ষ্ণ হাসি হেসে বলে, 'ওঃ; তাই বুঝি? তবে ক্ষমতা নেই বলে ক্ষমা তো করতে দেখি না! সর্বদাই তো আমার সেই অক্ষমতার ওপর জুলুমের পরীক্ষা চালাচ্ছো!...একটা রাস্তার পাগলী, তার জন্যেও তুমি আমায় অপমান করতে ছাড়ো না—'

অপমান!

কমলেশ আরো গম্ভীর হয়, 'তুমি একে অপমান বলে মনে করো?'

'শুধু আমি কেন?' বিনতা ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে, 'যে কেউ শুনুক, অপমানই বলবে!'

'অথচ—'কমলেশ অফিসের ধরাচূড়া ছেড়ে বাড়ির পোশাক পরতে পরতে বলে, 'সেটা বারবারই ঘটছে!'

বারবারই ঘটছে!

'ঘটবে না কেন?' বিনতা তীব্র হয়, 'সমাজ প্রগতিশীল হয়েছে বলেই কি পতি পরম গুরুর পোস্টটা উঠে গেছে? না পরম গুরুদের মনোভাবের পরিবর্তন হয়েছে? বিবাহিতা স্ত্রীকে অপমান করবার যে তাঁদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার! নইলে একটা রাস্তার পাগলীকে নিয়ে এতটা বাড়াবাড়ি করবার কোনো হেতু নেই। আসলে ওটা উপলক্ষ্য, অপমান করাটাই লক্ষ্য!'

কমলেশ একবার নির্নিমেষ চোখে তাকিয়ে বলে, 'তুমি তো আমায় বেশ চিনে

~ www.amarboi.com ~

ফেলেছ?'

'আশ্চর্য কি? এক-আধদিন তো দেখছি না!'

'তা বটে!' কমলেশ আরো গম্ভীর হয়, 'বছর আঠারো হয়ে গেল বোধ হয়, তাই না?'

বিনতা গলায় অগ্রাহ্যের সুর আনে, 'কে জানে, মনে নেই! হবে ওই রকমই! আর এই আঠারো বছর ধরে শুধু সমালোচনাই শুনে আসছি!'

কমলেশের মুখে ফুটে ওঠে আর এক ধরনের তাচ্ছিল্য। বলে, 'তাই না কি? আশ্চর্য তো! আর আমি ভেবে আসছি, নিজেকে খুব 'চেক্' করে চলি আমি।'

'ওঃ তাই বুঝি?' বিনতার মুখটা কালো হয়ে ওঠে, 'তবে আমার অপরাধের হিসেব কষতে বসলে, লোকে তোমার উত্তেজনায় অবাকই হবে। অপরাধটা কি? না একটা পাগলী ভিখিরি দরজায় এসে খিদে ধরেছে, পেট জ্বলে যাচ্ছে বলে হামলা করে, আর তাকে কিছু খেতে দিই!'

কমলেশ আর একবার সেই দৃষ্টিতে তাকায়। আস্তে বলে, 'মনকে চোখ ঠেরে, তোমার বিবেককে তুমি শান্ত করতে পারো বিনতা?'

বিনতা এই সোজাসুজি আক্রমণে ঠিকরে ওঠে। বলে, 'আর ধরাচুড়ো পরে অফিসারি করা কেন? গেরুয়া ধারণ করে সাধু মহারাজ বনে যাওগে না! বিবেক! আমার বিবেক তোমার মত অত পলকা নয়।'

'নয় সে তো দেখতেই পাচ্ছি—,' কমলেশ তোয়ালে কাঁধে ফেলে স্নানের ঘরে যেতে যেতে বলে, 'তবু—তোমার সেই মজবুত বিবেকের কাছেই অনুরোধ জানাচ্ছি, দয়ার নাম করে মস্ত একটা পাপ তুমি করো না আর! ওই মেয়েটাই পাগল, তুমি তো তা নও? তুমি বোঝ না মমতা দেখিয়ে তুমি ওকে যা খেতে দাও, সেটা কতখানি বিষ! একটা ক্যানসার রোগীর এঁটো—'

'চুপ—চুপ কর বলছি—,' বিনতা যেন বাঘিনীর মত ঝাঁপিয়ে ওঠে, 'বলতে মুখে বাধল না তোমার? গলা ছেড়ে বলতে ইচ্ছে করলো?'

কমলেশ নিঃশব্দে ঘর ছেড়ে চলে যায়।

কমলেশ বোধ করি অপ্রতিভ হয়।

না কি, তা নয়?

কমলেশ এখনো নিজেকে সমর্থন, আর তার স্ত্রীকে সমালোচনা করছে! হয়তো তাই। কারণ কমলেশ নিজেকে তার স্ত্রীর থেকে উঁচুদরের মানুষ মনে করে।

আশ্চর্য, এতকাল ধরে এই মনোভাব নিয়ে বিনতার সঙ্গে ঘর করছে কমলেশ!

তুচ্ছ তুচ্ছ কারণেই ধরা পড়ে যায় মনোভাবটা।

যেমন এখন—

স্নান সেরে সাফ্ জামা পায়জামা পরে এ ঘরে এসে বসলো কমলেশ। যে ঘরটাকে

~ www.amarboi.com ~

বানানো হয়েছে বারান্দাটাকে গ্রীল ঘিরে, আর কাঁচ মেরে।

দক্ষিণের বারান্দা।

সবচেয়ে মনোরম ছিল জায়গাটা, যখন ঘেরা হয় নি। সন্ধ্যাবেলায় আড্ডা বসতো এখানে বেতের চেয়ার পেতে। চেয়ারে কুলোোতো না সব সময়, ঘর থেকে টেনে বার করা হতো মোড়া, জলচৌকি! বন্ধুবান্ধব আসতো অনেক। এখন আর আসে না। এখন আর ওদের কাউকে টানাটানি করবার দরকার হয় না। বারান্দাটা ঘিরে ঘর বানানো হয়েছে, সে ঘরের দেয়াল ঘেঁষে পাতা হয়েছে সরু খাট, তার মাথার কাছে ওষুধের শিশি বসানো টেবিল, এপাশে আলনা, জাল-আলমারি, আরো কত সব টুকিটাকি।

দেখলে বোঝা যায় না এটা একদা একটা বারান্দা ছিল। শুধু বোঝা যায় বাড়ির থেকে যেন বিচ্ছিন্ন।

কমলেশ অফিস থেকে ফিরে স্নান সেরে এসেছে, তবু এখনো আকাশের আলো একেবারে মিলোয় নি। শুধু নিমীলিত হয়ে এসেছে।

কারণ এটা গ্রীষ্মকাল।

ঘরটা আচ্ছন্ন হয়ে আছে একটা তামাটে ছায়ায়। কনে-দেখা সোনালী আলোর ধ্বংসাবশেষ!

হয়তো এ ঘরে এই রকম আলোই মানায়। হয়তো একটা সোনালী স্বাস্থ্যের ধ্বংসাবশিষ্ট চেহারার সঙ্গে ওটাই ঠিক খাপ খায়। তবু কমলেশ ঘরে ঢুকে বলে, 'কি রে ঘরে আলো জ্বালাস নি?'

আলো জ্বালানো নেভানো কাজটা মিষ্টুরই।

বেড্ সুইচ আছে, দুটো আলোই তার হাতের মধ্যে।

তবু আলস্য করে জ্বালায় নি।

যেন আকাশের শেষ আলোটুকু পান করে নিয়ে তবে অন্য আলোর দিকে মুখ ফেরাবে।

বাবার প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে হাত বাড়িয়ে সুইচটা অন্ করলো, আলোয় ভরে গেল ঘর

কমলেশের মনে হলো সকালে যা দেখে গিয়েছিল, তার চেয়েও রোগা হয়ে গেছে মিষ্টু। রোজই এ রকম মনে হয় কমলেশের। তবু বেদনায় ভেঙে পড়া কণ্ঠস্বরটাকে লোহার সিন্দুকে বন্ধ করে রাখে। রাখতে পরিশ্রম হয় বৈকি, খুবই হয়, তবু রাখতে হয়

খুব হালকা গলায় বলে, 'তারপর কী খবর শ্রীমতী মিষ্টুবাবুর? সারা দিনের রিপোর্ট কি?'

মিষ্টুর মুখটা ফ্যাকাসে, বালিশের উপর ছড়িয়ে পড়া রোগাটে বেণী দুটো রুক্ষ রুক্ষ. অথচ মিষ্টুর পরনে সিল্কের ব্লাউজ ঢাকাই শাড়ী!

কে জানে শখটা কার!

মিষ্টুর না মিষ্টুর মায়ের।

হয়তো মিষ্টুর মার মন ধ্বসে থাকে, তবু মিষ্টু খুশি হবে ভেবে উৎসাহ দেখিয়ে ভক

~ www.amarboi.com ~

ভাল শাড়ী ব্লাউজ বার করে সাজায় তাকে। হয়তো বা মিষ্টুর মন উদাস হয়ে থাকে, তবু মা খুশি হবে ভেবে ভাল শাড়ীতে সেজে খুশি খুশি ভাব দেখায়।

হয়তো ওটাই এখন কাজ হয়েছে মিষ্টুর, খুশির অভিনয়।

বাবাকে দেখেও সেই অভিনয় করে, 'রিপোর্ট? রিপোর্ট হচ্ছে মায়ের কাছে চার দফা বকুনি, সাত দফা উপদেশ, বাহান্ন দফা খাওয়া—'

'আরে বাস্ বাস্!' কমলেশ হেসে ওঠে।

হয়তো মেয়ের মত সেও অভিনয়-পটু হয়ে উঠেছে আজকাল, তাই হেসে হেসে বলে, 'তা হলে তো কথাই নেই। বাহান্ন দফাই খেয়ে ফেলেছ তো? আজ আর নিশ্চয় তোমার মার কাছ থেকে ক্ষুব্ধ নালিশ শুনতে হবে না?'

মিষ্টুও হাসে।

হাসিটা মরা চাঁদের মত দেখায়, তবু কণ্ঠস্বরে বয়সের লাবণ্য ঝরাতে চেষ্টা করে, 'ও হো হো, বাবা, সে আশাটি করো না। মার মেয়েটা যদি কুম্ভকর্ণের পিসি হতে পারতো, তবেই হয়তো নালিশের হাত থেকে রেহাই পেতে। পাঁচ-সাতটা মানুষের খাদ্য একটা পেটে চালান করবার বাসনায় মা—'

দুধ নিয়ে ঘরে ঢোকে বিনতা!

এবং সেও পাকা অভিনেত্রীর মত ক্ষণপূর্বের বিরক্তি বিদ্বেষ আর তিক্ততার রং মুছে ফেলে, মুখে উৎসাহ উচ্ছ্বাস আর আহ্লাদের রং মেখে বলে ওঠে, 'হচ্ছে তো? বাপ-মেয়েতে আমার নিন্দে? এ সময় দেখছি আমার আসাটাই ভুল, দুধের সময়টা চেঞ্জ করতে হবে, তোরা প্রাণভরে আমার সমালোচনা করে নিবি!'

অন্যদিন হলে হয়তো কমলেশও ওই সুরে সুর মিশিয়ে বলতো, 'শুনছিস মিষ্টু? আমাদের যেন আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই, তাই এই মহামূল্য অবকাশটুকু ওনার সমালোচনায় খরচ করবো!'

কিন্তু আজ বলল না।

বলতে পারলো না। বড় ক্লান্তি লাগছে, ইচ্ছে হচ্ছে সব ভেঙে যাক। এই অভিনয়, এই পালিশ, এই কৃত্রিমতা। মেয়ের ওই সরু খাটটার ধারে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে উঠে বলে, 'মিষ্টু, তুই কেন চলে যাবি?...মিষ্টু, তুই না থাকা পৃথিবীটা কেমন দেখতে হবে বলে দে!'

মিষ্টু এসেছিল, দুটো বিরুদ্ধগতি নদীর মাঝখানে সেতুর মত, মিষ্টু আছে তাই দুটো বিরুদ্ধশক্তি অবিরত লড়াই করে করেও একই ভূমিতে দাঁড়িয়ে আছে।...মিষ্টু না থাকলে কি হবে, সেই কথাটাই চীৎকার করে জানতে চাইবে কমলেশ!

ইচ্ছে হচ্ছে।

তাই ইচ্ছে হচ্ছে।

আর পারছে না রং মাখতে, পারছে না নকল চুল-দাড়িতে সাজতে।

কমলেশ পারলো না, মিষ্টু পারলো।

~ www.amarboi.com ~

বললো, 'মার কেবল ওই এক সন্দেহ। কেন ও ছাড়া আর কোনো মহৎ আলোচনা থাকতে পারে না?'

'থাকলেই মঙ্গল—,' বিনতা মুখ টিপে হেসে বলে, 'এখন দয়া করে দুধটুকু—'

'মাগো, আর পারা যাবে না মা, দোহাই তোমার!'

'আচ্ছা মিষ্টু, কোন্ মুখে দোহাই পাড়ছিস? বিকেলে কি খেয়েছিস বল্? সবই তো ঠেলে সরিয়ে দিয়েছিস?'

'তা তুমি যদি আমায় 'মুন্‌কে রঘু' ভাবতে থাকো, পেরে ওঠা শক্ত।'

'উঃ খালি কথার কায়দা শিখেছেন মেয়ে! সবটা না খাস, আধ কাপ—'

পেয়ালা নিয়ে মেয়ের বিছানার ধারে ঘনিষ্ঠ হয়ে গিয়ে দাঁড়ায় বিনতা।

যেন এঘর থেকে সরে গিয়ে প্রতিষেধক ওষুধ দিয়ে হাত ধোবে না বিনতা, যেন খেতে বসবার আগে এ শাড়ী বদলাবে না!

বোঝা যাচ্ছে না সে কথা বিনতার দাঁড়ানোর ভঙ্গীতে। এ ঘরটা যেন একটা সাজানো রঙ্গমঞ্চ, এটাই দেখবার। গ্রীনরুমের দিকে উঁকি মারতে যাবে না কেউ।

কেই বা যাবে?

মিষ্টু কি এ ঘর ছেড়ে অন্যত্র যেতে পারে? মিষ্টুর এই না পারাটা বিনতার সুবিধে করেছে, বিনতা সহজ ভঙ্গীতে বিছানা ঘেঁষে দাঁড়াতে পারছে।

অনেক ঝুলোঝুলি করে মেয়েকে অর্ধেকটুকু দুধ খাওয়াতে সক্ষম হয় বিনতা, আর সত্যিকার উল্লাসে মুখটা চকচকে দেখায় তার।

কিন্তু সেটা কমলেশের চোখে পড়ে না।

কমলেশ তার আগেই উঠে গেছে, 'তা হলে তুমি খাও, আমি যাই—একটু টায়ার্ড্ লাগছে।' বলে চলে গেছে।

এ ঘরে এসেও কি মুখটা অমন চকচক রাখতে পারবে বিনতা?

না, পারে না।

এ ঘরে এসে চাপা গলায় ফেটে পড়ে, 'এক্ষুনি অমন করে উঠে এলে যে?'

কমলেশ একখানা বই নিয়ে বসেছিল, সেই বই থেকে মুখটা তোলে। বলে, 'বললাম তো টায়ার্ড্ লাগছে!'

'জানি, লাগছে তা জানি। শুধু দেহেই নয়, মনেও লাগছে।' বিনতা যেন ধিক্কারের ভাষা খুঁজে পায় না। তাই চেঁচিয়ে বলে, 'কিন্তু সেইটা তুমি মিষ্টুকে বুঝতে দেবে? ও টের পাবে, ওর ঘরে বসতে হলে তোমার হাই ওঠে, টায়ার্ড্ লাগে?'

'কী আশ্চর্য, তুমি কি ইচ্ছে করে ঝগড়া বাধাতেই এলে?'

'ঝগড়া বাধাতে এলাম?'

বিনতা সহসা চুপ করে যায়।

বলে, 'ওঃ তা হবে। কি করবো, যার যা স্বভাব!'

~ www.amarboi.com ~

'তুমি মাঝে মাঝে ভুলে যাও, মিষ্টু আমারও মেয়ে।'

'ভুলে যাব কেন?' বিনতা হাত দুটো নিয়ে মোচড়াতে মোচড়াতে তীব্র ক্ষোভের গলায় বলে, 'ভুলে গেলে তো নিজেই হাল ধরতাম। হয়তো বড় বড় হাসপাতালের দরজায় গিয়ে দাতব্যের দাবি জানাতাম, হয়তো একটা সরকারী সাহায্য যোগাড় করে ফেলে বিদেশে চলে যেতাম ওকে নিয়ে। তুমি ওর বাপ, ও তোমারও মেয়ে, একথা মনে রাখতে হয়েছে বলেই ওকে ওই চার ফুট দেয়ালের খাঁজে ফেলে রেখে দিন গুনছি।'

এই, এই হচ্ছে বিনতার অহরহের অভিযোগ।

যেন কমলেশ মেয়ের জন্যে কিছুই করছে না। অথচ কমলেশ ভিতরে ভিতরে কী নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে, কী ভাবে সর্বস্বান্ত হয়ে যাচ্ছে, সে কথা কমলেশই জানে। একটা সন্তান, লোকে বলতো ছেলে নেই। কমলেশ বলতো, 'হোক্ গে, ও আমার একাই একশো হবে।'

হয়েছে তাই।

একশোটার মত রস যোগাতে হচ্ছে ওকে সমগ্র সংসার নিংড়ে।

কিন্তু বিনতা তা বোঝে না। বিনতা ভাবে কমলেশ আরো পারতো। কমলেশের আরো পারা উচিত ছিল। তাই সুযোগ পেলেই কমলেশকে বিঁধতে চায়।

কমলেশ আস্তে বলে, 'কথাগুলো একটু আস্তে বললে ভালো হয়।'

'জানি, সে হুঁশ আমার আছে,' বিনতা চাপা তীক্ষ্ণ গলায় বলে, 'শুধু তোমায় হুঁশ করিয়ে দিতে এসেছিলাম, দয়া করে আর গোটাকয়েক দিন কষ্ট করো। ওকে বুঝতে দাও, ক্লান্ত হয়ে পড়ছ না তুমি—'

কমলেশ এই নিষ্ঠুরতার সামনে স্তব্ধ হয়ে যায়।

তবু কমলেশ স্ত্রীর ওই উত্তেজিত মুখের দিকে তাকিয়ে, আস্তে বলে, 'চেষ্টা করবো।'

চেষ্টা করছিল কমলেশ।

চেষ্টা করছিল অভিনয়ে আরো সার্থক হতে, বিনতার ব্যবহারে বিরক্ত না হতে।

আর এই সাধু চেষ্টায় দুটো দিন তবু লড়াইটা একটু কম ছিল।

ভেস্তে গেল।

পা থেকে মাথা পর্যন্ত বিদ্যুতের চাবুক খেল কমলেশ। আবার আজ সেই দৃশ্য। বিকেলে অফিস থেকে ফিরে বাড়ি ঢোকবার মুখে দরজার পাশেই।

বছর চোদ্দ-পনেরোর সেই পাগলী মেয়েটা দরজার পাশের সরু চাতালটায় বসে একখানা কাগজ পেতে গোগ্রাসে গিলছে কামড়ানো টোস্ট, আধভাঙা ডিমসেদ্ধ, কাটা আপেলের টুকরো, চটকানো খানিকটা ছানা। কাগজের একধারে একগোছা বাসি রুটি!

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বিনতা।

খুব সম্ভব আপন বদান্যতায় পুলকিত হয়ে খাওয়ার তত্ত্বাবধান করতে এসেছে।

এ বদান্যতার কারণটা কি, ওই দুর্মূল্য বস্তুগুলোর উৎস কোথায়, এ আর বুঝতে দেরি হয় না কমলেশের, আর সমস্ত সাধু সংকল্প ভেঙে পড়ে তার।

~ www.amarboi.com ~

বিনতাকে একটা ক্রূর পিশাচীর মত লাগে, নিজেকে একটা কদর্য পাপের দর্শক মনে হয়।

আর সেই মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই, পাগলীর কাছে এসে হঠাৎ লাগামছাড়া গলায় চেঁচিয়ে ওঠে, 'এই পাজী বদমাস, হঠ্ যা। হঠ্ যা। খবরদার খাবি না!'

পাগলী মেয়েটা এই অপ্রত্যাশিত ধমকে প্রথমটা হঠাৎ চমকে যায়, তারপরই হি হি করে হেসে উঠে বলে, 'খাবি না! ইল্লি! মাগনা পেয়েছে!'

বলা বাহুল্য উঠে যাবার তিলমাত্র উদ্যোগ করে না, আরো তাড়াতাড়ি খেতে থাকে।

'ছাড়বি না? ছাড়বি না খাওয়া?' কমলেশ মেয়েটার একটা কাঁধ চেপে ধরে বলে, 'ছাড় বলছি! তোকে কি খেতে দিয়েছে জানিস? বিষ! বুঝলি বিষ! খেলে তুই মরে যাবি—'

প্রথম ধাক্কায় বিনতাও থতমত খেয়ে গিয়েছিল। মনে হচ্ছে কমলেশ যেন আজ অন্যদিনের থেকে খানিক আগে এসে গেছে। নইলে ও আসবার আগেই খাওয়াটা হয়ে যেত।

কিন্তু তাই বলে এই কাণ্ড করবে কমলেশ? ভেবেছে কি ও?

পাড়ার লোক ছুটে আসবে না?

বলবে না, ব্যাপার কি মশাই?

আর মিষ্টু?

যদি তার কানে পৌঁছয়? যদি সে বুঝে ফেলে কিসের এই চেঁচামেচি?

বিনতাও অতএব চোখে আগুন জ্বালে। 'চুপ! চুপ করো বলছি! ভেবেছো কি তুমি? পাড়ার লোক জড়ো করবে? সবাইকে ব্যাখ্যা করে বোঝাবে কী ব্যাপার?'

কমলেশ কথাটার তাৎপর্য বোঝে?

কমলেশের গা-হাত-পা কাঁপতে থাকে, তবু কমলেশ মাথাটা নীচু করে বাড়ির মধ্যে ঢুকে যায়।

পাগলীকে উদ্দেশ করে 'খা তুই! কেউ বকবে না—,' বলে বিনতাও ঢুকে যায়। পাগলী অবশ্য ভয়-অভয় কোনো কিছুতেই দৃকপাত করে না, আপন মনে খেতেই থাকে।

বিনতা কমলেশের সামনে দাঁড়ায়।

অপরাধীর ভঙ্গীতে? না অগ্নিগর্ভ ভঙ্গীতে? কে জানে!

কমলেশ আর এবার চেঁচায় না। দাঁতে দাঁত পিষে বলে, 'আগে ভেবেছিলাম না বুঝে অবোধের মত করছো কাজটা, সে ভুলটা ভাঙলো। দেখছি রীতিমত পরিকল্পিত হিংস্রতা। কিন্তু কী এটা বল তো? কোনো তুকতাক নয় তো?'

'কী বললে? কী বললে তুমি?'

'যা বলেছি বুঝেছ ঠিকই। অনেকরকম তুকতাকও তো আছে শুনেছি। একটা প্রাণ নষ্ট করে, আর একটা প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টা—'

কথাটার শেষ খুঁজে পায় না বলেই কি থামে কমলেশ? না বিনতার সহসা স্তব্ধ হয়ে

~ www.amarboi.com ~

যাওয়া মুখের দিকে তাকিয়ে থেমে গেল?

কিন্তু বিনতার দিকে তাকাল কই? ও তো শুধু পায়চারি করছে!

বিনতা মুহূর্ত কয়েক চুপ করে থাকে।

বিনতার মুখটা যেন আগুনের আঁচে টকটক করে।

বিনতার রুদ্ধ কণ্ঠে বলে, 'এই কথা বললে তুমি? আমি ডাইনী মন্ত্র পড়ে তুকতাক করছি? একটা প্রাণ নষ্ট করে—'

বিনতার স্বরটা আরো রুদ্ধ হয়ে আসে।

কমলেশ কি এখনো ওর মুখটা দেখতে পায় নি?

না কি পেয়েছে?

আর ভাবছে, বড় বেশী কড়া কথা বলা হয়ে গেছে। অতটা না বললেও হতো।

নাঃ, ও কথা ভাবছে না কমলেশ!

কমলেশের মনে হচ্ছে, 'উপযুক্ত' কড়া কথা তার জানা নেই কেন?

বিনতার ওই রুদ্ধকণ্ঠ, লালচে মুখ, ছায়াচ্ছন্ন চোখ সব কিছুই অভিনয় মনে হচ্ছে কমলেশের।

নিশ্চয়, অভিনয় ছাড়া আর কি! পাকা অভিনেত্রী! কে বলতে পারে কমলেশের সন্দেহই সত্যি কিনা। হয়তো লুকিয়ে কোনো অনিষ্টকারী তান্ত্রিক-ফান্ত্রিকের শরণাপন্ন হয়েছে, হয়তো তারই নির্দেশে—

তাই রূঢ় গম্ভীর গলায় বলে ওঠে কমলেশ, 'জগতে কিছুই অসম্ভব নয়। নইলে যে কারণ খুঁজে পাওয়া শক্ত হচ্ছে। তবে যদি বলতে যাও নিতান্তই করুণার বশবর্তী হয়ে ওই ভিখিরিটাকে পুষ্টিকর খাদ্য খাইয়ে হেল্‌দি করে তুলতে, ওর জন্যে ওগুলো মজুত রাখো, তা হলে বলবার কিছু নেই। অবশ্য বিশ্বাস করতে পরিশ্রম করতে হবে।'

কমলেশ হাঁপায়।

কমলেশ যেন খাঁচার বাঘের মত পায়চারি করতে থাকে।

কমলেশ তার স্ত্রীর মতিবুদ্ধি স'পর্কে খুব একটা শ্রদ্ধাশীল কোনোদিনই নয়, তবু কমলেশ এই ঘৃণ্য অমানবিকতার পরিচয়ে দিশেহারা হয়ে গেছে।

বিনতা কিন্তু আর উত্তেজিত হয় না।

বিনতা স্থির স্বরে বলে, 'ওগুলো ওর জন্যেই সংগ্রহ করে মজুত রাখি, ওর পুষ্টির চিন্তায় কাতর হই, এমন অবিশ্বাস্য কথা বলতে যাবো কেন? দেখে তো বুঝতেই পারছো কোথা থেকে আসছে ওগুলো?'

'পারছি বৈকি! আর সেই বুঝতে পারা থেকেই তো প্রশ্ন, ও পাগল হতে পারে, তুমি তো পাগল নও! ওর জ্ঞান না থাকতে পারে কী খাচ্ছে, তোমার তো জ্ঞান আছে কী দিচ্ছ! একটা মানুষের বোধহীনতার সুযোগ নিয়ে তুমি তাকে হাতে করে বিষ দেবে? কেন? কেন? বল তুমি আমাকে, ওগুলো ফেলা গেলে কী এত লোকসান তোমার? আর সেই ফেলে দেবার জিনিসগুলো একটা ভিখিরির পেটে ঢুকিয়ে দিয়ে কী লাভ?

~ www.amarboi.com ~

বল তুমি, বোঝাতেই হবে আমায়।'

'বোঝাতেই হবে?'

বিনতা রুদ্ধস্বরে বলে, 'না বললে বুঝতে পারবে না? বুঝতে পার না আমার কি যন্ত্রণা? বুঝতে পার না দিনের পর দিন এ দৃশ্য দেখা কী ভয়ঙ্কর! একটা বাচ্ছা মেয়ে, তার কাছে যে সব খাদ্য প্রায় দুর্লভ ছিল, সেই সব আকর্ষণীয় প্রিয় খাদ্যগুলো হাতে পেয়েও খেতে পারছে না!...সমস্ত সংসারের রস নিংড়ে যে জিনিস যোগাড় করে এনে তার সামনে ধরছি, সে জিনিস সে একটা কামড় দিয়ে ঠেলে রাখছে, ফেলে দিচ্ছে—' হঠাৎ সব অহঙ্কার ভেসে যায়, স্থিরতার অভিনয় ভেঙে পড়ে। কেঁদে ফেলে বিনতা।

কেঁদে ফেলে বলে, 'কতদিন চোখ মেলে দেখিনি একটা খিদে পাওয়া মানুষ আগ্রহ করে খাচ্ছে! ও "খিদে পেয়েছে" বলে পেট ধরে এসে বসে, সামনে খাবার ঢেলে দিই ও গব্ গব্ করে খায় আমি দেখি। চোখ ভরে দেখি। কিসের কথা বলছিলে? কিন্তু ভাবি ওরা তো ডাষ্টবিন থেকেও খুঁটে খায়। তবে কী এত ক্ষতি হবে ওর! ফেলে দিলেও হয়তো সেই ডাষ্টবিন থেকে কুড়িয়েই খাবে! তবে কেন আমি নিজে চোখে দেখে—'

বিনতার গলা ভেঙে যায়।

বিনতার গলা বসে যায়।

আর বিনতাকে যেন হৃতসর্বস্ব নিঃস্ব দেখায়। হঠাৎ ভিতরটা উদ্‌ঘাটিত করে ফেলে যেন মরমে মরে গেছে বিনতা। দুর্বলতা প্রকাশে যে বড় ঘৃণা তার। প্রকাশ করে ফেলে বুঝি ঘৃণা করছে নিজেকে।

কিন্তু কমলেশ আর তার ঘৃণাকে খুঁজে পাচ্ছে না, কমলেশ আর এখন তার স্ত্রীকে নিজের থেকে নীচু ভাবছে না। কমলেশ যেন আপন নিষ্ঠুরতায় বিদীর্ণ হচ্ছে।

আস্তে বিনতার পিঠের উপর একটা হাত রাখে কমলেশ, গাঢ় গভীর গলায় বলে, 'এদিক থেকে কোনোদিন ভাবিনি বিনতা, তাই ভুল করেছি।'

স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে কমলেশ, একখানি বেদনা-বিধুর মাতৃহৃদয়ের সামনে। যে হৃদয়কে এখনি আবার রং মেখে, পালিশ লাগিয়ে মঞ্চে গিয়ে উঠতে হবে। মুখে আলো ছড়িয়ে হেসে হেসে বলতে হবে, 'আবার সেই 'খাব না'র ধুয়ো? বিকেলে কি খেয়েছিস বল তো? সবই তো ফেলে দিয়েছিস!'

~ www.amarboi.com ~

প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ

রেলগাড়িতে অনেক সময় অনেকের সঙ্গে অনেকের ভাবটাব হয়। বেশীর ভাগই অবশ্য সে ভাবের পরিসমাপ্তি ঘটে যাত্রাপথের সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই, সমাপ্তি কালে কিছুটা করুণ-মধুর বিদায়ণীর আদানপ্রদানের মধ্য দিয়ে।

'আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে যে কী ভালই লাগল!'

'সত্যি, মনে হচ্ছে যেন কতকালের চেনা।'...

'এই এতখানি জার্নি, কোথা দিয়ে যে কেটে গেল!'...ইত্যাদি ইত্যাদি।...কখনও কখনও বা সে ভাব-ভালবাসার জের চলে কিছুদিন উচ্ছ্বাসময় পত্র বিনিময়ের মাধ্যমে।...ক্রমশই উচ্ছ্বাসের 'ভাঁটা পড়ে, অতঃপর বিস্মৃতির বালুবেলায় মিলিয়ে যায়।...অবশ্য দেখেছি এসব আগে আগে। এখন কী হয় সম্যক জানি না। এখন মানুষ সহজে মন খোলে না, তাই চট্ করে আলাপও হয় না। তবু এখনো রেলগাড়ির দেখা থেকে প্রেমে পড়া, বিয়ের সম্বন্ধ ঘটে যাওয়া বিরল নয়। এই তো ক'মাস আগে আমারই এক আত্মীয়পুত্র রেল গাড়ির মাধ্যমে দিব্যি একখানা কনে পেয়ে গেলে।...সে যাক—রেলগাড়ির এ এক বিশেষ অবদান।

তবে এছাড়াও রেলগাড়ির আসল অবদান মানবচরিত্রের বহুবিচিত্র রূপের দর্শন এবং সান্নিধ্য লাভ। ভাবলে ভাবা যায়, রেলগাড়ি যেন এই মানবসংসারের একটি মিনিয়েচার।...এখানে প্রেম হিংসা উদারতা সংকীর্ণতা, ক্রুরতা সরলতা, শালীনতা নির্লজ্জতা অনেক কিছুই দেখার সুযোগ ঘটে। দেখার সুযোগ ঘটে, 'বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী'-গোছের তীব্রতা, আবার বিনা অনুরোধেই নিজ ভূমি ছেড়ে দেওয়ার মত ত্যাগ,—এই একটুকরো পৃথিবীর মধ্যে অনেক কিছুই অবলোকন করা যায়।

আমরা অনেক ভুলি, আবার মনেও রাখি কিছু। তবে এখন এই জীবনের সন্ধ্যাবেলায় অতীত আর বর্তমানকে খতিয়ে দেখতে বসলে দেখা যায়, নরনারীর চরিত্রের যত বিচিত্র নমুনাই দেখে থাকি, একদা বুঝি পৃথিবীর উপর আশা রাখবার কিছু থাকত। পৃথিবী ফুরিয়ে যেতে বসেনি।

মনে পড়ে সেই প্রায়-বৃদ্ধ ভদ্রলোককে, যিনি রেলগাড়িতে কিছু আগে ওঠার দাবিতে পরবর্তীদের ওঠবার দাবিই নাকচ করে দিতে আপ্রাণ সাধনা চালিয়ে যাচ্ছেন।...

দরজার কাছে নিজের বা'তোরঙ্গ পোঁটলাপুঁটলি বসিয়ে রেখে দরজা আগলে দাঁড়িয়ে থেকে, উঠন্ত লোকেদের প্রায় ঠেলে ফেলার যোগাড় করে তারস্বরে ঘোষণা করে যাচ্ছেন, জায়গা নেই, জায়গা নেই, তিলার্ধ জায়গা নেই, ভেতরে ছুঁচ গলছে না।

~ www.amarboi.com ~

কিন্তু সেকালে 'পাবলিকে'র ন্যায্য কথা বলার সাহস ছিল। এখনকার মত নীরব দর্শকের ভূমিকায় থাকতে হত না। অতএব আগে উঠে আসা অন্য আরোহীরাই, এ অন্যায়ের প্রতিবাদ করে বুড়োর জিনিসপত্র টেনে সরিয়ে এবং দু'কথা শুনিয়ে দিয়ে পরবর্তীদের পথ করে দিল।...একজন তো এ টিপ্পনী করতেও ছাড়ল না, মশাই তো পৃথিবীতেও এসেছেন কিঞ্চিৎ আগে, তো পরবর্তীদের জন্যে কি একটুও জায়গা ছাড়তে রাজী হননি?'

আবার একদা দেখেছিলাম সেই ধনবতী মহিলাটিকে। যাঁর চেহারাটি এই দীর্ঘকাল পরেও ভাবলেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে। প্রৌঢ়াই বলা চলে, বিশেষ করে তাঁর সেই থসথসে গোলগাল গঠনভঙ্গীর মধ্যে 'যৌবন' শব্দটা যেন অলীক। কিন্তু মাংসবহুল মুখাকৃতির মধ্যেও এমন চমৎকার একটি সুকুমার লাবণ্য, যা প্রায় বালকসুলভ। বালকসুলভ বললাম এই জন্যেই, ভিতরের কাঠামোটা আবিষ্কার করে অনুভব করা যায়, এই ধরনের মুখকেই লোকে 'গোপাল গোপাল' মুখ বলে। রং ফর্সা ধপধপে, পরনে চওড়া লালপাড় গরদের শাড়ি, যদিও অগোছালো করে পরার জন্য বেশ লাট খাওয়া। কপালে একখানি লুডোর ঘুঁটি সাইজের টীপ, সেটি ঘামে গলে নাকের উপর গড়াতে শুরু করেছে। এক কথায় রীতিমত লক্ষ্মীমন্ত ঘরের গৃহিণীর নমুনা একখানি।

কাশীর গাড়ি, উঠলেন বর্ধমান থেকে। যাকে বলে হাঁসফাঁস করতে করতে। সঙ্গে বিশাল লটবহর, ছোট-বড় গোটা তিন-চার ছেলেমেয়ে এবং আরও গোটা তিনেক ভৃত্য এবং কুলি।

বর্ধমানে গাড়ি নেহাত কম সময়টা বিশ্রাম নেয় না, কিন্তু সারা সময়টাই গেল ওই মহিলার সৈন্যবাহিনীর কলকল্লোলে।

'মা, ঠিক পনেরো তারিখের মধ্যেই ফিরছ তো?'...'গিয়ে কিন্তু রোজ রোজ গঙ্গা নাইবে না।'...'আর শোন, একলা নামবে না গঙ্গায়, বলে দিচ্ছি।'...'রান্নায় ফাঁকি দিয়ে দোকানের খাবার খেয়ে চালিয়ে যেন সেবারের মত অসুখে পোড়ো না।'...'সত্যি দিদা, কী অদ্ভুত নিয়ম তোমাদের। কলকাতার তেলেভাজার দোকানের তেলেভাজা খেলে জাত যাবে, আর কাশীর দোকানের বেগুনী আলুর চপ খেলে দোষ নেই।'

তা সত্যি একদা ছিল এরকম অদ্ভুত নিয়ম। বিধবা মহিলারা (এবং নিষ্ঠাবতী সধবা গৃহিণীরাও) যাঁরা নাকি ভুজাওয়ালার দোকানের ছোলাভাজাটি পর্যন্ত খেতেন না, সিঙাড়া-কচুরিবিহীন 'ভাল দোকান' থেকে খালিপায়ে কেবল মাত্র সন্দেশ-রসগোল্লা নিয়ে আসতে পারলে তবে তাঁদের 'ভোগ' হত, তাঁরাও কালীঘাটে গিয়ে 'তেলেভাজা' খেতেন, এবং বাবা বিশ্বনাথ আর মা অন্নপূর্ণার রাজ্যে গিয়ে দিব্যি বাজারের খাবার খেতেন।

যুক্তি কী জানি না, সব গঙ্গাজলে তৈরি অথবা তীর্থমাহাত্ম্য, তীর্থাধিপতিই জানেন।

ছেলেমেয়েদের বাক্যবিন্যাসে বোঝা গেল মহিলাটি সধবা হলেও বিধবার ন্যায় নিষ্ঠাবতী। রেলগাড়িতে জল খান না এবং কাশী গিয়ে রান্নায় ফাঁকি দিয়ে ওই পরম

~ www.amarboi.com ~

বস্তুগুলি দিয়েই কাজ চালান।

ওদের কথাসূত্রে খবর জানা হয়ে গেল, মহিলা বছরে এমন দু-তিনবারই কাশী যান। যাওয়ার কারণ পিতৃকুলসূত্রে পাওয়া একখানি বাড়ি। ভাল বাড়িই মনে হল, কারণ বিবাহিতা যে মেয়েটি এসেছিল, সে বলে উঠল, তোমার জ্যাঠামশাই তোমায় পেল্লায় একখানা বাড়ি দিয়ে গিয়ে আমাদের আরও জব্দ করে গেছেন বাবা! বাড়ি রক্ষণাবেক্ষণ করতেই তো এই নিত্যি কাশী ছোটা!

আহা, সেটা মন্দ কী? কাশী হল তীর্থ! ইহকালের সম্পত্তি রক্ষার সঙ্গে সঙ্গে পরকালেরও সম্পত্তি কেনা হয়ে যাচ্ছে—বলে গালভরা হাসি।...

তা তো হচ্ছে। এদিকে আমাদের মাতৃহীন হবার ব্যবস্থা হচ্ছে—বলল বোধ হয় ছোট ছেলে, আচ্ছা গাড়িতে একটু জল খেলে কী হয় বাবা? একা যাচ্ছ—।

এতগুলি কণ্ঠ ছাপিয়েও মহিলার কণ্ঠ ধ্বনিত হতে থাকে, আচ্ছা আচ্ছা, সবাই মিলে আর গার্জেনগিরি করতে হবে না। একা যেন আমি আজ নতুন যাচ্ছি।...তোরা ভাল থাকিস দিকিনি তাহলেই হল।...এই হতভাগা মুকুন্দটাকে বলবি, খবরদার যেন খোকাধনকে পার্কে ছেড়ে দিয়ে আড্ডা না মারে।...এই এই জলের কুঁজোটাকে অমন হ্যাঁকাদমকা করে তুলছিস কেন? ভাঙাবি নাকি? বুড়বাক কোথাকার! কুঁজো ভাঙলে তোর মাথা ভাঙব।...ওমা! আসল মালটাই তুলিসনি নাকি? কচুরির ঝুড়িটা? তুলেছিস? তবু রক্ষে। কোথায় বসালি?...বাঙ্কের ওপর? বাঃ চমৎকার! মা খুব লম্বা, না?...আচ্ছা আচ্ছা থাক থাক, এক্ষুনি আর নামাতে হবে না। এই গাড়িতেই আমার কত লম্বা লম্বা ছেলে ভাগনা ভাইপো। দেবেই তখন পেড়ে। সীতাভোগ মিহিদানার চ্যাঙারি দুটো? ওমা! সীটের নীচেয়? দুর্গা দুর্গা, যত রাজ্যের জুতোর ধুলোর উপর?...সুটকেসের উপর রেখেছিস? তা ভাল। কৌটোগুলো? কৌটোগুলো সব উঠেছে? সিল্‌ভারের কৌটোটা? পেতলের দুটো? অ্যালমিনির ঝোলাটা কোথায় ঢোকালি?

গাড়ি নড়ে উঠল, একটি ছেলে বলে উঠল, আছে আছে মা, তোমার সব আছে। সব উঠেছে। সার্চ করে দেখতে পারো, কিছু আমরা হাতিয়ে নিয়ে যাচ্ছি না।

হা হা করে হেসে উঠলেন মহিলা। আচ্ছা আচ্ছা খুব হয়েছে! সর্বদা মাকে একহাত নেওয়া চাই!

ওই মুক্তোর সারি কি বাঁধানো?

সব দাঁত উপড়ে বাঁধিয়ে ফেলার মত বয়েসও তো মনে হচ্ছে না!...বাঁধানো যদি না হয় তো বলতেই হবে এই দাঁতের জন্যেই পরম সুন্দরীর পর্যায়ে ফেলা যেতে পারত তাঁকে, যখন মুখটা মেদবর্জিত ছিল।

* * *

গাড়ি ছেড়ে দিল।

আশ্চর্য, সবাই নেমে গেল হুড়মুড়িয়ে, বসে রইলেন শুধু মহিলা একা।...না, বসে রইল আরো কিছু। বেশ কিছু! বাঙ্কের উপর 'কচুরির ঝুড়ি', সুটকেসের উপর সীতাভোগ

~ www.amarboi.com ~

মিহিদানা চ্যাঙারি, সীটের উপর ঝক্‌ঝকে করে মাজা, দুটি বৃহদাকার পিতলের আর একটি জার্মানসিল্‌ভারের কৌটো। জানি না কী কী উপাদেয় ভোজ্যসম্ভারে পূর্ণ আছে এগুলি। তাছাড়াও রয়েছে একটা অ্যালুমিনিয়মের 'ঝোলা', মুখে তেল-তেল ন্যাকড়া বাঁধা আচারের 'বোয়েম' এবং ছোট-খাটো দু'চারটি শিশি-কৌটো। হরলিকসের বোতল, বার্লির কৌটো, এবং একটি মেলিন্স ফুডের টিন।...

বলে রাখা ভাল এটি সেই যুগের স্মৃতি, যে যুগে শিশুরা আমূল ল্যাকটোজেন না খেয়ে মেলিন্স ফুড খেতো। এবং হরিহরছত্রের মেলা বসানোর মত লম্বা লম্বা টানা টানা সীট সম্বলিত বেশ বৃহদায়তন 'ইন্টার ক্লাস' কামরা থাকত। যাদের সেকেন্ড ক্লাসে ওঠার সঙ্গতি নেই, তারা তো তাতে উঠবেই, সঙ্গতিসম্পন্নেরাও ইন্টার ক্লাসে ওঠাটা লজ্জার বলে মনে করতেন না। সুবিধে-অসুবিধের প্রশ্ন থাকতে পারে, লজ্জার কী আছে? এত লোক যাচ্ছে না? দু-দশ ঘণ্টা সময়ের একটু আরামের জন্যে রেলকোম্পানিকে মিথ্যে কতকগুলো টাকা গুণগার দেব? সেকেন্ড ক্লাসে চড়ে ফোতোমি করব?'

হ্যাঁ, তখন 'ফার্স্ট' 'সেকেন্ড' 'ইন্টার' এবং 'থার্ড' এই চারটি শ্রেণী ছিল রেল গাড়িতে। যেমন সনাতন সমাজে ছিল—ব্রাহ্মণ বৈশ্য ক্ষত্রিয় শূদ্র। চারি বর্ণের যথাযথ পোস্টের ব্যবস্থা।

তা গেরস্থলোকে তখন সেকেণ্ড ক্লাসে চড়াটাকেই 'ফোতোমি' মনে করত। ফার্স্ট ক্লাস? সে কথা উঠতই না।

কিন্তু একা মহিলা, এই বিরাট খাদ্যসম্ভার নিয়ে করবেনটা কি?...খাবারের সমারোহ আর হাঁকডাক হৈচৈ কলরবের বহরে মনে হচ্ছিল বোধ হয় কোন পিক্‌-নিক্‌ পার্টি উঠেছে, দু-এক স্টেশন পরেই নেমে যাবে। সেরকম তো মনে হচ্ছে না আর।

রহস্যভেদ হতে দেরি হল না। গাড়ির কোন এক কোণ থেকে এক ভদ্রলোক উঠে এসে পুলকপূরিত হাস্যে বলে উঠলেন, 'মাসিমাও যাচ্ছেন এই গাড়িতে?...আমাদের দেখছি আজ ভাগ্য খুব প্রসন্ন!'

তার মানে পূর্বপরিচিতা।

মাসিমা সারামুখে অনেকগুলি টোল খাইয়ে হেসে বললেন, ওমা! তুমি যাচ্ছ? কোথায়? কাশীতেই? বৌ ছেলে সঙ্গে আছে?...ভাল ভাল। তা ভাগ্য প্রসন্ন তোমাদের কেন বাবা? আমারই। একজনাকে দু'বার পাওয়াতো অনেক ভাগ্যের কথা।...তা সবাই ভাল আছ তো? যখনি গাড়িতে উঠি, আগে চেনামুখ খুঁজি। কোথায় বসেছে ওরা?...আচ্ছা! দেখব তো সবাইকেই।

ইতিমধ্যে আর এক দন্তমানিক ছোকরা এসে টিপ করে মহিলাকে একটা প্রণাম ঠুকে বলে উঠল, বাথরুমে ঢুকেছিলাম, ওঠাটা দেখতে পাইনি, এখন গলা শুনে গলা বাড়িয়ে দেখি, আমাদের সেই দিদিমা! ওঃ আজ কার মুখ দেখে গাড়িতে উঠেছিলাম!...ও দিদিমা, ছানার জিলিপি আছে তো?

মহিলা উদ্ভাসিত মুখে বললেন, আছে পেটুকচাঁদ আছে। তা তুইও এ গাড়িতে যাচ্ছিস

~ www.amarboi.com ~

জানলে তোর জন্যে ইস্‌পেশাল একটা কৌটো আনতাম।...তা না জেনেও এনেছি!—রাতভোর ভেজে যতগুলো হয়ে উঠল সবই এনেছি। বাকি ছানাটা বৌমাকে বলে এলাম, করে নিও। ছেলেপুলে খাবে। তেমন পারে না। কড়িয়ে ফেলে, রস ঢোকে না। তা হোক গে—ওদের তো বারো মাসই খাওয়াচ্ছি। এসব ছেলেদের আর কবে পাচ্ছি বল? তোকে দেখে বড় আহ্লাদ হল ভাই। তা বে-থা করেছিস?...এখনো করিসনি?অমা! কেন?

ভয়ে দিদিমা!

ভয়ে! শোন কথা! ভয় আবার কী? বৌ এসে খুন্তি পুড়িয়ে ছ্যাঁকা দেবে নাকি?

খুন্তি না পোড়াক দিদিমা, নিজের জিভ তাতিয়েই ছাঁকা দেবে। এ কী আর আপনাদের আমল? যে পতিপরমগুরু? এ যুগের মেয়েরা—

মহিলা ঝঙ্কার দিয়ে ওঠেন, থাম্ তো ডেঁপোছেলে। এখনো সেই বাকতাল্লার অভ্যেসটি আছে। কবে তোর সঙ্গে দেখা হয়েছিল রে?

বছর তিনেক আগে।

দেখ্ কোথা দিয়ে দিন কেটে যায়। মনে হচ্ছে এই সেদিন। কিন্তু রাগ করিসনি ভাই, তোর নামটি কিন্তু ভুলে গেছি।

পরিমল।

ও হ্যাঁ হ্যাঁ! মনে পড়েছে! বলেছিলাম, ডাকনাম কী পরি?

আবার উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে সেই গোল্লাগাল্লা ফর্সা মুখটি কৌতুকে আর হাসিতে, এরপর যেন দেখি বৌ নিয়ে উঠেছিস!

মহিলা গুছিয়ে বসেন।

গরদের আঁচল দিয়ে কপালের ঘাম মুছতে, সারা কপাল এবং গরদের আঁচল সিঁদুরে মাখামাখি হয়ে যায়। সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে বলেন, এবারের যাত্রাটা খুব সুযাত্রা। দু'খানি চেনামুখ দেখলাম। এই যে দেখ না—এই ইনি আর এক ক্ষেপের পাওয়া ছেলে।

পরিমল আগের ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে একটু নমস্কারের মত করে হেসে বলে, কোন্‌বারের ক্ষেপ? সেবারে ছানার জিলিপি ছিল?

ছিল।

কড়াইসুঁটির কচুরি?

না, কড়াইডালের রাধাবল্লভী।

আহা, সেও তো উত্তম! পাটিসাপটা?

হ্যাঁ! ইয়া ইয়া!

মালপো?

না, বোধ হয় মালপো ছিল না।

খুব মিস করেছেন। আলুরদম?

ওঃ ফার্স্ট ক্লাস! নারকোলবাটা না কি দেওয়া অমন আলুরদম কখনো খাইনি।

~ www.amarboi.com ~

এবারেও সেটা আছে নাকি মাসিমা?

মাসিমা প্রফুল্ল আননে বলেন, সেরকম নয়, এবারে অন্য প্যাটার্ন। খেয়ে দেখো। হিঙের কচুরির সঙ্গে খাপ খাবে ভাল। আসলে কাবুলী হিং আনিয়েছি কলকাতার বড়বাজারের দোকান থেকে।

শুনুন মশাই? পরিমল বলে ওঠে, আমার এই দিদিমাটির সহযাত্রী হওয়া একটা লাক-এর ব্যাপার।

'লাক'-এর যে ব্যাপার, তা বুঝতে পারলাম কিছুক্ষণ পরেই।

মাসিমা একটু বসেই উসখুস করে উঠে পড়ে বললেন, ব্যাঙ্কের ওপর থেকে ওই ঝুড়িটা নাবিয়ে দাও তো নাতি। কেন মিথ্যে পড়ে থেকে সিটে হবে? আর আগেই ভাজিয়ে নিয়েছি। বৌমাতে আর বামুনঠাকুরেতে মিলে হুটপাট করে—

কচুরির ঝুড়ি নামল।

রীতিমত ঝুড়িই। এলাহী কারবার তার মধ্যে। ঝুড়িভর্তি কচুরি। ঢাকা খোলার সঙ্গে সঙ্গেই মনে হল, 'বড়বাজারের দোকানের আসল কাবলী হিং-এর' কথাটা 'গল্প' নয়। দেখা গেল কচুরি বণ্টনের জন্য গোছাভর্তি শালপাতাও এসেছে। আর অ্যালুমিনিয়মের টিফিন-ক্যারিয়ারে সেই 'অন্য প্যাটার্নের' আলুরদম। লালচে সোনালী রঙের ইয়া ইয়া আস্ত নৈনিতাল আলুর। যে আলু এখন বাজার থেকে লুপ্ত হয়ে গেছে। হিমঘরে বন্দিনী নৈনিতালেরা এখন মিঠে আলুতে পরিণত।

সীটে একটু জায়গা করে নিয়ে শালপাতা পেতে পেতে খাবার সাজান। যেন নিজের নিতান্ত নিকট আত্মীয়ের জন্যেই সাজাচ্ছেন। তিন-চার রকম মিষ্টি, কচুরি, আলুরদম, পাশে পাশে একটু করে আমের আচার, মটরের ঘুগনি, এমন কি নুন কাঁচালঙ্কা।...দেখতে থসথসে, হাত খুব দ্রুত। ঝকঝকে মোটাসোটা—গোছা ভর্তি সোনার চুড়ি পরা হাতটাও যেন দেখতে পেলাম।

একটি করে সাজান, আর এক-একজনের সামনে গিয়ে ধরেন।...বলা বাহুল্য সকলেই যে উন্মুখ আগ্রহে হাত বাড়ায় তা নয়। কেউ অপ্রতিভ হয়ে না না করে, কেউ 'এত না এত না, কিছু তুলে নিন' বলে ব্যস্ত হয়। কিন্তু সফল হয় কি?

যে মহিলা বহু ব্যয়ে, বহু আয়োজনে এবং এতখানি আয়াস স্বীকার করে, এই খাদ্যসম্ভার বয়ে নিয়ে এসেছেন শুধু সহযাত্রীদের ভোগ চড়াবার জন্যে, তিনি কি আর ওইটুকুতেই হার মানবেন?

শেষ পর্যন্ত অতি অনিচ্ছুক শেষ ব্যক্তিটিকে পর্যন্ত (সকলেই কিছু আর পরের জিনিস নিতে খেতে ভালবাসে না) খাইয়ে ছাড়লেন, পুরো না হোক, কিছুও।

ভাজা সহ্য হয় না? ঠিক আছে, শুধু মিষ্টিই খাও।...এইসব মিষ্টিও সহ্য হয় না? বেশ, না হয় শুধু সন্দেশই খাও। ভীম নাগের কড়াপাক আছে সঙ্গে।...না না, মনে কোনো দ্বিধা রাখবেন না। পাছে কেউ 'না না' করেন, তাই সব আমার বাড়িতে বালগোপালকে ভোগ দিয়ে এনেছি। এ জিনিস কেউ অবহেলা করতে পারবে না তো!

~ www.amarboi.com ~

অতঃপর ঘণ্টায় ঘণ্টায় ভোগ চড়তে থাকে সহযাত্রী-যাত্রিণীদের। সীটের তলা থেকে বেরোয় বর্ধমানের অবদান, পেতলের কৌটো থেকে মহিলার নিজস্ব অবদান ছানার জিলিপি, জার্মান সিলভারের কৌটো থেকে এক অভিনব জিনিস 'মেমারির অবাক জলপান'। এ নাকি বিখ্যাত। জানা ছিল না এই খ্যাতির খবর, তবে দেখলাম খ্যাতির যোগ্য!

মহিলা এতক্ষণ পর্যন্ত আমায় পেরে ওঠেননি, শেষ পর্যন্ত জিতলেন।

আমিও 'আপনার দলে গাড়িতে খাই না'—বলে বলে কাটাচ্ছিলাম, কিন্তু তাঁর মিনতি বচন, আকুলতা, আগ্রহ, অথবা সাদা বাংলায় নাছোড়বান্দা ভাব দেখে বিখ্যাত এই অবাক জলপানে হার মানতে হল।

হি হি করে হেসে বললেন, আরে বাই এ তো জলও নয় পানও নয়, শুধুই অবাক। এ খেলে দোষ নেই। এই তো হাওয়া খাচ্ছেন? এও খাওয়া!

অতএব ওঁকেই চেপে ধরেছি, কই আপনি নিজে খাচ্ছেন কি? যদি শুধুই 'অবাক' তো খান?

বললেন, আমার যে ভাই সে উপায় বন্ধ। শ্বশুরের বারণ। ঠেলি কি করে?

শ্বশুরের বারণ!

হ্যাঁ, সেই কোন্ কালে। বাপেরবাড়ি ছিল দানাপুরে, বিয়ে হয়ে কনেবৌ বর্ধমানে আসছি—সঙ্গে শ্বশুর। একগলা ঘোমটা দিয়ে বসে ঘামছি। সঙ্গে ছোট ভাইও আসছে। বলল, দিদি, মা আলাদা করে মিষ্টি দিয়েছেন, বলেছেন তোর তেষ্টা পেলে দিতে। দেবো এখন?...সঙ্গে শ্বশুর আর শ্বশুরপুত্তুর, কোন্ দিকে মাথাটা নাড়ব ভাবছি—হঠাৎ ঘোমটার ছাউনি থেকে শ্বশুরের গলা কানে এল, না না, খাওয়াটাওয়া সেই বর্ধমানে গিয়ে কাপড়চোপড় বদলে হবে। 'মেয়েছেলে'কে রথে পথে খেতে নেই।...কথাটি মনে রেখো বৌমা। এটা শাস্ত্রবাক্য।

ব্যস হয়ে গেল জন্মের শোধ!

আর এই কলকাতায় দোকানের খাবার খাওয়াটাওয়া, সেও কি শ্বশুরের বারণ?

মহিলা গালে অজস্র টোল পড়িয়ে হাসিতে ফেটে পড়েন।

তা অবিশ্যি নয়। তবে একটা ব্যাধি থেকেই নানান উপসর্গ এসে জোটে, এই আর কি।...বিচার বাড়তে বাড়তে শুচিবাই।

একটা চপল মেয়ে বলে ওঠে, ও দিদিমা, যখন শ্বশুর আপনার তেষ্টার সময় মিষ্টিরহন্তারক হলেন, তখন শ্বশুরপুত্রটি কিছু বললেন না?

শ্বশুরপুত্তুর! হাসালে দিদি, সে কি আজকের আমল? নতুন বিয়ের বর বৌয়ের বিষয় কথা বলবে? গুরুজনের আসনে তো 'দারুভূত মুরারি'! বৌয়ের পানে তাকিয়ে দেখবার সাহসটুকুও নেই।...বাপের ভয়ে কাঁটা। আমার ভাগ্যি যে কোনদিন বাপ বলে বসেননি, বৌকে ত্যাগ কর। তাহলেই তো—

আবার সেই হাসি।

~ www.amarboi.com ~

আজকাল শুনতে পাই, কথায় কথায় উচ্ছ্বসিত হাসি নাকি একরকম নার্ভের রোগ। নার্ভরা বাগ মানে না। হবেও না। বেঞ্চের ধার থেকে একটা বৌ ফট করে বলে উঠল, সেই শ্বশুরটি আছেন এখনও?

না, না! কবে তামাদি হয়ে গেছেন।

বৌটি বলল, তা সেই কনেবৌ থেকে আপনি এই অবধি শ্বশুরের সেই নিষেধ পালন করে আসছেন? সেটা আর তামাদি হয়ে যায়নি?

মহিলার আবার সেই গালভরা হাসি, ও বাবা, একে শ্বরের বাক্য, তায় শাস্তবাক্য। ও কি আর তামাদি হবার জিনিস?

গাড়িতে হাসির বন্যা বহে যায়।

মহিলা গাড়িতে ওঠা পর্যন্তই ক্ষণে-ক্ষণেই হাসির বাতাস বইছিল।

'নিষ্পরকে খাওয়াবার জন্যে এত আকুলতা? এ মাসিমা আপনিই দ্যাখালেন।'...'আমরা যেন সবাই আপনার কুটুমবাড়ির লোক। তাই খাবার জন্যে এত সাধ্য-সাধনা।'...'ও বাবা, এ যে আবার নতুন মাল বেরোচ্ছে।...খেয়ে নিন মশাই, খেয়ে নিন। 'না' করবেন না। জীবনে এমন সুযোগ আর পাবেন না।'...'সুযোগ বলবেন না। বলুন অহেতুক স্নেহ।...কিন্তু আমরা কি দিদিমা জগন্নাথ? তাই বাহান্নভোগের ব্যবস্থা?'

*   *   *

এক একটা কথায় এক একবার হাসির দমকা হাওয়া যায়।...অনেকেরই দেখেছি পথেঘাটে রেলগাড়িতে মজা করে কথা বলা, কায়দা করে কথা সাজানোর প্রবণতা। তাঁদের পক্ষে ক্ষেত্রটা বেশ অনুকূল হয়েছিল।

একজন কট্টর বিধবা মহিলা, 'আমিও রেলগাড়িতে জলস্পর্শ করি না' বলেও, 'বালগোপালের প্রসাদ' শুনে, 'ভীম নাগের কড়াপাক' উদরস্থ করলেন। তবে জলস্পর্শ অবশ্য করলেন না, ঢোক গিলে সামলে নিলেন।...

হ্যাঁ, এসব বোকার মত কাজকারবার ছিল তখনও।...'মাকড় মারলে ধোকড় হয়' এই সহজ বুদ্ধিটা তখন সবাইয়ের মাথায় আসেনি। যাই হোক—সেই বিধবা মহিলাই হঠাৎ বলে বসলেন, অ্যাতোই যদি পয়সাবিষ্টির শখ, তো ভূতভোজন না করিয়ে কাশীতে গিয়ে কোনো মঠেমন্দিরে সাধুদের 'ভাণ্ডারা' দিলেই হয়।...

লালপাড় গরদে আর সিঁদুর-লেপা কপালে উজ্জ্বল মহিলা গালভর্তি হেসে বলে উঠলেন, আমার দিদি এইসব পথে জুটে যাওয়া ছেলে-মেয়ে বৌ-জামাই নাতি নাতনীই আমার কাছে সাধু সন্ত মন্দিরের বিগ্রহ।...ভাণ্ডারা খাওয়া সাধুরা আমায় এমন করে ভালবাসবে? মনে রাখবে? মাসিমা দিদিমা বলে ডাকবে?

*   *   *

তবে কি অতৃপ্ত স্নেহক্ষুধার পরিতৃপ্তির আশায় এই বাতিক? কিন্তু তাই বা কী করে বলা যায়? পতিপুত্রহীনা অভাগিনী তো নয়ই? অবহেলিতাও যে নয়, তা তো গাড়িতে উঠিয়ে দিতে আসা ছেলেদের বাক্যবিন্যাসেই বোঝা গেল।

~ www.amarboi.com ~

এক যদি স্বামীর ব্যবহার—

কিন্তু সে সন্দেহরও নিরসন হল পরবর্তী কথায়। সব প্রস্থ সাঙ্গ করে মহিলা যখন কুঁজোর জলটুকুও সাঙ্গ করে সেকালের সেই লম্বাউঁচু বার্লির কৌটো খুলে এলাচ দারচিনি মিশ্রিত সুপুরি মৌরি বার করতে বসলেন, তখনই আক্ষেপের সূত্রে যে প্রসঙ্গ তুললেন, একটাই দুঃখু থেকে যায়, তোমাদের ওই আসল জিনিস, চা-টাই খাওয়াতে পারি না।...কর্তাকে বলি দুটো বিগ্ সাইজের থার্মোফ্লাস্ক কিনে দাও না বাপু, তাহলেই আক্ষেপ মেটে।...তা কর্তা বলেন কি, ফ্লাস্ক আর কত বিগ্ সাইজের হবে যে তোমার মনের আক্ষেপ ঘোচাতে পারব, তার চেয়ে বল তো একটা চা ভেণ্ডার হয়ে পড়ে তোমার সঙ্গে সঙ্গে রেলগাড়িতে গিয়ে উঠিগে—

অতএব মনে হয় না কর্তার সঙ্গে বিচ্ছেদ।...আর তেমন হলে কি মুখে এই অনাবিল হাসি ফুটে ওঠে?

তবে? ধরেই নিতে হবে, এ বস্তু অতৃপ্ত স্নেহক্ষুধার পরিতৃপ্তির প্রচেষ্টা নয়, এ হচ্ছে এক অফুরন্ত হৃদয়-ঐশ্বর্যের বর্ণাঢ্য প্রকাশ।

অথবা সাধু ভাষা ছেড়ে সাদা বাংলায় বলতে পারা যায় এ একটা 'হবি'।

'হবি'র জন্যে কী না করে লোকে?

পাহাড়ে চড়ে, পাথারে সাঁতার দেয়।...তবে এমনটি আর দেখিনি।

তা কবে যেন ওই 'হবি'র প্রসঙ্গেই, একদিন এক পারিবারিক সম্মেলনে, অনেকদিন আগের দেখা সেই 'হবিবতী' মহিলাটির গল্পটি করে বসেছিলাম! এবং দুর্মতির বশেই বোধ হয় বলে ফেলেছিলাম, 'হবি' বললে 'হবি'। তবে এ 'হবি'র প্রেরণাটা অগাদ হৃদয়-ঐশ্বর্যের প্রকাশ।

কেন জানি না বলার সঙ্গে সঙ্গে সে সভায় যেন মৌচাকে ঢিল পড়ল।...অবজ্ঞা আর অসন্তোষের যে গুঞ্জনধ্বনি উঠল, তা নেহাত মৃদুও নয়।

একজন অবশ্য একটিমাত্র লাইনের মনোভাব প্রকাশ করল, 'গল্পের গরু গাছে ওঠে।'

জীবনভোর গল্প লিখে চলেছি, ওটাই তো পেশায় দাঁড়িয়েছে, গরুকে কখনো গাছে উঠিয়েছি বলে মনে পড়ে না। তবু শুনতে হল এ মন্তব্যটি! কারণ বলেইছি তো সম্মেলনটি পারিবারিক।

অন্য একজন আবার বিশদবচনে বলল, ভাল করে খোঁজ নিলেই জানতে পারতে, মহিলাটি পাগল। পাগলকে বাড়ির লোক প্রশ্রয় না দিয়ে কী করবে? যতক্ষণ গারদের বাইরে থাকবে, তার মাথা ঠাণ্ডা রাখার চিকিৎসা তো করতে হবে? সেই হিসেবেই রাস্তার লোকের জন্যে ছানার জিলিপি, ভীম নাগের সন্দেশ, কড়াই সুঁটির কচুরি সাপ্লাই।...পয়সাকড়ি ছিল কর্তার, চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছে।

তা হবে।

একটু হেসে বললাম, তবে হৃদয়ধনে যারা একটু বেশী ধনী হয়ে জন্মায়, তাদেরই 'পাগল' বলাটা পৃথিবীর চিরকালের রেওয়াজ। বেশী ভালর দিকে চোখ পড়লেই তো

~ www.amarboi.com ~

নিজের দৈন্যটার দিকে চোখ পড়ে যায়।

ও বাবা! এ যে তত্ত্বকথায় এসে গেলে। ভ্‌্রেরও একটা মাত্রা থাকা দরকার, বুঝলে? তা নয়, এ এক রকমের আত্মপ্রেম। নিজেকে বিকশিত করবার বিলাস।...

এই হাস্য-পরিহাসের মধ্যে কেন জানি না, একটি সম্পর্কিতা বধূমাতা এ কথায় হঠাৎ অহেতুক ক্রোধে ঠিকরে উঠে বলে ওঠেন, রেলগাড়িতে যখন ইন্টার ক্লাস ছিল, তখন টাকায় চার সের চিনি পাওয়া যেত পিসিমা! তখনকার আমলে এরকম হৃদয়-ঐশ্বর্যের পরাকাষ্ঠা দেখানোটা কি খুব শক্ত ছিল? শুনতে পাই নাকি তখন তিন-চার টাকা মণে বাসমতী চাল পাওয়া যেত, তিন টাকা গঙ্গার ইলিশের জোড়া! আমাদের মত আট টাকা কিলোর চিনি কিনে খেতে হলে আর প্রাণ অত গড়ের মাঠ করতে হত না, বুঝলেন?

বলেই ছেদ না দিয়ে সে রাগ-রাগ গলায় বর্তমানের জীবনযাত্রা নির্বাহের 'অবশ্য প্রয়োজনীয়' জিনিসগুলির প্রত্যেকটির নাম ধরে ধরে দাম কষতে শুরু করল।...সেই দামের অঙ্ক শুনে শুনে মাথা ঝিমঝিম করে আসতে বাধ্য। সেই মাথায় আর হৃদয়-ঐশ্বর্যের কথা ভাবা যায় না।

* * *

কিন্তু সত্যিই কি শুধুই তাই?

শুধুই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির ঘাড়ে সব দোষ চাপিয়ে আপন দৈন্যের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে থেকে, নিশ্চিন্তে নিঃশ্বাস নেওয়া যায়? দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিতে কি এ যুগের বিলাসিতা কিছু কমেছে? জীবনযাত্রায় আড়ম্বরে কিছু ঘাটতি ঘটছে? চাহিদাকে কিছু ছাঁটতে পারা যাচ্ছে?

তবে?

তাহলে এই সেদিন ওই রেলগাড়িতেই আর একটি যে 'নাটক' অভিনীত হতে দেখলাম, তার কি ব্যাখ্যা দেব?

* * *

বেশী নয়, এই ক'দিন আগেই।

যাচ্ছিলাম কোনো এক জায়গায়।...কেন, কোথায়, কী বৃত্তান্ত সে সব কথা থাক, মোটের মাথায় রাতের গাড়ি। এবং সারারাতের গাড়ি। যারা আমায় ধরে নিয়ে যাচ্ছে তারা আমাকে একখানি প্রথম শ্রেণীর চার-বার্থ কামরায়, একটি লোয়ার বার্থে (সে ছাড়া আর গতি কী?) স্থাপনা করে রেখে, আমার সুবিধা-অসুবিধা নিয়ে অনেকটা মাথা ঘামিয়ে, একগাল হেসে বলে গেল, কিছু ভাববেন না, আমরা অন্য গাড়িতে রইলাম। এই পাশেই।

'অন্য গাড়ি'র রহস্য অজ্ঞাত নয়, কাজেই সে সম্পর্কে দ্বিতীয় প্রশ্নও শোভন নয়। এ অভিজ্ঞতা তো আছেই।

কাজেই—

হ্যাঁ, কাজেই হাসির বিনিময়ে হাসি।

ওরা চলে যাবার পরই এ কামরায় এসে ঢুকল একটি নেহাত সাধারণ চেহারার আর

~ www.amarboi.com ~

সাদাসিদে সাজের রোগামত বৌ, কোলে একটি বাচ্চা। পিছনে একটি সাধারণ চেহারারই ছেলে, সঙ্গে জিনিসপত্র নেই বললেই চলে। ছোটগোছের একটা কিট্‌ব্যাগ জাতীয়। বৌটি তো ঢুকেই বাচ্চা নিয়ে আমার সামনের দ্বিতীয় লোয়ার বার্থটায় বসে পড়ে একটা নিঃশ্বাস ফেলল। যেন বসে বাঁচল।

পিছনে আসা ছেলেটি বলে উঠল, এই তো—যা চাইছিলে পেয়ে গেলে। গাড়িতে ইনি রয়েছেন বয়স্ক মানুষ। ঠিক তোমার মাসিমা পিসিমার মত। নাঃ বৌদি, তোমার লাকটা ভালই। একা গাড়িতে কী করে যাবে বলে ভেবে আকুল হচ্ছিলে। এখন দ্যাখো আর কোন ভয় ভাবনা রইল না। আমি তাহলে অন্য গাড়িতে রইলাম। পাশেই।

বলেই হঠাৎ আমায় একটা পেন্নাম ঠুকে বলল, আচ্ছা মাসিমা, এরা তাহলে রইল, আমার বৌদি আর ভাইপো। দেখবেন একটু। ভারী ভীতু মানুষ। আচ্ছা বাপী, টা টা!

নেমে গেল।

কিন্তু গাড়ির আর দুখানা বার্থের দাবিদার কই? দেখা নেই কেন? ট্রেন মিস করল নাকি?

অগত্যা মেয়েটির সঙ্গে আলাপ করতে চেষ্টা করি।

প্রথম তো ছেলের নাম জিগ্যেস করা দিয়ে শুরু। অতঃপর যা নিয়ম, কোথায় যাচ্ছে। জানলাম যাচ্ছে আমারই গন্তব্যস্থলে। তবে যাচ্ছে নয়, ফিরছে বরের বাসায়। কলকাতায় শ্বশুর শাশুড়ী দ্যাওর সবাই আছেন, শ্বশুরের অসুখ শুনে দেখতে এসেছিল বরের সঙ্গে। ছুটি ছিল না বেশী, বর ফিরে গেছে, এখন শ্বশুর ভাল হয়ে ওঠায় দ্যাওর দুদিন ছুটি নিয়ে পৌঁছতে যাচ্ছে।

একেবারে চিরপরিচিত ঘরোয়া বাঙালী পরিবারের শান্ত ছবি। দেখে বড় ভাল লাগল। এসব ছবি তো বিলোপের পথে।

বৌটি বলল, রাতের গাড়ি, একা আসতে হবে শুনে এত ভয় করছিল।...তা আমার দ্যাওরের এক বাড়তি শখ হল, ভিড়ের গাড়িতে বাচ্চাটার কষ্ট হবে—বাতিক। চিরকালই তো থার্ড ক্লাসে যাচ্ছি আসছি।

একটু হেসে বললাম, এখন আর 'থার্ড ক্লাস' বোলো না, থার্ড ক্লাস উঠে গেছে।

উঠে গেছে! ওমা!

বললাম, তার মানে তিনটে দাঁড়ির একটা দাঁড়ি মুছে দিয়েছে। সেইগুলোই সেকেণ্ড ক্লাস হয়ে গেছে।

তাই বুঝি? তা তাতে কী লাভ হল মাসিমা?

হাসলাম, সে বোঝাতে গেলে অনেক।

গাড়ি ছাড়ে ছাড়ে, প্ল্যাটফর্মে ব্যস্ততা।

ও বলল, গাড়িতে শুধু এই আমরা দুজন? ব্যঙ্কের লোকেরা এলো না?

উপরদিকে তাকাল।

ওটাকে যে 'বাঙ্ক' বলতে নেই, বলতে হয় আপার বার্থ এটাও বলে দেওয়া ভাল

~ www.amarboi.com ~

কিনা ভাবছি, সহসা প্রায় নড়ে ওঠা গাড়িতে হুড়মুড়িয়ে ঢুকে পড়লেন অতি স্মার্ট চেহারার অতি অভিজাত বেশভূষায় ভূষিত এক অবাঙালী দম্পতি। সঙ্গে দুটো কুলির মাথায় বিরাট লটবহর।

কুলিদের কলরোল ধাক্কাধাক্কি, করিডোর দিয়ে দ্রুত অত মালপত্র টেনে এনে ঢুকিয়ে দেবার চেষ্টা, তার সঙ্গে 'মেমসাহেবে'র ইংরাজিতে তীক্ষ্ণ প্রশ্ন, সব উঠেছে কিনা, তার সঙ্গে সব কিছু মিলিয়ে নেবার আপ্রাণ চেষ্টায় সাহেবের গলদঘর্ম অবস্থা, এর ভিতরেই গাড়ি ছেড়ে দিল।

কুলিরা চলন্ত গাড়ি থেকেই নেমে গেল।

মেমসাহেব কামরায় ঢুকে এসেই ভুরু কুঁচকে ইংরাজিতেই সাহেবকে কী যেন বললেন, হাত উল্টে ঘড়িটা দেখে নিলেন, তারপরই মেয়েটির কাছে এসে তীব্র বিরক্তির কণ্ঠে খাঁটি বাংলার বলে উঠলেন, এর মানে? আপনি এখানে কেন? আপনার নিশ্চয় আপার বার্থ!

হরি! হরি! নির্ভেজাল বাঙালীনী!

আর আমি ভাবছি—

গাড়িতে ওঠার সময় থেকেই তো মুখে ইংরিজি বুলির খই ফোটাচ্ছিলেন।

আবারও ফোটালেন, বরের দিকে তাকিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হেনে যা বললেন, তার অর্থ হচ্ছে—তোমার জন্যেই এই বিপত্তি। লাস্ট মোমেন্টে তুমি গেলে তোমার বোতল কিনতে। অথচ আমি আগে থেকে ব্যবস্থা করে রেখেছি।...না না, আমি আর এক মিনিটও সহ্য করব না। এত টায়ার্ড লাগছে, দাঁড়াতে পারছি না।...এই শুনছেন, আপনার সীটে চলে যান।

বৌটি অসহায় মুখে বলল, কী বলছেন?

আঃ! এ আচ্ছা বুদ্ধু তো। বলছি—এ সীটটা আপনার নয়, আপনার ওই ওপরে। নম্বর দেখে ওঠেননি? আশ্চর্য! রাত নটার পর আর নেমে বসা চলে না, সেটুকুও জানেন না?

বৌটি আরও অসহায় ভাবে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, আমাকে তো আমার দ্যাওর এইখানেই বসিয়ে দিয়ে গেল। ওই মাসিমা সব বলতে পারবেন।

হায় বেচারী! এই মাসিমা তো যা বোঝবার তো বুঝেই গেছেন। আর কি বলবেন? এখন উপায় শুধু ওই নবাগতার করুণা। কিন্তু ওই উগ্র সাজসজ্জায় মণ্ডিত, তীক্ষ্ণনাসা কুঞ্চিতভ্রূ মহিলার কাছ থেকে সে বস্তুর আশা কোথায়?

তবু বিবেকের দ্বারা চালিত হয়েই সেই অসম্ভব কাজটা করতে হল। মনে পড়ল, ছেলেটি বলে গেছে 'মাসিমা এদের দেখবেন'।

অতএব সাহসে ভর করেই বলতে হল, মনে হচ্ছে কিছু ভুল হয়ে গেছে। নইলে এর-সঙ্গে যখন এতটুকু বাচ্চা, তখন আপার বার্থ নেবার তো কথা নয়।

তীক্ষ্ণনাসা চশমার মধ্যে থেকে তীব্র হেনে বললেন, ইনি আপনার সঙ্গে এসেছেন?

~ www.amarboi.com ~

না না হাসলাম একটু, এইমাত্রই দেখলাম।

তাহলে আর আপনার এ নিয়ে বলার কী আছে?...ভুল হয়ে গেছে বললেই তো সব ঠিক হয়ে যায় না। না না, উঠুন উঠুন, উঠে যান। ওইটা আপনার জায়গা।

ইতিমধ্যেই মালপত্র ম্যানেজ করে ফেলে 'সাহেব' উচ্চচূড়ায় উঠে বসেছেন।

অনেকদিন পরে একটা কথা মনে পড়ল, 'দারুভূত মুরারি'।

বৌটি প্রায় কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল, ছেলে নিয়ে বাঙ্কে উঠব কী করে?

বাঙ্কে? চৌধুরী! শুনছ? মহিলা অসহিষ্ণু গলায় বললেন, তা আমি কি জানি? আপনাকে যাঁরা উঠিয়ে দিয়ে গেছেন, তাঁরা কি বুদ্ধু? কোন্ বার্থ রিজার্ভ করেছেন জানেন না? তা তো নয়, এ ইচ্ছাকৃতই।...কিন্তু এসব প্যাঁচ সব জায়গায় চলে না, বুঝলেন? উঠুন বলছি শীগ্‌গির।

মানসম্মানের মাথা খেয়ে আবার ও মহিলার করুণা ভিক্ষার চেষ্টা করলাম। বললাম, আমার পক্ষে আপারে চলে যাওয়া সম্ভব হলে, কোনো সমস্যাই হত না। কিন্তু এখন আর—একটু হাসলাম, সত্তর পার করে ফেলেছি।

নিজে সাফার করতে পারছেন না যখন, তখন আর অপরের ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন কেন? বলেই মেমসাহেব বৌটির সেই ব্যাগটা অবহেলায় মাটিতে নামিয়ে দিয়ে বলে উঠলেন, চৌধুরী, একবার নেমে এস তো, জোর করে তোলানো ছাড়া উপায় নেই। এ হচ্ছে মফঃস্বলী ত্যাঁদোড়!

লিপস্টিক-রঞ্জিত সেই রক্তাক্ত ওষ্ঠাধর থেকে এই অখদ্যে গ্রাম্য শব্দটা বেরোলোও তো, আশ্চর্য!

'চৌধুরী' বংশবদের ভঙ্গীতে মুহূর্তেই নেমে এলেন বটে, কিন্তু চট্ করে 'ফাইটে' যোগ দিলেন না, খুব নিম্নস্বরে কি একটা বললেন। বোধ হয় মাতৃভাষায় নয়।

কিন্তু উত্তরে মাতৃভাষার প্রচণ্ড প্রকাশ দেখতে পাওয়া গেল। মহিলা যেন ছিটকে উঠে বলে উঠলেন, থামো থামো! তোমার এখনো এদের চিনতে দেরি আছে। আমার আর চিনতে বাকি নেই। এরা হচ্ছে ঘোড়েল নাম্বার ওয়ান। ন্যাকাবোকা সেজে সুযোগটি আদায় করে নেয়। আদৌ টিকিট আছে কিনা দেখো।

এবার বৌটি ক্ষুব্ধভাবে উঠে দাঁড়াল, টিকিট নেই মানে? টিকিট না কিনে উঠেছি?

তাও ওঠে অনেকে। কই দেখি টিকিট!

আর সহ্য হলে না। যদিও আমার মাথা ঘামানো নিষেধ, তবু বলে উঠলাম, দেখতে হলে চেকারকেই দেখাবে। আপনাকে কেন?

মহিলা আমার দিকে একটা অবজ্ঞা-দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলেন, দয়া করে অপরের ব্যাপারে নাক গলানোটা ছাড়বেন? আমার সীট বেআইনী দখল করে বসা আমি বরদাস্ত করব কেন?...চৌধুরী, দরদ দেখাতে এসো না।...

ছেলেটা যদি পড়ে যায়?

কোলে নিয়ে জেগে বসে থাকুন, এতই যখন ভয়!

~ www.amarboi.com ~

অতঃপর আর কী?

সাহেব মেমসাহেবের সমবেত চেষ্টায় বৌটির জিনিসপত্র মায় পুত্র, আপার বার্থে উঠে গেল। সাহেব, মেমসাহেবকে ন্যায্যভূমিতে সুকোমল বিছানা বিছিয়ে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়ে আবার উচ্চচূড়ে উঠে গেলেন।...এবং আরো কিছুক্ষণ পর্যন্ত মেমসাহেবের বিরক্তিপূর্ণ স্বগতোক্তির পর ঘরে কিছুটা শান্তি নামল। যার মধ্যে সংকল্প ঘোষণা চলেছে, চেকার উঠলে ওই গাঁইয়া মেয়েমানুষটার কি দুর্গতি তিনি করবেন, তা দেখিয়ে ছাড়বেন।...কে জানে স্মাগলারের সহকারিণী কিনা। এত ন্যাকাবোকা মেয়েমানুষরা কখনো একা ট্রেনজার্নি করে? ব্যাপারটা রীতিমত সন্দেহজনক।

স্বগতোক্তি এইজন্য যে সাহেব শুয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই এমন আশ্চর্য তৎপরতার সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়েছেন যে, জবাবের অভাবে মিসেসের উচ্চ প্রশ্ন ফিরে আসছে।

আমার ঘুম নেই।

আপার বার্থ লোয়ার বার্থ নিয়ে নির্লজ্জ অনুদারতা দেখা এই নতুন নয়। 'শিশু বৃদ্ধ রোগী, বয়স্ক মহিলা' কোনো কিছুই খাটে না, আসল অধিকারীর পাষাণপ্রাণ গলে না। দেখা দৃশ্য। আমার ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে এই ছোট্ট কামরাটার মধ্যে আটকে থাকা একমুঠো রুদ্ধ বাতাসটায় বিদেশী পারফিউমের ভারী গন্ধের বিচরণ!

*   *   *

দুঃখ হচ্ছে মাত্র কয়েক বছর আগে হলেও, ওই বেচারী মেয়েটার প্রতি এ দুর্ব্যবহার হতে দিতাম না।...তাছাড়া এই ভয়ে ঘুম আসছে না—মায়ের ঘুমের অসতর্কতায় বাচ্চাটা পড়ে যাবে না তো?

বার্থ নিয়ে নির্লজ্জতা দেখা নতুন নয়, কিন্তু আর একটা নতুন দৃশ্য দেখা বাকি ছিল।...অনেকক্ষণ পরে—হয়তো ঘুম এসেই গিয়েছিল, সেটা ভেঙে গেল বাচ্চাটার প্রবল কাশির শব্দে। দম আটকে যাবার যোগাড়।

ব্যস্ত হয়ে বলি, ওকে একটু জল খাইয়ে দাও না মা।

সঙ্গে সঙ্গে চৌধুরী সাহেবও বলে ওঠেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, একটু জল খাইয়ে দিন।

এ কি হৃদয়বত্তার প্রকাশ?

না মেমসাহেবের ঘুমের ব্যাঘাত নিবারণের জন্য দ্রুত প্রচেষ্টা?...পাপ মন, শেষেরটাই মনে হয়, কারণ ছেলেটা তখনো সেই দমবন্ধ কাশি কেশে চলেছে।...হৃদয়বত্তাই যদি হবে তো সে হৃদয়কে কি তখন চাবি লাগিয়ে 'লকারে' পুরে রেখেছিলেন সাহেব? যখন সপুত্র জননীকে ওপরে চালান করে দেবার ব্যাপারে হাত লাগিয়েছিলেন?

কিন্তু জল খাওয়ানোর প্রস্তাবে বৌটি ক্ষীণস্বরে যা বলল তার অর্থ হচ্ছে, সঙ্গে জলের সঞ্চয় নেই।

হায়! হায়! আমারও যে নেই সে সঞ্চয়।

যারা নিয়ে যাচ্ছে তারা আমার জন্যে জল জল করে ব্যস্ত হয়েছিল, আমি নিবৃত্ত করেছিলাম 'লাগবে না' বলে। ইস! যদি নিবৃত্ত না করতাম! কাশতে কাশতে গলা চিরে

~ www.amarboi.com ~

যাবার জোগাড় হচ্ছে ছেলেটার। আহা কতই বা বয়েস, বছর দুইও নয় হয়তো। এত কেশে কাহিল হয়ে পড়বে ক্রমশঃ।

এত অস্থিরতা বোধ করি যে আবারও ওই অ-সভ্য সভ্যযুগলকে ডেকেই কথা বলতে বাধ্য হই, আমার কাছেও তো নেই জল, আপনাদের বট্‌ল থেকে যদি—

ঢুকেই দেয়ালের হুকে একটি অতি সুদৃশ্য ও দামী ওয়াটারবট্‌ল ঝুলোতে দেখেছি।

তা কোন্ জিনিসটাই বা এঁদের দামী আর সুদৃশ্য নয়? বহুবিধ বিচিত্র ব্যাগ সুটকেস এবং ক্যামেরা টেপরেকর্ডার রেকর্ডপ্লেয়ার ফোল্ডিং বিছানা ইত্যাদি করে যা কিছু এনে ঢোকানো হয়েছে, সব কিছুতেই দামের এবং রুচির ছাপ।

কে জানে এত সব নিয়ে বেড়াতে যাচ্ছে, না বাস করতে যাচ্ছে! মুহূর্তেই এই চিন্তাটা মাথায় এল, আর মুহূর্তেই সে চিন্তার উপর একটা থাপ্পড় পড়ল। মেম সাহেবের বেজার গলার স্বগতোক্তি কানে এল, আশ্চর্য! 'সেন্স' বলে কি কিছুই থাকতে নেই? 'বাচ্চা' এনেছে, সঙ্গে জল আনেনি! এদের শিক্ষা হওয়াই উচিত! জল নেই!

আর একটু অস্ফুটে, এই সব 'মাল' আসে ফার্স্ট ক্লাসে চাপতে!

ইত্যবসরে কিন্তু চৌধুরী হাত বাড়িয়েই জলের পাত্রটা হুক থেকে খুলে মুখে ঢাকা গ্লাসটায় জল ঢেলে বৌটির হাতে এগিয়ে ধরেন।

মেমসাহেবের তিক্ত ব্যঙ্গ মিশ্রিত কণ্ঠ থেকে ঠিকরে ওঠে কয়েকটি তীক্ষ্ণ বাক্য, দেখো বদান্যতা দেখিয়ে যেন সবটাই ফিনিশ করো না। এই গ্যাস্ট্রিকের রোগীটার জন্যে ফোটানো জল তুমি আর যোগাড় করতে পারবে?

মন্তব্য ইংরিজি বাংলায় মিশেল, তবে বুঝতে কি আর অসুবিধে হয়?

কিন্তু মায়ের মত নিরুপায় আর কে আছে? নিরুপায় জননীকে সেই জলই হাত বাড়িয়ে নিতে হয়, এবং ছেলেটা যখন সবটা ঢকঢক করে খেয়ে নিয়ে বলে ওঠে, 'আরো জল'—তখন মাথা হেঁট করে অতি কুণ্ঠিত ভঙ্গীতে বলতেই হয় বেচারীকে, আর একটু খাবে বলছে—

এই কুণ্ঠাই বোধ হয় অপর পক্ষের মধ্যেও একটু কুণ্ঠার সঞ্চার করে, তাই ভয়ে কাঁটা সাহেব পরিণাম চিন্তা না করেই বলে ওঠেন, ঠিক আছে, ঠিক আছে অনেক আছে। আসলে তেষ্টার জন্যেই কাশিটা—

সাহেব জলের পাত্রটাকে আবার হুকে আটকে রাখবার আগে মাথাটা ঝুঁকিয়ে বলেন, রিণা, একটু জল খাবে নাকি?

রিণা তীব্র গলায় উচ্চারণ করেন, না!

তারপর পায়ের কাছে জড়ো করা মাখন-মোলায়েম মখমলি চাদরটা টেনে ভাল করে গায়ে জড়িয়ে পাশ ফিরে শুয়ে, চোখের উপর রঞ্জিত নখ চাঁপারকলি আঙুলগুলি চাপা দিয়ে বলে ওঠেন, দয়া করে এবার আলোটা নিভিয়ে দিতে পারবে? ঘুমের তো বারোটা বেজে গেল!...

নিভল আলো।

~ www.amarboi.com ~

আলো নিভেছে, বাচ্চাটাও চুপ করেছে, আমি না ঘুমিয়েও গভীর ঘুমন্ত, বোধ করি চৌধুরী সাহেবও তাই।...শুধু বেশ কিছুক্ষণ ধরে মাঝে মাঝেই আহত নিদ্রা মেমসাহেবের ক্লান্ত বিরক্ত পীড়িত কণ্ঠের 'আঃ উঃ' শব্দ কামরার নিশ্চিদ্র স্তব্ধতার বুকে পিন ফোটাতে থাকে।...এ ধ্বনি অবশ্যই কাঁচা ঘুম ভাঙা বাবদ মাথার যন্ত্রণার।...

কোনোটাই 'গল্পের গরু নয়', দুটোই প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ! শুধু মাঝখানে একটা দীর্ঘযুগের ব্যবধান।

*　　　*　　　*

সেই পিন্-ফোটানো স্তব্ধতার মধ্যে স্তব্ধ হয়ে ভেবেছি সেই রাত্রে, এই মানসিক দৈন্য কি শুধুই চিনির কিলো আট টাকায় উঠেছে বলে?...কিন্তু 'পৃথিবীর মিনিয়েচার' রেলগাড়ির এই যাত্রীযুগলের কাছে কি দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধিটা একটা প্রশ্ন?

মেমসাহেবের গায়ে জড়ানো ওই মাখন-মোলায়েম মখমলি চাদরটার কত দাম সে তো আমার আন্দাজের বাইরে। আন্দাজের বাইরে এই বাতাস ভারাক্রান্ত করা বিদেশী সুরভিসারের কত দাম। আন্দাজের বাইরে এঁদের সঙ্গের বিচিত্র মালপত্রের পাহাড়ের দাম।

তবে?

তবে এ দৈন্যের ব্যাখ্যা কী?

মনে হয় না কি এই যুগই ক্রমশই মানবসমাজকে হৃদয়সম্পদে দেউলে করে ছাড়ছে!

~ www.amarboi.com ~

বেহায়া

তিথি চলছে আঁধারের, চাঁদের আলোর দাক্ষিণ্য নেই। আকাশ থেকে এসে পড়া কোটি কোটি যোজন দূরবর্তী নক্ষত্রদের আলোটুকুই ভরসা করে দাওয়ার ধারে ভাত খেতে বসেছে অটল ঘোষ।

অনর্থক কেরোসিন খরচা করে 'লম্প' জ্বেলে খেতে বসার বিলাসিতার বিশেষ বিরোধী অটল। মানদা একটু খুঁতখুঁত করে, বলে, আঁদায়ের মদ্যে মুখে গেরাস তোলা। পোকামাকড় কিছু ঢুকে গেলে?

অটল বলে, পোকামাকড়ই বা ঢুকতে যাবে ক্যানো? ভাত বেড়েছিস তো তুই, তোর তো আর আমার মত চক্ষে ছানি পড়ে নাই।

তারপর আবার বুঝ দিতে বলে, দু'চারটে দিন পরেই তো আবার জ্যোছ্‌ছোনার দিন আসবে গো।

তিনপুরুষের ভারী কাঁঠালকাঠের পিঁড়িখানা আর টানতে পারে না বলে একখানা খুরসি পিঁড়ির ওপর হাঁটু উঁচু করে উবু হয়ে বসেছে অটল। এইভাবেই বসে। অথচ অটলের ঠাকুর্দা অর্জুন ঘোষ আশী বছর বয়েস অবধি ওই পিঁড়িটায় বসে ভাত খেয়ে গেছে, আর খেয়ে উঠে চলে যাবার আগে শক্‌ড়িহাত মুঠিয়ে বাঁহাতে পিঁড়িখানাকে তুলে নিয়ে রান্নাঘরের দেয়ালে ঠেসিয়ে রেখে তবে ঘাটে নেমেছে আঁচাতে।

ঠাকুর্দার সেই ভঙ্গীটা যেন চোখ বুজলেই দেখতে পায় অটল। কাঁঠাল-কাঠের পিঁড়িখানার মতই চওড়া মজবুত আর তেল-তেল পিঠখানার রংটাও ছিল তেমনি।

অটলের দেহে সে ঐতিহ্যের ছিটেফোঁটাও নেই। ঠাকুর্দার বয়েস পেতে অটলের এখনো এককুড়ি বছর বাকি, তবু এখনি চোখে 'সর' পড়েছে; কানে তালা পড়ে আসছে। হাঁটু উঁচু করে ভিন্ন বাবু গেড়ে বসতে পারে না।

এ অবস্থা ঘটেছে অটলের অবশ্য কালের গুণে, আর ভাগ্যের দোষে। নইলে কাঠামোখানায় এখনো বংশের ধারার ছাপ মেলে। তবে হাড়সার, এই যা!

বাপ-ঠাকুর্দা দুধ দই ঘি-মাখনের ব্যবসা করে গেছে বটে, তবে নিজেদের জন্যেও তার থেকে কিছুটা বরাদ্দ রেখেছে। ঠাকুর্দার সেই বড় একটা জামবাটি ভর্তি দু'হাতে মুখে তুলে খাওয়ার দৃশ্যটাও এখনো চোখে ভাসে।...বাপের দৈনন্দিনের ছবিটার থেকে ঠাকুর্দারটাই বেশী স্পষ্ট, কারণ ঠাকুর্দার সময়ে অটলের শৈশব-বাল্য। প্রতিক্ষণ 'ঠাকুর্দা'র সঙ্গে সঙ্গে। বাপের আমলে নিজেও ব্যবসায় জুতে গেছে, সর্বদা অত দেখার সুযোগ হত না।...তারপর তো ক্রমশই কালের বদল ঘটেছে।

কালের গুণে গরুতে দুধ ছাড়ে না, পুকুরে মাছ বাড়ে না। গাছের ফলে পূর্বের স্বাদ

~ www.amarboi.com ~

মেলে না। গরুর খাদ্যের দর আকাশ ছোঁয়ার চেষ্টা চালিয়ে চলেছে, গরু চরবার মাঠগুলোয় কলকারখানার ইমারৎ বসছে।...গোয়াল ক্রমেই হালকা হতে বসেছিল, তবু—ব্যবসাটা তো একেবারে লাটে উঠে যায়নি। এখন গেছে, ভাগ্যের দোষে।

এখন শূন্য গোশালটা অটলের হাতবদল হয়ে সাত্যকীবাবুর পোলট্রি হয়েছে। খুব রমরমা। ঝুড়ি ঝুড়ি ডিম চালান যায় রাণাঘাট লোক্যাল ধরতে।

গোশালটা যেদিন বেচে দিতে হয়েছিল, সেদিন অটল উঠোনে পড়ে গড়াগড়ি দিয়ে কেঁদেছিল, সাতপুরুষের জাত-ব্যবসার 'লক্ষ্মীর স্থান' মুরগী চরাতে দিয়ে এলাম খোকার মা!

মানদা মন শক্ত করে বলেছিল, আবার হবে। সব্বস্বান্ত হয়ে নড়তেচো, বেফল যাবে? ধর্ম নাই? ভগমান নাই? লোকের চক্রান্তই বড় হবে?

কিন্তু ক্রমশই যেন বিশ্বাসের মূল শিথিল হয়ে আসছে মানদার। 'ধর্ম আছে, ভগবান আছে'—এমন প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না।

এই কিছুদিন আগেও মানদা অটলের ভাতের পাতে একহাতা দুধ জোর করে ঢেলে দিয়েছে, বলেছে, আপিং খাওয়া শরীল, একছিট্টেখানি দুদ পেটে না পড়লে টেঁকবে কিসে?

কিন্তু এখন আর সেটুকুও জোটে না।

ঝড়তি-পড়তি যে দুটো গরু গোশালা ছেড়ে বাসবাড়ির উঠোনের চালার তলায় আশ্রয় পেয়েছিল, উচিতমত যত্নের অভাবে তাদের দুধের সম্ভার ক্রমেই শূন্যের অঙ্কে পৌঁছচ্ছে, অথচ এখনো তারাই এই সংসারের অন্নদাত্রী।

তবু তো সংসারের আসল খাওয়ার মুখটা—

কথাটা মনে পড়তেই অটল হাতে তোলা ভাতের গ্রাসটা ভাতের থালার ওপরই রাখল।

তিনপুরুষের পিঁড়িখানা বাতিল হয়েছে বটে, কিন্তু তিনপুরুষের এই ভাত খাওয়া পাথরখানা এখনো চলছে।...ঠাকুর্দা অর্জুন ঘোষ শেষজীবনে একবার বারোদোলের মেলায় গিয়ে নিজের জন্যে গাবদাগোবদা অথচ প্লেন পালিশ এই কানাউঁচু পাথরখানা কিনে এনেছিল। বলেছিল, একজন বলতেছেলো, পাতরে ভাত খেলে প্রেরমাই বাড়ে। তো নে এলাম একখান। চেরজম্মো তো কাঁসা-পেতলেই খেয়ে আসতেচি, দেকি যদি পাতরে খেয়ে আর কিছুদিন 'প্রে[illegible]ই' টানতে পারি।...অ্যাকটা বৈ তো ব্যাটা নাই, য্যাদ্দিন খাটি ত্যাদ্দিনই ব্যাবসার লাভ।...

আর বলেছিল, চাকদার এই ঘোষেদের সাতপুরুষ যাবৎ অ্যাক ব্যাটার বংশ, মেয়ে হয় গুচ্ছির, ছেলে অ্যাক বৈ দুই না। কে জানে কোন ভগমানের নিদ্দেশ।...তো ওই একজনাকেই তো খেটেপিটে ব্যবসা রখ্যে করতে হবে।...এই পাতর খানা হাত থে' ফেলে না ভাঙলে, পুরুষানুক্রম চলবে। ঘরের মেয়েছেলেদের হাত সাবধানের দরকার, বংশধরেদের পরমায়ু বেশী হওয়া জরুরি।...অর্জুন ঘোষেদের বিশ্বাসের জগৎ এইরকমই

~ www.amarboi.com ~

ছিল।

বালক অটল বলেছিল, তুমি মরে গেলে, আমি এই থালাটায় ভাত খাব ঠাকুর্দা?

আহা আমার পর তোর বাবা খাবে, তা'পর তুই। আর তা'পর তোর ছেলে, তা'পর তার ছেলে।...হেসে উঠেছিল হা-হা করে।

তা 'ওই' এক ব্যাটার নির্দেশের বিরুদ্ধে ভগবানের বিরুদ্ধে ভগবানের কাছে অনেক নালিশ-ফরিদ মানতটানত করেছিল অটলের ঠাকুমা, পিসি, মা এবং পরে মানদাও। কিন্তু কী এক রহস্য, অটল ঘোষ নিজেও বাপ অঘোর ঘোষের 'এক ব্যাটা' এবং অটল ঘোষেরও—

* * *

প্রাণটা হাহাকার করে উঠল অটলের।

সোম্‌সারের আসল মুকটা নাই অ্যাখোন, কিন্তু আমার পেটের রাক্কোসটা তো মরতেচে না।...এই পাতরে কত সমারোহো করে পাঁচ বেন্নুন সাজিয়ে খেয়ে গেলেন আগের মানুষরা, আর এই লক্ষ্মীছাড়া অটল ঘোষ? পান্তো আর কাঁচালঙ্কা সার, তবু খাওয়ায় বেরাগ বেতরাগ তো আসতেচে না।...কান যাচ্চে চোক যাচ্চে, শরীলের ক্ষ্যামোতা যাচ্চে, অথচো রাবণের চিতুর অগ্নিটা যাচ্চে না।

তা' সত্যি, সংসারে যত দুঃখ-দুর্দশা বাড়ছে, অটলের পেটের জ্বালাটাও যেন ততই বাড়ছে।...ভাত চাইতে মাথা কাটা যায়, তবু এদিক ওদিক তাকিয়ে অমলের বৌটা ধারেকাছে আছে কিনা দেখে নিয়ে মানদার দিকে কেমন বোকাটে দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে, আর দুড়ো হবা নাকি?

আর অমলের বৌ মালতী ঘরের মধ্যে থেকে দাঁতে দাঁত পিষে বলে, পিচাশ! পিচাশ! এখনো অ্যাতো পেটের জ্বালা! হায়া নাই, লজ্জা নাই।

আজও মালতী অটলের জলসুদ্ধু পান্তাভাত মুখে তোলার শপ্‌শপ্‌ আওয়াজ শুনতে পেয়ে মনে মনে বলছিল, ওই 'পাতর' আর বন্‌শের ধারার জন্যি রেকে যাবে না তুমি বুড়ো। নিজিই খেয়ে খেয়ে ক্ষয় করে দে' যাবে। চুলোয় যাক্‌! মালতীর জীবনে সব নতুন হবে।

তারপর আচ্ছন্নের মত আর এক স্বপ্ন দেখতে থাকে মালতী।...ঝকঝকে খাগড়াই কাঁসার নতুন থালায় এক শিশুর অন্নপ্রাশনের ভাত বাড়া হয়েছে, লোক-জনের ভিড়ে ভিড়ারণ্য, মালতী সাজানো-গোজানো সেই ছেলেটাকে কোলে করে বসেছে, দীর্ঘকায় সুন্দর মানুষটা অসুরের মত খেটে বেড়াচ্ছে, আর মাঝেমধ্যে এসে হেসে দুটো কথা কয়ে যাচ্ছে।...বলছে, উঃ! সেই দুঃস্বপ্নের দিনগুলান মনে কর মালতী, আরটু হলে তো হয়েই যাচ্ছিলুম, তো নেয্য বিচারটা হল তাই—

ধড়মড়িয়ে উঠে পড়ল মালতী।

হঠাৎ অটলের গলার একটা আর্তস্বর শুনতে পেল মালতী, কে? কে ওখেনে?

* * *

~ www.amarboi.com ~

হ্যাঁ, প্রায় আর্তস্বরেই চেঁচিয়ে উঠেছিল অটল ঘোষ, যখন উঠোনের ধারে বাতাবিলেবু গাছটার কাছে একটা দীর্ঘ ছায়া দেখতে পেয়েছিল।

কোটি কোটি যোজন দূর থেকে নেমে আসা অনন্তকোটি মৃত আত্মার বিষণ্ণ করুণ দৃষ্টির আলোতেও চিনতে ভুল হয় না, তবু আচমকা ওই ছায়ামূর্তিকে দেখে নিরাপত্তার প্রশ্ন ভুলে চেঁচিয়ে উঠল, কে? কে ওখেনে?

ছায়ামূর্তি, না প্রেতমূর্তি?

হয়তো প্রেতই, নইলে দ্রুত সরে এসে, অটলের ভাত-খাওয়া শক্‌ড়ি মুখটাই চেপে ধরল কি বলে?

* * *

ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে, কপাটে হুড়কো লাগিয়ে দিয়ে চৌকিতে বসে পড়ে অটল হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, এ কী সব্বনাশা বুদ্ধি করলি বাপ? বিপদডা বুঝলি না?

ছায়ামূর্তি বিরক্ত গলায় ঝাঁঝিয়ে উঠল, উঃ, কত কাণ্ড করে কত কাঠখড় পুড়িয়ে অ্যাকবার জম্মেরশোদ দ্যাকা করতে আসলাম! তা' আনন্দ নাই? সর্বনাশ টাঁকতে বসলে তুমি?

ষাট ষাট!

মানদা ছেলের পিঠে একটু হাত ঠেকিয়ে বলে উঠল, জম্মেরশোদ ক্যানো বাপ? বেনোদ উকিল তো বলতেচে, মামলায় জিৎ হবে!

মিথ্যে কথা।

মানদার ছেলে মানদার অজানা-অশ্রুত একটা কদর্য গালাগাল উচ্চারণ করে বলে উঠল, শালা, বদমাস! টাকা খাওয়ার যম! ও-পক্ষের ঘুষ খেয়ে মামলা ফাঁসাচ্ছে—

'কে? কে ওখেনে?' শুনেই মালতী ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল। কাঠের মত দাঁড়িয়ে ছিল। অটল যখন ছেলেকে নিয়ে দাওয়া থেকে উঠে এসে ঘরের দরজায় হুড়কো লাগাচ্ছে, তখন ঢুকে এসেছিল তার শ্বশুর-শাশুড়ীর ঘরে, যে ঘরে আজ তিন সন সে পা ফেলেনি।

তিন সন? তা' তিন সনই তো। তদবধিই তো মামলা চলছে।...কিন্তু এই ঘরটার দোষ কী?...দোষ কিছু না, আক্রোশ। ছেলেকে পুলিসে ধরে নিয়ে গেছে, আর স্বামী-স্ত্রী এক ঘরে শুতে ঢুকছে দেখে বিষ ওঠে মালতীর।

অথচ প্রথম দিনেই তো মানদা কেঁদেকেটে বলেছিল, আমি তোর ঘরে থাকি বৌ!

মালতী অকারণ রূঢ় গলায় বলেছিল, না।

কাঁচা বয়েসের মেয়েছেলে, অ্যাকা থাকাডা ভাল না বৌ!

বৌ উদ্ধত উত্তর দিয়েছিল, ক্যানো? আমার চারিত্তিরে বিশ্বাস নাই?

দুগ্‌গা দুগ্‌গা! ই কি কতা! বলতেচি সোমত্ত মেয়ে হাওয়া-বাতাস, দেবতা-অপোদেবতা, কত দিকে কী! সাবদানডা হওয়া ভাল।

ওসব হাওয়া-বাতাস অপোদেবতা-ফেবতা আমার কিছু করতি পারবো না। যমেও

~ www.amarboi.com ~

ছোঁবা না আমায়। তুমি তোমার জায়গায় যাও গিয়ে?

এরপর আর কী করবে মানদা?

অথচ মানদা যেই সকল দিকেই কাজকর্ম সেরে পাশের ঘরটায় ঢুকে কপাটটা চেপে দেয়, মালতীর ইচ্ছে করে নোড়া ছুঁড়ে ওই পলকা কাঠের কপাটখানা ভেঙে দু-হাট করে দিয়ে চেঁচিয়ে বলে, তোমরা কী? তোমরা কী? হায়া নাই? নজ্জা নাই? মান্‌ষের রক্ত গায়ে নাই?

তা' মালতীর শ্বশুরের বোধ করি সত্যিই নেই ওসব। তা নইলে মানদা যখন ফিরে এসে বলল, বৌ তো ওর কাচে থাকতে দেল না—

তখন অটলের মধ্যে অত দুঃখেও একটা আহ্লাদের ভাব খেলে গিয়েছিল কী করে?

বলেছিল, না দিলে আর তোর কী দোষ? তোর কোর্তব্য তুই করেচিস। নে চেরকালের জায়গায় শুয়ে পড়।

তাই শুয়ে পড়েছিল।

তাই শুচ্ছে এযাবৎ।

এই তিন বছর কাল মালতী তার নিজের ঘরে একাই থাকে। মামলার বিবরণ নিজে থেকে জিজ্ঞেস করে না, শুধু শ্বশুর-শাশুড়ীতে মিলে এক এক দিনের এক এক বিবরণ বলাবলি করে, কান খাড়া করে শুনে নেয়।...দু'বার সাক্ষী দিতেও যেতে হয়েছে ওই শ্বশুরেরই সঙ্গে, তবু যেন কেমন ছাড়াছাড়া ভাব। মালতীর মনে হয় বুঝি তেমন চেষ্টা করা হচ্ছে না।...মনে মনে বলে, হবার গরজ কী? নিজেদের জেবনটি তো ঠিকই আচে।

ওই 'ঠিক'টাই বোধ করি মালতীর আক্রোশের মূল।

তাই এ ঘরে ঢোকে না।

প্রথম প্রথম মানদা কোনোদিন বলেছে, এ ঘরডায় কী গোলান্যাতা পড়ে নাই বৌ?

বৌ বলেছে, না। বলেছে রূঢ় কঠোর ভঙ্গীতে।

মানদা আর কিছু বলেনি, নিজেই সেরে নিয়েছে।

আর সুযোগ পেলেই তার 'ঠিক জীবনের' মূল কেন্দ্রে গিয়ে চুপি চুপি বলেছে, এক দিনের তরে সুকের সুকী দুঃখের দুখী হল নাই।...শুদু ওনারই বুক ফাটতেচে? আমার ফাটতেচে না? তুই ক'দিন পেইচিস ক'দিন দেকেচিস? অ্যাঁ? আর মায়ের যে বৎতিরিশ নাড়িছোঁড়া ধন।

সেই বত্রিশ নাড়িছেঁড়া ধন মানদার আজ তিন-তিনটে বছর মিথ্যে খুনের দায়ে হাজতে পড়ে পচছে।

কিন্তু কেন পচছে?

নিরীহ অটল ঘোষের নতুন বিয়ে হওয়া হাল্কা স্ফূর্তিবাজ ছেলেটা, কারো সাতে-পাঁচে নেই, হঠাৎ তার ঘাড়ে খুনের দায় এল কেন? কে চাপাল?

কে আর?

~ www.amarboi.com ~

চাপাল তারা, যাদের একটা 'হত্যাকারী'র দরকারটা জরুরি ছিল। তা' এরকম দরকার তো থাকেই। হঠাৎ একটা কিছু করে বসার অপরাধে কোনো 'দাদাকে' তো আর ফাঁসিতে ঝোলানো যায় না? একটা 'হত্যাকারী সমাজবিরোধীকে' সংগ্রহ করে ফেলতে হয়। পারলেই সমস্যার সমাধান হয়ে যায়।

তা' ব্যাপারটা কিছু নতুন নয়, বছরের পর বছর কেউ কারো ঘানি ঘোরানোর প্রক্সি দিচ্ছে, অথবা মাঝেমধ্যে ফাঁসির মঞ্চে ওঠার প্রক্সি দিচ্ছে, এ তো চিরকেলে ব্যবস্থা। তবে সব কিছুর বাড়বাড়ন্তর যুগে ঘটনা-ফটনাগুলোও বাড়বাড়ন্ত।

অটলের বোকা ছেলেটা যদি স্রেফ কৌতূহলের বসে একটি সংঘর্ষের ধারেকাছে উঁকি দিতে যায়, তাহলে সেই সুবর্ণ সুযোগটা ছাড়বে কেন তারা, যারা একটা প্রক্সিদার খুঁজছে।

একটা কাউকে ঝুলিয়ে ফেলতে পারলেই যে জেরটা মিটে যায়, এ আর কে না জানে?

একটার জন্যে তো দুটোকে ঝোলানো যায় না? পরে প্রকৃত অপরাধীকে পেলেও।

'একের বদলা দশ' এ শ্লোগান তো আর ধর্মক্ষেত্রে পুণ্যক্ষেত্রে ন্যায়বিচারের দরবারে উঠতে পারে না।

উদ্যোক্তারা অবশ্য ভেবেছিল ব্যাপারটা অতি সহজেই মিটে যাবে, অটল গোয়ালা যে এভাবে দাঁতে মাটি কামড়ে লড়ে যাবে তা' ভাবেনি।

তাছাড়া খুনের কেসকে গড়িয়ে দেওয়াই তো ধর্মক্ষেত্রের নীতি। গড়াতে গড়াতে ক্রমশই গতিবেগ কমে যায়, এটা নিশ্চিত নিয়ম। অতএব লড়ুয়েদেরও মনোবল কমে যায়।...

সেই গড়ানোর সীমান্তে এসে প্রতিপক্ষের উকিলকে হাত করে ফেলে ব্যবস্থাটা পাকার মুখে এগিয়ে নিয়ে ফেলেছেন 'দাদা' এবং তাঁর সম্প্রদায়।

শুধু রায় বেরোনোর দিনের অপেক্ষা।

অটল ঘোষ কি এই অবস্থায় এসে পৌঁছানোর খবরটার আঁচ পায়নি? পেয়েছে, কিন্তু ব্যক্ত করেনি কারো কাছে। অটল এখনো 'মা সিংহবাহিনী'র প্রতি বিশ্বাস রাখছে। কে বলতে পারে অলৌকিক একটা কিছু ঘটে গিয়ে বেকসুর খালাস পেয়ে আসবে কিনা ছেলেটা।

কিন্তু অটলের ছেলে অমল তা' মনে করে না।

'একদা'র বোকা ছেলেটার এই তিন বছরে বুদ্ধিতে অনেক শান পড়েছে। সে বুঝে নিয়েছে কুমীরের কামড়ের ছাড়ান নেই। তাই সে এই একটা অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটিয়ে জম্মেরশোধ একবার তার ফেলে যাওয়া জগৎটাকে দেখতে এসে দাঁড়িয়েছে তার ভিটের উঠোনে।

অমল! খোকা!

এই ভিটের 'এক ছেলের' বংশধারার শেষ প্রদীপটি। মানদার বত্রিশ নাড়ি ছেঁড়া ধন। কিন্তু দাঁড়ানো মাত্র ভয়ে কাঁটা হয়ে যাচ্ছে কেন মা-বাপ? কার বিপদের ভয়ে? যার

~ www.amarboi.com ~

ওপর যম থাবা বসিয়ে রেখেছে, তার?

ছেলের বিরক্তিতে অটল থতমত খেয়ে বলল, কাজডা ভাল কর নাই বাপ, সেইডাই বলচি। তা' এডা সম্ভব হল কী ভাবে?

সে অনেক কথা। শেষ রাত্তিরের মধ্যেই ফিরে যেতে হবে, এই গ্যারান্টি দিয়ে তবে—

সহসা ঘরের দেয়ালের ধারে দপ্‌ করে জ্বলে উঠল একটা আগুনের ঝলক। যেন অনেকক্ষণ ধোঁয়ানো কাঠ হঠাৎ বাতাস পেয়ে জ্বলে উঠল।

সেই আগুন চাপা আক্রোশের গলায় বলে উঠল, জেলখানা থেকে অ্যাকবার পেলিয়ে এসে, আবার তার মদ্যে সেদুতে যাবা তুমি?

পালিয়ে আসিনি, অনুমতি নিয়ে এসে তবে—

সে অ্যাকই কতা! সেই গরাদের মদ্যে থেকে বেইরে তো এয়েচ! অ্যাতো বড় পিথিমিতে পেলিয়ে যাবার জন্যি এট্টু ঠাঁই জুটবেনি?

মালতী একটু দেহাতি গ্রামের মেয়ে, তার কথার সুরে টান বেশী, ঝাঁজ বেশী।

অমল তাকিয়ে দেখল সেই ঝাঁজটার দিকে।

যদিও এখন আর তাকে 'অমল' বলে চেনার উপায় নেই। মনে হচ্ছে তার প্রেতাত্মা। তবু 'অমল' ছাড়া আর কী বা বলা যাবে? তাই বলতে হচ্ছে।

অমল বলে উঠল, তা' হয় না। কতা দিয়ে এয়েচি।

কারে কতা দেচো?

যারে দিলে এমন ঘটনা ঘটতে পারে তারেই দেচি।

ওই ছোটলোক রাক্কোসদের কাচে কতা দেওয়াটাই বড় হল তোমার? আর আর কিচু নাই?...রাতের মদ্যে অনেক ধুরে কোতাও পেলিয়ে যাও। পারবেনি চোট্‌পায়ে হাঁটতে?...বনে-জঙ্গলে গে' নুকিয়ে থাকগে—

অমল কিছু বলার আগেই অটল ঘোষ গভীর আক্ষেপের গলায় বলে উঠল, জেলখানার আসামী কি পুলিসের হাত থেকে পালিয়ে প্রাণ বাঁচাতে পারে মা?

'মা' একটি কঠোর দৃষ্টি হেনে বলল, ওঃ! আর সুড়সুড়িয়ে গে' আবার ওদের হাতে ধরা দিলেই প্রাণডা বাঁচবা, কেমন?

অমলের মধ্যে এখন একটা দুরন্ত ইচ্ছে, ওই অভিমানিনী নাগিনীকন্যাকে সাপটে ধরে তুলে নিয়ে যায় এখান থেকে, পিষে গুঁড়ো করে ফেলে এতদিনের বুভুক্ষার জ্বালা মেটায়।

কিন্তু এটা সভা সমাজ। তাই অমলকে বলতে হয়, ও তুমি বোঝবা না।

বোঝালে বুজি।

এ তক্কাতক্কি বৃথা, অটল বলে উঠল, ছেলেডা ঘরে এল কিচু খেতে দাও খোকার মা!

বলেই সাবধান হল অটল, আস্তে বলল, খাওয়া-দাওয়া তো মিটে গ্যাচে, হাঁড়িতে ভাত আর আচে নাকি?

মানদার মুখটা একটু শুকিয়ে গেল। যা আছে তা কি ছেলের সামনে ধরে দেবার মত?

~ www.amarboi.com ~

নিজের জন্যে যে যৎসামান্যটুকু রাখা আছে, তাই। মালতীর সন্ধ্যেবেলা ঘুম ধরে, তাই তাকে সন্ধ্যের মুখে খাইয়ে দ্যায়। সে কোনোদিন খায় কোনোদিন ফেলে দেয়। অটলের খাওয়ার পর আর কি বা থাকে? তবু মানদা তাড়াতাড়ি বলল, আচে বৈকি। নে' আসছি। নেবুর আচার দে' খাবি খোকা? আর কচি শসা কেটে দিই?

খোকা বলল, নাঃ, ভাত-ফাতে কাজ নাই। নাড়ু নাই?

বলল মাত্র, কিন্তু উত্তরের অপেক্ষায় কি মায়ের মুখের দিকে তাকাল? দুটো অগ্নিবর্ষী চোখের দিকে তাকিয়ে অটকে গেল না?

মানদা অবশ্যই উত্তর দিল।

মনে মনে বলল, 'নাড়ু' বলে যে অ্যাকটা জিনিস ছেল জগতে, সেডা তো ভুলে গেচি বাপ। নারকেলগাচগুলো তো সব জমা ধরানো। মুখে বলল, তুমি ঘরে নাই, কার জন্যে আর নাড়ু করি বাপ?

খোকা সে কথায় কান দিল না, প্রসঙ্গান্তরে চলে গেল, বলল, আসার পথে গোয়ালবাড়ির মদ্যে থেকে মোরগের ডাক শোনলাম মনে হল! কী ব্যাপার?

শুনে অটলের বুকটা জুড়িয়ে গেল।

এই সূত্রে তবে নিজের এতদিনের প্রাণান্তকর সংগ্রামের ইতিহাসটার কিছুটাও শোনাতে পারবে ছেলেকে। নড়েচড়ে বসে বলল, গরু-মোষ তো অ্যাকে অ্যাকে সবই গ্যালো, দুটো মাত্তর পড়েছিল, তো সাত্যকীবাবু ধরল বাথানটা ওনারে বেচে দিতে—

অমল ভুরু কোঁচকালো, সব গরু-মোষ গ্যালো কিসে? মড়ক ধরেছিল?

অটল একটু দার্শনিক হাসল, তা' ধরেছেলো। মড়ক ধরেছেলো তোর বাপের ট্যাকে!...সাত্যকীবাবু কিনে পোল্‌টি বানাল। মা ভগবতীর থানে মুরগী!

কিন্তু অমল কি এ উত্তরের মধ্যে ঢুকতে পারল? অমল কি আদৌ এ সংসারের সুখ-দুঃখের মধ্যে আর ঢুকতে পারবে?

অমল হঠাৎ অন্য কথায় চলে গেল।

বলল, কেশবের বিয়ে হয়ে গেছে?

কেশব? কোন্ কেশব?

কেশব আবার কটা আছে? পালেদের কেশবের কথা বলচি।

অমলের স্বরে অসহিষ্ণুতা, ভঙ্গীতে অস্থিরতা।

অটল বলল, অ, তো সে তো সেই ত্যাখোনই—বরযাত্তিরের নেমন্তন্ন ছেলো তোমার না সেইদিন! আর তো একটা ছেলেও হয়ে গেচে।

হুঁ!...

অমল আবার সহসা বলে উঠল, তা' তুমি তো আর হাজতে পচো নাই, তোমার চ্যাহারা অ্যামোন হল ক্যানো?

আমার চ্যাহারা?

অটল একটু ক্ষুব্ধ হাসি হাসল, বাজপড়া তালগাচ দেখিস নাই?

~ www.amarboi.com ~

বাজপড়া তালগাছ!

তা হয়তো দেখে থাকবে অমল ঘোষ। তাদের ঘাটের ধরেই তো আছে একটা। কিন্তু তিন বছর যাবৎ 'ফাঁসির দড়িতে' ঝুলে থাক' লোকটার কি এই সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনাধর্মী উত্তর মাথায় ঢুকবে? ঢোকা সম্ভব?

তবে এই বাবদ একটা কথা বলে উঠল সে।

বলল, হারামজাদা শুয়োর বিনোদ উকিল বুঝি নিংড়ে নিংড়ে টাকা নিয়েচে? শালাকে হাতে পেলে খুন করে ছাড়তাম।

টাকার কথাটা ছেলের মাথায় একটু ঢুকেছে দেখে কিছু শান্তি পেল অটল, কিন্তু এ কী 'মুখ' হয়েছে তার ছেলের? এত কদর্য ভাষা অমলের মুখে?

তাছাড়া শেষ কথাটায় শিউরে উঠল। বলল, এসব ভয়ঙ্করী কতা কোয়ো না বাপ!

শালা, অ্যাকবার বৈ তো দুবার ফাঁসি হবে না!

দাঁড়িয়ে উঠে পায়চারি করতে শুরু করল। দরজার কাছে কাঠের পুতুলের মত এক নারী! যার দু'চোখে আগুন।

অথচ অমলকে এখন এইসব আবোল-তাবোল কথায় তার কোহিনুর হীরের দামের মত দামী সময়টুকু খরচা করতে হচ্ছে।

আশ্চর্য, এরা বুঝছে না কেন? বুড়ো হয়ে কি মানুষ এতও বোকা হয়ে যায়?

তা' হয়তো যায়। অন্ততঃ মানদার মত মানুষ। তাই মানদা বলে ওঠে, বলে কয়ে এসেচিস য্যাখোন, ত্যাখোন এমন অস্থির হচ্ছিস ক্যানো বাপ? বোস্ না একটু থির হয়ে আমার কোলের গোড়ায়। গায়ে মাতায় একটুক হাত বুইলে দিই।

প্রথমটায় মানদা খুব সঙ্কুচিত হয়ে ছেলের গায়ে হাত ঠেকিয়েছিল। ছেলেকে হঠাৎ মনে হয়েছিল একটা অপরিচিত বিভীষিকার মূর্তি। তা'ছাড়া আজন্মের সংস্কার, জেলখানার আসামী, না জানি কী নোংরা জামা-কাপড়। ক্রমে মনকে ছেড়ে দিচ্ছে।

ছেলেটার হাতে যে একটু খাবার জিনিস ধরে দিতে পারল না, তাতেই হাহাকার করা প্রাণটা, তার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে সান্ত্বনা খুঁজতে চাইছে। ভাবছে, ঠাকুর ঘরের কোনোখানে কিছু নাই আমার গো! কোতায় কী পাই এই রাতে?

বোকা! নীরেট বোকা!

মানদার ভয়ানক ক্ষুধার্ত ছেলেকে ধরে দেবার মত এক উত্তম খাদ্যবস্তু যে তার ঘরেই মজুত রয়েছে, তা খেয়াল করছে না।

অথবা হয়তো বোকা নয়।

খেয়াল করছে না নয়, খেয়াল না করার ভান করছে।

কে জানে কোনটা ঠিক! তবে ছেলের গায়ে স্নেহের হাতটি রেখে বলছে, বোস না বাবা আমার কাচডায় একটু থির হয়ে।

দুটো আগুনের গোলা যে এখন স্থির হয়ে আছে এই সীমাহীন ধৃষ্টতার দিকে তা লক্ষ্য করছে না।

~ www.amarboi.com ~

কিন্তু আর একজন তো লক্ষ্য করছে? যার নিজের মধ্যেও ধ্বকধ্বকিয়ে জ্বলছে লেলিহান আগুন। অতএব বসল না সে। অস্থির ভঙ্গীতে বলল, নাঃ, বসব না আর, একটু শুয়ে পড়ি গে। বিশ্রামের দরকার।

সে তো নিয্যস দরকার—অটল ঘোষ সহসা কেমন একটা ভারী-ভারী নীরেট গলায় বলে উঠল, অতটি রাস্তা হেঁটে এয়েচো, আবার অতটি রাস্তা হেঁটে রাত থাকতে ফেরা। বিনে কারণে অ্যাতটা তজ্‌দি, অ্যাতটা ঝুঁকি।...তো শুয়ে পড়। এখেনে টানটান হয়ে শুয়ে পড়।

বলে অটল ঘোষ নিজের চৌকিতে পাতা বিছনাটা হাত ঘষে টান-টান করে দিয়ে আবার বলে উঠল, শুয়ে-শুয়েই অ্যাতোদিনের বিত্তান্ত-বেবরণগুলো শোনা একটু।

বিবরণ শুনিয়ে আমার কী ঘোড়ার ডিম হবে? শরীর টানচে! আপন ঘরে একটু লম্বা হয়ে শুয়ে পড়িগে।

বলে মানদার সেই একদার লাজুক লাজুক ছেলেটা পরম নির্লজ্জের মত, সেই অগ্নিবর্ষী চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে স্পষ্টই আমন্ত্রণ জানিয়ে দরজার দিকে পা বাড়াল।

কিন্তু অটল ঘোষ?

সেই বা নির্লজ্জতায় কী কম গেল?

সেই বা কী বলে ছেলের এই অস্থিরতা দেখেও ছেলের গায়ের কাছে এসে পড়ে, প্রায় আটকানোর ভঙ্গীতেই বলে উঠল, এ সোমসারের সকল ঘর-দুয়োরই তো তোমার বাপ! বেশী আরাম নাগলে চোকের আবল্যি ছাড়বে না। এখেনে বরোং আমি ডেকে তুলতে পারব। টাইমের একটুক হেরফের হলেই তো সোমূহ বেপদ মানিক!

অটলের কণ্ঠে স্নেহ ঝরে পড়ে।

কিন্তু 'স্নেহ' জিনিসটা কি সব সময় বরদাস্ত হয়?

আমার যখন 'স্নেহ'র প্রয়োজন হবে (অথবা 'যদি' প্রয়োজন হয়), তোমার কাছে এসে দাঁড়াব, দিও তোমার যা সম্বল আছে। কিন্তু তোমার স্নেহের ঝুলি নিয়ে আগ বাড়িয়ে ঢালতে এসো না আমায়, এই সাফ কথা। তা যদি আসো, তোমার ওই স্নেহ-সুধাই আমার বিষ লাগবে। মাংসাশী প্রাণী কি দুধে তুষ্ট হয়?

অতএব অটলের কণ্ঠ থেকে ঝরে পড়া ওই স্নেহধারা এখন বিষ লাগল অটলের ছেলের। দীর্ঘদিনের অনুপস্থিত পুত্র, জীবন আর মৃত্যুর মধ্যবর্তী চৌকাঠে দাঁড়িয়ে আছে, তবু তার মুখভঙ্গীতে সেই বিষের স্বাদেরই প্রতিক্রিয়া দেখা দিল।

অটলের সঙ্গে মিলোনো নাম অমল! চাকদার এই ঘোষেদের ঘরে এমন সৌখিন নামটি আর দ্বিতীয় নেই, সেই অমলের সমস্ত ভঙ্গীতে কী বিকৃত মালিন্য! কাকে বলছে না ভেবেই বলে উঠল, দূর শালা! নিকুচি করেছে! কত কারখানা করে এই আসা, তো উটোনে পা দেওয়া এস্তক বেপদ!...বেপদ! ফাঁসির ব্যাবোস্থা তো হয়ে গ্যাচে, আর কতটা কী বেপদ হবে?

অ্যাঁ! কী বলতেচ?

~ www.amarboi.com ~

হঠাৎ একটা চেরাফাটা গলা চাপা চীৎকার করে উঠল, ওরে মা রে!

একটা গলা? না দুটো?

আশ্চর্য! দুটো দু'বয়সের মেয়েমানুষ একসঙ্গে একই ভাষায়, একই ভঙ্গীতে শিউরে চেঁচিয়ে উঠল।

কিন্তু অটলবিহারী অটল।

ব্যাবোস্থা হয়ে গ্যাচে বলচ কেন বাপ? রায় তো বের হয় নাই।

না হোক! যা বেরোবে আমার জানা হয়ে আচে।...বেপদ হয় আমি বুজব।

নির্লজ্জ বেহায়া ছেলেটা আবার তার আপন ঘরের দিকে পা বাড়াল, যেখানে ইতিমধ্যেই এখান থেকে একটা বেতডগা সাপ ফস করে পিছলে চলে গিয়ে ঢুকে গেছে।

কিন্তু অটল ঘোষ যে লজ্জাহীনতায় তাকেও হারাল। হারাল নিজের বিকৃত বিধ্বস্ত হয়ে যাওয়া ছেলেটাকেও। ছেলের পথ আগলে একটা কঠিন ধাতব গলায় বলে উঠল, ওই ঘরের মদ্যে তো অ্যাখোন তোমারে ঢুকতে দেওয়া চলে না খোকা।

অটল ঘোষের কণ্ঠ শুধু ধাতব কঠিনই নয়, বোদা বিস্বাদ।

খোকা ছিটকে উঠল, তার মানে? ঘরে ঢুকতে দেবে না? তুমিও কি আমারে খুনী ভাবো নাকি?

আমি? তোমারে?

অটলের গলার স্বর একটু বদলাল।

বলল, আমি তোমারে খুনী ভাবলে তোমারে খালাসের চেষ্টায় পতের ভিকিরি হয়ে যেতুমনি বাপ। কিন্তু কতা হচ্ছে, ঠারে-ঠোরের কতা য্যাখোন বুজচো না, ত্যাখোন পষ্ট্যাপষ্টিই বলতে হয়, রক্তমান্‌সের শরীর, কাঁচা বয়সের ধর্ম, আর এতদিনের খিদাতেষ্টা, ঘরে ঢুকলে কি নিজেকে রুক্‌তে পারবা? অ্যাকটা অঘটন হয়ে যেতে কতোক্ষণ? তা'লে? ত্যাখোন?

অমল নামের দুরন্ত ক্ষুধার্ত মানুষটাও সাহসা যেন হোঁচট খেল। একবার বোকার মত তাকাল। তারপরই হিংস্র ভাবে বলে উঠল, ঠিক আচে, আমি তা'তে চললাম।

কিন্তু চিরদিনের সভ্য-শালীন এই ঘোষ-বাড়িটায় কি আজ নির্লজ্জ বেহায়ামির প্রতিযোগিতার আসর বসেছে?

তাই অন্ধকার ঘর থেকে সেই বেতডগা সাপটা বেরিয়ে এসে চেপে ধরে ফেলল চলে যেতে উদ্যত মানুষটার একটা হাত। ধরে বলে উঠল, না, যাবা না! শুদোও তোমার বাপেরে, 'অঘটন' ক্যানো? শুভ ঘটনা নয় ক্যানো? ওনার ঠাকুদ্দার পাতোরে ভাত খেতে অ্যাকডা বন্‌শোধরের দরকার নাই? আসবা না সে?

হাতটা চেপে রইল শক্ত করে।

অন্ধকারটুকুই যা একমাত্র আবরণ।

বংশধর!

মাটিতে বসে পড়ল অটল।

~ www.amarboi.com ~

রুদ্ধ গলায় বলল, এলে তারে আমি 'বংশোধর' বলে পরিচয় দেতে পারবো? তিন সনের জেল হাজতের আসামী, হঠাৎ অ্যাকদিন একটুক্ষণ পালিয়ে এয়েছেলো, এ কতা পাঁচজনায় মানবা?

পাঁচজনায় না মানলো, তোমরা তো মানবা? ভগবান তো মানবা?...অন্ধকারে মালতীর চেহারাটা বোঝা যাচ্ছে না, শুধু সাপিনীর হিসহিস ফোঁস-ফোঁসটা শোনা যাচ্ছে—হিংস্র, রুক্ষ, তীব্র, আবার বুঝি স্যাঁৎসেঁতেও।...চাপা চেঁচানোর গলায় বলছে, ধমমো তো মানবা? পিত্রিপুরুষজনা তো মানবা? আর আমি তো জানবা—

শেষটায় গলা বুজে গেল।

কিন্তু 'অটল' নামের মানুষটা?

সে যে তবুও অটল, অনমনীয়। তার কণ্ঠস্বর যে আবার ধাতব, সে য্যাতো যাই হোক, সমাজ মানবা না। গায়ে ধুলো দেবা, মুকে চুনকালি দেবা, মাতাডা হ্যাঁট করে দে' ছাড়বা!...বাপ খোকা, তুমি বুজো—

ছাড়! ছেড়ে দে—

ক্ষিপ্ত হিংস্র ভঙ্গীতে হাতটায় ঝটকান দিল জেল-পালানো আসামীটা।

কিন্তু ওই তিন বছর জেলখানার ভাত খাওয়া জীর্ণশীর্ণ লোকটা কি পেরে ওঠে একটা সদ্য-যুবতী পাথুরে-গতর গ্রাম্যমেয়ের মরণকামড় শক্তির সঙ্গে?

মরণ-কামড়ই।

সে তো জানছে, এই ছেড়ে দেওয়া মানেই, সেই মুহূর্তে চিরতরে হারিয়ে ফেলা। এ জীবনে আর ওই হাতখানা তার হাতের নাগালের মধ্যে আসবে না। তাই তার পুরু ভারী থাবাখানার মধ্যে খটখটে সরু কব্জিটা জব্দ হয়েই রয়েছে।

যদিও ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টাটা চালিয়ে যাচ্ছে অমল, কিন্তু সেই চেষ্টার মধ্যে কি আপ্রাণের ভাব আছে? 'ভাব' আছে কিনা কে জানে, তবে ভঙ্গীটা রয়েছে।

অসব্যোতা ছাড় বলচি, ছেড়ে দে হাত।

না!

নাগিনী ফণা তোলে।

চিরে যাওয়া গলায় বলে ওঠে, ক্যানো ছেড়ে দেবা? এই জেবনে আর তোমারে পাবা আমি? তোমার মা-বাপ সমাজ নে ধুয়ে জল খাক! স্বাথ্যোপর নিষ্ঠুর! নিজিদের মুক হ্যাঁটটাই দেকতেচে। আর নক্কীছাড়ি মালোতীর প্রাণডা? না না, ভগোবান তোমারে পেঠিয়ে দেচে—ছাড়বা না।

হাঁপাতে থাকে, কিন্তু মুঠো শিথিল করে না।

মানদা এতক্ষণ চুপ করে ছিল, এখন তীব্র ধিক্কারে বলে ওঠে, হায়ানজ্জার মাতা অ্যাকেবারে খেয়চিস বৌ? ধিক ধিক!

কিন্তু এ ধিক্কারে কি লজ্জা পেল মালতী নামের মেয়েটা?

পেল না। পেলে কি আর বলে উঠতে পারত, হ্যাঁ খেয়েচি। নিজের হলে বুজতে।

~ www.amarboi.com ~

সিদিকে তো ষোলো আনা বজায়।

বলেই উন্মাদ হয়ে যাওয়া মুখ্যু গ্রাম্য মেয়েটা আজকের প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করে বসে।

আর সেই অবিশ্বাস্য ঘটনাটা ঘটে যায় কিনা তার শ্বশুর-শাশুড়ীর সামনে।

ফণাধরা নাগিনী হঠাৎ ডুকরে কেঁদে ওঠে, ওরে মা রে, আমি কী করব রে! বলতেচে ফাঁসির ব্যাবোস্তা হয়ে গ্যাচে—

আর কথাটা শেষ না হতেই ধৃত আসামীকে এক ঝটকায় ঘরের মধ্যে টেনে নিয়ে ফেলে।

শুধু তাই?

দু-দুজোড়া হতভম্ব চোখের সামনে দরজার কপাটজোড়া ধমাস করে বন্ধ করে দেয়।

হুড়কো লাগানোর শব্দটা জোরালো, তার সঙ্গে ভিজে ভিজে গলায় আর্তনাদটাও জোরালো,—তবে? এ জেবনে তবে সে নিদি আমি কোতায় পাব? তোমার ঠাকুদ্দার বনশের বনশোধর!

একেও যদি হাড়বেহায়া না বলবে তো কাকে বলবে?.

~ www.amarboi.com ~

প্রার্থনা

কিছুদিন আগে পর্যন্তও যেতে আসতে গলির মুখে দেখা হলে চোখের আর ঠোঁটের একটা বিশেষ আকুঞ্চনে পরিচয়ের স্বীকৃতিটা দিচ্ছিল, 'ভট্‌ভটিয়া'র আমল পর্যন্ত দিয়েছিল, এখন আর দিচ্ছে না।

দামী মোটর গাড়ী কেনার পর থেকে পাড়ার লোককে আর চিনতেই পারছে না!

ধরন-ধারণ দেখে মনে হচ্ছে যেন এ পাড়ায় ওই কমলেশ বোস ব্যতীত আর কোনো মানুষই নেই। চলনে বলনে দৃষ্টিক্ষেপণে আর পদক্ষেপণে সেই বিশ্বনস্যাৎ ভাব, যে ভাবটি 'হঠাৎ বড়লোকে'দের একচেটিয়া।

ওটা আশ্চর্যের নয়, ওটাই জাগতিক নিয়ম, তথাপি পাড়ার লোকেরা দেখে জ্বলে যায়। বিশেষ করে জ্বলে রবিপদ রায়, গলির মধ্যেকার পাঁচ নম্বর বাসার বাসিন্দা। সে বলে, 'মটমটানি দেখ! মটমটানি দেখলে মনে হয় তামাম দুনিয়ায় ওই কমলেশ বোস ছাড়া দ্বিতীয় আর মনিষ্যি নেই। সবাই কেঁচো বিছে গুবরে আরশোলা ব্যাং। আর উনি তাদের পায়ের তলায় মাড়িয়ে মাড়িয়ে চলেছেন।'

বলে, এইসব বলে রবিপদ।

আরো অনেক কিছুই বলে। ওইটাই তো একমাত্র সান্ত্বনা। আড়ালে ইচ্ছেমত বলতে পাওয়া।

কোন্ যুগে, কোন্ দেশে, কোন্ সমাজে নাক-খ্যাঁদাদের এত উদারতা দেখা যায় যে তারা নাক-উঁচুদের সমালোচনা করছে না?

কিন্তু তাতে নাক-উঁচুদের কী এসে যায়?

কিছু না।

অতএব কমলেশ বোসেরও রবিপদর এইসব মন্তব্যে কিছু এসে যায় না। কমলেশ এই অক্ষমের পরম সান্ত্বনার দিকে তাকিয়ে করুণার হাসি হাসে।

তা রবিপদ কি কমলেশের কান ধরে বলে যায়? কমলেশ টের পায় কি করে?

পায়।

টের পায়।

মানুষের বিধাতা মানুষের শ্রবণশক্তির একটা সীমানা নির্ধারণ করে দিলেও, তার অনুমান-শক্তির ওপর কোনো সীমারেখা টেনে রাখেন নি।

কাজেই অনুমান-শক্তির জোরে পাড়ার লোক এই 'হঠাৎ টাকা গজিয়ে ওঠা' কমলেশের টাকার অঙ্কে আর অহঙ্কারের অঙ্কে, এবং কমলেশ ওদের ঈর্ষার অঙ্কে যথেচ্ছ সংখ্যা বসায়।

~ www.amarboi.com ~

বিশেষ করে রবিপদ।

একদা ওই কমলেশটা নাকি যার সহপাঠী ছিল।

এ পাড়ায় নতুন এসে নতুন আলাপের সূত্রে, সেই পুরনো সম্পর্কটা ঝালিয়ে নিয়েছিল কমলেশ নিজেই। বলেছিল, 'আচ্ছা আপনি কখনো সাঁতরাগাছি হাইস্কুলে পড়েছিলেন? পড়েছিলেন! ঠিক আছে। তা হলে হাত গুণে বলে দিতে পারি আপনার নাম রবিপদ রায়। বলুন ঠিক বলেছি কিনা!'

এই সুর এই ভাষা।

অন্তরঙ্গতার আমেজ মাখানো।

কমলেশই ডেকে ডেকে যত কথা বলেছিল।

তার মানে তখন কমলেশ ছাপোষা গেরস্থ ছিল। কালো রোগা একটি বৌ আর দাঁতপড়া, ন্যাড়ামাথা, কালো-শুঁটকো একটা মেয়ে নিয়ে এ পাড়ায় উঠে এসেছিল গলির মোড়ের বাড়ির একতলাটা ভাড়া নিয়ে।

এসেই প্রথম কাছাকাছি পেয়েছিল রবিপদকে, তাই তাকেই আঁকড়েছিল।

'দুধ এ পাড়ায় কি রকম পান রবিবাবু? গোয়ালা না হরিণঘাটা? ধোবার রেট এ পাড়ায় কত রবিবাবু?...আচ্ছা রবিবাবু কিছু যদি মনে না করেন, আপনাদের বাসনমাজা লোকটাকে 'কিছু' দিলে আমাদের বাসনগুলো মেজে দিতে পারে না?'

প্রতিমুহূর্তে 'রবিবাবু রবিবাবু!'

তা রবিবাবুও সে সম্মানের সম্মান রেখেছেন। প্রাণপাত করে পড়শীর সুখ-সুবিধের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

নিজেরা কষ্ট করে ঝিকে আগে ওদের বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছেন, বর্ষার দিনে স্বেচ্ছায় বলেছেন, 'আমি তো জুতো ভিজোতে বেরিয়েইছি, আপনি আর কেন বেরোবেন? কিছু আনতে হয় তো দিন, এনে দিচ্ছি।'

করলেন, অনেক করলেন রবিবাবু।

কিন্তু শেষরক্ষা করতে পারলেন না।

কমলেশ বোস এখন আর তাঁকে পথে দেখে চিনতে পারছেন না।

কিন্তু ছাপোষা গেরস্থ কমলেশের এতটা বাড়বাড়ন্ত হল কিসে?

আবার কিসে? বিজ্‌নেসে।

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী—এ তো চিরকেলে কথা। তার উপর আবার লক্ষ্মী এখন সাদাকালো আলোছায়া দু পথ ধরে আসেন, অতএব আসার মাত্রাটা মাত্রা ছাড়ায়।

কমলেশ যখন কলম পিষতো তখন কি কমলেশ স্বপ্নেও ভেবেছে সেই কলমটা হেলায় ফেলে দিয়ে চলে আসবে সে? অফিস ছেড়ে দিয়ে ওই অফিসের পাড়াতেই এক ভট্‌ভটিয়া চেপে বীর বিক্রমে ঘুরে বেড়াবে? আর তারপর মোটর চেপে পয়লট্ট করবে!

কিন্তু সেই স্বপ্নাতীত অবস্থা এসেছে।

~ www.amarboi.com ~

এখন তাই কমলেশ যখন তখন লোককে বলতে পারছে 'কলকাতার এই ধুলো আর ধোঁয়া! অসহ্য! মানুষ যে কি করে বাস করে!'

কারণ কমলেশ এখন শহরতলীতে অনেকখানি জমি কিনে রেখেছে। চারিদিক খোলা রেখে মাঝখানে সুন্দর একটি বাড়ির প্ল্যানও তৈরি হচ্ছে।

এই সবের ফাঁকে ফাঁকে কমলেশ নিজেকে ধুতি থেকে ট্রাউজারে ট্র্যান্সফার করেছে, স্ত্রীকে 'বঙ্গলক্ষ্মী' থেকে বহুবর্ণে। আর মেয়েটাকে ট্রান্সফার করেছে 'ননীবালা বালিকা বিদ্যালয়' থেকে 'মডার্ন হাই স্কুলে'।

সদরে অন্দরে ভোল বদলাচ্ছে চকিতে চকিতে।

ইত্যবসরে সেই কালো রোগা আধঘোমটা বৌটাই কি কম ভেলকি খেলাতে শিখে গেছে?

নিশ্চিত নিয়মে এখন রংটা একটু ফরসা আর শাঁসটা বেশ বেশী বেশী হয়ে যাওয়ায়, তার মাথার চুল থেকে পায়ের নখের যে আধুনিকীকরণ হয়েছে, তা তাকে দিব্যি মানিয়েও গেছে। সেই মানানের সঙ্গে মানান রেখে সে এখন মাঝে মাঝে বরের পাশে বসে গাড়ীর স্টিয়ারিং ধরায় রপ্ত হচ্ছে।

মেয়েটাকে যা তালিম দিচ্ছে, সেও নিখুঁত। পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে আর কথা কয় না সে, কেউ কথা কইতে এলে মুখ টিপে হেসে সরে যায়।

কিন্তু এ সমস্তই তো নিশ্চিত অমোঘ, চন্দ্রসূর্যের মতই স্থির ঘটনা।

টাকা এলেই এসব আসবে।

অথচ রবিপদর গাত্রদাহের শেষ নেই। রবিপদর মনে হয় এতখানি নিলর্জ দাম্ভিকতা পৃথিবীতে এই নতুন।

হয়তো মনস্তাত্ত্বিকের বিশ্লেষণী যন্ত্রে ধরলে দেখা যেত একেবারে মূলে সেই সাঁতরাগাছি স্কুলের সহপাঠিত্ব।

তবে রবিপদ সে কথা ভাবে না।

রবিপদ এই নির্লজ্জতা আর দাম্ভিকতা বরদাস্ত করতে পারে না।

রবিপদর মতে প্রত্যহ সকালে ঠিক যে সময় রবিপদ একহাতে বাজারের থলি আর একহাতে দুধের বোতল নিয়ে গলির কাছাকাছি এসে দাঁড়ায়, ইচ্ছে করেই ঠিক সেই সময়ই ঠিক সেই সময়ই ওই নাকউঁচু ছোটলোকটা গলির মুখ ঘেঁষে গাড়ীটাকে দাঁড় করায়, এবং রবিপদকে বেশ কিছুক্ষণ দাঁড় করিয়ে রেখে ওর নাকের সামনে দিয়ে ডেক্রন ট্রাউজার আর টেরিলিন বুশসার্ট পরে মুখে পাইপ ঠুকে দৃক্‌পাতহীন ভঙ্গীতে এসে গাড়ীতে ওঠে, 'ধমাস' শব্দটাকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত জোরদার করে দরজা বন্ধ করে, রবিপদর নাকের গহ্বরে একমুঠো ধুলো ছুঁড়ে দিয়ে সাঁ করে বেরিয়ে যায়।

রবিপদ একটা বহুপ্রচলিত অকথ্য গালি উচ্চারণ করে দাঁতে দাঁত চেপে বাড়ি যায়, আর মনে মনে বলে—'বিজনেসের বারোটা বেজে যায়, তবে বলি ভগবান আছে।—আমার নাকে ধুলো ওড়াবে বলে ওৎ পেতে বসে থাকে!'

~ www.amarboi.com ~

হয়তো রবিপদর ধারণা নির্ভুল নয়, হয়তো ওটা কাকতালীয়, আর হয়তো বা ওই ঘটনাটা মাসের মধ্যে পাঁচ সাত দিনের বেশী ঘটে না, কারণ বিজনেসম্যান কমলেশ বোসের যাতায়াতের তো আর ঘড়িধরা টাইম নেই 'শুধু কেরানীদের' মত!

তবু রবিপদর মনে হয় এটা রোজ ঘটে।

রবিপদর বৌও যে পাশের বাড়ির বৌয়ের আঙুল থেকে কলাগাছ হওয়ায় খুব খুশী তা নয়, তবে সে আত্মস্থ। সে রবিপদর মতন অমন গায়ের জ্বালা প্রকাশ করতে জ্বালাময়ী ভাষা ব্যবহার করে না। সে যখন সেই জ্বালা প্রকাশ করে, সংক্ষিপ্ত ভাষণে, এবং পাশের বাড়ির কর্তার সম্পর্কে নয়, নিজ বাটির কর্তার প্রতি।

সে ভাষণে অধিক কিছু থাকে না—পুরুষের ক্ষমতা আর অক্ষমতার প্রতি কটাক্ষ থাকে মাত্র।

তাই রবিপদ প্রতিনিয়ত তার ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে তার বাল্য সহপাঠীর সাধের বিজনেসের বারোটা বাজুক, ওর জমিতে শেয়ালে 'সার' বাড়াক, ওর গাড়ীর টায়ার পাংচার হোক, ফুটো বেলুনের মত চুপসে যাক ইত্যাদি প্রভৃতি।

কিন্তু ভগবান চিরদিনই বুর্জোয়া, ধনিক সম্প্রদায়ের সঙ্গেই তাঁর আঁতাত, তাই রবিপদর এই প্রার্থনা তাঁর কানে পৌঁছয় না।

কমলেশ বোসের গাড়ীর শব্দ আরো জোরদার হয়। যেটা রবিপদর হার্টে গিয়ে ধাক্কা মারে।

আশ্চর্য, চুপি চুপি ওইখানে ধারালো কাঁচের টুকরো ফেলে রেখে দেখেছে রবিপদ, তীক্ষ্ণধার পেরেক দাঁড় করিয়ে রেখে দিয়েছে, কিছু হয় নি গাড়ীটার।

ক্রমশঃ তাই রবিপদর প্রার্থনার ভাষা তীব্র হতে থাকে।

ক্রমশঃই রবিপদ প্রায় শুনিয়ে শুনিয়ে স্বগতোক্তি করে 'শালার গাড়ী একদিন লরীর সঙ্গে ধাক্কা লেগে চুরমার হয়ে যায় তো ফুটুনি বেরিয়ে যায়!'

রবিপদর বৌ বিরক্ত গলায় বলে, 'ইতরের মতন কথা বল কেন? নিজের মুরোদ দেখালেই পারে!'

'মুরোদ! হুঁঃ! রবিপদ রায় অমন কালোবাজারের মুরোদ দেখাতে যায় না।...ইতরের মতন! তা তো বলবেই। দেখছো, দেখছো আমার ফর্সা ধুতিটার হাল কি করে দিয়েছে! গাড়ীর চাকায় জল ঢেলে ঢেলে খাপসুরৎ করেছেন, সেই কাদা ছিটকে এসে—'

রবিপদ ধুতির দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থটা মেলে ধরে ধরে দেখায়।

বৌ যদি সহানুভূতি দেখাতো, অথবা স্বামীর সঙ্গে গলা মিলিয়ে পাশের বাড়ির 'ফুটুনি'র আলোচনায় মুখর হতো, তা হলে হয়তো এত দাবদাহ হতো না রবিপদর। কিন্তু বৌ সেদিক দিয়ে যায় না।

বৌ মুচকি হেসে বলে, 'ফর্সা ধুতি পরেই বা বাজারে গিয়েছিলে কেন? আগে তো যেতে না। আগে তো লুঙ্গি পরেই—'

~ www.amarboi.com ~

রবিপদ জ্বলে যায়।

রবিপদ বলে, 'ঠিক আছে, কাল থেকে বাঁদিপোতার গামছা একখানা পরে বেরোব, তাতে যদি তোমার মুখোজ্জ্বল হয়।...রাতদিন মুরোদ নিয়ে খোঁটা রাতদিন বিদ্রূপ! অথচ শাস্ত্রে বলেছে স্ত্রীভাগ্যে ধন!'

কিন্তু রবিপদরও রাগের কারণ ছিল বৈকি। শুধু স্বাভাবিক ঈর্ষাই নয়, সূক্ষ্ম একটা অপমানের জ্বালাও ছিল।

কমলেশ বোস যেন বিশেষ করে ওকে দেখিয়ে দেখিয়েই মুখের পাইপটা যৎপরোনাস্তি কায়দায় ঠোঁটের কোণে ঝুলিয়ে রাখে, যেন ইচ্ছে করেই ওকে দেখলেই শিস দিয়ে উঠে গাড়ীতে চাপে।...

আর কমলেশের বৌ ওকে শুনিয়ে শুনিয়েই বলে, 'আশ্চর্য! মানুষ যে কি করে এত কৃপণ হয়! একটা চাকর কি এতই দুষ্প্রাপ্য? একটা ভদ্রলোক হাতে কাঁধে ঝোলা ঝুলিয়ে র‍্যাশন আনছে, এ দৃশ্য সহ্য হওয়া শক্ত।'

এ দৃশ্য যে কিছুদিন আগে সপ্তাহে সপ্তাহে দেখতে হতো তাকে, তা অবশ্য মনে থাকে না তার। কারণ তার এখন গোটা তিনেক চাকর। বাড়িওলাকে বলে বেশী সেলামী দিয়ে বাড়িটার দোতলা তিনতলা সবটা নিয়ে ফেলেছে কমলেশ বোস। বাড়িওলাই উদ্বাস্তু।

অতএব বাজার দোকান, রান্না, আর বাড়ি সাফ করতে তিনটে লোক লাগে। গাড়ীর তো আলাদা আছেই। রবিপদ কমলেশের বলতে গেলে এক দেয়ালের পড়শী, রবিপদকে তাই এই সমস্ত দৃশ্যেরই দর্শক হতে হয়। অগত্যাই রবিপদকে দেয়ালে ঝোলানো মা কালীর পটের সামনে দাঁড়িয়ে ঊর্ধ্বমুখে বলতেই হয়, 'শহরে এত অ্যাকসিডেন্ট হচ্ছে মা, লাগসই একটা অ্যাকসিডেন্টেই তোমার এত কার্পণ্য? আমার পয়সা নেই, তা হোক, ধার করেও তোমায় সোনার নথ গড়িয়ে দেব।'

তারপর সেই 'নথে'র প্রতিক্রিয়ার কল্পনা করতে করতে ভয়ানক একটা উত্তেজিত অনুভব করে রবিপদ।

বারোমাস আমাশায় ভোগা গাঁদালপাতার ঝোল-খেকো রবিপদ, তবু যেন রক্ত টগবগিয়ে ওঠে তার।

রবিপদ চোখের উপর দেখতে পায়, উদ্ধত অহঙ্কারী স্বাস্থ্যদীপ্ত একটা দেহ তালগোল পাকিয়ে মাংসপিণ্ডের মত বিছানায় পড়ে আছে বছরের পর বছর, ওঠবার আর আশা নেই। যে আধবুড়ী দেহটা সাজসজ্জায় চাকচিক্যে তরুণী সেজে ধিঙ্গীনাচ নেচে বেড়াচ্ছিল, আবার তার ভেতরের কাঠামো বেরিয়ে গেছে, বাসন মাজতে মাজতে আর মশলা পিষতে পিষতে হাড়মাস কালি হচ্ছে তার। তাছাড়া—আবার একতলায় নেমে আসতে হয়েছে উঁচু তলা ছেড়ে। আর কাঁধে পিঠে থলি বয়ে র‍্যাশন আনবার লোকগুলো সব কর্পূরের মত উপে গেছে বলে পাড়ার লোককে খোশামোদ করতে হচ্ছে, 'র‍্যাশনটা একটু এনে দেবেন'?

সিনেমার গল্পের মত অবশ্য আয়ের পথ বন্ধ হবার পরদিনই শতগ্রন্থী দেওয়া ছেঁড়া

~ www.amarboi.com ~

শাড়ী পরতে হবে না, টাকা আছে জমানো। কিন্তু কলসীর জল তো?

তা ছাড়া একটা দুরারোগ্য রোগী মজুত থাকবে, যার পিছনে সর্বস্বান্ত হয় সংসার!

রবিপদ যেন ছবির মত দেখতে পায় এসব।

অথচ চোখে দেখতে হয় একটা উদ্ধত অহঙ্কারের দৃশ্য। বাজারটা, দুধের বোতলটা যদি এত অমোঘ না হতো!

রবিপদ তাহলে অন্ততঃ সকালের ওই যন্ত্রণটা থেকে মুক্তি পেত।

কিন্তু তা হবার নয়।

বাজারও যদি রাতে সেরে রেখে দেওয়া যায়, দুধের বোতল?

আনতেই হবে। আর ঠিক পড়তেই হবে চোখে। হয় যেতে, নয় আসতে—হয় গাড়ী চড়ার সময়, নয় গাড়ী ধোওয়ার সময়।

আসবার সময় আজ দেখা হলো।

সেই গলির মুখ জোড়া করে গাড়ী বাবু দাঁড়িয়ে তদারক করছেন, আর একটা দস্যির মত নেপালী চাকর গাড়ী ধুচ্ছে।

রবিপদর গায়ে ছিটে লাগেনি, তবু রবিপদ হঠাৎ গলার স্বর ফুলিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'এই বুড়বাক্ কাঁহাকা, আঁখ্ অন্ধা হ্যায়?'

লোকটা এই আকস্মিকতায় চমকে উঠে স্থির হয়ে দাঁড়ালো, বাবুর মুখের দিকে তাকালো।

যেন বাবু যদি একবার হুকুম দেন তো দিয়ে দেয় সমুচিত জবাব।

কিন্তু বাবু হঠাৎ খোলা গলায় হেসে উঠলেন, হাত দুটো ট্রাউজারের পকেটেই রেখে এলায়িত ভঙ্গীতে বলে উঠলেন, 'কী হল? হঠাৎ রাষ্ট্রভাষা যে? এ কিন্তু ওটাও বোঝে না।'

ভঙ্গীটার মধ্যে এমন একটা অবজ্ঞা ফুটে ওঠে, যা কেবল অগ্রাহ্য দিয়েই হজম করা যায়, কিন্তু রবিপদ সেই অগ্রাহ্যটা আনতে পারল না, রবিপদ গ্রাহ্য দিল।

রবিপদ আবার চেঁচিয়ে উঠল। চেঁচিয়ে উঠলো রাষ্ট্রভাষায় নয়, মাতৃভাষাতেই।

বলে উঠলো, 'দুটো পয়সার মুখ দেখলেই যারা ধরাকে সরা দেখে, তাদের পয়সা বেশীদিন থাকে না বুঝলেন?'

কমলেশ বোস রেগে উঠল না। তেমনি হাসিমাখা মুখেই স্থির গলায় বললো, 'জ্ঞান দিচ্ছেন?'

'জ্ঞান?' রবিপদ গাড়ীর গায়ে নিজেকে ঘষটে গলিতে ঢুকে এসে বললো, 'আপনাদের মত অহঙ্কারীদের জ্ঞান দেবার ক্ষমতা মানুষের নেই, জ্ঞান যিনি দেবার তিনিই দেবেন। যাঁর নাম দর্পহারী!'

গট গট করে চলে আসে রবিপদ, আর দুধের বোতলটা নামিয়ে রেখে বলে ওঠে, 'আমি এই বলে দিচ্ছি দর্প ওর চূর্ণ হবেই হবে। ওই গাড়ীই ওকে যমের দক্ষিণ দোরে নিয়ে যাবে।'

~ www.amarboi.com ~

রবিপদর বৌ দুধের বোতলটা তুলে নিতে এসেছিল, থমকে দাঁড়ালো, তারপর একটা জ্বলন্ত দৃষ্টি হেনে চলে গেল।

যে দৃষ্টির অর্থ হচ্ছে, 'ইস্ এতো ইতর হিংসুটে তুমি? ছিঃ।'

রবিপদ কিন্তু অপ্রতিভ হয় না।

জোর গলায় বলে, 'দূর শালার পৃথিবী! এখানে স্ত্রী পুত্র পরিবার সবই মিথ্যে, সত্যি শুধু পয়সা! স্ত্রী সুদ্ধ পয়সাওলার দিকে।'

বৌ যে নিঃসাড় রইল, তাতেও অপ্রতিভ হলো না।

কিন্তু অপ্রতিভ কি কোনো কিছুতেই হবে না রবিপদ?

নাঃ হতেই হবে। হতেই হল।

নারায়ণের আসল নাম যে দর্পহারী!

তাই—সন্ধ্যাবেলা যখন অফিস থেকে বাড়ি ফেরে, দরজা পার হতে না হতেই বৌ নির্লিপ্ত গলায় বলে, 'তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হয়েছে।'

রবিপদ থমকায়।

রবিপদ ভাবতে চেষ্টা করে কী মনস্কামনা ছিল তার?

ভেবে না পেয়ে বলে, 'তার মানে?'

বৌ আরো নির্লিপ্ত গলায় বলে, 'মানে অতি সোজা! কমলবাবু হাসপাতালে গেছেন, 'যায় যায়' অবস্থা! না বাঁচাই সম্ভব, একখানা মালবোঝাই লরীর সঙ্গে ধাক্কা লেগেছে কিনা!'

রবিপদ থতমত খায়।

শুকনো গলায় বলে, 'ঠাট্টা হচ্ছে?'

'ঠাট্টা? তা হবে।' বৌ আরো উদাস হয়, 'ঠাট্টা কি সত্যি একটু পরেই টের পাবে। কান্নার রোল উঠবে তো?'

রবিপদ স্তব্ধ হয়ে যায়।

রবিপদ দেখে তার নিজের স্ত্রী যেন তাকে কেটে কেটে নুন দিতে চাইছে।

রবিপদ জোর করে বলতে চেষ্টা করে, 'বেশ হয়েছে। ঠিক হয়েছে!' কিন্তু গলা দিয়ে শব্দ বেরোয় না।

শুধু মাথার মধ্যে বুকের মধ্যে, বুঝিবা সর্বশরীরের মধ্যে কিসের একটা রোল ওঠে!

কিসের রোল এ?

আর্তনাদের?

না প্রার্থনার? নাকি দুটোই? কিন্তু—

কমলেশ বোস হাসপাতালে পড়ে আছে বলে রবিপদ রায় প্রার্থনা করতে যাবে, তাকে 'বাঁচিয়ে দাও' বলে? কেন? রবিপদ পাগল নাকি?

অথচ আর্তনাদের সঙ্গে সঙ্গে রবিপদ সেই প্রার্থনাটাই করছে।

না করে পারছে না তাই করছে।

~ www.amarboi.com ~

দেয়ালে ঝোলানো পটের সামনে গিয়ে বলে 'মা রাগের মাথায় বলা কথা ধরবে তুমি? আমি গরীব, তবু ধারধোর করে তোমার সোনার নথ গড়িয়ে দেব, এযাত্রা ওকে বাঁচিয়ে দাও।'

বলছে।

ওর এই উল্টোপাল্টা কথায় ঠাকুর হাসছেন কিনা ভেবে দেখছে না।

শুধু বলে চলেছে, 'মা অপরাধ ক্ষমা করো।...মা প্রসন্ন হও। ও বাড়ি ফিরে আসুক, ও আবার তেজ দর্প করে গাড়ী চালিয়ে বেড়াক। নইলে নিজেকে আমি ক্ষমা করতে পারবো না।'

প্রার্থনা করছে রবিপদ চোখ খুলে রেখে, বুজতে পারছে না। চোখ বুজলেই একটা বীভৎস বিধ্বস্ত মাংসপিণ্ড দেখতে পাচ্ছে।

কিন্তু 'মা' কি প্রসন্ন হাসি হাসছেন?

না সেই ব্যঙ্গ হাসিটাই লেগে রয়েছে তাঁর মুখে? হয়তো তাই, কারণ কোটি কল্পকাল ধরে মানুষকে দেখে দেখে আর তাদের প্রার্থনা শুনে শুনে মনুষ্যচরিত্রে অভিজ্ঞতা হয়ে গেছে মার।

তিনি হাড়ে হাড়েই জানেন, যদি তিনি প্রসন্ন হন, যদি রবিপদর প্রতিবেশী হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরে এসে আবার তেমনি উদ্ধত ভঙ্গীত বীরদর্পে ট্রাউজারের পকেটে হাত দিয়ে শিস দিতে দিতে গাড়ী ধোওয়ায়, অথবা ঠোঁটের ফাঁকে পাইপ গুঁজে, তরুণী-সাজা আধবুড়ী বৌটিকে নিয়ে গাড়ীতে উঠে প্রয়োজনের অতিরিক্ত জোরদার করে গাড়ীর দরজা বন্ধ করে, রাস্তার লোকের নাকে মুখে ধুলো উড়িয়ে সাঁ করে বেরিয়ে যায়, তা হলে এখনকার ওই প্রার্থনারত লোকটাই ঠিক বলে উঠবে, 'ইস্ শালার বড়লোকের প্রাণ যেন বেড়ালের প্রাণ! মরেও মরে না...লাগে একখানা লরীর সঙ্গে ধাক্কা—'

আর সোনার নথের সেই হাস্যকর প্রতিশ্রুতিটা? তা সেটা তো হাস্যকরই!

~ www.amarboi.com ~

চাপরাশী

অনেকক্ষণ ধরে কথা চালিয়ে, জোরালো গলায় অনেক ওজর-আপত্তি অনিচ্ছে দেখিয়ে অবশেষে প্রায় পরাজিতের গলায় 'আচ্ছা ঠিক আছে। কবে বললেন? বাইশে? টুকে রাখছি তারিখটা। তাড়াতাড়ি ছেড়ে দেবেন কিন্তু—' বলে

টেলিফোন রিসিভারটা নামিয়ে রেখে রাধিকানাথ হতাশ গলায় বলে ওঠেন, 'নাঃ এই 'সভা' করে করেই দেশটা পাগলা হয়ে যাবে। আর সভাতেই আমার জীবন মহানিশা করে তুলবে। একদিকে শ্লোগান, আর একদিকে ফাংশান, এই নিয়ে আছে দেশ। অন্য চিন্তা করতে ভুলে যাচ্ছে। কারণে অকারণে হরদম এই ফাংশান করা আইন করে বন্ধ করে দেওয়া উচিত।'

একসঙ্গে এতগুলো কথা বললে হাঁপাতেই হয়, কারণ কিছু কিঞ্চিৎ বয়েস হয়েছে রাধিকানাথের।

নন্দিতা অনেকগুলো বাংলা পত্র-পত্রিকা নিয়ে বসেছিল। পড়ছিল না, ওলটাচ্ছিল, আর বাবার জোরালো গলার আপত্তি শুনছিল। নন্দিতার হাসি হাসি মুখ দেখে মনে হচ্ছিল, ওই 'আপত্তি'টা সে যেন বেশ তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করছে। নইলে গল্প পড়তে পড়তে হাসবে, বা হেসে উঠবে খিলখিলিয়ে, সে বয়েস আর নেই নন্দিতার। তাছাড়া পড়েই বা কই এই সব পত্র-পত্রিকা? শুধুতো ওলটায়।

রাধিকানাথ একটি নামকরা কাগজের সহ-সম্পাদক, বাড়িতে পত্র-পত্রিকার বৃন্দাবন। কত পড়বে? আর কি-ই বা পড়বে?

এখন আবার স্বগতোক্তি শুনে নন্দিতা পত্রিকাটা মুড়ে রেখে মুচকি হেসে বলে, 'কেন বাবা, তুমি তো সভা করতে খুব ভালই বাসো।'

নন্দিতা সর্বদাই বাবাকে এ-অপবাদ দিয়ে থাকে, আর রাধিকানাথ সর্বদাই শুনে উত্তেজিত হন। কারণ তিনি তো জানেন এক-একটি সভাপতিত্বে, বা প্রধান অতিথিত্বে স্বীকৃতি দেবার আগে কত প্রতিরোধের চেষ্টা করেন তিনি।

জরুরী কাজ, স্বাস্থ্য ভাল নেই, সময়ের অভাব, ইত্যাদি প্রভৃতি বহুবিধ অস্ত্র নিয়েই লড়েন, কিন্তু প্রতিপক্ষের প্রাবল্যের কাছে, অবশেষে হার মানতেই হয়। বাঘ শিকারীরা কি কোনো বাধা মানে? আর সভাপতি শিকারীরা কি 'বাঘমারা'দের চেয়ে কম? অতএব পরাজয় মেনে বলতেই হয়, 'আচ্ছা ঠিক আছে—'

কিন্তু নন্দিতা যেন ওই ফাংশানকারীদের মতই একবগ্‌গা। কোনো কথা বুঝতে চায় না, স্বচ্ছন্দে বলে বসে, 'সভা তো তুমি ভালই বাসো বাবা?'

~ www.amarboi.com ~

এতে রাধিকানাথ উত্তেজিত হবেন না?

হলেন।

সেই গলাতেই বলে উঠলেন, 'ভালই বাসি? তুই বলিস কি নন্দা? তোর এই ভুল ধারণাটা কি কিছুতেই যাবে না? সভা ভালবাসি? বলে 'সভা' শুনলেই আমার আতঙ্ক হয়। কেবল সময় নষ্ট, নিজের কাজকর্ম কিছুই হয় না। শরীরেও বয়না সবসময়।'

'তবে যাও কেন?'

দুষ্টু দুষ্টু হাসে নন্দিতা।

অল্পবয়সে মাতৃহীন মেয়ে, বাবার উপর আবদার আধিপত্য দুই-ই প্রবল। হয়তো—এতটা উত্তেজিত হয়ে ওঠার কারণও রাধিকানাথের তাই। মেয়ের কথাকে রাধিকানাথ গুরুত্ব দিয়ে থকেন।

'যাও কেন' প্রশ্নটিকেও গুরুত্ব দিলেন। বললেন 'যাই কেন? যাই কেন, তা দেখতে পাস না? এককথায় যাই? কী অনুরোধ উপরোধের ঠেলা। বাপস্!'

নন্দিতা হেসে উঠে বলে, 'সে তো থাকবেই। নিজ নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে তো লোকে তেমন অনুরোধই করে থাকে, যাতে ঢেঁকি গেলানো যায়। কিন্তু ঢেঁকিটা তুমি গিলবে কেন?'

রাধিকানাথ ক্ষুব্ধ হন, আবার চড়াও হন। বলেন, 'গিলি কেন? গায়ে মানুষের চামড়া আছে বলেই গিলি। না গিলে পারি না। আমাকে সবাই এত ভালবাসে, এত শ্রদ্ধা সম্মান করে, আমাকে একটিবারের জন্যে নিয়ে যেতে পারলে কৃতার্থ হয়, সেটা দেখবো না? তবু তো চেষ্টা করি এড়াতে, তা বলে অভদ্র তো হতে পারি না? না অভদ্র হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

রাগ-রাগ মুখ করে বসে পড়েন রাধিকানাথ।

মেয়ের মুখটা কিন্তু হাসি-হাসিই থাকে, 'সম্ভব হতো বাবা—' নন্দিতা গলা ছেড়ে হেসে ওঠে। 'যদি তুমি ওই শ্রদ্ধা সম্মান ভালবাসার স্বরূপটা বুঝতে।'

রাধিকানাথ এবার গম্ভীর হন।

গম্ভীর আর ক্ষুব্ধ গলায় বলেন, 'তোর সেই কথা! তোরা এযুগের ছেলেমেয়েরা বড় অসভ্য হয়ে গেছিস নন্দা। এত ছোটকথা তোরা ভাবতে পারিস কি করে?'

নন্দিতাও অতএব গম্ভীর হয়, 'অবিরত 'ছোট' মানুষ দেখতে দেখতে, আর ছোট কথা বুঝে ফেলতে ফেলতে, 'ছোট' ভাবনা ভাবতে শিখে ফেলেছি বাবা। জ্ঞানচক্ষুটা বড় তাড়াতাড়ি খুলে গেছে আমাদের।'

রাধিকানাথ আরো গম্ভীর হন, 'যেটাকে জ্ঞানচক্ষু ভেবে আত্মপ্রসাদ অনুভব করছিস নন্দা, আসলে সেটা বিকৃত চক্ষু। আমাকে লোকে চায়, আমি 'কবি' বলে নয়, একটা কাগজের সাব এডিটার বলে, এই দেখাটাই তোর বিকৃত দৃষ্টির দেখা।'

নন্দিতা যদি রবীন্দ্রযুগের মেয়ে হতো, নিশ্চয়ই বাপের এই ধিক্কার বাণীতে আহত হতো, অভিমান করতো, চুপ করে যেতো। তা'হলে নন্দিতার 'চোখ ছলছলিয়া উঠিত'

~ www.amarboi.com ~

অথবা 'বড় বড় দুইচোখের কোল বাহিয়া দুইফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িত।'

কিন্তু নন্দিতা রবীন্দ্রযুগের মেয়ে নয়, যুদ্ধোত্তর যুগে জন্মানো মেয়ে, তাই নন্দিতা অপবাদ গায়ে রাখতে রাজী হয় না। জোর গলায় প্রতিবাদ করে, 'ওকথা বললে মানবোই না। নিজের চক্ষে দেখিনি বুঝি? যাইনা বুঝি তোমার সভায়-টভায়? দেখতে পাইনা তোমার কাগজের ক্যামেরাম্যানটি ক্যামেরা বাগিয়ে ধরলেই ফাংশান কর্তারা কেমন গুছিয়ে বাগিয়ে ক্যামেরার 'ফোকাসে'র মধ্যে এসে পড়েন। ঠেলাঠেলির চোটে তোমার মুখটাই প্রায় আড়াল হতে বসে। তা যাক, ফটোটা যখন কাগজে বেরোবে ওদের মুখটুখগুলো তো? আর বেরোবেই ফটো। অন্তত তোমার কাগজে। তুমি যেখানে 'চীফ্‌গেষ্ট' বা প্রেসিডেন্ট, সে সভার বিবরণ তোমাদের রিপোর্টার বেশ বিস্তারিত করেই লিখবে।'

'শুধু এই জন্যেই ওরা আমায় ডাকে?' রাধিকানাথ উত্তেজিত হন।

নন্দিতা কিন্তু নির্বিকার গলায় বলে, 'আমার তো তাই বিশ্বাস।'

'তোমাদের এযুগের এই বিশ্বাসহীনতার বিশ্বাসগুলো খুব ঠিক নয় নন্দা! আশ্চর্য, তুমিও এই বিকৃত আধুনিকতার শিকার হচ্ছো।'

'তুমি কবি মানুষ, কবিত্ব করে কথা বলতে পারো বাবা। আমি বলবো, 'ইহাই পরম সত্য।'

রাধিকানাথ আর কি বলতেন কে জানে, আবার টেলিফোন ঝনঝনিয়ে ওঠে। রাধিকানাথ ধরবার আগেই নন্দিতা ধরে, এবং বলে চলে, 'হ্যাঁ বাড়িতে আছেন, একটু ব্যস্ত আছেন। বলুন কি বলবেন? ও, আমাকে বললে হবে না? কিন্তু আমি তাঁর মেয়ে, যা বলবার—তাঁকেই একবার চাই? আচ্ছা ডেকে দিচ্ছি—কি নাম বলবো? 'বিশ্ববেকার সংস্কৃতি সংস্থা?' আচ্ছা, ধরুন এক মিনিট।'

কষ্টে হাসি চেপে বাবার দিকে রিসিভারটা এগিয়ে দেয় নন্দিতা। 'বাবা বিশ্ববেকার সংস্কৃতি সংস্থা।'

রাধিকানাথ সেটা হাত দিয়ে চাপা দিয়ে চাপা মেজাজী গলায় বলেন, 'কই ভাগাতে পারলে না?'

'পারতাম, যদি তুমি এখানে বসে না থাকতে।'

নন্দিতা হাসতে থাকে। এবং উৎকর্ণ থাকে বাবার কথার ধাঁচের দিকে। খুব উৎকর্ণের কারণ অবশ্য নেই। রাধিকানাথ বেশ চড়া চড়া গলাতেই বলে চলেছেন, 'না না মাপ করবেন। সময় একেবারে নেই।...কি করবো বলুন? উপায় কী?...কী আশ্চর্য। রাধিকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া আর কবি নেই বাংলাদেশে? ঠিক আছে, না থাকতে পারে। কিন্তু উপায় কি? ওইদিন আমার অন্য কাজ রয়েছে।

নন্দিতার কর্ণগোচরের উদ্দেশ্যই বোধ হয় ঝাঁজটা বেশী। তাছাড়া বাস্তবিকই কাজ রয়েছে রাধিকানাথের। তাই বার বার বলেন, 'সময় নেই, মাপ করবেন। একদিনে দুটো সভা করিনা আমি!'

কিন্তু 'করিনা' বললেই যদি ছাড়ান পাওয়া যেতো। রাধিকানাথের 'সময়' নেই, কিন্তু তাদের তো অগাধ-অনন্ত সময়? রাধিকানাথের 'কাজ' আছে, কিন্তু তারা যে 'বেকার।' তাছাড়া তারা সংস্কৃতির ধারক বাহক, তাদের কবির উপর একটা দাবি নেই? অতএব শেষ পর্যন্ত বলতেই হয় রাধিকানাথকে—'আচ্ছা ঠিক আছে—'

রিসিভারটা নামিয়ে রেখে রাধিকানাথ মেয়ের দিকে একটি প্রাঞ্জল দৃষ্টি হানেন। যার অর্থ হচ্ছে—'দেখলে?'

নন্দিতা তো দেখেইছে।

তাই নন্দিতা মৃদু হেসে বলে, 'ছাড়বে না জানতাম। 'সংস্কৃতির' ধারক তো। অন্যের অনিচ্ছের বন্ধ দরজায় তুরপুন চালিয়ে ছেঁদা করে ঢুকে পড়াই কাজ যাদের।'

'কী বললি?'

'কিছু না। কিন্তু বাবা এইবার তোমায় চান করতে যেতে হয়, আবার হয়তো কেউ এসে পড়বে। হয়তো ফোন।'

রাধিকানাথ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে তাড়াতাড়ি উঠে পড়েন।

রাধিকানাথ চান করতে যান, কিন্তু মনের মধ্যে অবিরত পাক দিতে থাকে মেয়ের ব্যঙ্গোক্তি। কানের পর্দায় যেন ধাক্কা মারছে এখনো।

'...যদি ওই শ্রদ্ধাসম্মান ভালবাসার স্বরূপ বুঝতে।...হি হি!'

রাধিকানাথের মেয়ে ওইসব অদৃশ্যপক্ষদের শ্রদ্ধাসম্মান ভালবাসার স্বরূপ বোঝাতে বসছে তার বাবাকে। টের পাচ্ছে না তা থেকে রাধিকানাথ তাঁর মেয়ের শ্রদ্ধাসম্মান ভালবাসার স্বরূপটাই বুঝে ফেলছেন।

এই কথা মুখের ওপর বলছে নন্দিতা?

রাধিকানাথ একটা কাগজের সাব এডিটার বলেই তাঁকে নিয়ে এত টানাটানি!

রাধিকানাথের এই দীর্ঘজীবনব্যাপী কাব্যসাধনাটা কিছুই নয়? বোঝা যাচ্ছে অন্ততঃ রাধিকানাথের মেয়ের কাছে 'কিছুই' নয়! তা-নইলে সেটা নন্দিতার সন্দেহের গণ্ডী অতিক্রম করে 'স্থিরবিশ্বাসের' ভূমিতে দাঁড়াতো না।

...'আমার তো তাই বিশ্বাস!'

রাধিকানাথ শাওয়ারের নীচে মাথাটা পেতে দাঁড়িয়েই রইলেন অন্যমনস্কের মত। যেন বাইরের জলে ভিতরের দাহ প্রশমিত হবে। আশ্চর্য বাপ সম্পর্ক এমন অশ্রদ্ধেয় মন্তব্য করতে বাধলোও না নন্দিতার?

জ্ঞানচক্ষু!

জ্ঞানচক্ষুর বড়াই!

তো সেই 'জ্ঞানচক্ষুতে' ধরা পড়লো না, দেশের লোকের 'কবি রাধিকানাথের' জন্যে মাথাব্যথা নেই, মাথাব্যথা দৈনিক 'মহৎ ভারতের'র সহ-সম্পাদক রাধিকানাথের জন্য, এই 'পরম সত্যে'র বাণীটি রাধিকানাথের মুখের উপর ছুঁড়ে মারাটা কী পরিমাণ নির্মম নির্লজ্জতা!

~ www.amarboi.com ~

সন্তানের হাত থেকে আসা আঘাত এত যন্ত্রণাদায়ক!

রাধিকানাথ কি তবে যাচাই করে দেখ্‌বেন নিজের মূল্যের পরিমাণ?

অথচ রাধিকানাথের জ্ঞানচক্ষুসম্পন্ন মেয়ে একচক্ষু হরিণের মত একটা দিকই দেখছিল। স্বপ্নেও ভাবেনি তার ওই 'স্থির বিশ্বাসের' পাথরের চাঁইটা সেই সব মতলববাজ অদৃশ্যপক্ষদের উপর না পড়ে তার সরলবিশ্বাসী এবং মানুষের ভালবাসার প্রতি আস্থাশীল বাবার উপর গিয়েই পড়েছে।

তখন বাবার মুখটাও ভাল করে লক্ষ্য করেনি নন্দিতা, তাঁকে ঘর থেকে ভাগাবার চেষ্টাই করেছে। কারণ 'হঠাৎ কেউ এসে পড়া'র আশঙ্কা নয়, নিশ্চয় 'একজন' এসে পড়ার আশা ছিল। বুকের মধ্যে টিপ্ টিপ্ করছিল আশাটা।

রাধিকানাথকে চান করতে পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত হলো, ঘড়ির দিকে তাকালো।

তারপর সে ঘরে ঢুকলো, সে এসেই ধপ করে বসে পড়ে বললো, 'সারা সকাল এত কার সঙ্গে টেলিফোনে আড্ডা মারো? যখনই রিং করি এনগেজ্‌ড্ সাউন্ড!'

নন্দিতা ভ্রূভঙ্গী করে, 'আহা আমিই যেন সকাল থেকে টেলিফোন নিয়ে বসে আছি। কেন বাবাকে প্রধান অতিথির পদে বরণ করবার জন্যে বরমাল্য হাতে ফাংশানীর দল নেই? পার্টির পর পার্টি?'

'সত্যি!' নন্দিতার প্রধান অতিথি বলে ওঠে, 'বড্ড বেশী সভা করছেন তোমার বাবা! কাগজ খুললে, দশটা সভার মধ্যে ছটায় তোমার বাবা! হেলথ্ খারাপ হয়ে যাবে।'

'তা'তে কি? সভাকারীদের সভাটা তো উজ্জ্বল হবে? বিস্তৃত বিবরণটা তো কাগজে বেরোবে? বাস্তবিক এত রাগ হয় বাবার এই ইয়ে'র সুযোগ নিয়ে কিভাবে ভাঙিয়ে খাচ্ছে সবাই ওঁকে।...বাবার ধারণা—'কবি'র প্রতিই এত শ্রদ্ধা সম্মান তাদের। টার্গেটটি যে কে, বুঝতেই পারেন না। চোখে ধরিয়ে দিলেও মানতে চান না।'

বাবার 'বোকমী' না বলে, বাবার ইয়ে' বলে নন্দিতা সৌজন্য করে।

তবু নন্দিতার প্রিয়বান্ধব বলে ওঠে 'এই নন্দিতা, এটা বোধহয় তুমি ঠিক বলছো না! এতটা নয়। দেশের লোকেরা কবি সাহিত্যিক এঁদের খুব ভালবাসে। সবাই দেখতে চায়, নিয়ে গেলে দর্শনার্থীর ভিড় জমে—'

'হতে পারে!' নন্দিতা হেসে উঠে বলে, 'এক্ষেত্রে কিন্তু আমার অনুমানই নির্ভুল। আমি তো হি হি বাবার একটা বিশেষণই আবিষ্কার করে ফেলেছি। বাবাকে বলি—'চাপরাশী'। বাবা কিন্তু মানে বুঝতে পারেন না, বলেন, 'চাপরাশী-চাপরাশী করিস কেন রে নন্দা?'

'তুমি একটি পয়লা নম্বরের অভব্য মেয়ে—' আগন্তুক বলে ওঠে, 'বাবা না তোমার?'

'তাতে কি? পৃথিবীটাকে যে চিনে ফেলেছি। সত্যি ওই চাপরাশটা খুলে পড়ুক, দেখবে এই সব শ্রদ্ধাসম্মান, কবি-প্রেম স্রেফ বাতাসে মিলিয়ে গেছে।...পাড়ার ছেলেরা পর্যন্ত ওঁকে ভুলে গিয়ে মেয়র আর মন্ত্রী খুঁজে বেড়াচ্ছে?'

~ www.amarboi.com ~

'বাঃ চমৎকার! পাড়ার ছেলেদের ওপর তো দেখছি অসীম শ্রদ্ধা তোমার। নিজের ভবিষ্যৎ খুব অনুকূল বলে মনে হচ্ছে না।'

'প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই করে জয় লাভই বীরপুরুষের কাজ।'

'বীরপুরুষ' শব্দটা তো ঐতিহাসিক।'

'ইতিহাসের পাতা থেকে নামিয়ে আনার চেষ্টা কর। জানো না বীরভোগ্যা বসুন্ধরা।'

'ওটা বোকা বোঝানোর ছল। আসলে বসুন্ধরা চতুর-ভোগ্যা। কিন্তু বাজে তর্ক থাক, আমাদের ব্যাপারটার কি ভাবছো তাই বল?'

'সব ভাবনাটা আমিই ভাববো?'

'বেশ আমিই ভাবছি। এই দণ্ডে গিয়ে বলছি তোমার বাবাকে।'

'থাক, অত বাহাদুরীতে কাজ নেই, বলবে ধীরে সুস্থে। সেবারে তোমাদের সরস্বতী পুজোয় প্যান্ডেলের কেলেঙ্কারীতে বাবা তোমার ওপর হাড়ে চটে গেছেন।'

'কিন্তু আমি বেচারা সবচেয়ে নির্দোষ ছিলাম।'

'সে কথা কে বোঝাবে। কিন্তু যাক—আমার শর্তটা মনে আছে তো? জীবনে কখনো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করা চলবে না।'

'ঠিক আছে?' বেহায়া ছেলেটা একটি ব্যঞ্জনাময় হাসি হেসে বলে, 'কথা দিচ্ছি কেবল অসংস্কৃতির অনুষ্ঠানই চালিয়ে যাবো।'

নন্দিতা চাপা রাগের গলায় বলে, 'এই দণ্ডে বিদায় হও। অভব্য কোথাকার।'

'যেতাম না। শোধ তুলে যেতাম এই অপমানের। কিন্তু তোমার বাবা আসছেন—'

'বাবা! এই সমীর, লক্ষ্মীটি শীগগির! প্লীজ্। আমিই বলবো, মুড্ বুঝে বলবো।'

বাবার 'মুড্' লক্ষ্য করছিল নন্দিতা।

কীভাবে পাড়বে কথাটা।

কিন্তু মুড্ আর পায় না। অথচ হঠাৎ ঝপ্ করে বলে ফেললে হয়তো বলা হয়েই যেতো। যেমন ঝপ্ করে বলে ফেললেন রাধিকানাথ, 'বুঝলি নন্দা 'মহৎ ভারতের' অফিসের দরজায় সেলাম ঠুকে চলে এলাম।'

মহৎ ভারতের দরজায় সেলাম ঠুকে চলে এলাম।

এ আবার কেমনতর ভাষা!

নন্দিতা অবাক হয়ে তাকায়।

রাধিকানাথ যেন ক্যানভাসারের যান্ত্রিক গলায় গড়গড়িয়ে বলে ফেলেন, 'বললাম, এই রইল তোমার সাব্-এডিটারী! এত ইয়ে হয়ে কখনো থাকা যায়! একটা কথা থাকে না, কোনো পরামর্শ কেউ গায়ে মাখে না, অথচ খেটে মরো ডবল। নাঃ পোষাল না আর! ছেড়ে দিয়ে চলে এলাম।'

'ছেড়ে দিলে? কাজ ছেড়ে দিলে?'

নন্দিতা অবাক হয়ে কূল পায় না।

~ www.amarboi.com ~

কিন্তু রাধিকানাথ আত্মস্থ।

'দিলাম! অপমান সয়ে টিকে থাকতে পারে মানুষ!'

নন্দিতা আরো অবাক হয়।

বাবার ওই কাগজের অফিসে কোনো দিন তো কোনো মতবিরোধ ঘটতে শোনেনি বাবার। হঠাৎ এমন কি ঘটনা ঘটতে পারে? অথচ এ মুহূর্তে জিগ্যেস করাও যায় না! বোঝা গেল না।

সমীরও সেই কথাই বলে 'বোঝা যাচ্ছে না। মাঝখান থেকে আমাদের ব্যাপারটাই গুবলেট্ হয়ে গেল।'

'আহা, গুবলেট আবার কি? বাবা 'মহৎ ভারতের' কাজ ছেড়ে দিয়েছেন বলে, আমরা বিয়ে করবো না?'

'করতে দেরী হবে। ওঁর এই মন মেজাজ খারাপের সময়—'

'যাক তুমি আবার মন-মেজাজটা যাচ্ছেতাই করে বোসো না। বাবাকে নিয়েই ভাবনা—'

'ভয় নেই তোমার বাবা ফাংশান টাংশানেই দিব্যি ভুলে থাকবেন। অন্য অসুবিধে আর কি! বাড়ি ভাড়ার আয়টা তো রয়েছে—'

নন্দিতা কি বলতে গিয়ে হঠাৎ থেমে যায়। তাকিয়ে থাকে ঘাড় ফিরিয়ে।

'কি হলো? কি বলছিলে?'

'বলছি—ফাংশানে কি আর কেউ ডাকবে বাবাকে?'

সমীর বলে ওঠে, 'বাজে কথা বোলো না। আর তোমার ওই সন্দেহের কথাটি যেন এক্ষুণি বাবাকে গিয়ে বোলো না।'

'হয়েছে। মার চেয়ে মাসীর দরদ। যাক কিছুদিন গা ঢাকা দিয়ে থাকো, যখন তখন এসো না। বাবা তো বাড়ি থেকে বেরোচ্ছেনই না। তোমায় দেখলে হয়তো—'

কথাটা নন্দিতার সত্যি।

বাড়ি থেকে বেরোচ্ছেন না রাধিকানাথ। বলছেন, 'নিজের কাজ করবার সময় তো পাইনি কখনো ভাল করে,—এবার নিজের দিকে তাকাই একটু।'

তাকাচ্ছেন তাই রাধিকানাথ।

নিজের দিকে তাকাচ্ছেন। সারাক্ষণ কবিতার খাতা নিয়ে বসে থাকছেন।

অসুবিধেও নেই।

ব্যাঘাত আসছে না কোনোখান থেকে। যেন প্রতিমা বিসর্জনের শেষে পূজা মণ্ডপ। ঢাক-ঢোল, ঘণ্টা-কাঁসরের জগঝম্প গেছে থেমে। আয়োজন করে প্রণাম করতে আসা দূরের কথা পথে যেতে যেতে কেউ থমকে দাঁড়াচ্ছে না।

কে জানে কেমন করে কোন তারে বেতারে বার্তা রটে। মোটকথা রটেছে। টের পাওয়া যাচ্ছে সেটা। টেলিফোনের রিসিভারের গায়ে ধুলো জমে, রাধিকানাথের

~ www.amarboi.com ~

ধোপদুরস্ত ধুতি পাঞ্জাবি চাদরের পাটভাঙা হয় না। আর সেটা হয় না বলেই হয়তো রাধিকানাথকেই কেমন ভাঙাচোরা দেখায়।

এতদিনে যেন 'চাপরাশী' শব্দটার মানে বুঝতে পারছেন রাধিকানাথ। মাঝে মাঝেই ধরা পড়ে সেটা তাঁর কথা-বার্তায়।

যাচ্ছে দিন সপ্তাহ মাস, মাসের পরে মাস, সেই 'মানে'টা যেন পাথরে কেটে বসছে।

নন্দিতার বাবার তবে এতদিনে জ্ঞান চক্ষু উন্মীলিত হয়েছে?

অতএব বলতে পারা যায় নন্দিতা খুশী হয়েছে?

কিন্তু নন্দিতাকেও তবে ভাঙাচোরা দেখাচ্ছে কেন আজকাল? নন্দিতা কেন বাবার দিকে তাকাতে পারছে না আজকাল?

নন্দিতা আগে হঠাৎ হঠাৎ একদিন বলতে চেষ্টা করছিল, 'বাবা এই তুমি সারাদিন বাড়ি আছো কেউ ডাকলো না, আর যেই একটু বেরিয়েছ অমনি ফোন্!... কী না 'বেহালা থেকে বলছি'—নাম বলবে না কিছুতে। যেন বেহালায় একমাত্র তিনিই আছেন। যত বলি আমি তাঁর মেয়ে যা বলবার আমায় বলুন, কিছুতে না। রেগে মেগে দিয়েছি আচ্ছা করে শুনিয়ে।'

বেহালা, হাওড়া, দমদম, উত্তরপাড়া।

সব পার্টিকে 'আচ্ছা করে শুনিয়ে' দিচ্ছে নন্দিতা। কিন্তু লক্ষ্য করছে ওর বাবা বড় 'আচ্ছা করে' ওর কথা শুনছেন। দৃষ্টিটা অস্বস্তিকর। তাই সেই হঠাৎ হঠাৎ ফোন্ আসার গল্পটা ক্রমশঃ ভুলে যাচ্ছে নন্দিতা।

রাধিকানাথই বরং হঠাৎ হঠাৎ বলেন, 'নাঃ স্বীকার করতেই হবে তোদের এই যুগটা বুদ্ধির যুগ।'

অবান্তরই বলে বসেন।

কিন্তু নিজের যুগের বুদ্ধির প্রশংসায় খুশি হতে পারছে না কেন নন্দিতা!

নন্দিতা কোনোদিন সমীরের কাছে আসেনি; সমীরই যায়।

তাই সমীর তদ্‌ব্যস্ত হয়।

'এ কি, তুমি? আর এই অসময়ে?'

'অপমান বোধ করছি সমীর। আমি আসা মানেই তো সুসময়'।

'অপরাধ স্বীকার করছি। কিন্তু—'

'সমীর!'...

'কী? কী হলো বলতো?'

'সমীর, অনেক দিনতো তোমরা সাংস্কৃতিক উৎসব কর না, সামনের পয়লা আষাঢ়ে 'মেঘদূত' উৎসব করতে পার তো?'

সমীর ওর নীচু করে থাকা মুখটার দিকে তাকায়। তারপর আস্তে বলে, 'শর্তটা

~ www.amarboi.com ~

প্রত্যাহার করে নিচ্ছ?'

'নিচ্ছি।'

'নন্দিতা তোমার ভবিষ্যৎবাণী সফল হওয়ায় তো তোমার খুশি হওয়ারই কথা।'

'সমীর দোহাই তোমার, থামো। কিন্তু এই শোনো, তুমি নিজে যাবে না খবরদার। তোমার ক্লাবের এই সাধারণ সম্পাদক না কে যেন তাকে পাঠাবে। তুমি শুধু টেলিফোনে যোগাযোগ করে—' নন্দিতার বড় বড় দু চোখের কোণে দু ফোঁটা জল জমে। নন্দিতা চুপ করে যায়।

~ www.amarboi.com ~

পুতুলের ছাঁচ

'আমি কোনোদিন কোনো অদৃশ্য শক্তিতে বিশ্বাসী ছিলাম না।...আমি চিরকাল জেনেছি আমার ইচ্ছাশক্তিই আমাকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। কিন্তু আজ আমার জীবনের চিন্তা-ভাবনার মূল শিথিল হয়ে যাচ্ছে। সহসা আমি এক অলৌকিক জগতের খোলা দরজার সামনে এসে পড়েছি, এসে-পড়ে তাকিয়ে দেখছি কী মিথ্যা দম্ভ নিয়েই চলেছি এতদিন।...এখন আমি অদ্ভুতভাবে বিশ্বাস করছি আমরা কিছু নয়, আমরা কেউ নয়, আমরা ভাগ্যের হাতের পুতুল মাত্র।'

চিরকালের মত স্তব্ধ হয়ে যাওয়া একটা দেহের দিকে প্রায় তেমনি স্তব্ধ হয়েই তাকিয়ে বসে থাকতে থাকতে গভীর একটা নিশ্বাস ফেললেন স্নেহাংশু। তারপর প্রায় উচ্চারণের মত করে ভাবলেন, তা নাহলে আমি এখানে এলাম কেন আজ!...আমার তো আসবার কথা ছিল না, আমি তো শুধু এই মফঃস্বল শহরটার পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছিলাম। বিদ্যুৎ গতি পাঞ্জাব মেলের তো এই মাঝারি স্টেশনটায় দাঁড়াবার কথা ছিল না। শুধু আমরা দু'জনে রেলগাড়ির জানলার ধার ঘেঁসে বসে উৎসুক আগ্রহে বারবার ঘড়ি দেখছিলাম, আর বাইরেটা দেখছিলাম।

ট্রেন এ স্টেশনে থামবেনা তা জানতাম, তবু ছুটন্ত প্লাটফর্মটা একবার দেখার ঔৎসুক্য, বোর্ডের গায়ে লেখা পরিচিত এই নামটা একবার পড়ে নেওয়ার আগ্রহ, এর বেশী কিছু না।...সুনীতির মধ্যে আর একটু চাঞ্চল্য দেখছিলাম। পাশের একটি মহিলার সঙ্গে গল্প করছিল সে, না, গাড়ি দাঁড়াবে না। তবু গলা বাড়িয়ে স্টেশনটা একটু দেখে নেওয়া! দেশের নামটা একটু পড়ে নেওয়া! এই আর কি! মেয়ে জামাই আছে এখানে। জামাই এখানের সুগার মিলের এঞ্জিনীয়ার, কিছুদিন হল বদলী হয়ে এসেছে।

তার পর ওদের মধ্যে আর কি গল্প হয়েছিল আমার কানে আসেনি, হঠাৎ সেই প্রচণ্ড শব্দটা কানের পর্দা ছিঁড়ে ফেলে মাথার মধ্যে ধাক্কা মারল। সুনীতির মাথাটা বোধহয় খুব ঠুকে গিয়েছিল, সে ভয়ঙ্কর জোরে একটা 'উঃ', করে উঠেছিল।

পরে, সাইকেল রিকশয় চেপে এবাড়িতে আসতে আসতে আমি হেসে সুনীতিকে বলেছিলাম, 'যমদূত তোমার মাথায় একটা ডাণ্ডস বসিয়ে দিয়ে জানান দিয়ে গেল। বলল, 'মনে রাখিস আমি আছি।' হেসে হেসেই বলেছিলাম। কারণ তখন বিপদ হয়নি। বরং বিপদ এসেও এলনা ভেবে উৎফুল্ল হয়েছিলাম আমরা। যমদূতের কথা নিয়ে ঠাট্টা করতে পেরেছিলাম।

এঞ্জিন চালকের প্রশংসা করতে করতে আসছিলাম আমরা। তার লক্ষ্য-শক্তি আর

~ www.amarboi.com ~

তৎপরতাই যে এই হাজার হাজার প্রাণকে রক্ষা করছে, সে কথা ঘোষণা করছিলাম।

শুধু ও যখন ঘোষণা করেছিল, 'সামনে লাইন খারাপ আছে, পাঁচ ছ ঘণ্টা গাড়ি এখানে থাকবে', তখন মনে হয়েছিল লোকটা একটু বেশী সাবধানতা করছে বোধহয়। সময় বোধহয় একটু বেশী নিচ্ছে। ...কিন্তু তারপর যখন আমরা প্রোগ্রাম চেঞ্জ করে ফেলে সাইকেল রিক্সায় চাপলাম, তখন বেশ ভালই লাগছিল।

সুনীতি তখন বলেছিল, 'দেখেছ তো, আমার ইচ্ছাশক্তির প্রভাব? তুমি বললে, নামা হবে না। বললে, সময় নেই, বললে একবেলার জন্যে গিয়ে কি হবে? কিন্তু আমি ভাবছিলাম ঝুপ করে একবার নেমে পড়ি। শুভ্রা আর দিব্যেন্দু যখন শুনবে এইখান দিয়ে চলে গেছি আমরা, তখন কী বকাটাই বকবে আমাদের!'

অথচ এই খানিকক্ষণ আগে সুনীতি আছড়া-আছড়ি করতে করতে বলছিল, 'কেন আমি এলাম গো! কেন আমি রেলগাড়ী ভেঙে পড়ে মরলাম না গো। গাড়ীখানা কেন গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেল না গো!'

আমি ওকথা বলিনি।

হাজার হাজার লোকের প্রাণের কাছে নিজের স্বার্থটাকে বড় করে দেখতে বেধেছিল আমার। সুনীতির ওই কান্নার সময়ই আমার চোখের সামনে সেই আর একটা জগতের দরজা খুলে পড়েছিল। আমার চিরকালের ধারণার মূল শিথিল হয়ে গিয়েছিল। আমি বুঝতে পেরেছিলাম ভাগ্যের দাস ছাড়া কিছু নই আমি। বুঝতে পেরেছিলাম কেন আমি এলাম। এখন আমাকে উঠে দিব্যেন্দুর সৎকারের চেষ্টা করতে হবে, দিব্যেন্দুর ওপরওলার সঙ্গে দেখা করতে হবে, কোথায় কি টাকাকড়ি আছে দিব্যেন্দুর, কোথায় কটা ইনসিওরেন্স তার সন্ধান নিতে হবে, উচিতমত ব্যবস্থা করতে হবে আর এই কোয়ার্টাসের বাড়িটা ছেড়ে দিয়ে, ওর সংসারটাকে তচনচ করে, বেচে বিলিয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে, আবার গুছিয়ে উঠিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

এই সমস্তই করতে হবে আমাকে। দু'দিনের মধ্যে করতে হবে। জানি নিখুঁৎ করেই এসব করতে পারবো আমি, এখনতো স্পষ্ট টের পাচ্ছি এই জন্যেই হঠাৎ লাইন খারাপ হয়েছিল, এই জন্যেই আচমকা রেলগাড়ি থেমে গিয়েছিল, আর এই জন্যেই, প্রোগ্রাম চেঞ্জ করে সাইকেল রিকশয় উঠেছিলাম আমরা।

এখানে কোনোদিন আসিনি আমরা, বারবার আসতে বলেছিল দিব্যেন্দু, সুবিধে হয়ে ওঠেনি। তবু বাড়ি খুঁজে নিতে অসুবিধে হয়নি। 'এঞ্জিনীয়ার সাহেবের কুঠি' বলতেই রিক্সওলা বলেছিল 'চলিয়ে!'

ও ঠিকই এনেছিল, শুধু যে শক্তিকে কোনোদিন স্বীকার করিনি, সেই প্রবল শক্তি তখন এক হিংস্র প্রতিশোধ গ্রহণের স্পৃহায় সব বেঠিক করতে বসেছিল নিঃশব্দে। চুপি চুপি।

~ www.amarboi.com ~

তাই আমরা যখন ঢুকছি তখন ডাক্তার অন্ধকার মুখে বেরিয়ে এল ঘর থেকে আর শুভ্রা চীৎকার করে উঠে বলল, 'তোমাদের কে খবর দিল বাবা?'

দিব্যেন্দু কিছু বলল না।

দিব্যেন্দু আমাদের যত ভালবাসা দেখাতো, তার শতাংশের একাংশও যদি সত্যি বাসতো, তা'হলে আমরা এসেছি দেখেও এমন নিষ্ঠুর উদাসীনতায় চুপ করে থাকত না। অন্ততঃ একথাটুকুও বলে উঠত শুভ্রাকে, 'খবর পেয়ে চলে আসবার মত টাইমটা তুমি আবিষ্কার করছ কোথায়?'

তা বললনা দিব্যেন্দু।

চুপকরে শুয়ে থাকল। বুঝতে পারছি, এক কানা কড়াও ভালবাসত না আমাদের, তাই শুয়ে থাকল। শুয়ে থাকতে পারল।

আমি, যে আমি বুড়ো হয়েছি বলে এত 'হাঁ হাঁ' করে সাবধান করতো দিব্যেন্দু, সেই আমি যে কতটা পারছি, কতটা পারতে হবে আমাকে, তা দেখলও না তাকিয়ে।

স্নেহাংশু উঠলেন।

অনেক পারতে হবে এখন তাঁকে।

প্রত্যেকটি কাজে বাধা দিচ্ছে শুভ্রা, যেখানে সেখানে আছড়ে পড়ছে, দিব্যেন্দুর দেহটাকে আগলে রেখে চেঁচাচ্ছে, 'দেব না, কিছুতেই দেব না, বাবা হয়ে এই করতে এসেছ তুমি!'

দিব্যেন্দু ওকে বকে উঠবে না, সে কথা নিশ্চিত বুঝে ফেলে বুঝি এত সাহস হয়েছে শুভ্রার? তাই যাকে যা খুসি বলছে?...ওই যে পাড়ার মহিলা দুটি, ওঁরা তো শুভ্রার দিকে সান্ত্বনার হাতই বাড়িয়ে দিয়েছিলেন, হাত ধরে তুলতে গিয়েছিলেন উঠোন থেকে। শুভ্রা ওঁদের সেই হাত ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। বলেছিল 'চলে যাও তোমরা সবাই, চলে যাও। ও, আর আমি একা থাকবো।' অথচ ওঁদের শুভ্রা বরাবর 'আপনি' বলতো।

মর্মাহত হয়ে সরে গিয়ে সেই কথাই বলাবলি করেন ওঁরা।

বলেন, 'বুঝলাম আকস্মিক ঘা, আচমকা শোক। শরীর কেমন করছে, একটু জল দাও বলল, আর মানুষটা চলে গেল। ও হাহাকারের তুলনা নেই। তবু মানুষের মান সম্ভ্রম রাখতেই হবে। হাতখানা ধরতে গেলাম, ছুঁড়ে ফেলে দিলি তুই? 'তুমি-টুমি' করে, যা তা করে কথা বললি?...বলি বিপদ আর কার ঘরে কখন নেই? তা বলে জ্ঞান হারাবে মানুষ? উন্মাদ হবে?'

ওঁদের কথাগুলো শুনতে পাচ্ছিলেন স্নোহাংশু। দিব্যেন্দুর বসবার ঘরে স্নেহাংশু তখন তালাচাবি লাগাতে এসেছিলেন। এখুনি বেরিয়ে যেতে হবে তাঁকে, পড়শী ভদ্রলোকেরাও যাবেন। দিব্যেন্দুর অফিসের যারা উদভ্রান্ত হয়ে এসে ভীড় করে দাঁড়িয়ে আছে, তারা সবাই চলে যাবে। কেউ শ্মশানে, কেউ নিজের নিজের বাড়িতে।...তখন চুরি হবার সম্ভাবনা। চোরেরা এই সব সুবর্ণ সুযোগ খোঁজে।

~ www.amarboi.com ~

তাই তালাচাবি লাগাচ্ছিলেন স্নেহাংশু এঘরে।

ঘরের ওদিকে প্যাসেজে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলেন মহিলারা, 'অথচ বাপকে দেখ! কী ধীর স্থির বিচক্ষণ! কী ভাবে চারদিক থেকে কাজ গুটিয়ে তুলছেন! আশ্চর্য ধৈর্য্য! ওই বাপের এই মেয়ে! হাতটা আমার এমন ছুঁড়ে দিল, শাঁখাগাছটা ফেটেই গেল।...তা' ওই রকমই তো অহঙ্কারী উন্নাসিক অসভ্য। আমরা নেহাৎ ইয়ে বলেই তাই মিশতে আসি। নইলে—'

স্নেহাংশু দিব্যেন্দুর টেবিলের ড্রায়ারগুলো টেনে টেনে দেখলেন খোলা আছে কিনা, টেবিলের ওপরে ছড়ানো খুচরো কাগজ-পত্রগুলো একত্রে জড় করে ভারী বই চাপা দিলেন একখানা। বেরিয়ে এসে তালা লাগিয়ে টেনে দেখলেন ঠিক লেগেছে কি না। তারপর তাড়াতাড়ি এঘরে চলে এলেন, যে ঘরে দিব্যেন্দুর স্থির হয়ে যাওয়া দেহটা ঘর ছেড়ে দিয়ে চলে যাবার জন্যে অপেক্ষা করছে।

চলে আসবার সময় আরো যেন নতুন গলা শুনতে পেলেন স্নেহাংশু। বলছে, 'আর মা? মা-টি কী করছেন! স্নেহাংশুর চিন্তা ভাবনা এখন সম্পূর্ণ অন্য জগতের। স্নেহংশুর মাথায় দায়িত্বের বোঝা। তবু স্নেহংশুর কানে ওই নতুন মহিলা-গলাটি খট্ করে বাজল।

ওরকম ব্যঙ্গের সুরে কথা বলছে কেন ওরা? সুনীতির মেয়ে অহঙ্কারী উন্নাসিক অসভ্য বলে কি সুনীতিকেও ওরা এতটুকু মমতা করবে না? আশ্চর্য্য তো! অথচ ওরা বলছিল, 'বিপদ আর কার ঘরে নেই?'

এঘরে এসে ভুলে গেলেন স্নেহাংশু, সুনীতিকে কে কি বলেছে। দেখতেও পেলেন না সুনীতিকে। কী করছে সে?

যাত্রার সময় আর একবার কোলাহল উদ্দাম হয়ে উঠল। শুভ্রা রাস্তা অবধি ছুটে এসে পথ আগলে ধরল, ওদের চলার সামনে রাস্তার ওপর শুয়ে পড়ল, ওকে মাড়িয়ে চলে যাক সবাই, মেরে ফেলে চলে যাক, এই আবেদন নিয়ে গড়াগড়ি খেল রাস্তায়, তার পর আস্তে উঠে বসল।

স্নেহাংশুরা এগিয়ে গেলেন।

কিন্তু সুনীতি?

সুনীতি কী করছে?

প্রতিবেশিনীরা সন্ধানী দৃষ্টি মেলে এদিক ওদিক দেখছে। যে লোকটাকে জীবনে আর দেখতে পাবে না তাকে একবার দেখে নেওয়ার থেকে যেন ঢের বেশী জরুরী তার সদ্য শোকাহত স্ত্রীকে আর তার স্ত্রীর মাকে দেখা!

তা দেখতে দেখতে যদি ওরা আবিষ্কার করে ফেলে মৃতের খাটের বিছানা থেকে বাড়তি বড় বড় বালিশগুলো আর কম্বল চাদর সব গুছিয়ে সরিয়ে ফেলছেন সুনীতি, সেই দেখায় চোখ বিস্ফারিত হয়ে যাবে না ওদের?

~ www.amarboi.com ~

দু'দিনে হল না।

তিন দিন লাগলো, পুরো তিনদিন। টাকাকড়িগুলোর ব্যবস্থা করতেই সময় লাগলো। অফিসের ফাণ্ডে যে টাকা রয়েছে দিব্যেন্দুর, সে ব্যাপারে অনেক লেখালেখি করতে হল। শুভ্রা যে সেই সদ্য মৃত ব্যক্তির বিবাহিতা স্ত্রী, সে ও তো প্রমাণ করা চাই। আইন প্রমাণ ভিন্ন কাজ করতে রাজী হয় না।

ফেরার সময় মেল-ট্রেন নয়, প্যাসেঞ্জার। মালপত্র লটবহরে কোম্পানীর একটা লরী বোঝাই হয়ে গেছে।

এই সমস্ত আবার ট্রেনের গুড্‌সে দিতে হবে। তার পর হাওড়া স্টেশনে গিয়ে ছাড়াতে হবে। তারপর স্নেহাংশুর যে সেই দু'খানা মাত্র ঘরের বাসাটি কলকাতার দক্ষিণে নতুন একটা রাস্তার ওপর হালকা পাতলা চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, সেই বাসার মধ্যে ঢোকাতে হবে।

খাট, বিছানা, টেবিল, ড্রেসিং টেবিল, চেয়ার, টিপয় কোনো কিছু বিলিয়ে দিয়ে আসতে দেয়নি শুভ্রা। স্নেহাংশু যেটা সম্পর্কেই অবহেলা দেখাতে গেছেন সেটাতেই বুক দিয়ে পড়ে কেঁদেছে। বলেছে, 'এই খাটে 'ও' শুতো বাবা। এই টেবিলে চেয়ারে 'ও' কাজ করতো। বলেছে, 'এই ড্রেসিং-টেবিল যে তোমার দেওয়া বিয়ের জিনিস বাবা, সাত জায়গায় বদলী হয়েছে, তবু যত্ন করে বয়ে বয়ে—'

মানুষটা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার পরও তার বিয়ের চিহ্নগুলো যত্ন করে রেখে দেওয়া নিয়ম কি না, এ কথা ভাবার সময় পাননি তখন স্নেহাংশু। বলেছেন, 'ঠিক আছে।

তারপর বেরিয়ে পড়ে কোম্পানীর লরী ঠিক করেছেন।

যে ধরনের লোকেরা ওপরওলা মারা যাবার পরও নিজেদেরকে অধঃস্তন ছাড়া—আর কিছু ভাবতে পারে না, কোম্পানীর সেই ধরনের ক'জন কর্মচারি অনেক সাহায্য করল স্নেহাংশুকে। স্টেশন পর্য্যন্ত এল, মাল তোলাতুলি করে দিল।

স্নেহাংশু ওদের ধন্যবাদ দিলেন। বললেন, 'আপনারা যা করলেন—'

কিন্তু সুনীতি ওই মহিলাদের ধন্যবাদ দিলেন না, মহিলারা সেদিন নিতান্ত অপমানিত হয়ে ফিরে গিয়েও আবার আজ এসেছিলেন শুভ্রাকে শেষ বিদায় জানাতে, এসেছিলেন সুনীতিকে সাহায্য করতে। তা একটা পাতানো সংসার ভেঙ্গে গুটিয়ে তুলে আনতে সাহায্য লাগে বৈকি। মেয়েলি সাহায্য। সে সাহায্য করেছেন ওঁরা।

গাড়ি খানিকক্ষণ চলার পর স্নেহাংশু আস্তে বলেন, 'শুভ্রা কথাই বলল না ওঁদের সঙ্গে, তুমি একটু ধন্যবাদ দিয়ে এলে পারতে!'

'শুভ্রা? শুভ্রা এখন লৌকিকতা সামাজিকতা করতে বসবে?' সিঁদুরের মত লাল মুখে বলে উঠলেন সুনীতি, 'মুখ দিয়ে বার করতে পারলে একথা, বাপ হয়ে!'

'শুভ্রার কথা বলিনি—' স্নেহাংশু আরো আস্তে বলেন, 'তোমার কথাই বলছিলাম! সামান্য একটু ভদ্রতা—'

সুনীতি ফেটে পড়লেন।

~ www.amarboi.com ~

গাড়ির শব্দ ছাপিয়ে সুনীতির ক্রুদ্ধ আবেগ গর্জে উঠল, 'থাক, থাক, তুমি আর আমায় ভদ্রতা সামাজিকতা শিক্ষা দিতে এসো না। ভদ্রের সঙ্গেই ভদ্রতা, অভদ্রর সঙ্গে ভদ্রতা কিসের? ওরা কি করল শুনি? আমরা বিদেয় হওয়া পর্য্যন্ত দেরী সইল না, আমারই কানের কাছে আমাদের মা মেয়ের ব্যাখ্যানা জুড়ে দিল! খুব ভাল? খুব ভদ্রতা এটা?'

স্নেহাংশু অবাক হয়ে তাকালেন। স্নেহাংশু যেন জীবনে এই প্রথম সুনীতির মুখ দেখলেন। এত লাল হয়ে গেছে কি করে সুনীতির মুখ? তিনদিন ধরে কেঁদে কেঁদে? না কি তাঁর মেয়ের পড়শিনীদের দুঃসহ দুর্ব্যবহারে?

স্নেহাংশু অস্ফুটে বললেন, 'ব্যাখ্যানা!' প্রশ্ন নয়, স্বগতোক্তির মত। যেন কথাটার মানে বুঝতে চেষ্টা করছেন।

কিন্তু সুনীতি বোধ করি প্রশ্নই মনে করলেন ওই অস্ফুট শব্দটুকুকে। তাই সুনীতি তীক্ষ্ণ উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ। তাই! বলে কি না, এতখানি বয়সে এমন অসভ্য মেয়ে দেখিনি! কী অধৈর্য্য, কী বেহায়া! শোকই না হয় হয়েছে, তাই বলে যা তা করবি? জ্ঞান থাকবে না? বাইরের এক রাশ ভদ্রলোকের সামনে কী কাণ্ডই করলো, ছি ছি!...শোনো! ওঁদের সভ্যতা! আমার কান বাঁচানো তো দূরের কথা, ইচ্ছে করে আমাকে শুনিয়ে শুনিয়েই বলল!...জীবনে আর আমার সঙ্গে কি আমার মেয়ের সঙ্গে দেখা হবে তোদের? কি করবো নিতান্ত অসময় তাই, নইলে মুখে আমার এসেছিল, সবাইয়ের ঘরেই বৌ মেয়ে আছে দিদি, দুর্দ্দিনও শুধু একজনের ঘর বেছে আসে না! বুকে হাত দিয়ে কথা বলতে হয়! বললাম না। না শোনার ভান করে নিজের কাজ করে গেলাম। অথচ দেখ আমার বেলায় উল্টো বদনাম।...বলছে কি না, কী শক্ত মেয়ে মানুষ! বাবাঃ! সেই যা একবার একটু চেঁচিয়েছিল তারপর বুকে পাথর বেঁধে মেয়ের জিনিসে আঁট করছে!...জামাইকে পোড়াতে গেল, আর শাশুড়ী মেয়ের ভাঁড়ারের আচারের বোতল মাখনের কৌটো, ধোওয়া মাজা করতে বসল...বলতে বলতে স্বররুদ্ধ হয়ে যায় উচ্ছ্বসিত হয়ে কেঁদে ওঠেন সুনীতি।

সুনীতির কান্নায় কি বিচলিত হবেন স্নেহাংশু? না কি সেই মহিলাদের হৃদয়হীন নিষ্ঠুর মন্তব্যের কথা ভেবে ধিক্কার দেবেন তাদের?

কিন্তু না, সে সব কিছুই করলেন না স্নেহাংশু, শুধু তেমনি স্বগতোক্তির মত আরো অস্ফুটে উচ্চারণ করলেন, 'আচারের বোতল, মাখনের কৌটো!'

স্বামীর এই অস্ফুট উচ্চারণে কি সুনীতির কান অভ্যস্ত? তাই সহজেই ধরা পড়ল তাঁর কানে? নইলে সঙ্গে সঙ্গে ছিটকে উঠবেন কেন, 'হ্যাঁ তাই! কেন নয়? আর ওর হবে? আর কেউ দেবে ওর সংসার গুছিয়ে? শুধু ওই কেন, নুনের শিশি, মরিচ গুঁড়োর শিশিটি পর্যন্ত ধোওয়া মাজা করে তুলে নিয়ে এসেছি। আমি ভিন্ন ওর স্বার্থ দেখবার আর কে রইল?'

স্নেহাংশু চমকে উঠলেন।

স্নেহাংশু ওপর দিকে তাকালেন।

~ www.amarboi.com ~

শান্তিতে একটু ঘুমোতে পারবে বলে শুভ্রাকে এঁরা আপার বার্থে তুলে শুইয়ে দিয়েছিলেন, দিয়েছিলেন ওর ভাল শালখানা গায়ে দিয়ে। কে জানে ঘুমোতে পারছে কি না। এই তিন দিনের মধ্যে তো খায়নি, চান করেনি, বেশ-বাস বদলায়নি।...শুধু যখন নিয়ম পালনের কথা স্মরণ করে সুনীতি স্নানের কথা তুলেছিলেন, চেঁচিয়ে কেঁদে উঠেছিল সে, 'ওকথা এখানে আর বোলোনা না আমায়। কলকাতায় গিয়ে যা হোক হবে! রাজরানী সেজে এসেছিলাম এখানে, রাজরানী সেজে দাপট করে বেড়িয়েছি, ভিখিরি সেজে বেরোতে পারব না এ দেশে থেকে।'

এখানে এসে অবধি শুভ্রার মুখের দিকে তাকাননি স্নেহাংশু, তাকাতে পারেন নি। সেদিন সেই কথাটা শুনে হঠাৎ চমকে উঠে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। আর কেন কে জানে মেয়ের মুখটা ভারী পাকা পাকা লেগেছিল স্নেহাংশুর। তাঁর ফুলের মত মেয়ের মুখটা।

এখন আবার চমকে তাকালেন স্নেহাংশু মেয়ের দিকে। মনে হল শালটা যেন নড়ছে। ইসারায় সুনীতিকে থামতে বললেন স্নেহাংশু।

কিন্তু সুনীতির মধ্যে যে এখন কথার জোয়ার, কান্নার জোয়ার, আবেগের জোয়ার। তাই সুনীতি এই সাবধানতাকে অগ্রাহ্য করেন, ঈষৎ নীচু গলায় বলেন, 'অঘোরে ঘুমোচ্ছে। আজ তিন দিন তিন রাত্তির পরে গাড়ির দোলানি পেয়ে—'

স্নেহাংশু হঠাৎ বলে ওঠেন 'শীত করছে!'

'শীত করছে?'

সুনীতির লাল লাল মুখটা হঠাৎ ফ্যাকাসে হয়ে যায়। সার্জের পাঞ্জাবী পরে রয়েছেন স্নেহাংশু, তবু হঠাৎ শীত করল কেন? এই তিন দিনের অমানুষিক পরিশ্রমে আর শোকে ভিতরটা কি ফাঁকা হয়ে গেল স্নেহাংশুর?...মেয়ের কপাল ভাঙার ফাটল দিয়ে কি তবে কালনাগ উঁকি দিচ্ছে সুনীতির কপালে দংশন করতে?

তাড়াতাড়ি একখানা ভারী র‍্যাপার ট্রাঙ্ক থেকে বার করে স্নেহাংশুর গায়ে চাপা দিতে দিতে শিলিল স্বরে উচ্চারণ করেন সুনীতি, 'কি জানি জ্বরটর আসছে কি না। ত'না আসাটাই আশ্চয্যি! এই তিনদিন যে কাণ্ড যে ধকল চললো শরীরের ওপর দিয়ে! কী কুক্ষণেই বাড়ি থেকে পা বাড়িয়েছিলাম, কী কুগ্রহ মাথায় নিয়ে এখানে নেমেছিলাম!...কপাল, কপাল, নইলে হঠাৎ লাইনই বা খারাপ হবে কেন! নাও শুয়ে পড়, জানিনা এখন আমার কপালে কী আছে।...এই তো এখন মেয়ে এসে গলায় পড়ল। সব দায় ভার তো এই বুড়ো হাড়েই বইতে হবে!...তবু রক্ষে যে পাঁচটা কাচ্চা বাচ্চা নেই। হলে তো হতে পারতো এত দিনে। আমায় বলছে পাষাণ! আর তুমি? তোমায় সকল কর্ত্তব্য করতে হ'ল না বুকে পাষাণ বেঁধে—?'

স্নেহাংশুর মনে হ'ল রেলগাড়িটা যেন তাঁর পায়ের নীচের মাটি দিয়ে ছুটছেনা, স্নেহাংশুর মাথার মধ্যেই ছুটছে, পাঞ্জাব মেলের গতিতে।

এই শব্দের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবেন কি করে স্নেহাংশু? মোটা র‍্যাপারটা মাথা

~ www.amarboi.com ~

অবধি টেনে দিয়ে শুয়ে পড়ে?...ওই একটানা একটা অসহ্য শব্দ তা' হলে আর তাড়া করে ফিরবে না তাঁকে?

এই কিছুক্ষণ আগে অবধি সিদ্ধান্তে আসতে পারছিলেন না স্নেহাংশু, কাকে সমর্থন করবেন। সুনীতিকে, না তার মেয়ের প্রতিবেশিনীর দলকে? বারবার গুলিয়ে যাচ্ছিল, চিন্তা থেকে চ্যুত হয়ে পড়ছিলেন।...সহসা চিন্তার প্রয়োজনীয়তাটাই অর্থহীন হয়ে গেল স্নেহাংশুর কাছে। সহসা সমস্ত মেয়ে জাতটার উপরই একটা নির্লিপ্ত ঔদাসীন্য বোধ করলেন স্নেহাংশু।

শুভ্রার ঘুম ভেঙে যাবে, সুনীতির তীব্র আক্ষেপের বাণীগুলো কানে যাবে তার, এ ভয়ও রইল না আর।

সারা শরীরটা ভাল করে ঢেকে নিয়ে স্নেহাংশু পাশ ফিরে শুলেন।

~ www.amarboi.com ~

আদি অন্তকালের

লোকটার আসপদ্দা দেখে অবাক হয়ে গেলাম। শুধুই যে ঠাঁই ঠাঁই করে মাথায় হাতুড়ির ঘা মারছে তাই নয়, আবার 'তুই তুই' করে কথা বলছে।

হাতুড়ির ঘা মেরে মেরেই বলছে 'নেই' মানে? 'নেই' মানে?...লক্ষ লক্ষ কণ্ঠের হাহাকার নেই? লক্ষ লক্ষ মানবাত্মার মুক্তি পিপাসার দুরন্ত ক্রন্দন নেই? লক্ষ লক্ষ গৃহহারার অবর্ণনীয় দুর্দশার ছবি নেই? লক্ষ লক্ষ মূঢ় ম্লান মুখের অন্তহীন প্রশ্ন নেই?...এ সব দেখতে পাস না তুই? শুনতে পাস না? তার মানে নেই তোর চোখ, নেই তোর কান, নেই তোর অনুভূতি। তবে কলম রাখ! রাখ্ কলম।

মাথার আঘতের থেকেও ওই কথার আঘাতটাই জ্বালা ধরাচ্ছিল বেশী। তবু মাথাটাকে বাঁচাতে চেষ্টা করি হাতুড়ির নীচ থেকে সরিয়ে নিয়ে।

কিন্তু কী আশ্চর্য! সরিয়ে নেব কোথায়? হাতুড়িটা যে মাথারই মধ্যে। খুলির হাড়ের মধ্যে ঢুকে গেল কী করে? সেইখানেই বসে ঠুকে ঠুকে মারছে।

গল গল করে রক্ত গড়িয়ে ঘাড় বেয়ে পিঠে ছড়িয়ে পড়ছে, অন্ধকার একটা গহ্বরের মধ্যে হাঁকপাঁক করছি, দমবন্ধ হয়ে আসছে যেন, তবু কষ্টে হাত বাড়িয়ে চেপে ধরতে গেলাম, ওই হাতকে।

ঘরটা আলোয় ভরে গেল।

তার মানে বেড্ সুইচটা চেপে ধরেছিলাম।

তার মানে রক্ত নয়, ঘাম।

সত্যি নয়, স্বপ্ন!

তবু নিঃশ্বাস নিতে সময় লাগলো। আর সেই সময়টার পর মনে পড়লো, রাত দশটা পর্যন্ত যে বন্ধুটি বকবকিয়ে গেল, কথাগুলো তার। ওই রকম হাতুড়ি ঠুকে ঠুকেই বলছিল।

ওর জামাইয়ের দাদা একটা পত্রিকা বার করবে সেই বাবদ ও আমার কাছে একটা লেখা চাইতে এসেছিল। কোনো 'লেখা' মজুত নেই শুনে খুব রেগে গেল। লেখকের গোলায় খুচখাচ দু'চার আঁটি ফসল মজুত থাকে না, এমন অবিশ্বাস্য কথা ও বিশ্বাসই করলো না। বললো, 'দিবি না তাই বল'। নইলে 'বাংলা দেশ' নিয়ে কিছুই লিখিসনি এই কথা বিশ্বাস করবো আমি?

ওর বিশ্বাস অর্জন করাতেই, বোঝাতে চেষ্টা করেছিলাম, 'কী করবো বল, তাড়নার লেখাই লিখে উঠতে পারছি না তা প্রেরণার।'

~ www.amarboi.com ~

আগে তাড়না তারপরে প্রেরণা? নিজের প্রেরণা থেকে লেখো না তুমি?'

বন্ধুর কণ্ঠে রীতিমত ঝাঁজ ছিলো।

তবু দোষ স্বীকার না করে তো উপায় নেই।

বলেছিলাম, 'কী করবো, কিছু দিন থেকে মাথাটা যেন স্রেফ বোবা মার্কা হয়ে গেছে। ও নিজে কিছু বলছে না। জোর করে যা বলতে চাইছি সবই জোলো জোলো লাগছে। মনে হয় লেখবার মতো যেন কিছু নেই আর সবাই সব লিখে শেষ করে ফেলেছে।'

ওই শেষ কথাটা শুনেই বন্ধু ক্ষেপে উঠে যাচ্ছেতাই করেছিল। হাতুড়িটা মাথার মধ্যে ঢুকিয়ে রেখে গিয়েছিল তখনই।...মনে পড়ছে আরো প্রশ্ন করেছিল ও 'শেষ' করে ফেলেছে? ওঃ! এখনো তোর সেই প্রেম ভালবাসা আর মনস্তত্ত্বের খুঁটিনাটি নিয়ে ইনিয়ে বিনিয়ে গল্প লেখা? এখানো সেই প্লট হাতড়ানো? লজ্জা করছে না? লক্ষ মানুষের বুকের রক্ত দিয়ে লেখা ইতিহাসের কাহিনী লিখবি না? লেখক হিসেবে সমাজে তোর একটা দায়িত্ব নেই? কর্তব্য নেই? ভবিষ্যৎ কালের কাছে জবাবদিহির দায় নেই?...প্লট খুঁজে পাচ্ছিস না? মনে হচ্ছে লেখবার কিছু নেই? যে 'বাংলাদেশ' আজ সাহিত্যে নতুন জোয়ার এনে দিলো কাব্যে গানে এতো উপকরণের যোগান দিলো, সেই বাংলাদেশের সামনে বোবা হয়ে বসে আছিস তুই? কলম ফেলে দে, কলম ফেলে দে!'

চলে গিয়েছিল রেগে।

অবিশ্যি কলম একেবারে ফেলে দেবার আগে ওর জামাইয়ের দাদার কাগজের জন্যে 'বাংলাদেশ' সংক্রান্ত একটা লেখা নিশ্চয়ই যেন লিখে দিই, এ প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিয়ে গিয়েছিল। নইলে জামাই বাড়িতে ওর মুখ থাকবে না। তারা জানে আমি ওর বিশেষ বন্ধু।

ওই ঘাম আর ঘুম ভাঙার পর আর ঘুম এলো না। নিজের ত্রুটিটা সম্পর্কেই চিন্তা করতে লাগলাম বাকি রাতটা।

সত্যিই তো মাথাটা আমার স্রেফ বোবাই।

নইলে যে ঘটনা সবাইকে এতো লিখিয়ে ছাড়ছে, তা আমায় এক লাইন লেখাতে পারলো না কেন?

কাগজের পৃষ্ঠায় যখন দেখি শরণার্থীর সংখ্যা লক্ষ লক্ষর সীমানা ছাপিয়ে কোটিতে উঠছে, তখনও তো বৃষ্টি এলে তাড়াতাড়ি জানলা বন্ধ করতে ছুটি। এই ঝড় জলে তাদের অবর্ণনীয় দুর্দশার কথা ভাবতে ভাবতে তো দিশেহারা হয়ে নিজের ঘর ভাসাই না।

এমন কি জানলার শার্সির কাচটি ঝকঝকে রাখতে না পারলে রীতিমত পীড়িত হই, ফুলদানীতে জল বদলাতে ভুলি না। আমি কোনোদিন ওই দুর্দাশাগ্রস্তদের দেখতে যাইনি, আমার কাছে ওরা একটা প্রকাণ্ড সংখ্যা মাত্র! ওই সংখ্যাদির দিকে তাকিয়ে অবাক হওয়া ছাড়া আমার তো আর কোনো ভাবই ফোটে না। ভাবতেও চেষ্টা করি না শেষ পর্যন্ত ওদের কী হবে, আর আমাদের কী হবে।

জোর করে ভাবতে চেষ্টা করলে তো দেখি চট করে এটাই মনে আসে, ভিড়

~ www.amarboi.com ~

বাড়লে—হয়তো বাজার আরো আগুন হবে, সিনেমায় আরো লাইন পড়বে, 'রবীন্দ্রসদনের' টিকিট আরো দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠবে, ইস্ট বেঙ্গল মোহনবাগানের ম্যাচের টিকিটের রেকর্ড দু ঘণ্টায় চব্বিশ হাজারের জায়গায় চল্লিশ হাজারে উঠবে। অথবা ততো সংখ্যক টিকিটের ব্যবস্থা না থাকলে রক্ত গঙ্গা'র স্রোতটা জোরালো হবে।

কিন্তু রক্তগঙ্গাতেই কি আর ভয় আছে আমাদের? ওটাও তো রোদ বৃষ্টির মতো হয়ে গেছে। 'কলিকাতার উপকণ্ঠে' তেরোটি তরুণের গলিত শব উদ্ধারের বিশদ বিবরণের ফলাও কাহিনী পড়ে ফেলার পর মুহূর্তেই মাছের 'তাজাত্ব' নিয়ে চাকরকে বকাবকি করতে তো বিন্দুমাত্র ক্লিষ্ট হই না, আর খাবার টেবিলে বসে রান্নার গুণাগুণের আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে অনায়াসেই আলোচনা করতে পারি, মানুষ মানুষকে কী বীভৎস আর নৃশংস ভাবেই মারছে।

এটা কি মানসিক পক্ষাঘাত?

না আমরা ক্রমশ বীরজাতি হয়ে উঠছি?

জানি না। অন্যের কথা জানি না, আমার নিজের কথাই জানি, সেখানে অনুভূতির দরজায় স্রেফ একখানা কুয়াশার পর্দা ঝুলছে। আমার সীমানাটুকু যে ঠিক আছে, এতেই নিশ্চিন্ত।

নাঃ পর্দাটাকে ছিঁড়ে ফেলতেই হবে।

আপন দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। যে কথা নিয়ে সবাই লিখছে, তা লিখতেই হবে।

সকাল হতেই গুছিয়ে কলম নিয়ে বসলাম।

কিন্তু কোন দিক থেকে ধরবো?

কোনখান থেকে আরম্ভ করব?

হিংসা আর রাজনীতির থাবার নীচে যাদের অসহায় আত্মসমর্পণ, যাদের স্বস্তি গেছে, শান্তি গেছে, সংসার গেছে, আশা এবং আশার ছলনাটুকুও গেছে, গেছে সভ্যতা ভব্যতা সমাজ পরিচয়, আছে শুধু খাঁ খাঁ করে জ্বলে যাওয়া একটা পেট, তাদের মধ্যে থেকেই বেছে নেব একজনকে? আমি ওদের চোখে ঠিক দেখিনি, কিন্তু খবরের কাগজে তো দেখেছি।

তাহলে সেই আমিনা বেগমকে নিয়েই লিখি—কাগজের পৃষ্ঠায় যাকে পুলিশ অফিসারের সামনে কান্নায় ভেঙে পড়তে দেখেছি। যার চোখের সামনে স্বামীপুত্রকে খতম করেছে। যার সাজানো সংসার আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে, যার লজ্জা নিবারণের সামান্য আবরণটুকুও নেই। ঠিক আছে, আমিনা বেগমকেই নায়িকা করে লিখতে বসি।

লিখলাম—অথচ একদিন সবই ছিলো আমিনার। গোয়লে গরু মরাইয়ে ধান, পুকুরে মাছ, বাটায় পান।...তারপর একদিন মাথার ওপর ঘুরলো শকুন, সংসারের ওপর পড়লো বাঘের থাবা।

~ www.amarboi.com ~

সেদিন তখন আমিনা চিঁড়ে কুটুছিল। আর ভাবছিলো ছেলে ইস্কুল থেকে ফিরলে ওই চিঁড়ের সঙ্গে ঘনদুধ আর শবরী কলা মেখে খেতে দেবে, ঠিক সেই সময় মাথার ওপর বাজ হাঁকলো।...তারপর—'

নাঃ ওই বাজটাকে যেন কলমের মধ্যে ভরা যাচ্ছে না। আর আমিনার আর্তনাদ হাহাকার কান্না, এগুলোকেও জমাট করে ধরতে পারা যাচ্ছে না। যেন ছড়িয়ে ছড়িয়ে যাচ্ছে, যেন অনেক দিন আগে কোথায় শুনেছি, তার রেশটা কোথায় বাজছে এখনো।

তবে কি আমিনা বেগমের কথা আগে কেউ লিখে ফেলেছে? হয়তো তাই।

ছেড়ে দিলাম ওকে।

টেনে নিলাম প্রৌঢ়া নন্দরানীকে। নন্দরানী দাসী। ভরা বয়সে একটা মাত্র ছেলে কোলে নিয়ে বিধবা হয়েছিল যে মেয়ে, তার পর অনেক দুঃখের নদী পার হয়ে বেচারী জোয়ান ব্যাটা-বৌ নিয়ে সবে একটি সুখের সংসার পেতেছিল।

হঠাৎ তচ্‌নচ্‌ হয়ে গেল সেই সংসার, ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেল ভবিষ্যৎ। চোখের সামনে ব্যাটাকে দাঁড় করিয়ে গুলি করলো শয়তানের দল, আর বৌটাকে টেনে নিয়ে গিয়ে—

নাঃ। থাক্‌, নন্দরানী থাক্‌।

মনে হচ্ছে ওর ওই বীভৎস কাহিনীটাও কে বোধ হয় আগে লিখে ফেলেছে। নইলে পড়া পড়া মনে হচ্ছে কেন? তবে কি বৃদ্ধ পাঁচু মণ্ডলকে নেবো নায়ক হিসেবে? যে পাঁচু সারাজীবন জমি ছাড়া আর কিছু জানেনি, জেনেছে শুধু মেঘ আর জল, মাটি আর ফসল আর ভগবান। কিন্তু বেইমান ভগবান শেষজীবনে তার সারাজীবনের বিশ্বাসটুকু নখে করে ছিঁড়ে ফেলে দিল। তাই পাঁচু তার নিজের সেই জমি থেকে অনেক দূরে অন্যের জমিতে দাঁড়িয়ে শুধু সেই বেইমান ভগবানকে গালাগালি দিয়ে চলেছে।

কিন্তু পাঁচু মণ্ডলকেও তো আগে দেখেছি বলে মনে হচ্ছে। এরা সব এমন হাতে হাতে ক্ষয়ে যাওয়া ঘসা পয়সার মতো হয়ে গেল কী করে? যেন ওই ঘসা পয়সার দল চিরকাল মিছিল করে চলেছে রক্তাক্ত ইতিহাসের পথ ধরে। কোথা থেকে বেরোচ্ছে—তার হদিস আছে, কোথায় যে পৌঁছলো তার সন্ধান নেই। যেন ওরা শুধু হারিয়ে যাবার জন্যেই একবার মিছিলে দেখা দেয়।

কেউ কোনদিন কি শুনেছে আমিনা আবার তার সেই ঢেঁকিঘরের চালার নীচে 'ধপ ধপ' করে ঢেঁকিতে পাড় দিচ্ছে, ঢেঁকির 'গড়ে' শালিধান ঢেলে ঢেলে। শোনেনি। শোনেনি পাঁচু মণ্ডল আবার তার খেঁটে লাঠিটা নিয়ে নিজের জমিতে গরু তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে 'হেট হেট' করে...কেউ শোনেনি নন্দরানী দাসী টানা টানা গলায় তার বৌকে ডাকছে—অ বৌ, বৌ, বেলা পুইয়ে গেল, সাঁঝবাতি দিচ্ছিস না যে? সোমসারের নক্ষী-ছেড়ে যাবে তা জানিস না আনক্ষী কোথাকার।'

না, কেউ কোনোদিন শোনেনি।

ওরা শুধু ওই একবারই দেখা দেয়, তারপর বাতাসে মিলিয়ে যায়। যেমন মিলিয়ে

~ www.amarboi.com ~

যায় বৈশাখী ঝড়ের ঝরাপাতার স্তূপ। প্রকৃতিই ওদের ওপর থাবা বসিয়ে শাখাচ্যুত করে উড়িয়ে ছড়িয়ে আবার ঝেঁটিয়ে সাফ্ করে দেয়। পৃথিবী আর তাদের নিয়ে মাথা ঘামায় না।

কে গুণতে পারে ওই ঝরাপাতাদের? কে হিসেব রাখতে পারে তারা কোথায় গেল? কে বসে থাকতে পারে—তাদের স্মৃতি আগলে? ওরা ছায়া, ওরা মিথ্যা।

পরম সত্য এই, আমি এখনো এখানে টিঁকে আছি। প্রকৃতির ওই ঝাড়ুর তাড়নায়—জঞ্জালের স্তূপে গিয়ে পড়িনি। আমি এখনো সকালবেলা খবরের কাগজখানা আসতে দেরী হচ্ছে দেখলে বিরক্ত হই, পেয়ালার চাটা ঠাণ্ডা হয়ে গেলে বেজার হই, দিনের অনুষ্ঠানে এতোটুকু ত্রুটি হলেই ক্রুদ্ধ অথবা ক্ষুব্ধ হই।...আমি এখনো বন্ধুর মেয়ের বিয়ে লাগলে বেনারসী শাড়ি কিনতে দোকানে ছুটি, আর নিজের মেয়ের বিয়েতে বাড়িতে কি ধরনের আলোকসজ্জা করতে পারলে লোককে তাক্ লাগানো যায় তার চিন্তা করি।

আমার এই পরম সত্যের সিংহাসনে বসে যদি ওদের কথা বলতে বসি, তার থেকে পরম মিথ্যা বস্তু আর কী হবে?

নন্দরানী আর পাঁচু মণ্ডলরা সেই শৌখিন কথায় গাঁথা মালার দিকে তাকিয়ে ঘৃণার হাসি হেসে বলবে না, দূর দূর ছাই, বুঝেছে আমাদের! কচু বুঝেছে!...

বলবে না, কর বাবা কর, আমাদের নে গপ্‌পো পদ্য নিকে নাম কর,—ট্যাকা ওজগার কর। আমাদের তো ঘোড়ার ডিম লাভ।

আর বাঙলা দেশ?'

বাঙলা মা?

নতুন নতুন নামকরণের মধ্যে দিয়ে যাঁকে নতুন করে আবিষ্কার করা হলো? নতুন আবেগের ঘটে যাকে অভিষেক করা হলো? যাঁর ফ্রেম ভাঙা কাচ ফাটা ধূলোয় ফেলে দেওয়া ছবিখানা আবার নতুন প্রিন্ট করে ঘরে ঘরে টাঙানো হচ্ছে? যাঁর নামের নামাবলী অঙ্গে অঙ্গে জড়ানো হচ্ছে? পরের দর্পণে মুখ রাখা সেই বাঙলা দেশ কোন হাসি হেসে উঠবেন?

আনন্দের? লজ্জার? ঘৃণার? না ধিক্কারের?

সারা সকালটাই বরবাদ গেল।

সারা দিনটাও বন্ধুর ফরমায়েসী লেখাটা আর হয়ে উঠলো না। পড়ন্ত বেলায় আবার চেষ্টা করতে গেলাম ফুলের মতো সেই কিশোরী মেয়েটাকে নিয়ে। যে মেয়েটা বই-খাতা নিয়ে বেণী ঝুলিয়ে স্কুল থেকে ফিরছিলো—হঠাৎ—

কলমে ক্যাপ পরিয়ে সরিয়ে রাখলাম।

হঠাৎ একজোড়া আগুনের ড্যালার মতো চোখ চোখের সামনে ঝলসে উঠলো, বলে উঠলো, 'কেন? কেন? কেন আমার এই লজ্জার কাহিনী লাঞ্ছনার কাহিনী অপমানের কাহিনী লিখবে তুমি, ইনিয়ে বিনিয়ে বিশদ করে? শয়তানের দল ঝোপঝাড়ের অন্ধকারে

~ www.amarboi.com ~

যে অপমানের কাহিনী লিখে রাখলো, তুমি সে কাহিনীকে আলোর আকাশের তলায় টেনে আনবে কেন? কী করেছি তোমার, আমি? আমার আত্মার এই চরম অবমাননার কথা এমন করে প্রকাশ করে বেড়াতে লজ্জা করবে না তোমার? দুঃখ হবে না? কলম কাঁপবে না? আমি যদি তোমার নিজের ঘরের মেয়ে হতাম? লিখতে পারতে আমার কথা? লিখে ছাপাখানায় পাঠাতে পারতে? দেখছি, ওদের থেকেও তোমরা নিষ্ঠুর, ওদের থেকেও তোমরা নির্লজ্জ!

রাস্তায় বেরিয়ে মাথায় হাওয়া লাগিয়ে অবশেষে সন্ধ্যার বাতি জ্বেলে কলমকে ছেড়ে দিলাম, যা লিখতে চায় লিখুক।

দেখলাম, লিখে চলছে, পর পর লাইন।

লিখেছে—মেয়েটা ফিরে তাকিয়ে অবাক হয়ে বললো, 'আমায় বলছেন?'

ছেলেটা বললো, 'হ্যাঁ তো! দাঁড়ান একটু।'

মেয়েটা বললে, 'কিন্তু আপনি বোধ হয় ভুল করছেন!'

ছেলেটা দিব্য সপ্রতিভ গলায় বললো, 'মোটেই না। ভীষণ রকমের ঠিক করেছি।'

মেয়েটা কিন্তু রেগে চলে গেল না, বিপন্নের মতো বললো, 'কী অদ্ভুত! আমি তো আপনাকে চিনিই না।'

'চিনবেন বলেই তো দাঁড়াতে বলছি।'

মেয়েটা হঠাৎ এক ঝিলিক হেসে ফেলে বললো, 'আপনি কি পাগল টাগল না কি?'

ছেলেটা বললো, 'ছিলাম না! এবার হবো—ঠিক করছি।'

'আশ্চর্য! আচ্ছা এই তো দাঁড়ানো হলো, এবার যেতে পারি?'

বললো মেয়েটা, কিন্তু গেলো না।

হাতের ব্যাগটা দোলাতে লাগলো।

ছেলেটা বললো, 'যেতে পারবেন মানে? চেনাটা হলো কই?'

এবার মেয়েটা রেগে উঠে বললো, 'তবে কি বলতে চান আপনার সঙ্গে গিয়ে রেস্তোরাঁয় বসে আড্ডা দিয়ে চেনা করবো?'

'একেবারে ঠিক—' ছেলেটা এক গাল হেসে বললো, 'ঠিক ওই কথাটিই বলতে চাইছি। মনের কথা বোঝবার ক্ষমতা তো আপনার খুব প্রখর।'

'দেখুন, আপনার মতো বিচ্ছিরি রকমের অদ্ভুত লোক আমি জন্মেও দেখিনি—'

'তবে তো খুব ভালো করেই দেখতে হয়। যা জন্মে দেখেননি সেটাই তো দ্রষ্টব্য!'

'আর আমি যদি আপনার অভব্যতার জন্যে চেঁচিয়ে রাস্তায় লোক জড়ো করি?'

'করতে পারেন। সে স্বাধীনতা আপনার আছে। কিন্তু অভিযোগটা কী?'

'অভিযোগ!'

'হ্যাঁ! মানে কী কী অভব্যতা করেছি, সেটা বলতে হবে তো?'

'বাঃ চেনা নেই জানা নেই, হঠাৎ রাস্তায় চলতে চলতে একটা মেয়েকে হুকুম করলেন, 'দাঁড়ান।' এটা বুঝি খুব ভব্যতা হলো?'

~ www.amarboi.com ~

'আপনি না দাঁড়ালে পারতেন।'

'পারতাম তো, এই চলে যাচ্ছি—'

'তাহলে তো চেঁচিয়ে লোক জড়ো করা যাচ্ছে না—'

হঠাৎ আবার ঝিলিক মেরে হেসে ওঠে মেয়েটা—'আচ্ছা আপনি এতো জুলুমবাজ কেন বলুন তো?'

'বলবো বলেই তো একটু নিরিবিলিতে গিয়ে বসতে চাইছি।'

'আমার অতো সময় নেই—'

'সময় থাকা না থাকাটা নিজের ইচ্ছাধীন'।

'সাধে বলছি আপনার মতো জুলুমবাজ লোক আমি কখনো দেখিনি। চলুন কোথায় গিয়ে বসতে হবে। বেশী বাচালতা করলে কিন্তু লোক জড়ো করবো—'

'ঠিক আছে, বাচালতার ভারটা না হয় আপনার ওপরেই থাক। আমি কিন্তু—লোক জড়ো করবো না। শুধু নিজে জড়ো হয়ে বসে—'

এই পর্যন্ত লেখার পরই বন্ধু এসে হাজির!

'কই? আমার গল্প? দিয়ে দে বাবা! মেয়ে তো খেয়ে ফেললো। বলে কালকের মধ্যে প্রেসে দিতে হবে, হয়ে না উঠলে শ্বশুরবাড়িতে তার প্রেসটিজ পাংচার হয়ে যাবে।'

যতোটুকু হয়েছে ওর দিকে এগিয়ে দিলাম।

বন্ধু চোখ গোল করলো, 'শেষ হয়নি?'

'কই আর হলো?'

'নাঃ মেয়ের বাড়িতে আর মান থাকবে না দেখছি। ওখানে কতো গল্প করেছি, তুই একদিনে দুটো গল্প লিখতে পারিস। দুদিনে একটা উপন্যাস! আর ওদের বেলাতেই—'

'চমৎকার! তুমি যেভাবে গল্প বানাতে পারো, তাতে তো গল্পটল্প বানিয়ে নিজেই লিখে দিতে পারো।'

'ঠাট্টা রাখ। রাতারাতি শেষ করে ফেল। সক্কালবেলাই এসে নিয়ে যাবো। বেশ 'জম্পেস' করে একখানা ধরেছিস তো?'

'পড়ে দ্যাখ।'

বন্ধু যেটুকু লেখা হয়েছিল পড়ে মুখটা কলো করে বললো, 'এটা কী হলো?'

'হয়নি তো! হচ্ছে—'

'কিন্তু এটা কি বাংলা দেশের গল্প হচ্ছে?'

'যে কোনো দেশেরই হতে পারে। বাংলো দেশের হতেই বা বাধা কোথায়?'

'বাধা নেই? এ সব কী ফচকেমি? ওরা—খাঁটি বাংলাদেশের ওপরই গল্প চাইছে। মানে 'বাংলাদেশ সংখ্যা' দিয়েই ম্যাগাজিনটা শুরু করেতে চায় আর কি!'

'তা' এটা যে বাংলাদেশের গল্প নয়, তা কে বললো?'

বন্ধু কাগজটা টেনে নিয়ে আবার এক বার চোখ বোলালো, তারপর সন্দেহের গলায় বলে উঠলো, 'ধ্যেৎ। এ তো তোমাদের সেই পচা প্রেমের গল্প বলেই মনে হচ্ছে। সেই

~ www.amarboi.com ~

আদি অন্তকালের একটা মেয়ে আর একটা ছেলে—রাবিশ!'

বন্ধুর রাগ দেখে না হেসে পারি না।

হেসেই বলি—'এটা তো আমাদের কিন্তু তোমাদের ওই অনাচার অত্যাচার, হিংসা, হত্যা, নারকীয়তা বীভৎসতা, লাঞ্ছনা, যন্ত্রণা, হাহাকার, আর্তনাদ', এ সবই বা এমন কি তরতাজা নতুন? এও তো সেই আদি অন্তকালের। মানুষ সৃষ্টির গোড়ার যুগ থেকেই চলছে—চলে আসছে!

বন্ধু ছিটকে উঠে বলে, 'এই তোর যুক্তি?'

'এই আমার যুক্তি! তবে বোধহয় অক্ষমতারই যুক্তি।'

'একশোবার! যার ভিতরে ভালবাসা নেই, অনুভূতি নেই—'

বন্ধু গট গট করে উঠে চলে গেল।

শুধু মুখটা না ফিরিয়েই বলে গেল, 'তুই যে এতোখানি মানবিকতা বোধহীন, তা জানতাম না। ঠিক আছে ওটাই শেষ করে রাখো, তোমার নাম লিস্টে না থাকলে যখন চলবেই না—'

সত্যিই চলে গেল এবার।

কিন্তু ওই ছেলেটা আর মেয়েটার মাঝখানে যেন একটা হাতুড়ি বসিয়ে গেল। ওই ধাক্কাটা সামলে আবার ওদের দুটোকে এক করে কোনো নিরিবিলি যায়গায় বসাতে সময় নেবে।

মরুকগে। রাতারাতি তো শেষ করছি না।

নিজের ক্ষতি নিজেই করে গেল লোকটা! জামাইবাড়িতে মুখ থাকবে না! আমার কি?

কিন্তু ছেলেটা আর মেয়েটার ওপর মন পড়ে রইলো। আবার কোথায় কোথায় ওদের টেনে এনে বসাতে পারি, দাঁড় করাতে পারি, পায়ে পায়ে হাঁটাতে পারি, সেই চিন্তাই করতে থাকি।

~ www.amarboi.com ~

পরাজিত

ইহ সংসারে প্রভাতমোহন কখনো 'একচক্ষু হরিণের' ভূমিকায় থাকেন নি, চোখকান দুই পরিষ্কার খোলা রেখে, দুনিয়ার মাঠে চরেছেন ; এবং এযাবৎ কাল অবিদ্ধ অবস্থাতেই কাটিয়ে এসেছেন।

লোকটা যাকে বলে স্বপ্রতিষ্ঠিত পুরুষ!

সামান্য অবস্থা থেকে 'যথেষ্ট' অবস্থায় পৌঁছেছেন, জাগতিক জীবনে যা কিছু দরকার মোটামুটি আহরণ করে ফেলে সংসারটাকে সাজিয়ে নিয়ে ডাঁটের ওপর বাস করেছেন।...অল্প বয়েসে স্ত্রী মারা গেছে বলে যে জীবনটাকে বইয়ে দিয়েছেন তা' নয়। আর আবার একখানা বিয়ে করে ফেলেও 'জীবন' লাভের চেষ্টা করেন নি।

তিন মাসের ছেলে রেখে বৌ মারা গিয়েছিল, তবু ভেঙে-পড়েন নি, বিধবা বোন অমলার সাহায্যে তাকে দিব্যিই মানুষ করে তুলেছেন। এবং জাতগোত্র মিলিয়েই এমন একখানি বৌ ঘরে এনেছেন, যাকে রূপকথার ভাষায় বলা যায় 'পরমাসুন্দরী।' অবশ্য রাজকন্যা নয়, নেহাৎই কেরানীকন্যা। তা সেটাই প্রভাতমোহনের পরিকল্পনায় ছিল। ছেলেকে বড়লোকের জামাই করবার দিক দিয়েও যাবার ইচ্ছে ছিল না তাঁর।

এই পর্যন্তই প্রভাতমোহনের 'দু' চোখ খোলার প্রমাণ বহন করছে, কিন্তু হঠাৎ নদীর দিক থেকে বাণ এসে বিঁধল।

এরজন্যে প্রস্তুত ছিলেন না প্রভাতমোহন, দুঃস্বপ্নেও না।

—তাই প্রথমটা অবিশ্বাস্য বিস্ময়ে পাথর হয়ে গেলেন। বুঝতে পারলেন না কথাটা ঠিক শুনছেন কিনা।

কিন্তু 'ভয়ঙ্কর' কখনো বেঠিক হয় না।

তাই প্রভাতমোহন যখন কিছু ভেবে না পেয়ে চশমাটা চোখ থেকে খুলে টেবিলে নামিয়ে রেখে আবার তৎক্ষণাৎ তুলে নিয়ে চোখে লাগিয়ে বলে উঠলেন, কী বললে? কী নিয়েছ?

তখন প্রবালভূষণ শান্ত গলায় উত্তর দিল, গলফ ক্লাব রোডে একটা ফ্ল্যাট নিয়েছি, সেই কথাই বলছি।

গলফক্লাব রোডে ফ্ল্যাট নিয়েছ?

প্রভাতমোহন প্রায় বোকার মতই বলে ফেললেন, ফ্ল্যাট নিয়েছ মানে?

মানে আর কি!

প্রবাল বলল, এমনি নিলাম। মোটামুটি সুবিধেয় পেয়ে গেলাম। পরশু সকালের দিকেই শিফট করবো ভাবছি।

~ www.amarboi.com ~

পরশু সকালের দিকে।

এখন আজকের সন্ধ্যে।...এই অগাধ সময়টা প্রভাতমোহনকে দিয়েছে প্রভাতমোহনের খোকা।

এরপর আর দ্বিরুক্তির কী থাকতে পারে? প্রভাতমোহন তো অমলা নয়, যে হাউহাউ করে কেঁদে ফেলবেন? আর বলে উঠবেন, ওরে খোকা! এ কী সর্বনেশে কথা বললি তুই?

না, প্রভাতমোহন অমলা নয়।

প্রভাতমোহন বললেন, 'ঠিক আছে।'

আর দ্বিতীয় কোনো শব্দ উচ্চারণ করেন নি প্রভাতমোহন।...শুধু 'ঠিক আছে।'

সংসারের সব দিকে বেঠিক ব্যাপারগুলো ঘটলে, যে শব্দটা উচ্চারিত হয়ে থাকে, সেই শব্দটাই উচ্চারণ করলেন।

ঠিক আছে।

সমস্ত পৃথিবীটা যখন বেঠিক বেতালা হয়ে পাক খেতে লেগে গেছে, সারাজীবনের সমস্ত বিশ্বাস, নিশ্চিন্ততা, সঞ্চয়, সবকিছু গোলমেলে হয়ে গিয়ে এলোমেলো ছড়িয়ে যাচ্ছে, তখন বললেন, ঠিক আছে!

প্রবাল কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে থাকলো।

হয়তো দ্বিতীয় কোনো কথার প্রত্যাশা করল ; অথবা, নিজের কথাটা বলে ফেলেই চলে যাওয়াটা কাপুরুষ জনোচিত দেখাবে ভেবে সোজা সতেজ ভঙ্গীতে একটু দাঁড়িয়ে থাকলো, কিম্বা বাপকে আর একটা কথা বলবার জন্যে সময় দিলো, কে জানে।...কিন্তু নিজে আর কিছু বললো না, বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

প্রভাতমোহন অর্থশূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখলেন চলে যাওয়াটা। বলে উঠলেন না, খোকা! কথাটা কি সত্যি? না কি আমাকে ঘাবড়ে দেবার জন্যে এ এক বিদঘুটে ঠাট্টা তোর?

না, সেকথা বললেন না। ছেলে তাঁর সঙ্গে হঠাৎ এমন বিটকেল এক ঠাট্টা করতে আসবে এমন কথা ধরা যায় না।

কিন্তু এটা তো বলতে পারতেন, ফ্ল্যাটটা কিনেছ, না ভাড়া নিয়েছ?...ভাড়া নিয়ে থাকো, ছেড়ে দাও, যদি কিনে থাকো ভাড়া দিয়ে দাওগে যাও।...এতে তোমার যা কিছু আর্থিক লোকসান হবে, ওটা আমিই ম্যানেজ করে দেব।

অথবা এটুকু তো বলে উঠতে পারতেন, এখানে তোমার যদি ভয়ঙ্কর কিছু অসুবিধে ঘটছিলো, যার জন্যে এমন ডিসিশান নিতে হয়েছে সেটা আগে একবার জানালে না কেন?

সে সব কিছু না।

স্রেফ 'ঠিক আছে।'

এরপর আর কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারে 'খোকা' নামের যুবক ছেলেটা?

একটুক্ষণ অর্থহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে প্রভাতমোহন হঠাৎ খুব সাধারণ

~ www.amarboi.com ~

একটা কথা ভাবলেন। ভাবলেন, আশ্চর্য! কথাটা খোকা নিজে আমার মুখোমুখি বলতে এলো।...অথচ এটা খোকা অমলার মারফৎ বলতে পারতো।...সেটাই স্বাভাবিক ছিল।...

তারপর ভাবলেন, নাঃ! এ একরকমের নিষ্ঠুর আনন্দ। যে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে শিকারীরা তার শিকারলব্ধ প্রাণীর মৃত্যু যন্ত্রণার ছটফটানি দেখে।...অনেক আততায়ী পিছন থেকে ছুরি মারার থেকে অনেক বেশী উল্লাস অনুভব করে সামনে থেকে বুলেট্ ছুঁড়তে।...

কিন্তু এটা প্রভাতমোহনের ছেলের প্রতি একটু অবিচার করা হলো। পিছন থেকে ছুরি বসানোর পদ্ধতিই অবলম্বন করতে চেয়েছিল সে, পিসিকেই বলেছিল, 'তোমায় বলে রাখলাম, বাবাকে জানিয়ে রেখো।'

তা' পিসি সেটুকু সহযোগিতা না করলে?

তখন পরমাসুন্দরী 'পরমা' তার সুন্দর মুখে একটু কঠিন হাসি হেসে বলেছিল, তুমি এমন অদ্ভুত করছ! কোনো মানে হয় না। বল তো আমি বলে আসি। বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবার গৌরবটা না হয় আমার খাতাতেই জমা পড়ুক।

প্রবাল বলেছিল, 'থাক। না এটা এমন কিচ্ছু একটা ব্যাপার নয়।'

আর এই বলাটা যে এমন একটা কিছু ব্যাপার নয়, সেটা অভিনয় মঞ্চে নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তোলবার জন্যে, রিহার্সাল দিয়ে এসেছিল রীতিমত করে।

প্রভাতমোহনের অবশ্য রিহার্সাল দেওয়ার সুযোগ হয়নি, প্রভাতমোহনকে বিনা সাজসজ্জায়, বিনা মহলায়, একেবারে স্টেজে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হল। তবু উৎরোলেন তো ভালই।

নিষ্কম্প গলায় বললেন, ঠিক আছে।

তারপর ভাবলেন, আমি এতো বিচলিত হচ্ছি কেন? খোকা তো বদলী হয়েও যেতে পারতো! তাহলেও তো আমার খোকাকে আর চন্দনকে ছেড়ে থাকতে হতো।...ছেড়ে থাকার ব্যাপারে 'পরমা'র নাম মনে আনলেন না।

ইচ্ছে করে বললেন না, নাকি ভুলে গেলেন কে জানে। অথচ পরমা এই তিন চারটে বছর—প্রভাতমোহনের সন্তোষসাধনে আপ্রাণ করেছে। কাজে লাগে নি।

তারপর আবার ভাবতে লাগলেন।

কী বোকার মত ভাবলাম আমি। খোকা বদলী হয়ে গেলে শুধু আমার মন কেমন করতো। তার বেশী কিছু না। কিন্তু এতে? এতে ঘরে বাইরে আত্মীয় বন্ধু প্রতিবেশী পরিচিত, সমগ্র সমাজে মাথাকাটা যাবে না আমার।

অথচ সেই কাটা মাথাটা নিয়েই আমার বেঁচে থাকতে হবে, এই পাড়ায় এই বাড়িতেই বসবাস করতে হবে। কারণ বাড়িখানা নিজের।...

আচ্ছা, বাড়ি তৈরী করার মত বোকামি আর কিছু আছে? বাড়ি তৈরি করা মানেই তো বিশেষ একটুকরো জমিতে শেকড় গেড়ে অনড় হয়ে বসে থাকা। ভাড়াটে বাড়ি হলে প্রভাতমোহন এই পরিচিত পরিবেশ ছেড়ে চলে যেতে পারতেন।...এই মস্ত

~ www.amarboi.com ~

বাড়িখানার প্রলোভনেও তো প্রভাতমোহনের আত্মসম্মানী ছেলেকে আটকে রাখা গেল না। যে বাড়িখানায় দোতলা তিনতলা দুটো অংশে হাত-পা ছড়িয়ে বাস করেও বাকি তলটা থেকে মাসে সাত-আটশো টাকা আয় হয়।

এই বাড়ি ছেড়ে খোকা কোথায় কোনখানে ফ্ল্যাটে উঠতে গেল। একী অদ্ভুত কথা! খোকাই তো একমাত্র উত্তরাধিকারী।

হিসেব মেলানো বড় কঠিন হচ্ছে।

প্রভাতমোহন কি সহস্রদৃষ্টির সামনে মাথাকাটা যাওয়া আটকাতে এখনই নিজের হাতে মাথাটাকে কেটে ফেলে, ছুটে গিয়ে বলবেন, খোকা, বৌমা, কী এমন ঘটনা ঘটেছে, যার জন্যে তোমরা এভাবে চলে যেতে চাইছ? তোমাদের কি ওই ডিসিশানটা নেবার আগে একবার মনে পড়ল না, তোমরা চলে গেলে আমরা কী করে এই শূন্য বাড়িখানায় থাকবো?

মাথাটা কাটবার জন্যে এই ছুরিখানা হাতে নিতে গিয়ে ঘৃণায় নামিয়ে রাখলেন। 'আত্মসম্মান' জিনিসটা কি শুধু এযুগেই?...

অমলা ঘরে ঢুকলো। বললো, খোকাকে তোমার কাছে আসতে দেখলাম একটু আগে। কী বলতে এসেছিল ও!

প্রভাতমোহন ভুরু কুঁচকে বললেন, তুমি জানো না কী বলতে এসেছিল?

জানি! জেনেই বলছি—তুমি একবার ওকে বারণ করলে না দাদা?

অমলার প্রশ্নটা যেন আর্ততায় আছড়ে পড়ল, একবার বললে না, 'দুর্মতি করতে যাসনে খোকা—'

প্রভাতমোহন এ আর্ততায় বিচলিত হলেন না, কড়া গলায় বললেন, কেন? বারণ করতে যাব কি জন্যে? দুর্মতি করতে চায় তার ফল ভুগবে।

অমলা বসে পড়ে বলল, এভাবে কথা বোলো না দাদা, বুদ্ধি থাকলে কি আর একাজ করতে যেতো?

প্রভাতমোহন বললেন, বুদ্ধি নেই কে বললো? যথেষ্ট বুদ্ধি আছে। না থাকলে বুদ্ধি জোগান দেবার মাস্টার আছে।

অমলা ভাঙা গলায় বলল, সেই তো হচ্ছে 'কাল', তবু তোমার সেদিন ওই কথাটা বলা খুব ভাল হয়নি দাদা, এখন যদি একবার বলতে রাগের মাথায় কখন কী একটা বলেছি সেইটাই বড় করে ধরছিস তোরা? তা'হলে—

এখন ওরা বাড়িতে উপস্থিত নেই, এইমাত্র বেরিয়ে যেতে দেখলো। তাই কথাটা তুলতে এসেছে অমলা। জানে তো এ আলোচনায় প্রভাতমোহন হয়তো আরো কি অসতর্ক উক্তি করে বসবেন। অনেকক্ষণের জন্যে বেরিয়েছে ওরা, কারণ অনেক কাজ ওদের। এই দুটো দিনে, অনেক ব্যবস্থা।

তা অসতর্ক উক্তি তো করে বসেছেনই প্রভাতমোহন, চীৎকার করে বলে উঠলেন, শুধু ওইটুকু? দুজোড়া জুতোপরা পায়ের ওপর মাথা খুঁড়লে ভাল হয় না?

~ www.amarboi.com ~

অমলা মলিন গলায় বলে সে কথা তোমায় আমি বলতে বলিনি দাদা! মা-মরা ছেলেটাকে তিন মাস বয়েস থেকে—

থেমে যায়।

প্রভাতমোহন তিক্ত কণ্ঠে বলেন, তিন মাস বয়েস থেকে মানুষ করেছিলে। বিধবামানুষ, ঠাকুর দেবতা পুজোপাঠে মন না দিয়ে ওকেই ধ্যানজ্ঞান করেছিলে জানি সবই। তা' ও তার মান রাখল? শুনতে হল না অজ্ঞান বয়েসে কে কী ঋণ দিয়ে রেখেছেন ভগবান জানেন, চিরকাল ধরে সে ঋণ শোধ করতে হবে?'

অমলা মাটিতে বসেছিল, টেবিলের একটা পায়া অমলার মুঠোয় চাপা ছিল, অমলা অন্যহাতটা দিয়ে সেই মুঠোটাকে চেপে ধরে আরো ভাঙা গলায় বলল, খোকা ওকথা বলেনি।

খোকা বলেনি, খোকার গুরুদেব বলেছে।...প্রভাতমোহন কটু গলায় বললেন, থাম অমলি, তুই আর ওর দোষ ঢাকতে যাসনি। গোড়া থেকে দোষ ঢেকে ঢেকেই—তুই ওকে—

অমলার ভিতরটা তোলপাড় করে উঠল।

চিরদিনই দাদা তাকে এই নিয়ে দোষ দিয়েছে সত্যি, কিন্তু সে বলার মধ্যে ভারও ছিল না, ধারও ছিল না। বলতেন, তুই ওর মাথা খেলি অমলি।...নাঃ আদর দিয়ে দিয়ে তুই ওকে একটা বাঁদর করে তুলবি, এটা আমি দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি অমলি।

কিন্তু আজ এই ভয়ঙ্করক্ষণে, যখন অমলার বুকের শিরগুলো ছিঁড়ে পড়তে চাইছে, তখন এই কথাটা যত ধারালো ঠেকলো তত ভারী ঠেকলো।

রুদ্ধ কণ্ঠে বলল, এ দোষ তো চিরকালই আমায় দিয়ে এসেছ দাদা, বলবার কিছু নেই। তবু এযাবৎ কাল খোকার কোনো নিন্দে তুমি কারো কাছে শুনেছ? কেউ ওকে দেখে 'মানুষ' করার দোষ ধরেছে? তুমিই অবুঝপণা করলে দাদা। বিয়ে হয়ে গেলে যে ছেলের সঙ্গে হিসেব করে ব্যাভার করতে হয়, সেটা মানতেই চাইলে না—

প্রভাতমোহনের গলার স্বর তিক্ততায় আর তীব্রতায় কর্কশ হয়ে ওঠে। সেই কর্কশ গলায় বলে ওঠেন তিনি, এতোখানি বয়েসে এটাই শিখতে বাকি ছিল। বিয়ে হয়ে গেলে, ছেলে কুটুম হয়ে যায় আর ছেলের বৌ গুরুমা! আমরা বিয়ে তো করিনি না? তোর বৌদির কী হাল ছিল সংসারে ভুলে গেছিস বুঝি?

সে সব কথা ভুলে যাও দাদা। সেকাল আর একালে অনেক তফাৎ। এখনকার ছেলে মেয়েদের আত্মসম্মানজ্ঞান বেশী—

ওঃ তাই? তাই গুরুজনের প্রাপ্য সম্মানটুকুও আত্মসাৎ করতে হবে কেমন?

অমলার প্রাণের মধ্যে আরো তোলপাড় করে ওঠে।

অমলার মনের মধ্যে অনেকদিনের অনেক ঘটনাই ছবির মত ফুটে ওঠে, কাঁটার মত ফোটে।...সবচেয়ে যন্ত্রণাদায়ক, ওদের ওই কোথাও বেড়াতে যাবার সময় চন্দনকে

~ www.amarboi.com ~

পরমার বাপের বাড়িতে টেনে নিয়ে গিয়ে সেখানে তার মায়ের কাছে রেখে যাওয়া। তবু কিছু বলবার মুখ নেই। শত কাঁটা ফুটলেও, মুখ ফোটবার উপায় নেই। এ অমলার নিজের অসতর্কতার ফল, অমলার নিজের কাটা খালে ভেসে আসা কুমীর।

অথচ কীই বা বলেছিল অমলা নিক্তির পাল্লায় কতটুকু চাপান দিয়ে ফেলেছিল? শুধু বলেছিল—তাও তো হাসির ছলেই বলেছিল, রোজ রোজ তোদের সন্ধ্যেবেলা ছেলে রেখে বেড়াতে যাওয়া। পিসির তো পুজো-পাঠ কাজকর্ম সব ডকে উঠে যাচ্ছে।

বাস! এর বেশী নয়।

বলে ফেলেই বুক ধড়ফড় করে উঠেছিল অমলার। কেন আবার একথা বলে মরতে গেলাম ছাই। কাল না আবার অভিমানে বেড়াতে যাওয়া বন্ধ করে বসে বাবু। তখন তো আবার লজ্জার মাথা খেয়ে, হেসে গা পাতলা করে খোসামোদ করে মান ভাঙাতে হবে আর কি।

সেই খোসামোদের ভাষাটা মনে মনে মুসাবিদাও করে রেখেছিল অমলা। কিন্তু কাজে লাগে নি। বৌ নিয়ে বেড়াতে যাওয়া বন্ধ করেনি খোকা। শুধু ছেলেটাকে পিসির কাছে রেখে না গিয়ে, বয়ে নিয়ে গিয়ে শাশুড়ীর কাছে রেখে যায়।

কারণ এযুগে 'অভিমান' নামক শব্দটা অভিধান থেকে বাতিল হয়ে গেছে। যা আছে, সেটার নাম 'আত্মসম্মান'।

তাই বড় সাবধানে চলতে হয় বড়দের।

অমলা তো সেই অবধি নিক্তি হাতে করেই থাকে। কথা বলার সময় অনুক্ষণ লক্ষ্য রাখে, এক কণা না এদিক ওদিক হয়ে যায়।

কিন্তু দাদাকে এঁটে উঠতে পারে না।

প্রভাতমোহন মানতে চান না, ছেলের বিয়ে হয়ে গেলে, সর্বদা মনে রাখা উচিত বৌ কুটুমের মেয়ে, আর ছেলে তার অধিকারভুক্ত সম্পত্তি মাত্র।

কোনো কোনো সময় হেসে বোঝাতে চেষ্টা করেছে অমলা, আচ্ছা দাদা মেয়ের বিয়ে দিলেই তো সে জামাইয়ের সম্পত্তি হয়ে যায়, জামাইয়ের অনুমতি ছাড়া একবেলা তাকে বাড়িতে রাখতে পারা যায় না, এতো চিরকালই মেনে আসা হয়ে চলেছে। মনে করলেই হয়, এও তেমনি।

প্রভাতমোহন ব্যাঙ্গের গলায় বলেছেন,—হ্যাঁ! অকাট্য যুক্তি। ছেলেকেও তো অগ্নিনারায়ণ সাক্ষী করে সম্প্রদান করা হয়ে থাকে।

খোকা তো তোমায় আজকাল যমের মত ভয় করতে শুরু করছে দাদা—

বড় বাহাদুরী করছে। বাপকে বাপের মত ভাল না বেসে, যমের মত ভয় করছেন বাবা আমার। কেন? রোজই বা সন্ধ্যেবেলা বেড়াতে যাওয়া কেন? একদিন ইচ্ছে করে না বুড়ো বাপের কাছে একটু বসি!

অমলা তবুও পরিস্থিতি হালকা করতে বলেছে, তুমি বুড়ো? খোকার থেকে তো তুমি অনেক বেশী ইয়ং।

~ www.amarboi.com ~

কিন্তু এসব কথা কি কাজে লাগে?

সেই একদিন সর্বনেশে সেই দিন—

ওরা না বলা কওয়া ওবাড়ি থেকে খাওয়া-দাওয়া সেরে অনেক রাত করে ফিরল ঘুমন্ত ছেলেটাকে কাঁধে দুলিয়ে—দেখেই দপ করে জ্বলে উঠে বলে বসলেন প্রভাতমোহন, এতো স্বেচ্ছাচার এ বাড়িতে থেকে চলবে না।

অমলা জানে বড় দুঃখেই বলে ফেলেছিলেন।

অনেকদিন পরে সেদিন প্রভাতমোহন খুব বড় বড় চিংড়ি মাছ এনেছিলেন, আর অমলাকে বলেছিলেন, ঠাকুরের হাতে এগুলো ছেড়ে দিসনি অমলি তুই নিজে বেশ জম্পেস করে রাঁধ।...আর ইচ্ছে প্রকাশ করেছিলেন, এর সঙ্গে ফ্রায়েডরাইস বানাতে। জিনিসটা প্রভাতমোহনেরও প্রিয়, খোকারও বিশেষ প্রিয়।

সেই প্রিয় বস্তু দুটো একসঙ্গে বসে খাবেন বলে, অতো রাত অবধি বসেছিলেন প্রভাতমোহন। অথচ খিদে সহ্য করতে পারেন না উনি। শরীর বেতাক হয়ে যায়, খাওয়ার দেরী হলে। অনেকবার বলেছিল অমলা, ওরা হয়তো সিনেমাটিনেমা গেছে, অনেক দেরী হবে, তুমি খেয়ে নাও। রেগে উঠেছিলেন প্রভাতমোহন।...আর ক্রমশই উদ্বিগ্ন হচ্ছিলেন।

দেরী হলেই তো দুশ্চিন্তা।

অমলারই কি ভয় করছিল না? অহরহ রাস্তায় অ্যাকসিডেন্ট ঘটছে!...তবু মুখে সাহস দেখিয়েছিল। প্রভাতমোহন ওর কথা গ্রাহ্য করেননি। রেগে উঠেছেন। টেলিফোন নেই খোকার শ্বশুরবাড়ি, অতএব একটা খবর নেবারও উপায় নেই। অন্ততঃ কখন বেরিয়েছে, অথবা আদৌ বেরিয়েছে কিনা, তাদের কোনো বিপদ ঘটলো কিনা চন্দনের হঠাৎ কোনো অসুখ-করলো কিনা—

অস্থির হয়ে যখন বামুনঠাকুরের হাতে বাস ভাড়ার পয়সা দিয়ে খোঁজ নিতে পাঠাচ্ছেন তখন ওরা ফিরল সিনেমা দেখে, নেমন্তন্ন খেয়ে।

অমলা দোষ দেয়না দাদাকে।

ধৈর্য জিনিসটা স্টীলের তৈরী নয়। অন্ততঃ পুরুষ মানুষের নয়।

কিন্তু ওই একটা লাইন কথা ছাড়া আর তো কিছু বলেননি প্রভাতমোহন। সেইটুকুই বাবুদের সঞ্চয় বাড়িয়ে তুলেছে? আশ্চর্য বৈকি।

তবু এখন অমলা বলছে, তোমারই অন্যায় দাদা তোমার একবার নতি স্বীকার করা উচিত ছিল।

প্রভাতমোহন বললেন, তোর বুঝি আজ কোনো কাজ নেই? না থাকে, মালাজপ করগে যা। কানের কাছে ভ্যান ভ্যান করিসনে।

আহত অমলা চলে যাওয়া ছাড়া আর কি করবে? অথচ ওর মনে হচ্ছে—একটু বাঁধ দিলেই এই বৃহৎ ভাঙনটা রোধ হয়।...অরোধ বলেই মনে হচ্ছে অবশ্য।

অমলা চলে যাওয়ার পর ক্রমশঃই এলোমেলো চিন্তায় টুকরো টুকরো হতে থাকেন

~ www.amarboi.com ~

প্রভাতমোহন।

রাতারাতি এমন ভয়াবহ একটা কিছু ঘটতে পারে না, যাতে ওদের যাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। যাওয়ার বাসনাও। কী সেই অঘটন? প্রভাতমোহনের হঠাৎ স্ট্রোক হওয়া? নাঃ সে তো প্রভাতমোহনের পরাজয়। নিজের সেই পরাজিত দীন মূর্তির কথা দুবার ভাবতে পারলেন না।...

পরমার মা অথবা বাবা কোনো একজন যদি রাতের মধ্যে—

না, তাতে আর ওদের এ বাড়ি ছাড়তে বাধা কোথায়? বরং নিজের সংসার হলে, ভাঙাচোরা বাকি মালটাকে নিজেদের কাছে নিয়ে যাবার সুবিধেই হবে।

খোকার কথা ওঠেনা। কিন্তু পরমার?

তাতেই কি সুবিধে হবে? বৌয়ের কিছু হলে, খোকা তো বাপকে আরোই ক্ষমা করতে পারবে না। এসব কিছু না। আচ্ছা—হঠাৎ কালই যদি খোকার অফিসে বদলীর অর্ডার এসে যায়?

যে আশঙ্কাটাকে প্রভাতমোহন অনবরত ভূতের ছায়ার মত সরিয়ে রেখে এসেছেন সেটাকেই তবু মন্দের ভালো মনে হচ্ছে। দেখতে পাবোনা খোকাকে, দাদু ভাইকে, তা হোক। তবু লোকসমাজে মাথাটা তো আস্ত থাকবে?

কিন্তু পর্শু সকালে যে লোক শিফট করে ফেলবে ঠিক করে ফেলেছে, কাল তেমন একটা অর্ডার এলেই কি কিছু সুরাহা হবে? একমাত্র যদি কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটে। ভয়ানক কোনো দুর্যোগ।...

তাকিয়ে দেখলেন নির্মল নির্মেঘ আকাশের দিকে। ওই আকাশ থেকে রাতা-রাতি বন্যা নামাতে পারে? অথবা এই জ্যোৎস্নাপ্লাবিত পৃথিবীর শান্ত ভূমি থেকে উঠতে পারে ভূমিকম্পের প্রচণ্ড তাণ্ডব?...

বাজে কথাগুলো ভেবে লাভ নেই।

একটা কিছু করা দরকার।

যাতে ওরা জব্দ হয়ে যেতে পারে। যদিও মাঝে মাঝে ভাবছেন, যাক না, দেখুক না দুদিন কত ধানে কত চাল। শখ মিটে যাবে। বাপের হোটেলে আছিস, খাওয়া থাকায় এক পয়সা খরচ নেই, মনে ভাবছিস ও আর কি? আড়াইখানা তো মানুষ। দেখগে যা আজকের দিনকাল।

রাতভোর যতরকম কুটিল চিন্তায় বিষাক্ত হতে থাকেন প্রভাতমোহন, ঘুমের ধার দিয়ে যাননা।

কিন্তু প্রার্থনা, অভিশাপ, প্রবল ইচ্ছাশক্তি, কিছুই কাজে লাগে না। সকালে ওঠে দেখেন তেমনি নির্মল আকাশে নির্লজ্জ সূর্যটা নিত্যকার মতই আলো ছড়াচ্ছে।

শুধু মাত্র আজকের দিনটা হাতে আছে প্রভাতমোহনের। কাল সকালে এমন সময় প্রভাতমোহনের নাকের সামনে দিয়ে একখানা গাড়ি বেরিয়ে যাবে, মালপত্র বোঝাই দিয়ে।

~ www.amarboi.com ~

না, এ বাড়ির কিছুটি নেবে না ওরা, এটা অবধারিত। শুধু নিজেদের জিনিসগুলোই। পরমার বাবা বিয়েতে কিছুই দিতে পারেননি, যা কিছু ব্যবহার করে ওরা সবই প্রভাতমোহন প্রদত্ত। সে সব নেবেনা ওরা...হয়তো দাদুভাইয়ের সেই দোলনা খাটটাও পড়ে থাকবে তিনতলার বড় ঘরখানার এক কোণে।

প্রভাতমোহনের চোখে কি হঠাৎ লঙ্কার গুড়ো পড়ল? তাই তাড়াতাড়ি জলের কলের কাছে চলে গেলেন?

দিনের ঘণ্টাগুলো কী অদ্ভুত নিস্তরঙ্গ কেটে গেল।

এমনিতেই তো আজকাল বড় বেশী চুপচাপ হয়ে গিয়েছিল বাড়িটা। অমলা আর গলা তুলে বামুনঠাকুরকে বকাবকি করেনা। প্রভাতমোহনও কোনো সুযোগ পাননা, গলা তুলতে।

আজও যথারীতিই চলল সংসার চক্র।

শুধু আরো নিঃশব্দে।

খোকা দাড়ি কামালো, চান করলো, অফিস গেলো।

পরমা ছেলেকে নাওয়ালো, খাওয়ালো ঘুম পাড়ালো, নিজে খেলো। তারপর কী করলো ভগবান জানেন।

প্রভাতমোহনের অবসর গ্রহণের পর থেকে পরমা তাঁর সঙ্গে দুপুরে খেতে বসতো। কিছুদিন থেকে সময়টা উল্টো পাল্টা হয়ে যাচ্ছে। হয়তো ঠিক খেতে বসবার আগেই পরমা কোথাও বেরিয়ে যায়। অথবা আগেই কাজ আছে বলে খেয়ে নিয়ে কোথায় কোথায় চলে যায়।

আজ কি করল বোঝা গেলনা।

প্রভাতমোহন তবু প্রতিক্ষণ একটা কিছুর প্রত্যাশা করতে লাগলেন।...

কিন্তু সেই কিছুটা ঘটল না।

প্রবাল যথারীতিই অফিস থেকে ফিরে চান করল। সামনের বারান্দার রেলিঙে ভিজে তোয়ালেটা ছড়িয়ে দিয়ে চা খেল এবং সন্ধ্যায় যেমন বৌ নিয়ে বেরিয়ে যায় বেরিয়ে গেল। কিছু ব্যাগ বাস্কেট নিয়ে।

কিন্তু ছেলেটা?

কই তাকে সঙ্গে দেখলেন না তো?

একটু পরে গুটি গুটি চলে এলেন অমলার কাছে, বললেন, কী? আজ যে পিসির বড় ভাগ্যি দেখছি? তা ছেলে পকেটে করে যাওয়া হল না কেন?

অমলা কথা বলল না।

বোঝা গেল বলবার ক্ষমতা নেই বলেই বলল না।

ছেলেটাকে কোলে ফেলে চাপড়েই চলেছে।

এক্ষুনি পিটিয়ে পিটিয়ে ঘুম পাড়াচ্ছিস কেন?

অমলার রুদ্ধকণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হল, বলে গেছে।

~ www.amarboi.com ~

তা বলবে বৈকি। বুড়ো পাছে নিয়ে একটু খেলে।

অমলা কথা বলল না।

যে অমলা কথা বলার সুযোগ পেলে সহজে ছাড়ে না। একটা কথা বলার সুযোগ পেলে একশোটা বলে।

ঘুম পাড়িয়ে শোয়াতে যাবিনে,' প্রভাতমোহন হঠাৎ তীব্র গলায় বলে ওঠেন, শোয়াতে হবে না। আমি জাগাব।'

গলাটা যেন প্রতিহিংসার মত শোনালো।

অমলা ভয়ে ভয়ে বলল, সে আবার কী? কাঁচা ঘুমে ওঠালে কাঁদবে না?

কাঁদুক। ভোলাব।

পারবে না।

দেখি পারি কিনা।

বলে ছেলেটাকে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে গিয়ে নাড়িয়ে বসিয়ে ডেকে ডেকে ঘুম ছাড়ালেন।

ছেলেটা বোকার মত তাকিয়ে রইল।

দাদুকে দেখে হাসল না! তার মানে ঘুমের রেশ রয়েছে। এই প্রকৃষ্ট সময়।

গূঢ় কুটিল একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে হোমিওপ্যাথির বাক্সটা পাড়লেন প্রভাত মোহন। বেছে বেছে একটা শিশি বার করলেন। কয়েকটা পালসেটিলা খেলে এমন আর কী ক্ষতি হতে পারে একটা বছরখানেকের ছেলের?

যেটি চাইছেন সেইটিই হবে শুধু।

তার বেশী কিছু নয়।

পেটটা ভাঙবে। আর রাত থেকে যদি ছেলের পেট ভাঙতে থাকে, তাহলে বাপ সকালে উঠে ডাক্তার ডাকার চেষ্টা করবে নাকি ভিটে ছেড়ে বাসায় উঠতে যাবে। সেটা হতে পারেনা। তার মানে কাল সকালটায় বাঁধ পড়লো।

অতঃপর মন ঘুরে যেতে পারে না কি?

ভাবতে পারেনা, ভগবান নিষেধ করলেন। নইলে সহজ ছেলে, হঠাৎ এমন হবে কেন?

গোটাকতক দানায় কিছুই হবেনা।

প্রভাতমোহনের ছোটমামার ছোট ছেলেটা একবার চুরি করে আধ শিশিটাক পালসেটিলা শেষ করেছিল লজেন্স ভেবে। কী আর হল? ওই পেটটা বেদম খারাপ হল।...প্রভাতমোহন বুঝেসুজেই দেবেন।

শিশি [illegible] একটা দানা নিয়ে প্রায় জোর করেই ছেলেটার জিভে ধরিয়ে দিয়ে বললেন, লদেন্ত খাবে দাদু? লদেন্ত?

জিভে মিষ্টি স্বাদ।

ছেলেটা হাত বাড়িয়ে শিশিটা ধরতে গেল।

~ www.amarboi.com ~

এখন একটু হাসি বেরোল মুখে। ঝুঁকে শিশিটা চেপে ধরল।

এখন ভারী ভয় পেয়ে গেলেন প্রভাতমোহন।

ওর চেপে ধরা কচি হাতটা থেকে ছাড়িয়ে নিলেন শিশিটাকে। ছেলেটা কেঁদে উঠল। কাঁদুক।

জানলা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিতে গেলেন শিশিটাকে, সাহস হল না। যদি কারো চোখে পড়ে যায়। যদি জানালার দিকে তাকিয়ে দেখে, লোকটা কে!

নাঃ ফেলা চলবে না।

ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। দালানের বেসিনের কলের তোড়ের মুখে শিশির মুখটা খুলে খুলে ধরলেন। বার বার ধুয়ে ধুয়ে ফুঁকো-শিশিটা সাফ করে ফেললেন। খুনের চিহ্ন গোপন করার মত বেসিনে জলে ঢেলে ঢেলে হারিয়ে যাওয়া দানাগুলোকেই পার করতে লাগলেন কিছুক্ষণ ধরে।

খালি শিশিটাকে রেখে দিলেন বাক্সের মধ্যে তার খাঁজে।

তারপর পরাজিতের ভঙ্গীতে অমলাকে ডাক দিয়ে বললেন, এই, নিয়ে যা একে। ঘুম ছাড়ছে না। কাঁদতে লেগেছে।

~ www.amarboi.com ~

অহমিকা

ভোর থেকে বৃষ্টি পড়ছে। অদ্ভুত একটা রিমঝিম শব্দময় ঝিরঝিরে বৃষ্টি। ওই শব্দটাকে মনে করা যেতে পারে কোথায় যেন কারা চুপি চুপি কথা বলছে।

আমি অবশ্য কাব্যি-টাব্যির ধার দিয়েও যাই না। তবু বেশ ভাল লেগে যাচ্ছে এই ভোরটা। আরো ভালো লাগছে, সকলটা, রবিবারের সকাল মনে পড়ছে। কী মজা। আজ আর একটু পরেই অফিসের জন্যে তৈরী হতে হবে না। ভাললাগাটা বেশ যথেষ্ট পরিমাণেই এসে গেছে বলেই বোধ করি আশা হচ্ছিল, আজকের সকালটা বেশ শান্ত শান্ত কাটবে নিত্যদিনের মত ধুন্ধুমার কাণ্ড বেধে যাবে না।

হায় আশা মরীচিকা।

দ্বিতীয়বার চোখে ঘুমের আমেজটা ছড়িয়ে পড়ার মুখে, আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল সেই কলকল্লোল ধ্বনি। কলরব না বলে কলকল্লোল বলছি এই কারণে, এই উদ্দাম নাটকের আবহে একটি মুখ খোলা জলের কল একভাবে নিজের কাজ করে চলেছে।

তাই চলে প্রায় রোজই।

প্রাত্যহিক লড়াইয়ের সূত্রপাত হয় প্রায়শই ওই মহাপীঠস্থানটি থেকেই, লড়াইয়ের বিষয়বস্তু যেদিন যাই হোক, লড়াইটা প্রতিদিনই উদ্দাম হয়, এবং শেষ পর্যন্ত মোটামুটি ড্র-ই যায়। এ-বাড়িটায় আমার বাস করার পূর্ণ অধিকার থাকলেও এখানে আমি জন্মাইনি শৈশব-বাল্যও এখানকার স্মৃতিমণ্ডিত নয়, কিছুকাল হল থাকতে এসেছি।

আর এসে পর্যন্তই বুঝতে পারছি এই যোদ্ধাদম্পতীর, আসলে 'ঝগড়া' করাটাই মূল লক্ষ্য, কারণটা উপলক্ষ্যমাত্র। সেটা যাহোক একটা কিছু হলেই হলো।...সারারাতের শান্ত নিশ্চিন্ততার পর সক্কালবেলাই বা এঁদের এমন রণপিপাসা জেগে ওঠে কেন?...এটা ভাবতে গিয়ে মনে মনে যে সিদ্ধান্তে গিয়ে ঠেকেছি, সেটা চট করে উচ্চারণ করা চলে না। কারণ যতই যা হোক লৌকিক বা সামাজিক আইনে ওঁরা আমার গুরুজন।

যদিও দু-দুটো বিবাহিত মেয়ের এবং গোটা তিন-চার শিশু-শাবকের জনক ওই প্রায়-প্রৌঢ় ভদ্রলোকটিকে এবং তাঁর প্রায় সমবয়সিনী সহধর্মিণীটিকে মনে মনে আমি গুরুজন পদে বসাতে রাজী নই। ওঁদেরকে দুটো 'ছোটলোক' বলেই মনে করি, তথাপি মৌখিক ভদ্রতা বলে একটা কথা আছেই তো। ওটা না দেখলে চলবে কেন? অন্য পাঁচজনের সামনে নিজের একটা ইমেজ রাখতে হবে না?

নইলে আপনারাই আমার নিন্দে করে বেড়াবেন।

তবে রোজ সকালে এই বিরক্তিকর ব্যাপারটা নিয়ে আমি কোনো কিছু মন্তব্য করতে

~ www.amarboi.com ~

যাই না। কী দরকার? ওঁদের নিয়ে আমার মাথা ব্যথার কারণ নেই কিছু।

হতে পারেন ওই প্রৌঢ় ব্যক্তিটি আমার নিজের কাকা, বাবার সহোদর ভাই। কিন্তু ওঁকে আমি 'আপনজন' ভাবতেই পারি না।

অতএব ওঁর স্ত্রীটিকে তো আরোই না। নেহাৎ কোনো কারণে কথা বলতে হলে 'কাকা-কাকিমা' বলতে হয় তাই বলা।

আমি জানি কলকাতার উত্তর অংশের এই ভাঙ্গা বাড়িটা আমার ঠাকুরদার তৈরি। সে বাবদ এই কাকা, এবং আমার পরলোকগত বাবা, দু-জনেই এ বাড়ির সমান অংশীদার। উত্তরাধিকারসূত্রে—এখন আমি আমার বাবা অকালে মারা গিয়েছিলেন বলে, আমার তরুণী মা নিতান্ত শিশু 'আমাকে' নিয়ে কালনায় বাপের বাড়ি চলে গিয়েছিলেন, তদবধি এ পক্ষ আর কোনো খবরই নেননি। কেনই বা নেবেন? খবর নেওয়া মানেই তো স্বেচ্ছায় কোনো কিছুর দায় ঘাড়ে নেওয়া? বুদ্ধিমানেরা তা করে?

আমার এই কাকা, হরপ্রসাদ ঘোষ এঁকে কেউ বুদ্ধিহীন বলে অপবাদ দিতে পারবে না।

আমার পিতৃকূলের কেউ (পিসিও তো আছেন দু'জন শুনেছি। কোথায় আছেন, তা অবশ্য জানি না।) আমার খোঁজ খবর না নিলেও আমার কোনো কিছু এসে যায় না।' আমি দাদামশাইয়ের বাড়ি থেকেই মানুষ হয়েছি, পড়াশুনো করেছি, কালনা কলেজ থেকে বি-এ পাশ করেছি এবং অবিশ্বাস্য হলেও সত্য, 'খুঁটির জোর' ব্যতীতই একটা বে-সরকারী অফিসে কেরানী গোছের একটা চাকরীও পেয়ে গেছি। সরকারী অফিসের থেকে বেসরকারীতে মাইনে বরাবরই বেশী, এখনও তাই। সরকারের স্কেল বাড়ালেও বে-সরকারীরা তাকে ডিঙ্গিয়েই চলছে। অতএব মাইনেটা তুচ্ছ অংকের নয়।

বাবা অবশ্য অকালেই মারা গিয়েছিলেন, তবু বেশ কিছু বছর কাজ করেও বাবা, তাঁর সেই রাইটার্স বিল্ডিঙের চাকরীতে মৃত্যুকালে যে মাইনেতে পৌঁছতে পেরেছিলেন, আমি প্রবেশকালেই তা পেয়ে গেছি। কে জানে বেঁচে থাকলে ভদ্রলোক নিজের মেয়েকেই হিংসে করতে বসতেন কি-না।

সে যাক, মায়ের কাছে আমার এই চাকরীটা অপ্রত্যাশিত, আশাতীত। তাই মা বলেছিলেন, আমাকে আর তোর টাকা পাঠাতে হবে না বাপু, তুই নিজের খরচ বাদে বাকি টাকা জমাতে চেষ্টা করবি। তোর বিয়ের জন্য আমার তো আর কোন সঞ্চয় নেই।

দাদামশাইও সেই কথারই পুনরাবৃত্তি করেছিলেন। তবু আমি বুঝি, নিষেধ সত্বেও অবচেতনে একটু প্রত্যাশাও থাকে। তাই আমি আমার সাড়ে চারশো টাকা থেকে, প্রথমেই দেড়শো টাকা দাদামশাইয়ের নামে পাঠিয়ে দিই।...জানি দাদামশাই নিজে একপয়সাও নেবে না, মার হাতেই তুলে দেবে, তবু এটাই সৌজন্য। মা হয়তো ওই থেকেই জমাবে, তবু ইচ্ছে হলে কিছুও খরচা করবে। চিরদিন তো অপরের হাত তোলায়। যদিও দাদামশাই চিরদিন এই ভাগ্যহীনা মেয়েটা অন্তপ্রাণ, এবং দাদামশাই যথেষ্ট অবস্থাপন্ন, তবুও অধিকারের জিনিস, আর উপহারের জিনিস!

~ www.amarboi.com ~

কালনায় দেড়শো টাকা মণি অর্ডার করে এসেই কাকার হাতে নগদ দুশোটি টাকা ধরে দিই। প্রতিবারেই কাকা হাতটা বাড়িয়ে ধরেই বলে, কেন যে এতগুলো টাকা দিয়ে দিস। বাড়ির মেয়ে সামান্য দুটো ডালভাত খাচ্ছিস—(এটা কাকার অত্যুক্তি নয়।)

আমি সৌজন্য এবং গাম্ভীর্য দুটোই বজায় রেখে বলি, তা হোক আমারও তো সংসারের প্রতি একটা কর্তব্য আছে কাকা!

কাকা বিগলিতভাবে বলে, তবে আর কী বলব বল, দে তবে। কাকা তো তোর অভাবীই।

আবার হঠাৎ গলা নামিয়ে বলে তোর ওই কাকীটা না টাকা পেলেই সন্তুষ্ট, বুঝলি? ওর রাগের ভয়েই আমার মেয়ের কাছে হাত পেতে খাইখরচা নিতে হয়।

আমি আরো গম্ভীরভাবে বলি, এ-সব কথা বলছেন কেন কাকা? আমার ভাললাগে না।

কাকা থতমত খেয়ে যায়। তারপর আরো গলা নামিয়ে বলে, বলি কি আর সাধে মা? ও এমন মেয়েমানুষ, আমায় পর্যন্ত বিশ্বাস করে না। বলে, নিশ্চয় টুনু বেশী দিয়েছে, তুমি কিছু গাপ্ করছো। শোন তো মা? এইটা একটা কথা হলো?

আমি মনে মনে ভাবি, খুবই হলো। কাকীর সঙ্গে এ বিষয়ে একমত হতে আমার বাধছে না।...

কিন্তু ব্যাপারটা এমন যে, খোলা-খুলি বলে নেবার কোনো উপায়ও নেই। আমি তো আর কাকীকে জিগ্যেস করতে যেতে পারি না, কাকী! কাকা তোমায় আমার নাম করে কত দেয়?

যাকগে—।

না পারি না পারি, তবু আমি বলতে কি বেশ সুখেই আছি। বাকি সারাটা মাস বাকি একশোটি টাকার একচ্ছত্র অধিশ্বরী আমি রীতিমত পোজিশানের উপরই থাকি।

আমার ওই খুড়তুতো ভাই-বোনেরা রীতিমত সমীহর দৃষ্টিতে দেখে আমায়, এবং কাকীও সরাসরি কোনো আক্রমণাত্মক কথা বলতে সাহস পায় না।

একদিনই শুধু ঘটেছিল একটা ঘটনা। কিন্তু এখানে আসার অনেক দিন পরের ব্যাপার। বুলানের এক সহপাঠিনীর দিদির বিয়েতে বুলান কী পরে বিয়েবাড়ি যাবে এই বলে মায়ের কাছে কান্নাকাটি করছিল শুনতে পেয়ে, আমি মেয়েটাকে আড়ালে ডেকে বলেছিলাম, বুলান, বিয়েবাড়ি যাবি?

ও বলল, হুঁ।

বললাম, আমার এই সিল্কের শাড়িখানা পরে যাবি?

তোমার শাড়ি।

ও তো হতভম্ব।

দেখে খুবই লজ্জা করল। খুবই মায়া হল। এমন কথাও মনে এসে গেল এদের সঙ্গে অন্তত আর একটু সহজ হয়ে মিশলে হয়। তাই শাড়িটা ওর গায়ের ওপর ধরে বললাম,

~ www.amarboi.com ~

পরনা। রংটা তোকে খুব মানাবে। ফর্সা আছিস তো! আমি তো কেলে, তবু দাদামশাই পুজোর সময় ডীপ ডীপ রঙের শাড়ি দেন।

শাড়িটা পেয়ে ও এতো বিগলিত হয়েছিল যে হঠাৎ ওর চোখ দিয়ে জল এসে গিয়েছিল।

পরে মানিয়ে ছিল সত্যি খুব।

হেসে বলেছিলাম, তোকেই কনে বলে ভুল করবে লোকে।

ভেবেছিলাম, এই সহজ হয়ে মেশবার মধ্যে কতো আনন্দ। কিন্তু সে ভাব স্থায়ী হতে পেল কী?

পরদিন—বুলান যখন শাড়িখানাকে ভাল করে পাট করে ফেরত দিতে এলো আমি খপ্ করে বলে ফেললাম তোকে ভীষণ মানিয়েছিল শাড়ীটায়, তুই এটা নে।

ও ভয় পেয়ে বলেছিল, না না। মা বকবে।

দূর বকার কী আছে? দিদির কাছে নেওয়া যায় না কিছু?

কিন্তু হঠাৎ তদ্দণ্ডে রঙ্গমঞ্চে রাণী রিজিয়ার প্রবেশ ঘটল। সঙ্গে সঙ্গে সংলাপ, যাবে না কেন টুনু? খুবই নেওয়া যায়। রোজগারি দিদি। তবে দেখিনা তো তেমন। এটা তুমি ওকে দিতে চাইছ, ওর পরা কাপড় ঘেন্নায় আর পরবে না বলে। এই তো? ও নেবে না।

বুলান অবশ্য এতে ডুকরে কেঁদে উঠেছিল, কক্ষণো সেজদি ও জন্যে বলেনি। ভালবেসে দিয়েছে, আমায় খুব মানিয়েছিল বলে! আমি নেব।

এবং শেষ অবধি তার স্বর্গাদপিগরীয়সী'র কণ্ঠ থেকে আপসের সুরও বেরিয়েছিল, তা দিয়েছে যখন নাও। এই কাঁদবার কী হোল আবার?

কিন্তু এরপর কি আর সহজ হওয়া সহজ?

ওরাও তো পালিয়ে পালিয়ে বেড়িয়েছে কতদিন।

অতএব আবার আমি আমার গাম্ভীর্যের দুর্গে আশ্রয় নিয়েছি। যে আশ্রয় প্রথম থেকেই বেছে নিয়েছিলাম।

আচ্ছা 'কখনো কিছু দিই না'—এ অপরাধ ঘোচাতে, এরপর কোনো নতুন জিনিস কিনে উপহার দেওয়াই কি সম্ভব? হাস্যকরই হবে।

তাছাড়া—

হ্যাঁ তাছাড়া আসল কথাটা তো আছেই।

দেবার অবস্থা কি আছেই সত্যি?

মাসে একশো টাকার একছত্র "অধিশ্বরী" বলে মনে মনে যতই পুলকিত হই অথবা পুলকিত হবার ভান করি কলকাতা শহরে এই বাজারে একটা অফিস চাকুরে মেয়ের পক্ষে মাসিক একশোটা টাকা হাতখরচা সত্যিই তো আর বেশী নয়।

বলতে গেলে কিছুই নয়। তার থেকে বাড়তি কিছু হতেই পারে না।

বৃহৎ অংক কষে চলতে হয়। আইটেম তো অনেক। বাসভাড়া, চা, টিফিন, লণ্ড্রীতে

~ www.amarboi.com ~

কাপড় কাচানো, ন্যূনতম প্রসাধন দ্রব্য, মাঝে মাঝে কিছু ওষুধপত্র, অন্তত মাথাধরার ট্যাবলেট দু-চারটে, এ-সব তো আছেই, আরো কিছু আছে। এসেই যায় কিছু। মণি অর্ডার, চিঠিপত্র লেখা। কী নয়?

তবু আমি ডাঁটটা বজায় রাখি।

আমি নিজের সময়মাফিক উঠি, গম্ভীর মুখে মাজন, তোয়ালে, বুরুশ, ইত্যাদি নিয়ে নীচের তলায় নেমে যাই, মুখ ধুয়ে আসি। (কেন কে জানে আমায় সবাই সসম্ভ্রমে কলতলায় লাইন ছেড়ে দেয়।) নিজের ঘরে রাখা স্টোভটা জ্বেলে, নিজে গুছিয়ে রাখা চায়ের সরঞ্জামগুলো নিয়ে বসে চা বানিয়ে খাটের ওপর আরাম করে বসে পর পর দু পেয়ালা চা খাই, দু খানা করে থিন অ্যারারুট বিস্কুট খাই এবং সেই সময় হাতে একখানা বই কি কাগজ রাখি।

চা খাবার সময় কাকা পাঁচবার আমার দরজা দিয়ে ঘুরঘুর করলেও, কখনো বলি না কাকা এককাপ চা খেয়ে যান—অথবা মুখ ধুয়ে নীচে থেকে উঠে আসবার সময় যদি দেখতে পাই বুলান দালানে মাটিতে বসে অনেকখানি জায়গা বিস্তার করে চা খাচ্ছে, কক্ষণো বলি না, কী রে বুলান, চা হয়ে গেছে না কি?, তো আমার জন্যেও আন বাপু এককাপ। তা হলে আর নিজে বানিয়ে নিতে হবে না।

বললে নিশ্চয় কৃতার্থ হয়ে যাবে। হয় তো বা আহ্লাদের আতিশয্যে চায়ে সরবতের স্বাদ এনে ফেলবে।...কিন্তু অন প্রিন্সিপ্‌ল্‌ বলি না। হয়তো একদিন একটু সহজ হলেই এরা আমায় পেয়ে বসবে, পেড়ে ফেলতে চাইবে।...আমার ঘরে ঢুকবে, আমার আয়নায় মুখ দেখবে, আমার ক্রীমের শিশিতে আমূল আঙ্গুল ডুবিয়ে গালে ঘসবে। অতএব আমার ডাঁটটুকু বাসি কলমি ডাঁটার মত নেতিয়ে যাবে।

ওরাও অবশ্য কোনোদিন বলে ওঠে না, "সেজদি চা ঢালছি খেয়ে যাও না এককাপ।"...

বলে না, সাহস হয় না বলেই।

আমি আমাকে ঘিরে একটা অদৃশ্য লৌহ আবরণ রচনা করে রেখেছি। সেটা ভেদ করে গায়ে আঙ্গুল ছোঁয়াতে পারে না। বুলান, বুতাই, আর নীলম, এই তিনটে ছোট ছেলেমেয়ে। বাড়ির তৃতীয় মেয়ে হিসাবে আমাকে "সেজদি" বলে বটে, কিন্তু খুব সমীহর সঙ্গে।

এক-আধ সময় নিজের কাছে নিজেরই কুণ্ঠা আসেনা তা নয়। কিন্তু মনকে শক্ত করে রাখি। কিছুতেই ওদের সঙ্গে মাখামাখি নয়।

পৃথিবীকে বেশী দেখিনি, তবু যেটুকু দেখেছি, তাতেই অনুমান করছি, একদিন যদি কাকাকে ডেকে বলি, "কাকা চা ঢালছি, একটু খাবেন না কি?"

তা'হলে পরদিন থেকে আমার এই ঘরে কাকার মৌরুসীপাট্টা হয়ে যাবে।...আর একান্তে আমায় পেলেই, বিশদ করে বোঝাতে বসবেন, তিনি কত দুঃখী কত অভাবী! আর তারপরই হয়তো হঠাৎ হঠাৎ বলে বসবেন, 'টুনু! গোটা কতক টাকা হবে রে। এ

~ www.amarboi.com ~

হপ্তার রেশনটা তুলতে পারছি না!'

এ সব ছবি আমি যেন দিব্যচক্ষে দেখতে পাই। তাই নিজেকে একেবারে আলাদা রাখি।

তাই সকালবেলা যুদ্ধরত দুই প্রতিপক্ষের যদি গলা কাটাকাটি থেকে মাথা ফাটাফাটি, অথবা কথা কাটাকাটি থেকে গলা কাটাকাটির অবস্থাও ঘটে, আমি উঁকি মারি না। আমি তবু ঘরে বসে অনুধাবন করতে চেষ্টা করি আজকের ঘটনাটা কী নিয়ে?

আমি এখানে আসার আগেই ঠিক করে নিয়েছিলাম, এই ভাবেই সম্পর্কশূন্য ভাবে থাকব।...কেন ঠিক করবো না? সভ্যতা সৌজন্য কর্তব্য এ সব কি শুধুই একদিকে?

আমি যে চিরকাল মামার বাড়িতে মানুষ হলাম, কোনোদিন দেখলে তোমরা? যখন ইতিহাসে অনার্স নিয়ে বি-এ পাশ করে বেরোলাম, এম-এ পড়ার কী দারুণ ইচ্ছে ছিল। মা সে-কথা এখানে লেখায় তুমি কাকা, নিজের কাকা সে প্রস্তাব নাকচ করতে কতো-গুলো অজুহাত দেখালে।

জলের কল খারাপ, ঝিয়ের অসুখ, গিন্নীর কোলে কচি, তোমার অফিসে গোলমাল আরো কত কী!

ছেড়ে দিলাম ঝোঁক। উঠে-পড়ে চাকরী খুঁজতে লাগলাম, আর ভাগ্যক্রমে পেয়েও গেলাম। তখনই আমার চিরদিনের নির্বিরোধ ভালমানুষ মা, বলে উঠলেন, কাকার সংসারে গিয়ে ভর্তি হবার দরকার নেই। দেখেছিস তো সেবার? কিন্তু বাপ-ঠাকুর্দার বাড়িটায় একখানা ঘরে থাকবার অধিকার তোর নিশ্চয়ই আছে।...লিখে দিচ্ছি ঠাকুরপোকে সেই কথা। যে ঘরটায় আমি মানে আমরা, শুতাম সেই আলনা দেরাজ টেবিল সবই ছিল, যদি বেচে খেয়ে না থাকে তো আছেও। তুই সেই ঘরে থাকবি আর বাইরে কোথাও খাবার ব্যবস্থা করে নিবি।

অবাক হয়ে গিয়েছিলাম সেদিন মায়ের রোখা কথায়। চিরদিনই তো মাকে উদাসীন মূর্তিতে দেখেছি। তার মানে সেই ঔদাসীন্যের অন্তরালে সঞ্চিত ছিল একটা তীব্র অভিমান। ভাগ্যের উপর, আত্মীয়জনের উপর।

লিখেছিলেন মা সে কথা। কাউকে চাপ দিতে চান না মা, তবে বাড়ির মেয়ে অবশ্যই বাড়িতে থাকতে চাইতে পারে—

আর তার উত্তরে?

আহা। আমার বাবার সহোদর ভাইয়ের সে কী চিঠি! ফ্রেমে বাঁধিয়ে দেয়ালে টাঙিয়ে রাখবার মত। আহত অভিমানে কী দুঃখিত প্রশ্ন, "দৈবাৎ একবার দারুণ অসুবিধার সময় হতভাগ্য হরপ্রসাদ একটা অকর্তব্যের কাজ করে ফেলেছিল বলে কি এতোটাই শাস্তি দেওয়া উচিত হবে তার চিরস্নেহময়ী বৌদির। বৌদি আর হতভাগা হরপ্রসাদ প্রায় একই বয়সী, এটা কি মনে পড়েনি? মনে পড়েনি, সেই বড়দের লুকিয়ে কুলপিওলা ডেকে কুলপি বরফ খাওয়া? সেই চুপি চুপি ছাদে গিয়ে হরপ্রসাদের বৌদিকে ঝাল, মুড়ি, আলু-কাবলি, অবাক জলপান পৌঁছে দেওয়া?...আচ্ছা মনে না থাকুক কেবলমাত্র দয়ামায়ার

~ www.amarboi.com ~

চোখেই দেখুন তিনি, টুনু যদি তার 'নিজের বাড়িতে' থেকে অন্যত্র খেতে যায়, তবে তার কাকা-কাকী সমাজে মুখ দেখাতে পারবে?...পূর্ব অপরাধের যত শাস্তিই দিন বৌদি, অভাগা দ্যাওরটাকে যেন এই সামাজিক দণ্ডের মত কঠিন শাস্তিটা না দেন। এতোই যদি মান-অভিমানের প্রশ্ন থাকে তো টুনু যে টাকাটা খরচ করে বাইরে খাবে ভাবছে, সেটাই ওর কাকীর হাতে ধরে দিয়ে ডাঁটের ওপর থাকুক।"

চিঠিটা পড়ে মা কী হাসিই হেসেছিল।

বলেছিল, এতো উদারতা, তোর চাকরী আর মাইনে শুনে। চিরকেলে স্বার্থপর। তোর বাবা বেঁচে থাকতে সংসারে একটা পয়সা দিতো না। তিনি উদার, তাই আমাদের নিঃসম্বল করে রেখে গেলেন।...ঠাকুরপো আবার সমবয়সী হল কবে? কম করেও ছ-সাত বছরের বড়। দুই ভাই তো পিঠোপিঠি। দু-একদিন হয়তো কিছু কিনেটিনে এনে দিয়েছে। তাও নিজের পয়সায় নয়। আমি নাকি ওর সঙ্গে লুকিয়ে ঝালমুড়ি খেতে গেছলাম!...আর কিছু না।...ঠিক আছে, তাই ভাল, পয়সা দিয়েই থাকবি। যা বলেছে কাকা! আমি লিখে দিচ্ছি—

কাকা যদি ফ্রেমে বাঁধিয়ে রাখার মত এই চিঠিটা না দিতো মাকে, আর মা যদি তার নিজের সারা জীবনের অবরুদ্ধ রাগ অভিমান ক্ষোভের ভারে হঠাৎ ফেটে না পড়তো, তাহলে হয়তো আমি এমন 'নির্লিপ্তের সাধনা' গ্রহণ করবার সংকল্প নিয়ে এখানে এসে ঢুকতাম না। হয়তো স্নেহ ভালবাসা রক্তের সম্পর্ক ইত্যাদি শব্দগুলো সম্পর্কে এমন মোহমুক্ত হতে চেষ্টা করতাম না।

কিন্তু কাকা আমার আসার আগে ওই চিঠিখানি দিয়েছিল। আমিও মনকে ঠিক করে নিয়ে—

তবে সব ঠিকটাই কি সবক্ষেত্রে ঠিক থাকে? লোকে রাখতে দেয় ঠিক? এ বাড়িতে যে আর একটা বেহায়া লোক আছে, তার আচরণ আমার কষ্টে রক্ষিত নির্লিপ্ততার দেয়ালে আঘাত হেনে হেনে আমায় টেনে বার না করে ছাড়তে চায় না।

যতই সংকল্প করি ওর সঙ্গেও দূরত্ব রেখে চলবো, ওর চেষ্টা ব্যর্থ করবো, পেরে ওঠা যায় না।

প্রথমদিন থেকেই ওর এই গায়ে পড়ামি।

নইলে আমি এসেছি আমার ঠাকুরদার বানানো বাড়িতে থাকতে, তুই কোন্ সুবাদে একগাল হেসে বলতে আসিস 'হরপ্রসাদবাবুর নতুন পেয়িং গেস্ট তো? চলুন ওপরে চলুন। রাস্তার সামনের বারান্দা ধারের ঘর।

রাগ সামলানো সোজা?

বললাম, বেশ চড়া গলাতেই বললাম, 'পেয়িং গেস্ট' মানে?

মানে। এই সেরেছে—

বেহায়াটা মাথা চুলকে বলল, 'পেয়িং গেস্টের' মানে? অর্থাৎ ওর বাংলা প্রতিশব্দ?

~ www.amarboi.com ~

তাই তো—আছে কি আদৌ? মানে ব্যাপারটাই তো আমাদের দেশীয় নয়। গেষ্ট মানে তো অতিথি—

খুব রেগে বলেছিলাম, কী বকছেন বাজে বাজে? আপনি এ বাড়ির কে?

সত্যি। 'কে' হতে পারে? কাকার সংসারে আর কারো অস্তিত্বের আভাস তো শুনি নি।

ও হেসে উঠে বলল, আমি? আমিও এ বাড়ির একজন ওইরকম গেষ্ট! তবে আমার পরিচয় এ বাড়ির নীচেরতলার ভাড়াটে। চিরকালীন পরিচয়।

আমি হরপ্রসাদবাবুর ভাইঝি।

বলে গট গট করে উপরে উঠে এসেছিলাম।

ও তবু আমার সঙ্গে সঙ্গে উঠে এসে জানলার একটা ধার চেপে বসে পড়ে বলল, মেসোমশাই অবশ্য আমায় বলেছিলেন, আপনাকে আনতে স্টেশনে যেতে। আমি গেলাম না। ভেবে দেখলাম, আপনি তো আমায় চেনেন না, গুণ্ডা কি জোচ্চোর ভেবে, সঙ্গে আসতে রাজী না হতেও পারেন।

লোকটাকে দেখতে অতি পরিষ্কার, মার্জিত। কিন্তু কথাবার্তা এমন অ-মার্জিত কেন?

বললাম, যাক তবু একটা বুদ্ধিমানের মত কথা ভেবেছিলেন।

ও হো হো করে হেসে উঠল। তার মানে বাকিটা সবই বুদ্ধিহীনের মত?

আমি ঘরটার চারিদিকে তাকিয়ে দেখলাম।

মোটামুটি বেশ গোছানই দেখছি।

খাট, আলমারি, আলনা, আরশি সবই রয়েছে মোটামুটি। পুরনো পুরনো ভারী ভারী অবশ্য। এই হয়তো আমার মার বর্ণিত সেই জিনিস। আমার বাবা-মা এই খাটে শুতেন, ভেবে একটু আবেগ আবেগ ভাব এলো। কিন্তু সামনেই একটা বাজে বাড়তি লোক।

বললাম, আমার তো তাই মনে হচ্ছে। যাক বাড়ির আসল লোকেরা কোথায়?

আসল?

লোকটা অকারণে হেসে উঠে বলল, আপনি আমায় যতই হুট্-আউট করতে চান, আপনার কাকা কিন্তু আমায় খুব ভালবাসেন।

শুনে খুশি হলাম। কিন্তু কোথায় তাঁরা?

এখনি দেখতে পাবেন। যাক আমায় দেখে খুশি হচ্ছেন না মনে হচ্ছে। আপাতত চলে যাচ্ছি, কিন্তু চিরতরে নয়।

কী অদ্ভুত আশ্চর্য লোক বাবা গম্ভীর থাকতে দেবে না।

প্রথমদিন থেকেই এই আচরণ।

তারপর জানতে পারলাম (নিজেই গায়ে পড়ে পড়ে জানিয়েছে) নীচেরতলাটা কাকা ভাড়া দিয়েছেন আমার বাবা মারা যাওয়া এবং আমরা চলে যাবার পরই। ওই ছেলেটা,

~ www.amarboi.com ~

যার নাম সলিল, তখন স্কুলের ছাত্র। মা-বাবা আর সে এসেছিল এখানে। বাবা মারা গেছেন বেশ কিছুদিন। তারপর মা। সেও বছর দুই। তদবধি ও এ বাড়ির রান্নাঘরে ভর্তি হয়ে গেছে।

ব্যাঙ্কে কাজ করে, পুরো বাড়িটার ভাড়া দিয়ে, একখানা ঘরে থাকে। দরকারে লাগে না বলে বাকিটা সব বাড়িওলার ব্যবহারের জন্যে ছেড়ে দিয়ে রেখেছে।...এবং রান্নাঘরের খরচের শেয়ার করে ভাল-ভাবেই। আরো অনেক বোকামির কথাই বলে ফেলেছে ও আমার কাছে।

বাড়িতে যত না কথা, বাসস্ট্যাণ্ডে তার থেকে বেশী। কারণ একই সময় দু-জনকেই অফিসের উদ্দেশ্যে যাত্রা করতে হয় এবং ফেরাটাও প্রায়ই একই সময় হয়ে যায়।

কোনো কোনো দিন বলে, চলুন বাড়ি ঢোকার আগে কোথাও একটু চা খেয়ে নেওয়া যাক। ঢুকে পড়লেই তো আপনি আপনার নিজের মহলে উঠে গিয়ে নিজে চা বানিয়ে খেতে বসবেন। আর অভাগা আমাকে বুলানের বানানো পাঁচন গিলতে হবে।

খুব রাগ ধরে।

বলি, ইচ্ছে করে নিজেকে অভাগা করে রাখা। টেষ্টফুল চা বানিয়ে দেবার লোক নিয়ে এলেই হয় তাড়াতাড়ি।

বলে ওঠে, ইচ্ছে তো বেদম। কিন্তু চা টা টেষ্টফুল হয় কি-না এখনো পর্যন্ত তো পরিচয় পেলাম না।

এই লোক।

এই রকম অভব্য, বেপরোয়া কথাবার্তা। অথচ কথা এড়াতে যায় না।

চায়ের দোকানে নিয়ে না গিয়ে ছাড়ে না।

তা এতো তবু একরকম সহ্য করে যাওয়া যায়, অসহ্য লাগে ওর মাসিমা মেসোমশায় বলে গলে পড়ায়। ওঁদের কোঁদলের মধ্যস্থতা করতে আসায়, শোকে সান্ত্বনা দেবার মত সান্ত্বনা দেবার চেষ্টায়।

এই যে এখন—

ছুটির ভোরের ঝিরঝিরে বৃষ্টির আকাশকে বিদীর্ণ করে দুই কর্তাগিন্নীর বীররসের আলাপ চলছে, নির্ঘাৎ ও এসে থামাতে চেষ্টা করবে।

খুব ভোরে যোগব্যায়াম না কি মাথা মুণ্ডু করে, তাই আসছে না এখনো।

অতএব এনাদের ডায়লগ ক্রমশই হয়ে উঠছে—'উচ্চমানের'। উচ্চরবের।

গৃহকর্তার কণ্ঠস্বর—তুমি কলঘর থেকে বেরোবে কিনা? আর—একমিনিট সময় দিচ্ছি, স্রেফ একমিনিট। না বেরোলে দরজা ভেঙে বার করবো।

এই দৃপ্ত ঘোষণায় গৃহিণীর যে কিছু এসে গেল তা মনে হল না। উত্তর ভেসে এলো, ওরে আমার সময় দেনেওলা জজসাহেব। দরজা ভেঙে টেনে বার করবেন। এই লাশ টেনে বার করবার ভারী ক্ষ্যামতা তালপাতার সেপাইয়ের। যাও যাও নিজের কাজে যাও। দিক্ করতে এসো না।

~ www.amarboi.com ~

নিজের কাজেই আসা হয়েছে। বাড়ির কর্তার দেখা উচিত সংসারের প্রতিটি জিনিস সবাই সমান ভাগে ভোগ্ করবে। তুমি, এই তুমি দু' ঘণ্টা কলঘর দখল করে থাকবে কীসের জন্যে? আর কারুর দরকার নেই।

যাদের দরকার, তারা বুঝবে। সবাই তো এখন নাকে তেল দিয়ে ঘুমচ্ছে। তুমি তাদের হয়ে ওকালতি করতে নাইবার ঘরের দরজায় নাক গলাতে এসেছ কেন? যাও বলছি। আমার দেরী আছে।

এই 'নাকে তেল'এর লক্ষ্যবস্তু যে আমি, তা বুঝতে পারি, মনে মনে হাসি।

গৃহকর্তার আবার হুঙ্কার। ঘুমোয় কী আর সাধে? তোমার এই দখল করে পড়ে থাকার জন্যেই ঘুমোয়। শেষে অফিস যাবার সময় হুড়োহুড়ি—

জেগে জেগে স্বপন দেখছো নাকি? আজ অফিসটা কার আছে শুনি? রবিবার সে খেয়াল নেই! যাও আমার ব্যস্ত করতে না এসে তাড়াতাড়ি বাজার যাও দিকি।

রবিবার যদি তো বাজারের তাড়াটা কী?

না! তাড়া নেই! গড়িয়ে গড়িয়ে দেরী করে তারপর মাছের থলে নাচিয়ে এসে বলবে, বাজারে কিছু মাছ নেই। শুধু এই চারা মাছ দুটো পেলাম!

এবার চাপা গর্জন।

তা কী করা হবে শুনি? এই রাবণের গুষ্টির জন্যে মুর্গী-মটন আনতে হবে?

উত্তর কিন্তু চিলকণ্ঠে, তা 'রাবণের গুষ্টি' জোগাড় করতে বলেছিল কে? নিত্যি নতুন আপদ বালাই এনে হেঁসেলে ভর্তি করা হচ্ছে।...আমি পারবোনা এই বিরিঙ্গির গুষ্টির ভাত রাঁধতে এই বলে দিচ্ছি।

ওঃ। পারবেন না। বেগম জাহানারা এলেন। পারবে না তো—আচ্ছা ঠিক আছে। এই চললাম বাজারে। আনব না চারা চুনোমাছ। মাংস কাটা পোনা হাঁসের ডিম নিয়ে আসছি। দেখি ক'দিন চালাতে পারো।

এই খবরদার বলছি। ভূত ভোজন করাতে আর মাংস কাটা পোনা আনতে হবে না—

এইসব পরস্পরবিরোধী কথায় ক্রমশই হাসি পাওয়ার বদলে রাগ আসছিল। যদিও এইসব ইঙ্গিত নতুন নয়। যখন তখনই দেয়ালকে শুনিয়ে উচ্চারিত হয় এমন সব কথা—যার অর্থ খেটে খেটে হাড়কালি হলো, ভারী ভারী ভাতের হাঁড়ি নামাতে নামাতে বুকে ব্যথা হল। যিনি সংসারে আপদ-বালাই জোটাতে ওস্তাদ, তিনি তো তাকিয়েও দেখেন না, লোকে কেমন পায়ের ওপর পা দিয়ে বাড়া ভাতটি পাচ্ছে। একটা জোয়ান ছেলে, বাজারটুকু এনে দিতে পারে না? অ্যাঁ! আর আর একজনতো কুটোটি ভেঙে দুটোটি করতে জানেন না। এবার মরে মা লক্ষ্মী হবো, এম-এ বি-এ পাশ করবো, আপিসের বাবু হবো—

ছড়িয়ে ছিটিয়ে টুকরো টুকরো ভাবে আসেই এসব কথা কানে। গ্রাহ্য করি না। কিন্তু ক্রমশই মনে হচ্ছে একটা লেডিজ হোস্টেলে ঠিক করে চলেই যাই। ঠাকুরদার বাড়ির

~ www.amarboi.com ~

ইট দখল করে থাকবার আর দরকার নেই আমার।

আরো রাগ হয় সেই 'জোয়ান ছেলে' নামক লোকটাও এগুলো শুনে অম্লান মুখে এদের রান্নাঘরে খেতে আসে। ভগবান জানে কি দেয়-না-দেয়। তবে বাড়িটার দখল ছেড়ে দিয়েও পুরো ভাড়া দেয় এটা তো জানতেই পেরে গেছি।

নীচের তলার তিনখানা ঘর একটা দালান ইত্যাদির মধ্যে একটা মাত্র ছোট ঘরে থাকে সলিল নামের বুদ্ধু বোকাটা। মাঝে মাঝে ধিক্কার দিতেও তো ছাড়ি না। বলি তো—কোন্ লজ্জায় ওই ভাত অম্লান মুখে খান আপনি? আপনার তো আর অন্যত্র খেলে শ্রীহরপ্রসাদ ঘোষকে সামাজিক শাস্তি দেওয়ার দোষ ঘটবে না।...যান যান কাল থেকে একটা মেসে গিয়ে উঠুন না। একখানা ঘরে পড়ে থেকে পুরো বাড়ির ভাড়া দিচ্ছেন, পুরো দাম দিয়ে 'আপদ-বালাই' হয়ে দু' মুঠো ভাত খাচ্ছেন, আপনি বুদ্ধু না ভুতুম।

তবু লজ্জা পায় না।

চেষ্টাও করে না মেসে যাবার।

বরং এদের সঙ্গে যেন গায়ে মেখে থাকে।

এই যে—

এক্ষুণি শুনতে পাচ্ছি—কী মাসিমা? আপনাদের প্রভাত সঙ্গীত শেষ হলো? উঃ। মাথাও ধরে না আপনার?

মাসীমা বোধ করি এখন ভিজে কাপড়ে খপখপিয়ে বেরিয়ে এসেছেন। বলে উঠলেন, তা আমায় বলতে এসেছ কেন বাছা! ঝগড়াটা যে বাঁধাতে আসে তাকে বলতে পার না?

আহা আপনারাই তো বলেন দু' হাত ছাড়া তালি বাজে না। হা হা হা। বেশী চেঁচালে জীবনীশক্তি কমে যায় তা জানেন?

যাক না। গেলেই বাঁচি। মরে আবার নতুন জন্ম নিই...।

নতুন জন্ম? হা হা হা! কী জন্ম পাবেন, জানা আছে তো? কী রে বুলান। চায়ের জল চাপিয়েছিস? না এখনো পেরে উঠিসনি?

জানি বুলান কিছু বলার আগেই বুলান-জননী কিছু একটা কটু ভাষায় মন্তব্য করে বসবেন।

এটা হোটেল নয় যে সব সময় খিদমদগার থাকবে, সেটা ভেবে দেখতে বলবেন।

আর এও জানি ওই বেহায়া হতভাগাটা হা হা করে হেসে বলবে, ওরে বুলান, আগে মাসিমাকে আচ্ছা করে কড়া করে বড় একগেলাস চা দে, তারপর অন্য অভাগাদের।

সর্বদাই তো দেখছি।

অসহ্য। ক্রমেই অসহ্য লাগছে।

একটা আস্ত পুরুষমানুষ এমন নিরুপায়ের ভূমিকায় পড়ে থাকবে! এটা দেখে বরদাস্ত করা যায় না।

ও মেসে না যায়, আমিই একটা হোস্টেল দেখে চলে যাব।

~ www.amarboi.com ~

নিজের স্টাইলে যথারীতি সেরে রাস্তায় বেরোলাম। এখন আকাশ পরিষ্কার।

বাসের রাস্তায় এসেছি। ও মা দেখি ঠিক দাঁড়িয়ে সলিলচন্দ্র।

এ কি ছুটির দিনে অফিসের সময় কোথায় চললেন?

গম্ভীরভাবে বললাম, কোনো একটা লেডিজ হোষ্টেলে সীট পাই কি না দেখতে।

চমকে উঠে বলল। সে কী?

অবাক হচ্ছেন কেন? আগেও তো বলেছি, এতো অশান্তি সহ্য হচ্ছে না আমার।

কী আশ্চর্য! অশান্তি করছেন তো ওঁরা। আপনার কী?

কান থাকলে বুঝতেন আমার কী। না এতো অপমান সহ্য হচ্ছে না আমার। আপনার যে কী করে সহ্য হয়।

আরে অপমান ভাবলেই অপমান। কাক ডাকে কা-কা। ভাবলে কিছুই না।

আপনার মত কচ্ছপের খোলা সকলের গায়ে থাকে না। আমার পক্ষে থাকা অসম্ভব। মাকে লিখেও দিয়েছি।

তাহলে আর কী বলবার আছে? তবু মরুভূমিতে ওয়েশিস্ সদৃশ ছিলেন এতোদিন, সে সুখটাও গেল।

থামুন থামুন। আমার দাদু একটা কথা বলতেন। 'ঘর থাকতে বাবুইভিজে', কথাটার মানে বুঝতে পারতাম না, এখন বুঝছি।

এমনও তো হতে পারে ও প্রবচনটা এখানে খাটছে না।

হতে পারে। আমার কিছু এসে যায় না। আমি সংকল্পে স্থির হয়েছি। আচ্ছা যান।

হ্যাঁ সংকল্পে স্থির হয়েই ছিলাম, আরো হলাম লেডিজ হোষ্টেলের চার্জের অঙ্ক শুনে। মাত্র দুশো দশ টাকা, তার মধ্যে দু'বেলা চা জলখাবার। তাছাড়া একটা ঘর আলো পাখা, ঘর পরিষ্কারের লোক সব ফ্রী!

স্থির সংকল্প আরো স্থির হল আজ কাকার মুখ-ফসকানো একটা কথায়। মানুষকে প্রায় পাথর করে দেওয়া ভাষায় বললো কিনা—সজল ছেলেটিকে তোর কেমন মনে হয় বল তো টুনু?

অবাক হলাম। কেঁপে উঠলাম।

কেমন মনে হওয়া মানে?

মানে জামাই করবার মত কিনা। খুবই ভাল ছেলে কী বলিস? ব্যাঙ্কে চাকুরী করছে। ঘাড়ে কোনো আলাই-বালাই পুষ্যি নেই। বুলানের জন্যে এর থেকে ভাল পাত্র আমি আর কোথায় পাবো বল?

বুলান! স্তম্ভিত হয়ে বলি বয়েসের তফাত বোধহয় গোটা কুড়ি?

আরে না, না। অতো নয়। ও বোধহয় আটাশ-তিরিশ। আর বুলানও কোন্ না চোদ্দ-পনেরো হলো। এখনই বলছি না। আর কিছুদিন যাক—একেবারে চেপে ধরবো।

তবে তো ভালই। বলে সংকল্পে আরো দৃঢ় হলাম।

~ www.amarboi.com ~

হোষ্টেলে সীট ঠিক করে এসে বলা মাত্র আমার অপরাজেয়া কাকীর হঠাৎ যেন বিষবাণ খেয়ে বাকরোধ হয়ে গেল। অতি কষ্টে শুধু উচ্চারণ করতে পারলেন, হোস্টেলে?

ছোট ছেলেমেয়ে তিনটে প্রায় ভয় পাওয়ার মত চোখের সামনে থেকে হাওয়া হয়ে গেল। শুধু দেখালেন আমার কাকা।

হাউ-হাউ করে কাঁদলেন, আমার হাত ধরে আমাকে এ সংকল্প ত্যাগের অনুরোধ জানালেন, বললেন, আমার মার কাছে গিয়ে আর্জি করবেন। বাড়ির মেয়ে, বাড়িতে এসে খুড়ো-খুড়ির ব্যবহারের দোষে টিকতে পারল না, এ জানতে পারলে, লোকে তাঁদের গায়ে ধুলো দেবে, বলে বলে বুক চাপড়ালেন, নিজের মাথায় নিজে কিল মারলেন, এবং পাপিষ্ঠা গৃহকর্ত্রীকে উচিত শাস্তি দেবেন বলে শাসালেন।

এই নারকীয় নাটকীয় দৃশ্য দাঁড়িয়ে দেখা কম শক্ত নয়। থামাবার জন্যে অনেকবার বলতে চেষ্টা করলাম, এসব কথা ভাবছেন কেন? এতো উতলাই বা হচ্ছেন কেন? আজকাল ট্রাম-বাসের অবস্থা তো জানেন? ওখান থেকে অফিস যাবার সুবিধে হবে। কিন্তু কে শোনে কার কথা।

অবশেষে বললাম, লোকের কাছে না হয় বলবেন, অফিস থেকে কলকাতার বাইরে বদলী করে দিয়েছে।

শুনে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, পাড়ায় মুখ রাখতে, তাই একটা কিছু বলতে হবে।

যদিও বুঝছি সবটাই অভিনয়, তবু মনটা একটু বিচলিত হল বৈ-কি। বিশেষ করে ছোট তিনটের কথা ভেবে। ওরা বোধহয় অপ্রত্যাশিত আহত হয়েছে।

আর মহিলাটি?

শুনতে পাচ্ছি রান্নাঘরের ঘরের মধ্যে মেয়েদের কাছে চাপা গর্জন করছেন, হবে না কেন সাহস? নিজের রোজগারের পয়সা, পায়ের তলায় মাটি। পৃথিবীও তেমনি হয়েছে আজকাল, মেয়েমানুষকে স্বাধীনতা দেবার জন্য দিকে দিকে হাজারো সুবিধে করে দিয়েছে। মুখ্যু মেয়েমানুষের গলায় দড়ি। তার খাটুনি, ভস্মে ঘি।

অসম্ভব রকমের কথা জানেন মহিলা।

এই কিছুদিনে কত কথাই যে শিখলাম।

এসব ঘটনা যখন ঘটছিল, তখন সেই বুদ্ধুটা বাড়ি ছিল না। মিছিমিছি 'নিরুপায় আশ্রিতের' ভূমিকায় পড়ে থাকা লোকটাকে আমি মনে মনে বুদ্ধু ছাড়া আর কিছু বলি না।

ফিরল তখন, যখন ট্যাক্সির জন্যে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছি। কাকা আমার চলে যাওয়ার দৃশ্য চোখে দেখতে পারবে না বলে, বলে কয়ে বেরিয়ে গেছে।

~ www.amarboi.com ~

ও এসে থমকে দাড়াল।

কী ব্যাপার।

সংক্ষেপে জানালাম ঘটনাটা।

বিশদ বলবার প্রয়োজন ছিল না। অনেকবারই বলেছি ওর কাছে, এভাবে বাক্যজ্বালা সয়ে থাকা যায় না। তাছাড়া থাকবোই বা কেন?

তবু ও থমকে গেল।

বলল, সত্যিই চলে যাচ্ছেন?

বললাম, আমি যা করি সত্যিই করি।

আমি কিন্তু ভাবতে পারিনি সত্যি। মেসোমশাই নিশ্চয়ই খুব ইয়ে হয়েছেন?

আমি ব্যাপারটাকে লঘু করবার জন্যে একটু হেসে উঠে বললাম, তা বেশ একটু। একটা দারুণ নাটকীয় দৃশ্য মিস করলেন।

নাটকীয় দৃশ্য?

হ্যাঁ, ভাইঝির বিচ্ছেদের আশংকায় কাকার দুরন্ত শোকের দৃশ্য।

ভেবেছিলাম হেসে উঠবে।

হাসল না। গভীর পরিতাপের মত একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, হাসছেন আপনি। আমার কিন্তু ওঁর জন্যে খুব দুঃখ হচ্ছে। আসলে শোকের মতই হলো। জানেন তো অবস্থা। কী বা চাকরী, কী বা মাইনে! নিজের বাড়িটা আছে তাই।

সত্যি বলতে একটু থতমত খেয়ে গেলাম। অতএব হালকাভাবে বললাম, তা আমার জন্যে আর অবস্থার তারতম্য কী হচ্ছিল? মহারাণীর স্টাইলে কিছু না খেটে খেয়েছি থেকেছি।

ও একটু বিষণ্ণ হাসি হাসল।

তেমনিভাবেই বলল, তা নয় মোটেই। আসল ভরসা তো ছিল ওঁর বাড়ির এক তলাটার বাড়িভাড়া, আর সেই পেয়িংগেস্ট ভাড়াটেটার মান্থলি কনট্রিবিউশানটা। সেটা কতই আর? খুবই টানাটানি। তবু আপনি আসায় আপনার অবদানে একটু সুবিধের মুখ দেখেছিলেন।

আবার একটা নিঃশ্বাস ফেলল।

শুনে লজ্জায় মাথা কাটা গেল।

একটা নিষ্পর ব্যক্তি এভাবে ভেবেছে। আমি তো ঠিক এভাবে ভাবিনি। আমি ভেবেছি—এই সামান্য খাওয়া-দাওয়া, একটা মানুষের পক্ষে যথেষ্ট দিচ্ছি, একটি কথা বলার অধিকার থাকার কথা নয়।

তাই পরিস্থিতি হালকা করতে চেষ্টা করি, না, না, ওঁর আরো নেশা আছে। রেসের বইটই নাড়েন দেখি।

সে তো মায়ামরীচিকা। স্রেফ একটা 'জীবনে ব্যর্থ' লোক। অথচ মজা এই সারা জীবনই নানাবিধ প্যাঁচ কষলেন, চালাকি খাটাবার চেষ্টা করলেন, ওয়ান পাইস ফাদার-

~ www.amarboi.com ~

মাদার করলেন। তবু—

এসব জেনেও আপনার মায়া আসে?

জেনেই তো বেশী মায়া আসে।

আশ্চর্য।

শ্রেষ্ঠ অবোধের চিরন্তন উদাহরণে গাছের যে ডালে বসে আছেন সেই ডালেই কোপ দিয়ে চলেছেন। এতে রাগ আসে, না করুণা আসে? আমার বিশ্বাস ছিল আপনারও হয়তো লজ্জায় মরে যেতে ইচ্ছে করছে।

তবু মুখ রক্ষা করতে বলি, আপনার মত মহৎ মহান সবাই যদি না হতে পারে?

ও আমার দিকে তাকাল।

আস্তে বলল, এরকম ক্ষেত্রে মহৎ মহান হবার জন্যে কতটুকুই বা কী লাগে? শুধু তুলোর গদার আক্রমনটাকে একটু ইগ্‌নোর করতে পারার ধৈর্য্য। দেখতেন ক্রমশই গা-সহা হয়ে যেত, দিব্যি আনন্দেই থাকতেন।

নিজেকে সামলে বলি, সেটা অবশ্য আপনাকে দেখে বোঝাই যায়।

যায়?

যায় বৈকি!

এখন হঠাৎ কেমন একটা অপদস্থ অপদস্থ ভাব এসে গেল। রেগে রেগে বললাম, সর্বক্ষণ তো আহ্লাদের সাগরে ভাসছেন দেখি।

ও এতোক্ষণে একটু হাসল।

বলল, কিছুদিন যাবৎ আহ্লাদের মহাসমুদ্রে ভাসছিলাম। মানে শূন্যে একটা সোনার প্রাসাদ বানাতে বসেছিলাম কিনা।

...এই আপনার ট্যাক্সি এসে গেল। এই ট্যাক্সি—

আশ্চর্য। অন্য সময় কতো দাঁড়াতে হয় ট্যাক্সির জন্যে।

কিন্তু যদিই বা, আরো অনেক অনেক দেরী করেই আসতো। কী করতাম? কী করে উঠতে পারতাম?

ফিরে গিয়ে বাঁধা বিছানা খুলে ফেলে আবার বিছিয়ে নিতাম? গোছানো সুটকেশ ছড়িয়ে ফেলতাম? যা হতে পারে না, হওয়া অসম্ভব তা ভেবে আর লাভ কী? সকলের উপর আত্মমর্যাদা।

ট্যাক্সিটা সামনে এসে দাঁড়াল।

মিটারটা নামিয়ে দিল।

~ www.amarboi.com ~

ঈর্ষা

সুজাতার ঘরের বড় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সুমন্ত একটা ছোট্ট চিরুণী দিয়ে জোরে চুল আঁচড়াচ্ছিল, অথবা বলা যায় আঁচড়েই চলছিল। কারণ তার মাথায় চুলের যা চাপ, তাতে দাঁত বসাবার মত দাঁত ওই ক্ষুদে চিরুণীটার নেই। গায়ে হাত বুলোনোর মত ভেসে যাচ্ছিল সুমন্তর প্রবল চেষ্টাতেও।

সুজাতা মোমবাতি নিতে ঘরে ঢুকে, ছেলের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, ওটা কি হচ্ছে? চিরুণীটা ভেঙে যাবে যে? তোর চুলে ওই চিরুণী!

সুমন্ত একইভাবে হাত চালাতে চালাতে অগ্রাহ্যের গলায় বলল, তোমার চিরুণী নেওয়া হয়নি।

সুজাতা ভুরু কুঁচকে বলল, চমৎকার! খুব 'ম্যানার্স শেখা হচ্ছে।

সুমন্তদের স্কুলে 'ম্যানার্স' সম্পর্কে বিশেষ নজর রাখার ব্যবস্থা আছে এবং সুমন্ত না কি তাতে একটা সার্টিফিকেটও পেয়েছে। কিন্তু স্কুলের ব্যবহার স্কুলে, তাকে বাড়িতেও নিয়ে আসতে হলে পেরে উঠবে কেন? হাত পা খোলাবার জন্যে খেলামাঠের দরকার হয় না?

সুমন্ত মায়ের থেকেও অধিকভাবে ভুরুজোড়া কুঁচকে একবার মার মুখের দিকে তাকাল। কোনো কথা বলল না। আবার একই কাজ করতে লাগল। আজকাল এই এক বাহাদুরী হয়েছে সুমন্তর, ক্লাশ ইলেভেন-এ উঠে পর্য্যন্তই বোধহয় হয়েছে, ইচ্ছে করে মা-বাপকে অগ্রাহ্য দেখানো। বাহাদুরী ছাড়া আর কি? তবে বাবা বলে, তুমি আর শাক দিয়ে মাছ ঢেকো না সুজাতা! বাহাদুরী নয় লায়েক হাওয়া। দেখো তোমার ওই ছেলে ক'দিন পরেই কী মূর্তি ধরে।...

এরকম সময় 'তোমার ছেলে' বলাই বিধি।

সুজাতা অবশ্য বাহাদুরী বলেই ধরে আছে এখনো। নতুন বড়ো হওয়ার সুখে এটা একটা নতুন সখ। এই আর কি! তবু ছেলের ওই ভুরু কোঁচকানো দেখে রাগে গা জ্বলে গেল। এবং মাতৃঅধিকারের শক্তিটা কাজে লাগাতেই বোধহয় জোরে জোরে বলল, বেরোচ্ছিস কোথায়?

বেরোচ্ছে, এটা সাজ সঙ্গতেই বোঝা যাচ্ছে।

সুমন্ত তখন চিরুণীখানা প্যান্টের হিপ্ পকেটে পুরে ফেলে ধীরে-সুস্থে বলল, কোনো একদিকে নিশ্চয়ই। কেন, কিছু আনতে হবে?

কিছু আনার ব্যাপারে অবশ্য সুমন্ত এখনো একপায়ে খাড়া। আট-দশ বছর বয়েস থেকে হরদম ছেলেকে দোকানে পাঠিয়ে তার এই নেশাটি ধরিয়ে দিয়েছে সুজাতা।

~ www.amarboi.com ~

সুজাতা কঠিন গলায় বলল, না! কিছু আনতে হবে না, জানতে হবে।

কী জানতে হবে?

এই সন্ধ্যের মুখে, লোডশেডিঙের মধ্যে যাচ্ছিস কোথায় সেটাই জানতে হবে।

কেন? আমি কি হাজতের আসামী: তাই এক পা বেরোলেই বলে যেতে হবে?

বাঃ চমৎকার! ক্রমশঃই বেশ বোলচাল শেখা হচ্ছে। তোর বাবা এখনো কোথাও বেরোলে বলে বেরোয় দেখিসনা?

স্রেফ্ স্লেভ্ মেন্টালিটি। বলে সুমন্ত সিঁড়ি দিয়ে নেমে যায় তরতরিয়ে।

কিন্তু মায়ের মত জাতবেহায়া আর কে আছে? তাই সুজাতাও সঙ্গে সঙ্গে নেমে যায় দু'চার সিঁড়ি। চেঁচিয়ে বলে বেশী দেরী করবিনা কিন্তু! আকাশটা দ্যাখ। দারুণ বৃষ্টি আসছে।

কথার জবাব অবশ্য পায়না সুজাতা।

ঘুরে এসে রাস্তার দিকের বারান্দাটায় সুজাতা দাঁড়ায়। তরতরিয়ে হেঁটে যাচ্ছে সুমন্ত, নেহাৎ 'ছেলে' বলেই বুঝতে পারছে, নইলে দেখার কথা নয়। সত্যিই আকাশ কালো মেঘে ঢেকে গেছে। তার সঙ্গে চন্দ্র-সূর্যের অমোঘ নিয়মের মত লোডশেডিঙের অবদানতো আছেই। তবু হাঁটার ওই পরিচিত ভঙ্গিটা থেকেই হঠাৎ আবিষ্কার করে বসে সুজাতা ওর গতিভঙ্গিটা ঠিক ওর বাপের মত গঠনভঙ্গিও। এই বয়সেই বাপের মতো লম্বা হয়ে উঠেছে। অর্থাৎ পুরো দৈর্ঘ্যটাই এসে গেছে ওর এখনই।...এই তো ক'টা মাস হলো ক্লাশ নাইন পার করেছে। বড় তাড়াতাড়ি বড় হয়ে গেল ছেলেটা।

ঘরে চলে এসে জানলা-টানলাগুলো বন্ধ করতে করতে ভাবলো সুজাতা, বাপের মত আকৃতি পাচ্ছে। এই প্রকৃতিটা তো পাচ্ছেনা?

শ্রীমন্তর মধ্যে কতো শান্ত সভ্য নির্বিরোধী ভাব। কাউকে উঁচু কথাটি বলতে জানেনা। এই তো নতুন বাহাদুরীতে ছেলে তো শুধু মাকে কেন, বাপকেও 'ডোন্টকেয়ার' ভাব দেখিয়ে মজা পায়। সুজাতার ভয় হয় ফট্ করে না ধাড়ি ছেলের গালে একটা চড় কসিয়ে দেয় শ্রীমন্ত, কিন্তু তেমন ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটে না। বড়জোর স্বগতঃ মন্তব্য করে কিছু। মন্তব্য করে সরে যায়, 'ভাল! ভাল! শিক্ষাদীক্ষা ভালই হচ্ছে। ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল তো—'

এই ব্যঙ্গটুকু অবশ্য সুজাতার উদ্দেশ্যে।

চারবছর বয়েসে ছেলেকে পাড়ার স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিল শ্রীমন্ত, যে স্কুলে নিজে পড়ে বড় হয়েছে। তখনতো শ্রীমন্তর মা দিব্যি ডাঁটো।...'পাড়ার ইস্কুল' বলে সুজাতা একটু খুঁৎ খুঁৎ করায় সতেজে বলেছিলেন, কেন? ওই পাড়ার ইস্কুলে পড়ে কি মন্তু আমার 'অমানুষ' হয়েছে?' তোমার ছেলে যদি আমার ছেলের মত হয়, তা হলেই বর্তে যেও বাছা।

তবু দু'বছর পর থেকেই সুজাতা 'ইংলিশ মিডিয়াম, ইংলিশ মিডিয়াম' বলে এমন অস্থির হলো, শাশুড়ী নিজেই বললেন, 'তবে দে বাবা, ছেলেকে সাহেবের ইস্কুলে ভর্তি করে দে। বৌমার যখন এতো ভয় ভাবনা, বাংলা ইস্কুলে পড়লে ছেলে বিলেত যেতে

~ www.amarboi.com ~

পারবে না, দিল্লী বম্বের চাকরী পাবেনা।—শেষে আবার হয়তো তোকে দূষবে, মা বুড়ীর প্ররোচনায় পড়ে ছেলেটার পরকাল খেয়ে রেখেছো তুমি।

চোস্ত সতেজ কথাবার্তা ছিল মহিলার।

হয়তো সেইজন্যেই শ্রীমন্তর স্বভাবটা এতো শান্ত শান্ত। বলতে গেলে মায়ের আওতাতেই তো জীবনটা কাটলো। মহিলা মারা গেছেন তো এই সেদিন। যখন সুমন্ত বেশ বড় হয়ে গেছে। আড়ালে মায়েতে ছেলেতে শ্রীমন্তর 'মাতৃভক্তির' প্রাবল্য নিয়ে হাসাহাসি করেছে। সুজাতা বলতো, ঠাকুমা বলেছেন? ও বাবা! মাতৃভক্ত বিদ্যাসাগর ওর আর নড়চড় করতে পারেন?

সুমন্ত হাসতো হি হি করে।

আবার মায়ের অসুখের সময় শ্রীমন্তর অস্থিরতা দেখে চিন্তাও প্রকাশ করেছে, মা-বাপ তো মানুষের চিরদিন থাকে না। ঠাকুমা গেলে তোর বাবা যে কী করবে!

কিন্তু আশ্চর্য! মায়ের মৃত্যুর পর কোনো অধীরতা দেখা গেল না শ্রীমন্তর মধ্যে। বরং আরো বেশী শান্ত হয়ে গেল। পরিবর্তনের মধ্যে, সাতজন্মে পুজোপাঠ সন্ধ্যা গায়ত্রীর দিক দিয়ে যেত না, সেটাই হয়েছে। অবশ্য মায়ের ঠাকুরঘরের দুর্দ্দশা দেখতে পারবে না বলেই।

অশৌচান্তর পর থেকেই শ্রীমন্ত সকাল-সন্ধ্যে দু'বেলা মায়েরই পুরনো একখানা গরদের থান জড়িয়ে উঠে যায় তিনতলায় মায়ের ঠাকুর ঘরে। কী করে না করে সুজাতা দেখতে যায় না, তবে সকালে পুজো করে নেমে আসা শাশুড়ীর কপালে যেমন ছোট্ট একটি চন্দনের টিপ দেখতে পেতো, তেমনি ছোট্ট একটি টিপ্ শ্রীমন্তর কপালেও দেখতে পায়। ভাত খেতে বসেও রয়ে যায় সেটা, অফিস যাবার সময় মুছে ফেলে।

সুমন্ত এক একদিন হেসে হেসে বলে, বাবা নির্ঘাৎ একদিন বোষ্টম হয়ে যাবে মা, দেখো তুমি।

সুজাতা তো ছেলের কথায় সায় দেবেই, ছেলেকে নিজের পক্ষে না রাখতে পারলে পৃষ্ঠবল কোথায়? শ্রীমন্তকে তো কোনদিনই ঠিক 'নিজপক্ষ' করে তুলতে পারেনি। মরে গিয়েও যেন ছেলের জীবনের বেশ খানিকটা নিজের দখলে রেখে দিয়েছেন সেই পরলোকগতা। অথচ কী বুদ্ধিসুদ্ধিহীন গ্রাম্য মহিলাই ছিলেন! আশ্চর্যই লাগে। শ্রীমন্তকে তো বুড়ো বয়েস পর্যন্ত বকে 'ধুড়ধুড়ি' নেড়ে দিতেন।' (এটি তারই ভাষা) পান থেকে চুণ খসলে রক্ষে রাখতেন না।

শ্রীমন্তর ছোটবোন খুকুর শ্বশুরবাড়ি ভবানীপুরে। এই ঢাকুরিয়ার বাড়ি থেকে নেহাৎ কম দূর নয়, তবু প্রতি সপ্তাহে বোনকে দেখতে যাওয়া চাইই চাই। কোনো কারণে একটা সপ্তাহ বাদ গেলেই মহিলা অনায়াসে বলতেন, তোর যে একটা বাপমরা ছোটবোন আছে সেটা বোধহয় এবার ভুলতে চেষ্টা করছিল মন্তা?

আর আশ্চর্য, শ্রীমন্ত রেগে দু'কথা শুনিয়ে দেওয়ার বদলে পরদিনই বোনের প্রিয় খাদ্য গড়িয়াহাটার দোকানের ডালমুট আমসত্ত্ব শোন্ পাপড়ি নিয়ে ছুটতো তার কাছে।

~ www.amarboi.com ~

মাতৃভক্তির পরাকাষ্ঠাতেই বোধহয় এখনো হপ্তায় হপ্তায় 'খুকুর বাড়ি' যাওয়াটি অব্যাহতই আছে। আজই তো যাবার সময় বলে গেছে, খুব সম্ভব খুকুর বাড়ি হয়ে আসবো, দেরী হলে ভেবোনা।'

সুজাতা বলে ফেলেছিল, 'এই তো গেলে সেদিন—'

শ্রীমন্ত কিছু বলেনি, জুতোর ফিতে বেঁধে হাত ধুয়ে চলে গিয়েছে। তা বলে সুজাতার ছেলের মত ভুরুও কোঁচকায়নি।

দেরী হলে ভাবতে বারণ করেছিল শ্রীমন্ত, তবে দেরী করল না। এসেই গেল ঠিক সময়ে। বললো খুব বৃষ্টি আসছে মনে হল, তাই আর নামলাম না, টানা চলে এলাম।

এসেই যথারীতি মায়ের ছেঁড়া গরদ গায়ে জড়িয়ে সবে ঠাকুর ঘরে গিয়ে উঠেছে। আর তখনই নেমে এলো সেই বৃষ্টি যে নাকি এতোক্ষণ 'নামবো নামাবো' করে ভয় বাড়াচ্ছিল।

কিন্তু ভয়ের কী থাকতো যদি সুমন্তও বাড়ি থাকতো। বাড়ির লোকেরা যদি বাইরে না থাকে, বেদম বৃষ্টির মত মজার কী আছে? কিন্তু এখন বাড়ির আসল লোকটাইতো বাইরে।

এখন ক্রমশঃ যত বাজ বিদ্যুৎ আর মেঘের দাপট বাড়ছে, ততই সুজাতার প্রাণের মধ্যে হু হু করছে। আর আপন মনে ছেলের উদ্দেশ্যে বলে চলেছে—পাজী হতভাগা ছেলে! এতো করে বললাম, শোনা হল না কথা! কোথায় গিয়ে পড়েছিস্, কী ভাবে ভিজে ঢোল হয়ে ফিরবি ভগবান জানেন। দেখতেই লম্বা হয়েছে, আর মনে করছো মস্ত নায়েক হয়েছি। আসলে তো পট্‌কা। সে হুঁস আছে? এক্ষুনি কাসতে শুরু করবি।

আপন মনে অনুপস্থিত ছেলেকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে বকেই চলে সুজাতা। সামনা সামনি তো একটা কথা বলার সাহস নেই।

বৃষ্টি কমবার নাম নেই। বরং বাজ বিদ্যুতের সমারোহ বাড়ছে। আশ্চর্য শ্রীমন্ত দিব্যি নিশ্চিন্ত মনে 'টঙে' চড়ে বসে আছে।

একবার বুক দুরদুর করছে না, কোথায় কী ঘটছে ভেবে। সুজাতার তো মনে হচ্ছে এটা প্রলয়ের সূচনা। ভাবল ছুটে ঠাকুরঘরে উঠে গিয়ে বলে, তুমি কী মানুষ না পাথর? যেতে হলনা। যথাসময়েই নেমে এল শ্রীমন্ত। থান গরদ ছেড়ে সুতি ধুতি পরে চায়ের টেবিলে এসে বলল, বাবু বুঝি এখনো ফেরেননি?

সুজাতা ক্ষুব্ধ উত্তেজিত গলায় বলে ওঠে, দেখোনা, এতো করে বললাম, ভীষণ মেঘ করেছে, দেরী করিসনি,—তবু এইটুকু ছেলে, এতো কিসের আড্ডা! তুমিও তো কিছু বলনা। মায়ের শত কথায় কাজ হয়না, বাপ একটা ধমক দিলে—কাজ হয়।

ধমক?

শ্রীমন্ত চায়ের কাপটাই কপালে ঠেকিয়ে নমস্কারের ভঙ্গি করে বলে তোমার ওই 'হীরো' ছেলেকে আমি দেব ধমক?

বলে নিশ্চিন্তভাবে চায়ের কাপে চুমুক দিতে থাকে।

~ www.amarboi.com ~

কড়কড় করে আবার বাজের শব্দ!

সুজাতা অস্থির হয়ে জানলা খুলে দেখতে যায়, শ্রীমন্ত বলে, ওটা কী হচ্ছে? ঘর যে ভেসে যাবে।

খুব নিশ্চিন্দি মানুষ বাবা। ছেলেটা কোথায় কী করছে—

কী আশ্চর্য! পাগলতো নয় যে এই সময় রাস্তায় থাকবে। আছেই কোথাও বন্ধুর বাড়ি-টাড়ি। আটকে পড়েছে। এতো ভাবনা করছো কেন?

একথায় আবার রাগ এসে যায় সুজাতার। মনে হয়, খুব একটা বিপদে পড়ে ভিজে নেয়ে বাড়ি আসে সুমন্ত, তবে জব্দ হয় লোকটা।...আর তা যদি না হয়, তো আজ ছেলেকেই সুজাতা দেখে নেবে একহাত। ওইটুকু ছেলেকে এতো ভয়ই বা পাবো কেন আমি?...মনে দুঃখ পাবে বলেই না কিছু বলিনা। রাত বাড়তে বাড়তে ক্রমে বৃষ্টি কমে। থামে মেঘের ডাক, বাজের ডাক, বিদ্যুৎ চমকানি। ঝিরিঝিরি বৃষ্টি, যেন জেরটা বজায় রাখতে চেষ্টা করে।

অতঃপর বাড়ি ফেরে সুমন্ত। ফেরে একখানা রিকশা করে।

কোথায় ছিলি এতোক্ষণ?

কোথাও না, এই ঢাকুরিয়ার মধ্যেই, সুধাময়দের বাড়ি।

সুজাতা এতোক্ষণ মনে মনে ভাঁজছিল ছেলে যদি শুকনো গায়ে মাথায় ফেরে তো দেখে নেবে তাকে। কিন্তু কি করে নেবে দেখে? কোন কথার পিঠে? ছেলে যদি বলে, তা' তুমি যদি ভাবতে বসো আমি বাজ পড়ে মারা গেছি, তা কষ্ট তো পাবেই! আমি কি কচি খোকা যে, তুমি একেবারে অস্থির হয়ে উঠলে?

সুজাতা ভারী মুখে বলে, অস্থির কী সাধে হই? কচিখোকা নও বুঝলাম ধাতটি তো খোকারই মত। এই যে জোলো হাওয়াটি লাগিয়ে এলি এতোক্ষণ, রাতেই কাসতে শুরু করবি। বলছিসতো ভিজিসনি, কই দেখি মাথাটা! যা চুলের রাশ—মুছে দিই ঘসে।

সুজাতা ছেলের মাথায় হাত দিয়ে দেখতে আসে, এক ঝটকায় মার হাতটা ঠেলে দিয়ে বলে ওঠে সুমন্ত, আঃ! ভেবেছ কি তুমি? বাড়াবাড়ির একটা সীমা আছে, বুঝলে?

নিজেই তোয়ালে দিয়ে ঘসে ঘসে মাথাটা মুছে নিয়ে জামা বদলে শুয়ে পড়ে গিয়ে।...সুজাতা স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকে।

শ্রীমন্ত ওর ঘরের দরজায় এসে একটু হেসে বলে, কী রে? মার ওপর রাগ করে না খেয়ে শুয়ে পড়লি?

রাগ আবার কী!

সুমন্ত পাশ ফিরে বলল, সুধাময়ের মা ছাড়লেন না, জোর করে ওদের সঙ্গে খিচুড়ি বেগুনী ডিমভাজা খাইয়ে দিলেন।

ওঃ তাহলে তো আজ তোর মজার দিন গেল।

শুনলে তো?

~ www.amarboi.com ~

শ্রীমন্ত বলে উঠল, বন্ধুর বাড়ি খিচুড়ি বেগুনী ডিমভাজা—যাক বেচারী আমরা আমাদের রুটি তরকারি নিয়ে বসিগে। যথেষ্ট রাত হয়ে গেছে।

এখন আর লোডশেডিং নেই। দালানের দুটো আলোই জ্বালা। খাবার টেবিলের সামনে দেওয়ালে শ্রীমন্তর মার যে মস্ত ফটোখানা টাঙানো রয়েছে, তার উপর আলো এসে পড়েছে...খেতে বসে শ্রীমন্ত যথা নিয়মে আগে সেই ছবির দিকে নীরব প্রণামের ভঙ্গিতে একটু চোখ ফেলে খাবারে হাত দেয়। আর কেন কে জানে সেই মুহূর্তে ভয়ানক একটা জ্বালায় সুজাতার ভিতরটা তোলপাড় করে দু'ঝলক গরমজল এসে যায় দুচোখের কোলে।

ওই অতি সাধারণ প্রায় অশিক্ষিত গ্রাম্যচেহারার মহিলাটির উপর ভয়ানক একটা ঈর্ষা অনুভব করে সুজাতা!

~ www.amarboi.com ~

স্বর্গ-মর্ত্য

স্বর্গরাজ্যে কারো কোনো আক্ষেপ নেই, মানুষের এ ধারণাটা ভুল। আছে বৈকি। আক্ষেপ আছে, অভিযোগ আছে, ক্রন্দন আছে, সবই আছে। আক্ষেপ নারায়ণের লক্ষ্মীর আছে, মহাদেবের দুর্গার আছে, এমন কি ইন্দ্রের ইন্দ্রাণীরও আছে। স্ত্রীজাতি থাকলেই এগুলিও থাকবে।

'আক্ষেপ অভিযোগ ক্রন্দন, এই তিন রমণীর লক্ষণ!' স্বর্গেও এর ব্যতিক্রম নেই।

অতএব শচীদেবী যখন ইন্দ্রের কাছে এসে ঝঙ্কার দিয়ে বললেন, 'স্বর্গ সাম্রাজ্যের সম্রাজ্ঞী' বলে তো অনেক নামডাক, অথচ ইন্দ্র খুব বেশী অবাক হলেন না।

ইন্দ্র শুধু গোঁফে 'তা' দিয়ে বললেন, 'আ ছি ছি শচী, মর্ত্যভূমি কি একটা দ্রষ্টব্য স্থান? মর্ত্যটা যে নরকাসুরের মাসির বাড়ি, সেটা ভুলে গেল নাকি?'

শচী অবশ্য এতে দমলেন না, তীব্র প্রতিবাদে বললেন, 'আর এই যে দেবী ভগবতী বছর বছর যাচ্ছেন? তার বেলা?'

ইন্দ্র প্রমাদ গণলেন।

ফট্ করে একখানি কড়া যুক্তি উপস্থাপিত করে বসেছেন শচী!

তবু তিনি তাচ্ছিল্যের ভাব দেখালেন, 'ভগবতী? ভগবতী যান সেটা আলাদা কথা। ভগবতীর ওটা পিত্রালয়। আর নারীজাতির কাছে পিত্রালয় যে স্বর্গাপেক্ষা মনোরম এ আর কে না জানে? তুমিও না জানো তা নয়। কিন্তু মর্ত্যলোকে তোমার কে আছে? কেউ না। তবে?'

শচী গম্ভীর ভাবে বললেন, 'লোকে দেশভ্রমণেও যায়।'

'কিন্তু তার জন্যে ওই হতচ্ছাড়া মর্ত্যলোক কেন? 'ব্রহ্মালোক' রয়েছে, 'গোলোক' রয়েছে, 'সোমলোক'—

'ওসব বুঝি এখনো দেখতে বাকি আছে?' শচী ঝঙ্কার দেন, 'দেখে দেখে তো চোখ পচে গেছে। যেখানে যখন যা ফাংশান হয়, সেখানেই তো তোমার আর আমার নেমন্তন্ন।'

'তাহলেই বোঝো?' ইন্দ্র যুক্তির জাল ফেলেন, 'তোমার এই এতোখানি মান-সম্মান, আর তুমি কিনা বিনা নিমন্ত্রণে—'

'তা হোক!' শচীদেবী সেই জেদের সুরে কথা বলেন, যে জেদ অমোঘের ইশারাবাহী।

'আমি মা ভগবতীর কন্যাতুল্য, সেইরূপ স্নেহও তিনি করেন আমায়, আমি ওঁর সঙ্গেই যাবো।'

'উনি তো তিন দিন ধরে চর্ব্যচোষ্য খাবেন, তোমার কী হবে? হরিমটর? তোমার

~ www.amarboi.com ~

জন্যে তো কেউ নৈবেদ্য সাজাবে না?'

শচীদেবী অমায়িক হাস্যে বলেন, 'তা আমি কি ওঁর সঙ্গে পুজো প্যান্ডেলেই বসে থাকবো? মর্ত্যভূমিটা দেখবো না ঘুরে ঘুরে?'

'সেটা দেখবে আর কী করে? দেবী তো কেবলমাত্র বাংলাদেশেই—'

'ভুল ধারণা তোমার এটা মহারাজ, আমি লক্ষ্মী-সরস্বতীর কাছে সব শুনেছি, বাংলাটাই প্রধান হলেও, আজকাল পৃথিবীর সর্বত্রই দেবীর আবাহন হয়। মানুষ ক্রমশঃই ধার্মিক হয়ে উঠছে সন্দেহ নেই। তবে হ্যাঁ, বাংলাদেশেই বেশী, প্রধানতঃ কলকাতায়।'

শচীদেবী একটু মধুর কটাক্ষে বলেন, 'গণেশের ইঁদুর আমায় চুপিচুপি বলেছে, শুধু কলকাতা দেখলেই পৃথিবী দেখার কাজ হয়।...মানে ওর তো সর্বত্র গতি। পৃথিবী জুড়ে ওর নাতিপুতি, ব্যবসা-বাণিজ্য।...ইঁদুর বলেছে, কলকাতায় রাস্তায় রাস্তায় হোটেল রেস্তোরাঁ, মিষ্টি-মিঠাইয়ের দোকান, তাছাড়া ফুটপাথে ফুটপাথে এমন সব মুখরোচক খাদ্যের সম্ভার সাজানো যে, জীবনেও কোনোদিন আমরা তা অবলোকন করিনি। অতএব ওখানে রান্নাঘরের সঙ্গে সম্পর্ক না রেখেও মানুষ জীবন কাটিয়ে দিতে পারে। আর এ তো তুচ্ছ তিনটে দিন! মুখ বদলে বাঁচবো!'

'ওহো হো শচী, সেই নারকীয় খাদ্য—মানে অখাদ্যগুলো তুমি খাবে?'

শচী এবার ক্রুদ্ধ হলেন, 'দেখো আমি কি করবো না করবো, সেটা তোমায় এখন থেকে ভাবতে হবে না। যা করবো—বুঝেই করবো। আমি নাবালিকা নই।'

ইন্দ্র নীরব হলেন।

বুঝলেন, এরপর কথা বললেই শেষ অস্ত্রটি ধরবেন শচী। আর তারপর? মানতেই হবে হার। অতএব চুপ করে যাওয়াই শ্রেয়। শচী এবার না গিয়ে ছাড়বেন না। কে জানে ভগবতীই নাচিয়েছেন কিনা। অথবা তাঁর ওই মেয়ে দুটি।...তাই বা কী বলবো, ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী হয়েও ওঁর এমন সস্তা রুচি, গণেশের বাহনটার সঙ্গে পর্যন্ত আড্ডা দিতে যান! ঠিক আছে যান না, বুঝুন গিয়ে। বুঝুন গিয়ে পৃথিবীর প্রতীক সেই 'কলিকাতা' নামক স্থানটি কিরূপ।...তাছাড়া—প্রতি বৎসর ওই দেবী ভগবতীর পিত্রালয় যাত্রা প্রস্তুতি শুরু হলেই, শিবঠাকুরটি যাত্রায় বাধা সৃষ্টি করতে পবন বরুণ এবং নন্দী-ভৃঙ্গীর সঙ্গে গুপ্ত পরামর্শ করে ঠিক পূজার প্রাক্‌কালে যা কীর্তিটি করেন! আটকাতে পারেন না, বারে বারেই পরাজিত হয়ে সেই বলদের ল্যাজে মোড়া দিয়ে দেবীর পিছু পিছু ধাওয়া করতে হয়, তবুও এই মিথ্যা চেষ্টা! মাঝখান থেকে শরৎকাল পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই বাংলাদেশের জলে স্থলে প্রত্যক্ষে অন্তরীক্ষে লেগে যায় লাগ ঝমাঝম! ঠিক আছে বুঝুন গিয়ে। তবে একবার ঘুরে আসাও মন্দ নয়, মর্ত্যের মোহটি 'বাপ বাপ' করে ছেড়ে যাবে।

ইন্দ্র অতএব দরাজ গলায় বললেন, 'বেশ যাবে যাও, সব চেয়ে দামী শাড়ী গহনাগুলি পরে সেজেগুজে যাও, যাতে না ওই তিন দেবীর কাছে নিষ্প্রভ হয়ে যাও। ওনারা নিজ নিজ গুণ মহিমাতেই ভাস্বর, তোমার তো শুধু শাড়ী-গহনার জোরেই—'

শচী ভারী মুখে নন্দন হীরকের কণ্ঠহারটি আঁচল দিয়ে পালিশ করতে করতে বলেন,

~ www.amarboi.com ~

'থাক সেটা তোমায় মনে না পড়িয়ে দিলেও চলবে। লাটের লেডিদের যদি সমাজের চূড়োয় স্থান হয়, আমারও হবে। পদস্থ ব্যক্তির স্ত্রী হওয়াই কি একটা মহিমা নয়?'

অতঃপর দেবী ভগবতীর পরিবারের সঙ্গে শচীদেবীও মর্ত্যলোকে যাত্রা করলেন। লক্ষ্মী-সরস্বতীর মুখ পূর্ব অভিজ্ঞতায় মসৃণ। শচীদেবীর মুখে ঔৎসুক্যের প্রবল উত্তেজনা।

ওদিকে ইন্দ্র উদ্বেগ উৎকণ্ঠায় কম্পমান।

ঘড়ি ধরে হিসেব কষছেন পৌঁছলো কিনা। অবতরণ স্থানটি কিরূপ কে জানে! বন্যায় তো চারিদিক ডুবু-ডুবু।

* * *

একটু ঢুলুনি এসেছিল, হঠাৎ আকাশ প্রকম্পিত করে হাজারে হাজারে লাউডস্পীকার একসঙ্গে ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো। ঢাক-ঢোলের বাদ্য কোথায় তলিয়ে গেল, হিন্দী বাংলা মিশ্রিত সেই সঙ্গীতধ্বনি আকাশে উঠে ধাক্কা দিয়ে ইন্দ্রকে জানিয়ে দিল, পূজা শুরু হয়ে গেছে। তার মানে ওঁরা নিরাপদে পৌঁছে গেছেন।

ক্রমশঃই সেই সুরলহরী উত্তাল উদ্দাম উন্মাদ হয়ে উঠে যখন সুরলোকের চাঁদোয়া ভেদ করে ব্রহ্মালোক পর্যন্ত উঠলো, তখন ইন্দ্র রীতিমত নিশ্চিত হয়ে পড়লেন। প্রতি বৎসরই এটি হয়, আর শচী স্বর্গ থেকেই ওই শব্দে নিদারুণ মাথা ধরার কবলে পড়ে শয্যাগত হয়ে পড়েন। এবারে তাহলে কী অবস্থা তাঁর!

ইন্দ্র এখন কী করেন? কী করে শচীদেবীর খোঁজ নেন? ট্রাঙ্ককল যে করবেন, সেটা কোথায়?...

হঠাৎ মেঘ না চাইতেই জল?

ঝনঝনিয়ে বেজে উঠলো টেলিফোনটা।

তারপর শোনা গেল সেই মধুর মোহন কণ্ঠধ্বনি।...'হ্যালো কে? দেবরাজ! ওঃ প্রভু, কেমন আছেন?'

ইন্দ্র উচ্চ চীৎকারে কাতর জিজ্ঞাসা করলেন, 'হ্যালো কে শচী? তুমি ভালো আছো তো?'

শচীদেবীর মধুর সুরেলা হাসি টেলিফোনের এপারে রিনরিনিয়ে উঠলো। 'ওঃ প্রভু, অপূর্ব! অপূর্ব! কী ভালো যে আছি ধারণাই করতে পারবে না তুমি! ভেবে আফশোস হচ্ছে, এতোদিন কেন আসিনি!'

'কিন্তু শচী, ওই দারুণ মাইক সঙ্গীতে তোমার মাথা ধরেনি?'

'মোটেই না। হি হি, একই গান অজস্রবার শুনতে শুনতে বহু গান নিজে থেকেই মুখস্থ হয়ে গেল। গিয়ে তোমায় শোনাবো।...'সখী ও ঘাটেতে জল আনিতে যাবো না যাবো না—'' আহা কী অভূতপূর্ব সুর। তোমাদের স্বর্গীয় সুর শুনতে শুনতে মন যেন বর্ষাকালের দেশলাইয়ের মতো স্যাঁৎস্যাঁতে হয়ে গিয়েছিল। প্রভু তুমি যে কি 'মিস' করলে।'

~ www.amarboi.com ~

'কিন্তু ওখানে তো শুনছি দারুণ অভাব-টভাব?'

'অভাব! কিসের অভাব?'

'সব কিছুরই। মানে অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, ঔষধ, যানবাহন, শৃঙ্খলা, নেতা—সব কিছুই নাকি—'

'বাজে কথা! বিরুদ্ধ পক্ষের অপপ্রচার—', শচী আবার হেসে ওঠেন, 'সব আছে, গাদা-গাদা আছে। তথাকথিত "শিক্ষা" না থাক, নতুন শিক্ষার প্রচারে দেশের ছেলেমেয়ে—'

'কী বললে? তথাকথিত? কথাটার মানে?'

শচী-কণ্ঠে একটু লজ্জিত হাসি ধ্বনিত হলো, 'মানেটা আমিও এখনো খুব ঠিক জানি না, সবাই বলে তাই বলছি। এখানে অনেক এরকম শব্দ চালু আছে, মানেটানে সবাই জানে বলে মনে হয় না। হ্যাঁ আচ্ছা তুমি কেমন আছো বললে না?'

'আমার কথা থাক, কলকাতার হালচালটা কী দেখছো বলো!'

'কলকাতার হালচাল?'

শচী লহরে লহরে হেসে উঠলেন, আর তার মাঝখানেই একটা বুনো গলা হাঁক পড়লো, 'টাইম ওভার—'

ইন্দ্র সধমকে বললেন, 'এক্সট্রা চার্জ, কনটিনিউ প্লীজ...ওঃ, হ্যাঁ কী বলো?'

'বলছি, বলছি কলকাতায় বুঝলে, হি হি, "হাল" এবং "চালের" মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ। গিয়ে সব বলবো। কিন্তু প্রভু, রাগ করো না, এই দুটো দিন যে কী অপূর্ব মাদকতাময় আনন্দে কাটিয়েছি—'

'এই সেরেছে—', ইন্দ্র চিন্তিত হন, 'ওখানে আবার কী মাদক খেতে গেলে? দিশী-টিশী—'

'আরে ছি ছি, হি হি, প্রভু না না। এই অপূর্ব নগরীর জলে-বাতাসেই মধুর মাদকতা। আমি বলবো এখানে যা আনন্দ, এখানে যা বৈচিত্র্য, এখানে যা থ্রীল, তোমার স্বর্গে তার এক শতাংশও নেই। তোমার স্বর্গে মৃত্যু নেই সত্যি, কিন্তু 'জীবন'ও নেই। কলকাতা যাকে বলে 'লাইফ' আছে! কলকাতায় তা আছে, প্রচুর পরিমাণে আছে, সেই লাইফে কলকাতা টগবগ করছে। বন্যা বোমা মড়ক মস্তান কেউ একে কাবু করতে পারে না, পারছে না, পারবে না।'

'এই শচী, তুমি যে এই দুদিনেই অনেক নতুন নতুন কথা শিখে ফেলেছো দেখছি। "মস্তান" আবার কী?'

'মস্তান!'

আবার হাসির জলতরঙ্গ, 'প্রভু সে একটা জাতি! আশ্চর্য নতুন জাতি, এ যুগের সৃষ্টি। এক কথায় বোঝানো যাবে না। তাছাড়া আমি নিজেই এখনো ভালো করে বুঝিনি, বলতে কি ওরাও বোঝে না ওরা কী! গিয়ে সব বলবো। কিন্তু এদিকে আবার টাইম ওভার হয়ে যাচ্ছে না তো?'

~ www.amarboi.com ~

'চুলোয় যাক, এক্সট্রা চার্জ দেবো। তুমি বলো, সে আবার কোন্ জাত?'

শচী গলা নামিয়ে বলেন, 'এখন বলা যাবে না। তারাই ঘুরছেন আশেপাশে। বেফাঁস কিছু বলে ফেললেই—' কলকাতার লাইফের কথা হচ্ছিল সেটাই বলি, কলকাতা হচ্ছে রক্তবীজের জ্ঞাতি, বুঝলে তো? কলকাতা, সারাদিন রোদে ঝলসে গলা ফাটিয়ে স্লোগান দিয়ে সেই সন্ধ্যাতেই ধূপ জ্বেলে ফুল সাজিয়ে ফাংশান করতে পারে, কলকাতা গায়ে বোমা পড়লে, সে আগুন ঝেড়ে ফেলে দিয়ে সিনেমায় লাইন দিতে ছুটতে পারে, কলকাতা মাথায় বজ্র, বিছানার নীচে কালসর্প, এবং পায়ের তলায় নরকের পাঁক নিয়ে উচ্চাঙ্গের সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারে, বুকে ছুরি খেয়ে ওই ছুরি পোঁতাটা নিয়েই কবিতা লিখতে পারে, কলকাতা একাদিক্রমে আঠারো ঘণ্টা বেতার প্রোগ্রাম শুনতে পারে, আর একটা কফির কাপ হাতে পেলে তোমার গিয়ে সৌরজগৎ সমতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড স্রেফ্ নস্যাৎ করতে পারে।'

ইন্দ্র বললেন, 'শচী, বড্ডো বেশী হয়ে যাচ্ছে না! ওরা কি তোমায় হঠাৎ পাবলিসিটি ডিপার্টমেন্টে কোনো পোস্ট দিয়ে বসেছে নাকি?'

শচী বললেন, 'দেবরাজ, কী আর বলবো, অন্ধকে কি জগৎ-সৌন্দর্য বোঝানো যায়? অবোধকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের রহস্য? নাকি শিশুকে রমণীপ্রেম মাদকতা বোঝানো সম্ভব? তুমি কিছুতেই এলে না, যদি আসতে তো বুঝতে, বেশী তো দূরের কথা, যৎসামান্যও বলে উঠতে পারিনি। স্বয়ং পঞ্চাননও পঞ্চ আননে বলে পেরে উঠবেন না।

'কলকাতার মুহূর্তে মুহূর্তে নব নব রূপ, নব নব মত, নব নব দৃষ্টিভঙ্গী। কলকাতা আজ যার শতবার্ষিকী করছে, কাল তার মুখে কালি মাখাতে পারে ; আজ যাকে মাথায় তুলে নাচছে, কাল তার মাথায় চড়ে নাচতে পারে।...বুঝতে পারছো কী রকম টগবগে প্রাণপ্রাচুর্য!'

ইন্দ্র সকাতরে বলেন, 'তোমার এসব ভালো লাগছে শচী?'

'ভালো লাগবে না? বল কী? কী মার্ভেলাস বল তো! মিনিটে মিনিটে এক-একরকম চেহারা। এই তো এখানে পা দিয়েই শুনলাম, দেশে নাকি অরাজকতা, রক্ষকই নাকি ভক্ষকের ভূমিকা নিয়েছে, মেয়েদের নিরাপত্তা বলে আর কিছু নেই, হ্যানো-ত্যানো আরো কত কী! আর এই দেখো—দেখবে কী ছাই আজ পর্যন্ত তো স্বর্গে একটা টেলিভিশান বসাতে পারলে না।—দেখতে পেলে দেখতে, রাস্তায় শুধু নারীকুলেরই অবাধ পরিক্রমা। চোখের সামনে শুধু লাল কালো হলদে সবুজ নীল গোলাপী মেরুণ ম্যাজেন্টা, লালেতে সবুজে, হলদেয় কালোয়—নীলে গোলাপীতে—'

'শচী থামো থামো! মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে—ওগুলো কী?'

'কী আশ্চর্য! বুঝতে পারছো না? মেয়ে গো মেয়ে! ওসব হচ্ছে শাড়ী শালোয়ার কামিজ ব্লাউজের রং! এখানে যে কতো রং সে তোমায় বলে বোঝাতে পারবো না। মার্কেটিংয়ে গিয়ে, বুঝলে প্রভু, সে যে কী অবর্ণনীয় অবস্থা! দিশেহারা হয়ে গিয়েছিলাম। যেদিকে তাকাই ইচ্ছে হয় সব কিনি, গণেশের বাহন বললো—'

~ www.amarboi.com ~

'শচী!'

শচীদেবী হঠাৎ এই সুরফের্তায় ঈষৎ চুপ করলেন।

ইত্যবসরে আর একবার 'টাইম' নিয়ে কথা কথা হয়ে গেল, ইন্দ্র আবার **'বুক'** করলেন, তারপর গম্ভীর ভাবে বললেন, 'শচী! তুমি ওই ইঁদুরটার সঙ্গে মার্কেটিংয়ে গিয়েছিলে? ছি ছি!'

শচী আত্মস্থ হলেন।

বললেন, 'ছি ছি মানে? ও ছাড়া আর কার এতো সময় আছে শুনি? আর শহরের সমস্ত পথঘাটের খবরই বা এতো রাখে কে? "ইঁদুর" বলে তুচ্ছ করছো তুমি ওকে? চেঁচিয়ে কোরো না। মনে রেখো এখানে "সাম্যের বীজ" বপন করা হয়েছে। তার ফসল ঘরে উঠতে যা দেরি। তখন যদি তুমি "ইঁদুর" "ইন্দুর" করো বিপদে পড়বে।"

'তবু বলছো দেশটা ভালো?'

'একশোবার বলবো! এখানে এসে তবে টের পেয়েছি প্রভু। শুধু বেঁচে থাকাটাই "জীবন" নয়। বাঁচা -মরায় প্রভেদ থাকবে না, তার নামই জীবন। ভাবতে পারো, ঘরে বন্যার জল ঢুকছে—লোকে বাজারে বড়ো বাগদা চিংড়ি এসেছে শুনে ছুটছে? তোমরা পারবে? পারবে উপভোগের এই অমৃতময় স্বাদ পেতে? কিন্তু টেলিফোনে আর কতোটুকুই বা বলা যায়! শুধু হিঙের কচুরি, কিংবা আইসক্রীমের স্বাদ বোঝাতে বসলেই রাত কাবার হয়ে যাবে।...অথচ ফুচকা আলুকাবলী ঝালমুড়ি—ও কতো কীই যে আছে! তোমরা স্বর্গসুখের বড়াই করো, ইন্দ্রের ঐশ্বর্যের বড়াই করো, এখানে এসে সে কথা ভেবে হাসি পাচ্ছে! কতো রকম! কতো রকম! আমার আর যেতে ইচ্ছে করছে না প্রভু।'

'সর্বনাশ। বল কী শচী!'

'আহা যাবো না কি বলেছি? যেতে ইচ্ছে করছে না তাই বলছি! তাছাড়া—'

শচী আবার সুললিত হাসি হাসলেন, 'তাছাড়া এখানে সিনেমা-ডিরেক্টররা তো আমার পায়ে পায়ে ঘুরছে—'

'তার মানে?'

ইন্দ্র বজ্রগর্জন করে উঠলো।

শচীদেবী কিন্তু নির্ভীক কণ্ঠে উত্তর দিলেন, 'মানে অতি প্রাঞ্জল! কেবলমাত্র পদস্থ ব্যক্তির স্ত্রী ছাড়াও আমার মধ্যে যে অন্য অগাধ মহিমা আছে, সেটা এরা আবিষ্কার করে ফেলেছে। তাই 'নবাগতা'র তালিকায় আমার নামটা দেবার জন্যে ঝুলোঝুলি করছে—'

'শচী ভালো হবে না বলছি। এখুনি ঐরাবতকে পাঠাবো তাহলে, তোমায় নিয়ে আসতে। তচনচ হয়ে যাবে তোমার মর্ত্যভূমি।'

'কেলেঙ্কারি কোরো না—', শচীদেবী ঝঙ্কার দেন, 'যাঁর সঙ্গে এসেছি, তাঁর সঙ্গেই যাবো। না গেলে এতো গল্প করবো কী করে? একা কলকাতার একদিনের ঘটনা বর্ণনা করতে বসলেই দুখানা মহাভারত লেখা হতে পারে। তবে এক কথায় বলি—এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি। তুমিও যদি আসতে, তবে তুমিও বলতে তাই।'

~ www.amarboi.com ~

ইন্দ্র বেজার গলায় বলেন, 'আমরা স্ত্রীলোকের ন্যায় অতো আ-দেখলে নই, বুঝলে? নিকৃষ্ট মানুষজাতির দেশের গুণবর্ণনায় তুমি একেবারে পঞ্চমুখ! ছি! মনে জেনো, দেবতাদের থেকে অনেক হীন ওরা। ওরা মরে! একটা ঘুঁষি খেলেও মরতে পারে, দুটো গলদা চিংড়ি খেলেও মরতে পারে—'

'তাতে কি?'

শচীদেবীর হাসি জলতরঙ্গের মতো বেজে ওঠে, 'মরলেই তো শহীদ! তার মানেই অমরত্ব লোভ! মানে বুঝতে পারছো? তোমাদের মরণ নেই, তাই তোমরা অমর, আর এরা মরে অমর। বুঝতে পারছো, তফাৎটা কোথায়?...হ্যালো...হ্যালো, কী হলো? কেটে দিলো নাকি? হ্যালো দেবরাজ—'

'না না—', দেবরাজ স্তিমিত কণ্ঠে বলেন, 'কেটে দেয় নি, মাথাটা কেমন ঝিমঝিম করছিল—'

'বাঁচলাম! আসল কথাটাই যে বলা হয়নি, শোনো—', শচী-কণ্ঠে মধুর প্রেমের কুটিল আবদার, 'এই ওখান থেকে যা কিছু এনেছিলাম সবই তো খতম, এখন মুশকিলে পড়ে যাচ্ছি, কুবেরকে বলে চটপট একটা ব্যবস্থা করে ফেলো—'

ইন্দ্র বিস্ময়-বিচলিত কণ্ঠে, 'সে কী শচী, তুমি যে প্রভূত স্বর্গমুদ্রা নিয়ে গেলে, এই দুদিনেই—'

'স্বর্গমুদ্রা বলেই তো—', শচীদেবী ঝঙ্কার দিয়ে ওঠেন, 'সেই "ফরেন এক্সচেঞ্জের" ঝামেলার কতো ঝকমারি ভোগ করতে হয়েছে জানো? ঘুষ দিতে দিতেই তো অর্ধেক মুদ্রা হাওয়া—'

'ঘুষ!'

'হ্যাঁ গো, প্রভু! আকাশ থেকে পড়লে যে! এই মর্ত্যলোকে কি ঘুষ না দিয়ে কোনো কাজ হয় নাকি? এতোদিনে এটুকু খবরও রাখো না! অথচ তোমার বৈজগৎ দূতাবাসের জন্যে কতো কতো স্বর্গমুদ্রা ব্যয় করে চলেছে এতাবৎকাল। এখানে প্রতি পদক্ষেপে ঘুষ না দিতে পারলে, পদ আর ক্ষেপণ করা যাবে না, অচল প্রতিমা হয়ে থাকতে হবে।'

ইন্দ্র সন্দিগ্ধ গলায় বলেন, 'দেবী ভগবতীর মুখে তো কোনো দিন এসব তথ্য শুনি নি!'

'দেবী ভগবতী?...প্রভু, ওঁর কথা বাদ দাও, একেই তো উনি বাপের বাড়ি আসেন, বেদীতে আটকে পড়ে থাকেন, তাছাড়া কোনো কিছুর প্রয়োজনই আছে নাকি ওঁর? ঠাকুরের সংসারটি তো ভূতের আড্ডা! ওঁর সঙ্গে তুলনা করা সমীচীন নয়।...যাক তুমি ওটার ব্যবস্থা কোরো, আর শোনো, তুমি বিমান স্টেশনে ঐরাবতকে একবার পাঠিও।'

'ঐরাবতকে!'

ইন্দ্র অবাক গলায় বলেন, 'কেন?'

'বাঃ, এখানে থেকে যা সব কেনাকাটা করেছি সে-সব কি রথে করে নিয়ে যাওয়া যাবে? একা ঐরাবতই পারবে কিনা তাই ভাবছি—'

~ www.amarboi.com ~

'শচী!'

ইন্দ্র প্রায় কেঁদে ফেলে বলেন, 'এতো কী কিনলে তুমি? তোমার কিসের অভাব?'

শচী অমায়িক কণ্ঠে বলেন, 'দেবরাজ, স্বর্গে যার অভাব শুধু তাই কিনেছি। শারদীয় সাহিত্য। আর শাড়ী—'

'শারদীয় সাহিত্য! সেটা কী শচী?'

'নিয়ে গেলে বুঝবে, প্রভু। অপূর্ব বস্তু। তবে ভাবছি—একা ঐরাবতই কি পেরে উঠবে? তুমি বরং তোমার ঘোড়াটাকেও—'

হঠাৎ ভিতরে কড়াৎ কড়াৎ শব্দ হতে থাকে, তারপর ক্রস-কানেকশনে দুই শেয়ার মার্কেটের দালালের আলাপ-আলোচনা শুরু হয়ে যায়।

শচী বারকয়েক 'হ্যালো হ্যালো' করে ছেড়ে দেন এবং ভাবেন, শেষ পর্যন্ত বোধ হয় শুনতে পেয়েছেন প্রভু। তবে প্রণামটা জানানো হল না এই যা। যাক গে মরুক গে, কি আর করা!

~ www.amarboi.com ~

ক্ষমতার উৎস

অশোক জানলার ধারে দাঁড়িয়ে দাড়ি কামাবার গোল আর্শিটা বাঁ হাতে ধরে ডানহাতে সূক্ষ্ম একটা চিমটে নিয়ে রগের থেকে একটা পাকা চুলকে উচ্ছেদ করবার চেষ্টায় সময় খরচ করছিল, কিন্তু কিছুতেই বাগাতে পারছিল না। সম্প্রতি চুল ছেঁটেছে, রগের চুলগুলো আলপিনের আগার মতো শক্ত আর খোঁচা খোঁচা হয়ে গেছে, এদিকে আবার আর্শিটা ধরে মুখ ফেরালেই ছায়া পড়ছে।

চেষ্টা সফল না হওয়ায় অশোকের মুখটা খিঁচোনোর মত দেখাচ্ছে।

সোমা ঘরে ঢুকলো চায়ের পেয়ালা হাতে। সোমা পেয়ালাটা টেবিলে নামিয়ে রাখার আগেই বলে উঠলো, কী হলো? অমন খুনীর মতো মুখ করে জানলার ধারে যে? কাউকে তাক করছো না কি?

করছি, বলে ঘুরে দাঁড়ালো অশোক, আর সোমা ওর হাতের অস্ত্রটা দেখতে পেলো। মুখ টিপে হাসলো সোমা, ওঃ সেই ব্যাপার, কিন্তু কতো শত্রুকে নিপাত করবে?

যতো পারবো।

কিছুই পেরে উঠবে না। সোমা হেসে ওঠে। একটা যাবে একশোটা গজাবে। হেরে যেতে হবে।

অশোক রাগ দেখিয়ে বলে, তোমার তো কেবল আমাকে বুড়ো বানানোর চেষ্টা। আর কোথায় আছে কই দেখাও তো?

দেখতে পাবে না, সোমা হেসে ওঠে, চোখের বাইরে, দৃষ্টির সীমানার ওপারে।

তার মানে?

তার মানে ঘাড়ে।

অশোক তাড়াতাড়ি মাথাটা নিচু করে বলে, এই এই তুলে দাও না প্লীজ।

আমার দায় পড়েছে। সোমা তাড়া দিয়ে ওঠে, চাটা জুড়িয়ে যাচ্ছে, খেয়ে নাও শীগগির।

অশোক হাতের জিনিস নামিয়ে চেয়ারে বসে পড়ে পেয়ালাটা হাতে তুলে নিয়ে বলে, সত্যি ভাবলে কী আশ্চর্য্যি লাগে, নিজের শরীরের সবটা দেখতে পাওয়া যায় না। হাত দিয়ে ছুঁতে পারছি অনুভব করতে পারছি, অথচ দেখতে পাচ্ছি না। আমার শরীরের খানিকটা আমার অচেনা।

এরকম আশ্চর্য্যি জিনিস আরো কতো আছে।

সোমা হেসে উঠে বলে, ভাবতে বসলে বসে পড়তে হবে তাই ভাবতে বসা হয়না।

~ www.amarboi.com ~

যাক গে ও কথা, শোনো, ও বেলা কি তুমি সকাল করে অফিস থেকে ফিরতে পারবে? তা'হলে দু'জনে এক সঙ্গেই যাবো। আর না পারবে তো বলে দাও, আমি একাই চলে যাবো বেলাবেলি, তুমি একেবারে সোজা অফিস থেকে— তোমার পক্ষে অবশ্য সেটাই সুবিধে, এতোটা উজান এসে—

অশোক সোমার কথাটা সব শুনে নিয়ে নস্যাৎ করার সুরে বলে, তুমি কি সত্যিই বেলেঘাটায় যাবার ঠিক করছো নাকি?

তার মানে? সোমার আলগা লাবণ্যে ভরা মুখটা হঠাৎ কাঠ কাঠ দেখায়। তুমি ঠিক করছিলে না?

মোটেই না! অশোক আবার গোল আর্শিটা মুখের সামনে তুলে ধরে বলে, বেলেঘাটায় নেমন্তন্ন যাওয়া? এই বাজারে? ক্ষেপেছ!

সোমার হঠাৎ মনে হয় অশোকের মুখের সামনে ওই আর্শিটা 'ঢাল' এর মতো দেখতে লাগছে। সোমার সঙ্গে সঙ্গে 'রণক্ষেত্র' শব্দটাও মনে পড়ে যায়। কিন্তু সোমা উত্তেজিত হয়না। খুব শান্ত ভাবে বলে, এই বাজারে বেলেঘাটায় কেউ যাচ্ছে না?

যাবেনা কেন? নেহাৎ যাদের প্রাণের দায় তারাই যাচ্ছে।

ওঃ তাহলে ঠিক আছে, সোমা খালি পেয়ালাটা তুলে নিয়ে বলে, এটিও 'প্রাণের দায়'!

বিয়েবাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে যাওয়াটা প্রাণের দায়?

অশোক আবার রগের সেই শত্রুটার দিকে চোখ রাখে।

সোমা চলে যাচ্ছিল, দাঁড়িয়ে পড়ে বলে, মেয়েরা বিয়েবাড়িতে শুধু নেমন্তন্ন 'খেতে' যায় না।

আরে বাবা না হয় সাজ দেখাতেই যায়, তা' এখন তো সে গুড়েও বালি। গহনা সবইতো ভল্টে।

অশোকের মুখের রেখায় সাফল্য।

যুক্তিটা মোক্ষম দেওয়া গেছে।

সোমার মুখে কিন্তু পরাজয়ের রেখা দেখা যায় না, কোনো রেখাই নয়। সোমা মসৃণ গলাতেই বলে, ও কথা থাক। রাঙাদির এই প্রথম মেয়ের বিয়ে, সেটা তুমি ভুলে যেতে পারো, আমি পারিনা।

অশোক ভেবেছিল শান্তির পথে কার্যসিদ্ধি করে ফেলবে, সোমাকে তুতিয়ে পাতিয়ে। কিন্তু সোমা যেন প্রথম থেকেই অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বসে আছে। এর পর আর শান্তির পথের আশা কোথায়?

অশোক অতএব চড়া গলাতেই বলে ওঠে, মানে বলে ফেলতে বাধ্য হয়, কথা চাপা দেওয়ার চেষ্টা কোরো না। খাবার জন্যে কেউ মরে যাচ্ছে না। আমি বলছি তোমার যাওয়া হবে না।

যা হোক একটা কিছু বললেই তো হয় না।

সবাই ঠিক মতো যাবে?

~ www.amarboi.com ~

তা' ঠিক বলা যায় না। তোমার মতো অতি সাবধানীও তো আছে ঢের! তবে বর ঠিকই ফুল সাজানো গাড়িতে গিয়ে দাঁড়াবে। আর বরযাত্রীরা 'বরযাত্রী' সেজে!

তার মানে ব্যঙ্গ করছে সোমা। যেন অশোক কিছু না।

আমি যদি তোমাকে যেতে না দিই?

আলগা মতো একটা হুমকি বেরিয়ে আসে অশোকের গলা থেকে। অথচ অশোক খুব জোরই দিয়েছিল। অশোকের মনে হলো একটু 'গার্গল' করা দরকার, গলাটা কেমন বসে গেছে।

সোমা জানতে পারলো না অশোকের হুমকিটা জোরালো হলো না গলার দোষে, তাই সোমা ভয়টয় পেলো না। সোমা খুব হাল্‌কা গলায় বললো, কি করে? সঙ্গে করে অফিসে নিয়ে যাবে না ঘরে তালা দিয়ে আটকে রেখে যাবে?

অশোকের আর এই অসহ্য নির্ভীকতার সামনে দাঁড়াতে ইচ্ছে করলো না। চলে এলো, নিঃশব্দে খাওয়া সারলো বেরোবার জন্যে সাজসজ্জা করলো, এবং কিছু না বলে বেরিয়ে গেল। অন্য দিন বলে যায়, দু' একটা হাসির চাহনিও বিনিময় হয় ঘর আর রাস্তা থেকে। কিন্তু আজ রাগ!

সোমা অবশ্য কথা বন্ধ করেনি, সে সমানেই ওই নীরবতার উপরই কথার বৃষ্টি করেছে, রান্নাঘরটা আর তোমার খোলবার দরকার নেই, আমিই তালা লাগিয়ে যাবো, শোবার ঘরের চাবিটা যেমন বসবার ঘরে ফুলদানির নিচে থাকে, থাকবে! ফ্ল্যাটের দরজার চাবিটা বাড়িওলাদের কাছে দিয়ে রেখে যাব। চাটা তুমি বরং বাইরে থেকেই খেয়ে এসো, নইলে ওঁরা আবার ব্যস্ত হবেন। এসেই বলে দিও চা খেয়ে এসেছি, জানো তো ওঁকে—

অশোক ততক্ষণে রাস্তায়।

অশোক ভীষণ রেগে যায়।

তার মানে অশোককে বাদ দিয়েই সব ব্যবস্থা ভাবা হয়ে গেছে। তার মানে অশোক না গেলেও কিছু এসে যাচ্ছে না ওর!

আচ্ছা!

ঠিক আছে, যাও। টের পাওগে একা যাওয়ার মজাটা কি। জানি সেখানে হি হি করার জন্যে অনেক তুতো দাদা আর তুতো জামাইবাবু জুটবে, কিন্তু কে তোমায় রাত দশটায় বেলেঘাটা থেকে গড়িয়াহাটায় পৌঁছতে আসে দেখা যাবে।

কিন্তু অফিসে এসে ওই নির্লিপ্ত ভাবটা বজায় রাখা সম্ভব হলো না। সকলের মুখেই আজ ঔই বেলেঘাটা প্রসঙ্গ। তার কারণ সতীশবাবু এসে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ শুনিয়েছেন। সতীশবাবু বেলেঘাটার ওদিক থাকেন। তিনি নাকি খবর শুনেই দেখতে গিয়েছিলেন কাল রাত্তিরবেলা। অশোক যখন পৌঁছলো তখন তিনি অনেকক্ষণ ধরে ধারাবিবরণী দিয়ে সবে পানের ডিবেটি খুলেছেন।

অশোককে দেখেই যারা সব শুনেছে তারা হৈ চৈ করে উঠলো, এই যে অশোকবাবু এসে গেছেন তাহলে? দেরী দেখে ভাবছিলাম আপনাদের পাড়ায় আবার কিছু ঘটলো

~ www.amarboi.com ~

না তো রাতারাতি? হলেই হলো। এই যে সতীশবাবুদের ওখানে—সকালের কাগজ দেখেছেন তো? সতীশবাবু নিজের চোখে দেখে এসেছেন কী নারকীয়ভাবে মেরেছে লোক দুটোকে, মাথায় মেরে—বলুন না সতীশবাবু।

সতীশবাবু তখন সবে পানটি মুখে দিয়ে জর্দার টিপটি গালে দিয়েছেন, তাই রসেভরা ভরাটি মুখে বলেন, বলবো আর কী, চোখে না দেখলে বিশ্বাস হতো না মানুষের মাথাটা ওভাবে ফাটিয়ে ঘিলু বার করে ফেলা যায়। তাতেই শেষ নাকি? সর্বাঙ্গে ছোরা খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে—পানের পিকটি সাবধানে মুখের মধ্যেই রক্ষা করে বলেন, ইঁদুর মারা করে মেরেছে।

অশোক নিজ আসনে বসে পড়ে। অশোক উদ্বিগ্ন গলায় বলে, তা এলেন কী করে? বাস টাস চলছে?

সকালে তো চলছিল, পাছে হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায় তাই তাড়াহুড়ো করেই চলে এসেছি। বললাম, তোমাদের ও সব ডাল চচ্চড়ি মাছে দরকার নেই আমার, চট করে একটু চালে ডালে ফুটিয়ে দাও।...আরও একবার পিক্ ফেলে এসে কথা শেষ করেন, তা' গিন্নী ভালোই খাইয়ে দিলেন ; তোফা ফুলকপি কড়াইশুঁটি আর বড় বড় আলু ফেলে দিয়ে খিচুড়ি তার সঙ্গে ডিম ভাজা। তাই বললাম, এই তো হয়ে গেল, কেন মিথ্যে পাঁচরকম পদ রেঁধে হিমসিম খাও?

বাসটাস তাহলে চলেছেই দেখলেন! ট্যাক্সী-ফ্যাক্সী—

ওই তো বললাম এখনো চলছে। তবে বন্ধ হলেই হলো। একটা কিছু হুজুগ হলেই তো সর্বাগ্রে বাস বন্ধ। রাস্তার লোক রাস্তার লোককে পিটিয়ে মারলো, তার জন্যে গাড়ি বন্ধ করে পাবলিককে জব্দ করে কী লাভ বাবা! চলে তো এসেছি এখন ফিরবো কি করে জানিনা।

তাহলেই তো মুস্কিল!

অশোক সিগারেট বার করলো।

কে একজন বললো, কেন ওদিকে কোনো কাজটাজ আছে না কি? থাকলেও যাবেন না আজ। কী দরকার!

অশোক প্রথমটায় ভাবলো, ঘরের কথা চেপে যাবে, কিন্তু আক্ষেপ জানানোর লোভটা ছাড়তে পারলো না। বলেই ফেললো দরকারটা কী।

আর সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় ঘেরাও হয়ে পড়লো অশোক।

বিয়ের নেমন্তন্ন?

বেলেঘাটায়?

আজকের দিনে ক্ষেপেছেন, না পাগল হয়েছেন?...কী বললেন, আপনি না গেলেও গিন্নী একাই যাবেন? বলেন কি মশাই? সাংঘাতিক মেয়ে তো! কাগজ দেখেননি আজকের? তা' সত্বেও? নাঃ আপনি মশাই একেবারে ইয়ে! আজকালকার দিনে আর অতোটা লাগাম ছেড়ে দেওয়া ঠিক নয়।...তাওতো বললেন মামাতো শালির মেয়ের

~ www.amarboi.com ~

বিয়ে! আশ্চর্য। এতোটা রিস্ক নেওয়ার কোনো মানে হয়? যেন একটি জ্ঞানবৃক্ষ থেকে ঝরঝরিয়ে পাতা ঝরতে থাকে অশোকের উপর...মেয়েদের তো বাপের বাড়ির মাছিটির দিকেও উৎসাহ, সে উৎসাহে প্রশ্রয় দেওয়া ঠিক নয় অশোক বাবু! ব্যাপারটা বন্ধ করুন।

আর তো এখন কোনো চারা নেই—

অশোক সিগারেটটায় শেষ মোক্ষম টান টেনে বলে, আমি ফেরার আগেই তো হাওয়া হবে।

সতীশবাবু আবার একসঙ্গে দুটো পান মুখে ভরে একটু ফাঁপরে পড়েছিলেন, তবু সেই অবস্থাতেই বলেন, তোমার বাড়ির কাছাকাছি কোথায় একটা ফোন আছে না?

ওপর তলায় বাড়িওলার বাড়ি।

তবে আর কি? ডাকিয়ে নিয়ে বলে দাও যাওয়া হতে পারে না, সবাই বারণ করছে। কাল আরো একটা কেলেঙ্কারীতো হয়ে গেছে মানিকতলার ওদিকে—

এই সেরছে! আবার কী হলো?

বললো আর একজন।

সে এক বিতিকিচ্ছি কাণ্ড! মানে খুন টুন অবশ্য নয়। তবে লজ্জার কথা! দুটি তরুণী খুব ছক্কা পঞ্জা হয়ে সেজে দুপুরের শোয় সিনেমা না কোথায় যাচ্ছিলেন, তাদের রাস্তার মাঝখানে দাঁড় করিয়ে গলার হার কানের দুলটুল ছিল, সে সবতো নিয়েইছে, পরণের সিল্কের শাড়ি দুটোও নাকি খুলে নিয়ে শুধু পেটিকোট পরা অবস্থায় ছেড়ে দিয়েছে। দিন দুপুরে দরাজ রাস্তায়—

ছি ছি কী কাণ্ড!

কই এতোক্ষণ বলেন নি তো?

আরে এই জোড়া খুন নিয়েই হৈ হৈ ব্যাপার ওটা আর—মানে সূর্য্যিমামা উঠলে তো পিদ্দিম মামার গরব যায়।

সতীশবাবু আপন রসিকতায় আপনিই হাসতে থাকেন।

অশোকের চোখের সামনে হঠাৎ যেন একটি 'শুধু পেটিকোট পরা' নারী মূর্তি ছায়া ফেলে গেল। অশোক বিচলিত গলায় বললো, দিনের বেলায় কেউ কিছু বললো না?

কে কী বলবে? একটা ঘাড়ে একটা বৈ দুটো মাথা তো কারুর নেই? গর্দান যাওয়া তো আজকাল ভাতডাল হয়ে গেছে। এটা ঠিক কোনো পার্টিফার্টির ব্যাপার নয়, গুণ্ডা ক্লাশের লোকরাও তো বেশ মজা পেয়ে গেছে আজকাল। জানে যেখানে যা ঘটুক, যতো দোষ নন্দ ঘোষ হবে।

কিন্তু যাই বলুন, মেয়েগুলোর মাঝে মাঝে এরকম শিক্ষা হওয়াও দরকার, এই দিনকাল, কী দরকার ছিলো তোদের সিল্কের শাড়ির বাহার উড়িয়ে সিনেমা দেখতে যাবার? বেশ হয়েছে! ঠিক হয়েছে!...

সমাজ চিন্তার খানিকটা ফসল এখানে ওঠে।

সতীশবাবুই শুধু তার মধ্যে বলে ওঠেন, তবে নিজেদের ঘরের মেয়ে বৌয়ের না

~ www.amarboi.com ~

হওয়াই ভালো! তুমি অশোক এখুনি একটা ব্যবস্থা—

সকলেই অশোকের হিতৈষী।

অশোক কৃতজ্ঞচিত্তে উপদেশ শোনে।

কিন্তু অশোকের ভাগ্য মন্দ। ফোনটা বেজেই চলে, কেউ ধরে না। অশোকের মনে পড়ে যায়, এসময় বাড়িওয়ালা তাঁর দোকানে, মেয়েটা কলেজে চলে গেছে, আর গিন্নী সেজেগুজে বেতের ঝাঁপি হাতে নিয়ে বাজারে দোকানে বেরিয়েছেন।

অপেক্ষা করতে হলো!

অনেকক্ষণই অপেক্ষা করতে হলো।

তারপর যা হবার হলো।

অশোক বাড়িওলা গিন্নীর হতাশ গলা শুনতে পেলো, ওমা সোমা যে এইমাত্র আমার কাছে চাবি দিয়ে বেরিয়ে গেল।

বেরিয়ে গেল। এক্ষুণি!

হ্যাঁ, বললো, আপনার আজ অফিসে কাজ বেশী, যেতে পারবেন না, একাই যখন যাচ্ছে, যতো তাড়াতাড়ি হয় ভালো। গল্প-টল্প করার সময় পাবে।

ও আচ্ছা।

দরকার ছিল কিছু?

না, ওই কথাই বলে দিচ্ছিলাম, আমার দেরী হবে।

অশোক হিংস্রভাবে ঠিক করে ফেললো আজ যতো পারবে ওভারটাইম খাটবে। সোমা ফিরে এসে দেখবে কেউ তার ঢেকে রেখে যাওয়া খাবার খায়নি।

ফিরবেই নটা সাড়ে নটার মধ্যে। আজকাল ভোজবাড়িতে খুব সকাল সকাল খাইয়ে দেয়।

কিন্তু প্রায় দশটার সময় বাড়ি ফিরেও অশোক দেখতে পেলো ঘরে আলো জ্বলছে না, তার মানে ফেরেনি। এই দুঃসহ স্পর্দ্ধার উপযুক্ত শাস্তিটা কী হওয়া উচিত ভাবতে ভাবতে দোতলায় উঠে চাবি চেয়ে নিয়ে এলো।

বাড়িওয়ালার মেয়ে বললো, বৌদি বলে গেছেন দুধটা গরম করে নিয়ে খাবেন।

অশোক কোনো কথা বললো না।

ভাবলো, ওই দুপুরবেলা রেঁধে রেখে যাওয়া খাবার আমি খাচ্ছি না। থাক পড়ে।

হাতমুখ ধুয়ে এলো, দেখলো দশটা দশ, দেখা নেই সোমার। অশোক শুধু একবার ঢাকা খুলে দেখতে গেল কী রেঁধে রেখে গেছেন মহারানী। খুলতেই খুব ভালো গন্ধ বেরোলো। অশোক দাঁতে ঠোঁট চেপে একবার ভেবে নিলো, চোরের উপর রাগ করে মাটিতেই বা খেতে যাবে কেন আমি?

অতএব ওই বোকামিটা আর করলো না অশোক।

কিন্তু রাত যে ক্রমশই বাড়ছে।

রাস্তা জনশূন্য হয়ে গেল।

~ www.amarboi.com ~

বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখতে দেখতে সর্বনাশা একটা ভয় পেয়ে বসলো অশোককে।

অশোকের দৃষ্টির সামনে যেন নিরাভরণ নিরাবরণ একটা মূর্তি শুধু পেটিকোট পরে কোথাকার কোন্ রাস্তায় ছুটোছুটি করছে। অশোক সেই কোথাকার কোন্ রাস্তার ধারে রক্তের ছড়াছড়ি দেখতে পেলো, অশোকের বুকের রক্ত হিম হতে থাকলো, অথচ খোঁজ নেবার কোনো পথ নেই।

অশোক আবার বারান্দায় এসে দাঁড়ালো। নিঃসীম অন্ধকার। আলোগুলোও যেন কুয়াশার জাল চাপা দিয়ে বসে আছে।

দশটা পঁয়ত্রিশ!

ভেবেছে কী! আজ একবার আচ্ছা করে ধমক দিয়ে আহ্লাদ বার করে দিচ্ছি।

কিন্তু কার আহ্লাদ বার করবে!

কোথায় সে?

ঘড়িতে বেজে চলেছে দশটা চল্লিশ...দশটা পয়তাল্লিশ...দশটা পঞ্চাশ।...

একটা কোনো অঘটন ঘটে গেছে তাতে আর সন্দেহ রইল না অশোকের কিন্তু কী করবে সে এখন? এই রাতে ট্যাক্সী ধরে বেলেঘাটায় ছুটবে?

জনহীন রাস্তার দিকে তাকিয়ে দেখলো, কল্পনাটা নেহাৎই অবাস্তব মনে হলো। সকাল হবার আগে কিছু করার নেই, মনে মনে ভাবলো অশোক। আগামী কালকের খবরের কাগজে হেডিংটা ভাবতে চেষ্টা করলো, সারা শরীর শিরশিরিয়ে উঠলো অশোকের, আর ঠিক সেই সময় বাইরে গাড়ি থামার শব্দ পেলো। শব্দ পেলো চির পরিচিত কণ্ঠধ্বনি।—তুই তা হলে মেজদিকে ঢাকুরেয় পৌঁছে দিয়ে ওখানেই রাত্তিরে থেকে যাবি তো পল্টু?

অশোক হঠাৎ একটা কাজ করে বসলো, জানলা থেকে সরে গিয়ে কম্বল ঢাকা দিয়ে শুয়ে পড়লো। শুয়ে পড়বেই তো। রাতটা মানুষের ঘুমেরই জন্যে, চরে বেড়াবার জন্যে নয়।

বেল বাজিয়ে কাহিল হয়ে গিয়ে পল্টু, যখন তার জামাইবাবুকে দরজা খোলাতে সমর্থ হলো, তখন ঘড়িতে আরো খানিকটা বেজে গেছে!

অশোক দরজা খোলার জন্যে ছিটকিনিতে হাত রেখে ভেবে নিলো দরজা খোলার সঙ্গে ভয়ঙ্কর রকমের একটা ধমক দিয়ে সোমাকে ওর আহ্লাদের ভাই আর মেজদির সামনে অপমানের একশেষ করে দেখে! উঃ এতোখানিটা সময় কী যম যন্ত্রণা ভোগ করেছিল অশোক, আর উনি দিব্যি হাসতে হাসতে, গল্প করতে করতে—ভগবান, একটা কোনো বিপদ কেন হলো না! টের পেতো মজা।

কিন্তু অশোকের কপাল! দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে সোমা প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়লো, লোক জাগিয়ে দরজা খোলাতে হলো! দ্যাখ্ পল্টু দ্যাখ, তুই কিনা তাড়া দিচ্ছিলি, জামাইবাবু ভাবনা করছেন। দ্যাখ্ ভাবনার বহর, খেয়েদেয়ে কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুম হচ্ছে। অথচ বেলেঘাটার রাস্তায় খাঁড়া পাতা আছে বলে নিজে গেল না। এই মানুষ নিয়ে ঘর

~ www.amarboi.com ~

করছি আমি। বোঝ আমার গুণ।

গাড়ি ছেড়ে গেল।

ধমাস করে দরজাটা বন্ধ করে দিল সোমা।

আর অশোক ধুলোয় মুকুট লুটানো পরাজিত রাজার মতো মাথা নিচু করে আবার গিয়ে শুয়ে পড়লো কম্বলটা মুখ পর্যন্ত ঢাকা দিয়ে।

কিছুতেই ভেবে পাচ্ছে না অশোক, ভেবে পায়ওনা, ষোলো আনা দোষ করেও সোমা কেন জিতে যায়, আর অশোক কেন নিজের দিকে সব যুক্তি নিয়েও হেরে যায়। সোমার জিতটা কি শুধু মুখের জোরে! না অন্য কোথাও অন্য কোন জোর আছে তার?

যা অশোকের নেই।

~ www.amarboi.com ~

পকেটমার

'মেয়েমানুষ পকেটমার!'

কেয়াবৌদিকে যেন সাপে ছোবল দিল। হাতের বটুয়া হাত থেকে পড়ে গেল কেয়াবৌদির। অনেকক্ষণ গেল ওই সাপের ছোবলের আঁৎকানি কাটতে।

এমন জানলে খবরটা একটু ধীরে-সুস্থে জানাতাম, এমন 'ধাঁই' করে দিতাম না। এই ধাঁইটা যেন কেয়াবৌদির আজন্ম লালিত ধারণার উপর প্রচণ্ড একটি হাতুড়ির ঘা হয়ে বসেছে।

'ধাঁই' বিশেষ জোরালো হয়েছে তা বোঝা গেল—শুধু ওই বটুয়া পড়ে যাওয়া থেকে নয়, বোঝা গেল ওই 'মেয়েমানুষ' শব্দটা থেকে!

কেয়াবৌদির মুখে এমন একটা অরুচিকর গ্রাম্য শব্দ! আধুনিক সমাজে যা স্রেফ্ অপাংক্তেয়! এ যুগের কে না জানে 'মেয়েমানুষ' 'স্ত্রীলোক' এসব শব্দগুলো গ্রাম্য!...নারীজাতি সম্পর্কে কোনো কিছু বোঝাতে হলে যেখানে 'মহিলা' শব্দটা চালানো যাবে না, সেখানে 'মানুষ' শব্দটা বর্জন করে শুধু 'মেয়ে' বলতে হয়! স্ত্রীলোকে 'লোক' থেকে যায়, মেয়েমানুষে 'মানুষ!' অচল! অচল! অচল! তাই শুধু মেয়ে।

মেয়ে মানে মেয়েই! আর কিছু না, আর কিছু হওয়া উচিত না।

একথাটা, অন্য আর সব অগ্রাম্যদের মত কেয়াবৌদিও জানেন। আরো অনেক সভ্য ভব্য মার্জিত শব্দ জানেন কেয়াবৌদি। তাঁর নিজস্ব মৌলিক অবদানও আছে কিছু কিছু। ওই 'অগ্রাম্য' শব্দটাই তো কেয়াবৌদির। যেমন বাঙালী আর অবাঙালী, মুসলমান আর অমুসলমান, তেমনি গ্রাম্য আর অগ্রাম্য।

কেয়াবৌদির কথার মধ্যে সর্বদাই এইরকম বাছাই বাছাই মার্জিত শব্দের সমাবেশ!...তথাপি আজ কেয়াবৌদির মুখ ফস্কে বেরিয়ে গেল, 'মেয়েমানুষ পকেটমার!'

এ হচ্ছে—আচমকা আঘাতের ফল!

আর এ আঘাত আমিই দিয়ে ফেলেছি ভেবে অনুশোচনায় শোচনীয় হচ্ছি।

অথচ কি করেই বা জানবো কেয়াবৌদি এতে এত আহত হবেন? জানলে কি আর গল্প করি—'কেয়াবৌদি, ট্রামে যা একখানা কাণ্ড দেখে এলাম!'

কেয়াবৌদি আগ্রহ ভরে বললেন, 'কী হলো?'

'আর বলবেন না! দেখে হাসবো না কাঁদবো। ইয়া সা জোয়ান এক তাগড়াই চেহারার ভদ্রলোকের পকেট সাফ করতে গিয়েছে একটা মেয়ে পকেটমার—'

~ www.amarboi.com ~

মেয়েটা ধরা পড়ে কী চালাকি করছিল সেই গল্পটা করতাম, কিন্তু করা হল না। মেয়ে পকেটমার শুনেই তো সাপের ছোবল খাওয়ার মত আঁৎকে উঠলেন কেয়াবৌদি!

ধাতস্থ হতে সময় লাগল।

কিন্তু কেয়াবৌদিকে আপনারা চেনেন তো?

সেই যে যিনি সেবার তিনবছরব্যাপী শতবার্ষিকীর শেষ বছরে রবীন্দ্র জন্মোৎসব করতে বসে রবীন্দ্রনাথের গানের ভাঁড়ারে সময়োপযোগী গানের অভাব দেখে হতাশ নিঃশ্বাস ফেলে বলেছিলেন, 'অত কম' লিখে গেছেন রবীন্দ্রনাথ! সেই তিনি!

আমাদের কেয়াবৌদি! সারা বছর কিছু না কিছু করে থাকেন যিনি। এবার আর রবীন্দ্র জয়ন্তী নয়, শুধু শুধুই একটা গীতিনাট্য করাবেন। মানুষ যে কেবলমাত্র খেয়ে ঘুমিয়ে আর টাকার ধান্ধায় ঘুরে দিন কাটাবে, এ বরদাস্ত করতে পারেন না কেয়াবৌদি। মাঝে মাঝেই তাই নানাবিধ অনুষ্ঠান জুড়ে দেন। পাড়াটা একটু জুড়িয়ে এসেছে দেখলেই দেন। ডানলোপিলোর আয়েস ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন চাঁদার খাতা হাতে। সিনেমা, মার্কেটিঙের মোহময় আকর্ষণ ত্যাগ করে ঘুরতে যান বিজ্ঞাপনদাতাদের দোরে দোরে। ফাংশান করেন, স্যুভেনির বার করেন।

অমানুষিক খাটেন-কেয়াবৌদি এক একটি অনুষ্ঠানের পিছনে। এবারেও দেখলাম সেই অমানুষিক খাটবার সংকল্পের ছাপ কেয়াবৌদির মুখে! ভয় হল। নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করলাম। বললাম, 'কেয়াবৌদি, এই সেদিন ডেঙ্গু থেকে উঠেছেন আপনি—

'তাতে কি!' কেয়াবৌদি মধুর হাসি হাসলেন, 'তোমরা তো রয়েছ! তপন স্বপন গদাই পল্টু অ্যাটম বুলেট্ সাইক্লোন আর্থকোয়েক' সব্বাই আমার কাজ করবে। আর তুমি তো আছই!'

মধুর একটু হাসলেন কেয়াবৌদি।

ডজনখানেক ষণ্ডা গুণ্ডা ছেলের উপর আধিপত্য বিস্তারের ক্ষমতা বাবদ আত্মপ্রসাদের হাসি। ছেলেগুলোর ওই নামগুলো সবই যে পিতৃমাতৃ দত্ত, তা নয়, ওগুলোও কেয়াবৌদির অবদান। আর বোধকরি ওতেই মরে আছে ছোঁড়াগুলো! ওরা কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলে আর ভয় নেই।

'শুধু ট্রেজারার করা যাবে না—' কেয়াবৌদি বিগলিত হাস্যে বলেন, 'ওদের থেকে একটাকেও ট্রেজারার করা যাবে না। বললে বিশ্বাস করবে না, সবগুলো হচ্ছে চোরের রাজা। টাকা হাতে পেয়েছে কি তার সেভেনটিফাইভ পার্সেন্ট পকেটে চালান করেছে।'

হেসে খান খান হন বৌদি!

'ট্রেজারার যথানিয়মে তোমাকেই করেছি!'

'আমাকে!'

আমি চোখে ধোঁয়া দেখি। গতবারের সুখস্মৃতি এখনো মনে আছে বলেই দেখি। বলি, মোটে সময় নেই বৌদি!'

বৌদি উড়িয়ে দেন সে অজুহাত।

~ www.amarboi.com ~

হাস্যবদনে বলেন, 'একটু বরং কম ঘুমিও।'

'বোধহয় ক'দিনের জন্যে বাইরে যেতে হবে—'

বৌদি লীলায়িত হলেন, 'কে ছাড়ছে?'

'কিন্তু শুনুন—'

'শুনতে পাইনা, বধির!'

'আচ্ছা না—দেখুন—'

'দেখতে পাই না, অন্ধ!'

বুঝলাম উপায় নেই! কেয়াবৌদির সাংস্কৃতির অনুষ্ঠান ভাণ্ডারের ভাঁড়ারি আমার হতেই হবে!

অন্যদিক থেকে চেষ্টা দেখি।

দেখুন বৌদি, চারদিকে এই অভাব অভিযোগ, ধর্মঘট, কালোবাজার, এর মধ্যে এই সব আমোদপ্রমোদ আহ্লাদ করাটা কি ঠিক?'

কেয়াবৌদি জোরগলায় ঠিকরে উঠলেন, 'নিশ্চয়!' এই তো সময়। মানুষকে এই পৃথিবীর সমস্ত তিক্ততা ভুলিয়ে দেবার এইটাই তো একমাত্র উপায়! কালচারাল ফাংশান!'

আর একটা দুর্বল অস্ত্র প্রয়োগ করি, কিন্তু এই তো শর্টটাইম। বলছেন সামনেই দোলের দিন করবেন, এত শর্ট নোটিশে 'হল' পাবেন কোথায়?'

কেয়াবৌদি আমার এই বাঁশের তীর দেখে হেসে উঠলেন, 'সে তোমায় ভাবতে হবে না। ঊনিশ শো তেষট্টির মার্চ থেকে বুক করা আছে হল!'

'ঊনিশ শো তেষট্টি—'

দিশেহারা হয়ে তাকাই। 'তখন কি আপনার কিছু ঠিক ছিল?'

'কিছু না। কিন্তু হলটা ঠিক করে রাখতে হবে তো? দু'বছর আগে থাকতে বুক্ করে না রাখলে ভাল হল' আমি পাচ্ছি কোথায়?'

সসঙ্কোচে সন্দেহ প্রকাশ করে ফেলি, কিন্তু ধরুন যদি হয়ে না উঠতো। ধরুন আপনার ওই গুণ্ডাগুলোর ডেঙ্গু কি চিকেন পক্স হতো—'

'তাতে কি? ফাংশান না হলে হলটা আর কাউকে ট্রান্সফার করে দিতাম। লোকে পায় না, পেলে ডবল দাম দিয়ে লুফে নিতো!'

অবাক হয়ে তাকাই!

জগতের কিছুই জানি না। কে জানতো এসব হয়! অথচ কেয়াবৌদি সব জানেন। এই কেয়াবৌদিকে কথায় ভুলিয়ে নিবৃত্ত করবো আমি? মনের মধ্যে হিমালয়ের বোঝা নিয়ে চলে আসছি, কেয়াবৌদি থামান। বলেন, 'দাঁড়াও, আজই বিল্ বইটা ছাপতে দাওগে! আর ওই স্যুভেনিরের কাগজগুলোও কিনে ফেলগে চটপট। ভাল আর্টপেপার পাওয়া যায় না, সব সময়।...শ পাঁচেক ছাপতেই হবে, কি বল? না কি হাজার? নইলে 'কস্ট' উঠবে না! আর শোনো—ইয়েটা—আচ্ছা ওটা এখন থাক! বিল বইটা যেন কালই পাই। প্রেসকে বলো আর্জেন্টের দাম দেওয়া হবে! আর ইয়ে—'

~ www.amarboi.com ~

আর দেরী করি না। না শুনতে পাওয়ার ভানে চলে আসি।

নতুন দা, মানে কেয়াবৌদির 'ওঁর' কাছে গিয়ে পড়ি। বলি 'নতুনদা আবার?'

নতুনদা হতাশার সেই পেটেন্ট ভঙ্গিটি করেন।

'আপনি আটকাতে পারেন না?'

নতুনদা হাঁ হয়ে তাকান। বলেন, 'বোকা বলেই জানতাম তোকে, কিন্তু এত বোকা তা তো জানতাম না! ওকে আটকাবো আমি?'

'তা এই এক একটি দমকে আপনার তো—'

নতুনদা মৃদু হাসেন।

বলেন, 'যা অনিবার্য অপ্রতিরোধ্য দুর্বার, তাকে কে বাঁধবে, রুখবে, ঠেকাবে?'

না, কেউ ঠেকাতে পারে না।

নতুনদার ব্লাডপ্রেসার নয়, নতুনদার মার গেঁটে বাত নয়, নতুনদার ভাগ্নের বিয়ে নয়। কেউ পারে না। যাদের যে কোনো একজনই পাড়ার যে কোনো বৌদিকে পারতো। কেয়াবৌদিকে পারে না। কেয়াবৌদির উপাদান আলাদা।

কেয়াবৌদি রাগতে জানেন না, লজ্জা পেতে জানেন না, প্রতিকূলতায় নিরুৎসাহিত বা প্রতিবন্ধকতায় দুঃখিত হতে জানেন না। কেয়াবৌদি লক্ষে স্থির, সংকল্পে অচঞ্চল।

তবে?

অচঞ্চল বৌদি সব সময়।

ওই যে একপাল গুণ্ডা এসে বাড়িতে আড্ডা গাড়ে, বৌদি কি চঞ্চল হন? হন না। বৌদি শুধু ওদের সামনে চায়ের কৌটো, চিনির বোতল, দুধের ডেকচি নামিয়ে দিয়ে আর ইলেকট্রিক কেটলীটা দেখিয়ে দিয়ে বলেন, 'যা পারিস করে খা! আমার দ্বারা হবে না।'

আর ওরা যখন নিজেরাই বিস্কিটের টিন মাখনের কৌটো জেলির বোতল আর ডালমুটের জার নামিয়ে নিয়ে মহোল্লাস ধ্বনি তোলে, কেয়াবৌদি হেসে গড়িয়ে পড়ে বলেন, 'রাক্ষস! রাক্ষস! সব ক'টা এক একটা রাক্ষস!'

ফুরিয়ে যাবে ভেবে চাঞ্চল্য প্রকাশ করেন না, শুধু চাকরকে লেলিয়ে দেন নতুনদার দিকে। বলেন, 'যা, যা, সাহেবের কাছে টাকা নিগে যা! যা কিছু ফুরিয়েছে লিস্ট করে নিয়ে যা!'

তা লিস্ট তাকে এখন রোজই করতে হয়। অবোধ অজ্ঞান বেচারা, ভবিষ্যৎ না ভেবে কাজে ঢোকবার সময় বাহাদুরী দেখাতে, বলে ফেলেছিল, 'পড়তে জানি লিখতে জানি, সেই বাহাদুরীর প্রায়শ্চিত্ত করতে হচ্ছে পেন্সিলের সীস্ ভেঙে ভেঙে!

কিন্তু নতুনদার চাকরের দুঃখে আর কি বিগলিত হব? আমার কথা কে ভাববে? লিস্ট তো আমাকেও রোজ করতে হচ্ছে।

তার ওপর আবার ধারের হিসেব রাখতে হচ্ছে। লিস্ট করতে হচ্ছে কেয়াবৌদির ফরমাসী মালের। একটা অভিনয় খাড়া করা তো সোজা নয়? আর তার কত র‍্যালা!

~ www.amarboi.com ~

ধান থেকে পান, ছুঁচ থেকে কুঁচ কোনটা না চাই? পুজোর কোশাকুশি থেকে 'ব্ল্যাক হর্সের' খালি বোতল পর্যন্ত কোনটা না দরকার? কলকাতা শহর চষে বেড়াতে হচ্ছে আমাকে। তবু বাসে করে ঘোরাঘুরি করতে হচ্ছে না এই রক্ষে! কেয়াবৌদি জোর করে ট্যাক্সি চড়াচ্ছেন। ছাড়ছেন না, এখন অবিশ্যি নিজের পকেট থেকেই দিচ্ছি, টাকা উঠলে সব ধার শোধ করে দেবেন কেয়া বৌদি।

মাঝে মাঝে নতুনদা শুধোন, 'কত উঠল?'

কেয়াবৌদি চরমতম অবজ্ঞার ভঙ্গিতে বলেন, 'কোথায়? তাও তো আটান্নটা...না না বাষট্টিটা। তাও তো বেশির ভাগ ব' টিকিটের এগেন্‌স্টে। কেপ্পন কেপ্পন! মহা কেপ্পন সব! বিশ্বসুদ্ধু লোক একেবারে চক্ষুচর্মহীন গো! এত উৎসাহ, তত উৎসাহ, টাকার কথা পেড়েছ কি মুখ একেবারে বোদা বিচ্ছিরি! ছি ছি! টাকা পকেটে পুষে রেখে লাভ? আমোদ করার জন্যেই তো টাকা, কী বল, হ্যাঁ গো?'

নতুনদা তীব্র উৎসাহে বলেন, 'নিশ্চয়!'

কেয়াবৌদি বিজয়গর্বের হাসি হাসেন। তারপর বলেন, 'চাঁদার ওপর ভরসা করিও না, যা ভরসা টিকিট বিক্রী আর সেই ওই স্যুভেনিরটার ওপর! তা পাচ্ছি, বিজ্ঞাপন পাচ্ছি। ভালই থাকবে মনে হচ্ছে।'

নতুনদা বলেন, তা তোমার ওই কুল্লে যা উঠেছে, তোমার ট্রেজারারের কাছে রাখতে দিয়েছ তো?'

কেয়াবৌদি অবাক হয়ে বলেন, 'শোনো কথা! সে টাকা আছে নাকি? গানের মেয়েদের আগাম দিতে হচ্ছে না? তাদের তবলচীদের দিতে হচ্ছে না? যারা পার্ট নিচ্ছে তাদের গাড়ি করে আনা-নেওয়া করতে হচ্ছে না? খাওয়াতে হচ্ছে না? টাকা তো কবে ফুরিয়ে গেছে। সবই তো ধারের ওপর চলছে! এখন শুধু ভরসা ওই টিকিট বিক্রী আর স্যুভেনির!"

নতুনদা গম্ভীর হন।

'তার ভরসায় তো ধার বাড়িয়েই চলেছে। উঠবে তো অত টাকা?'

কেয়াবৌদি আত্মপ্রসাদের হাসি হাসেন।

'উঠবে না? রিহার্সালটা তো দেখলে না একদিনও!'

দেখিনি অবশ্য আমিও।

তবে শুনছি অপূর্ব হচ্ছে নাকি! হবারই কথা! এবার নাকি কেয়াবৌদি সেরা সেরা সব মেয়ে ছেলে জোগাড় করেছেন। তা ছাড়াও শব্দযন্ত্রে আর আলোকসম্পাতে নাকি প্রচুর খরচা করবেন!

এক একটা খবরের ঢেউ আনেন কেয়া বৌদি, আর উথলে উথলে ওঠেন। 'শুনছো গো, মেক্‌আপম্যান বলেছে—'....বলেন, 'শুনছো গো, ডান্সমাস্টার বলেছে—'

উথাল পাথাল সেই আহ্লাদের মধ্যে কে কি বলেছে, তা আর শুনতে পাওয়া যায় না!

~ www.amarboi.com ~

শুনতে পাওয়া যায় নতুনদার কথা!

সেও প্রায় উথলে উথলেই, তবু বুঝতে আটকায় না।...

'শুনেছিস, ভাগ্নের বিয়ের জন্যে আটত্রিশ কেজি চিনি জোগাড় করে রেখেছিলাম—এখান ওখান থেকে পাঁচ কে জি, সাত কেজি করে। তার একদানা নেই, সব চায়ে উঠে গেছে।'

'আটত্রিশ কেজি চিনি চায়ে উঠে গেছে!"

'গেছে! তাও শুনছি ইদানীং নাকি ওঁর বাছাদের বাতাসা দিয়ে চা খেতে হয়েছে! বোঝ ভাই! দিদিকে আমি বিয়ের চিনির ভরসা দিয়ে রেখেছিলাম!'...

আজকাল আর কেয়াবৌদির নিতান্ত নির্বন্ধেও ট্যাক্সি চড়ছি না, বাসে ট্রামেই ঘুরছি, তাই একটু বেশী টায়ার্ড বোধ করছি। নতুনদার মুখ দেখে আরো করলাম! বললাম, 'তারপর? এখন উপায়?'

'উপায় তোদের বৌদি দেখিয়ে দিয়েছে। বলেছে কিলো পিছু চারটাকা করে ধরে দিলে নাকি ওর সেই টাইফুন না আর্থকোয়েক কে একজন মণ মণ চিনি এনে দিতে পারে!'...বলে চিনির আবার ভাবনা?'

আবার শুনতে পাই, 'এ মাসে গয়লার বিল বাড়তি কত হয়েছে জানিস? একশো যোলো! তবু নাকি কনডেন্সড মিল্ক কিনে কিনেই—'

না, চিনির ব্যাপারটা ছাড়া আর কোনো কিছুতে ওথলাল না নতুনদা! ওঁর সেই দার্শনিকের পোজটি বজায় রেখেই বলেন 'এই দু'মাসের ইলেকট্রিক বিলটার হিসেব শুনবি? এ মাসের টেলিফোন বিল?'

কেয়াবৌদি শুনতে পেয়ে গালে হাত দেন। অবাক হয়ে বলেন, 'ওইসব তুচ্ছ জিনিসেরও হিসেব রাখছো তুমি? তা বেশ সব ধারে রাখো, দিয়ে দেব নয়া পয়সাটি পর্যন্ত মিটিয়ে।'

তারপর ক্রমশই পালটাতে থাকেন কেয়াবৌদি, ক্রমশই দুর্লভ হয়ে ওঠেন। বাড়িতে আর টিকিটি দেখা যায় না তার। গোটা তিন চার ছেলেকে বাহন করে চরে বেড়াচ্ছেন সারা শহরটা।—কখনো ট্যাক্সিতে, কখনো বাসে, কখনো ট্রামে কখনো পদব্রজে?...যেতে যেতে তেষ্টা পেলেই চা খাওয়া হয়, শরবৎ খাওয়া হয়, পান খাওয়া হয়। হৈ হৈ রৈ রৈ করতে করতে এগনো হয়।

বলি, 'কেয়াবৌদি, এবার যেন একটু বেশী বেশী—'

কেয়াবৌদি মুখ টিপে হাসেন।

কেয়াবৌদি ঝকমকিয়ে বলেন, 'এবার কি রকমটি হচ্ছে তা দেখো!'

অবশেষে সেই দেখার দিনটি আসে!

সকলেই দেখতে যাই।

নতুনদা নতুনদার গেঁটেবাত মা, এ ও সে এবং আমি।

নামকরা একটি হল, নতুন ঝকঝকে। লোক আসছে গাড়ি গাড়ি...ভিড়ে ভিড়!

~ www.amarboi.com ~

উৎফুল্লচিত্তে কাউন্টারে গিয়ে, জিগ্যেস করি, 'কি রকম কালেকশান হচ্ছে?'

এপাশে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছিল নতুনদার সেই নতুন বিয়ের ভাগ্নের ভাই। সে মাথা ঝাঁকিয়ে বলে, 'অষ্টরম্ভা! সব তো ফ্রি পাশ!'

'সব ফ্রি পাশ!'

'সব সব! ওই পিছনের দুটো রো বুঝি শুধু খালি ছিল!'

'তা এত সব ভিড়?'

'সব ফ্রি!'

সমালোচনা করবার মুখ নেই, আমিও 'ফ্রি পাশে' এসেছি! অতএব নিথর হয়ে যাই। নীরবেই দেখতে থাকি।

তা মিথ্যে বলব না, সত্যিই কেয়াবৌদি যেটি ঘটিয়ে তুলেছেন তা অপূর্ব! নতুনদাও যেন মোহিত হয়ে তাকিয়ে থাকেন বিদ্যুৎগতি কেয়াবৌদির কর্মক্ষমতা দেখে! সমস্ত দর্শকই কেয়াবৌদির নিমন্ত্রিত, তাই কেয়াবৌদি একবার করে তাদের কাছে আর একবার করে গ্রীনরুমে 'সাট্‌ল ককে'র মত ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছেন। কেয়াবৌদির মুখে সাফল্যের হাসি, চোখে আনন্দের অশ্রু।

কেয়াবৌদি সবাইকে ধরে ধরে প্রশ্ন করছেন, 'বলুন কেমন হয়েছে? বল ভাই কেমন হয়েছে!'

সবাই উচ্ছ্বসিত হন। হবেনই।

সত্যিই তো ভাল হয়েছে, তাছাড়া বিনে পয়সার ব্যাপার। উপরি লাভ আর্ট পেপারে ছাপা 'স্যুভেনির' খানা! কেউ কেনেনি। কিনবে কেন? ও মা সে কি! যাদের নেমন্তন্ন করে নিয়ে এসেছেন কেয়াবৌদি, তাদের কাছে কি এই তুচ্ছ পাঁচসিকে দামের প্রোগ্রাম বইটার দাম নেবেন?

অনুষ্ঠান শেষে 'জনগণমন' হয় যারা যারা অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেছেন, তাঁদের সেই সাজসজ্জা সংবলিত চেহারারই একখানা গ্রুপ ফটো তোলা হয় এবং সব শেষে পরিচালিকা প্রযোজিকা এবং সম্পাদিকা শ্রীমতী কেয়া মল্লিক সমবেত জনমণ্ডলীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।...যাঁরা নেচেছেন, গেয়েছেন, বাজিয়েছেন এবং বেজেছেন, তাঁদের সকলকে ধন্যবাদ দেবার পর, যাঁরা এতক্ষণ ঘাড় ব্যথা করে আর পায়ে ঝিঁ ঝিঁ ধরিয়ে বসে বসে দেখেছেন, তাঁদেরও ধন্যবাদ দেন কেয়া বৌদি।

তারপর কি বলে সেই বসন্তের মাধবী লতা'র মত ছল্‌ছল্‌ করতে করতে নতুনদার সঙ্গে গাড়িতে গিয়ে ওঠেন। এটা অবশ্য ট্যাক্সি। কেয়াবৌদির আমন্ত্রিতের মধ্যে গাড়ি অনেকেরই ছিল, কেয়াবৌদির পাড়ারই ছিল।

কিন্তু যাদের ছিল তারা তো আর কেয়া বৌদির জন্যে বসে থাকবে না? ঘাড়ের ব্যথা সারাবে না তারা? পায়ের ঝিঁ ঝিঁ ছাড়াবে না? সময়ে খাওয়াদাওয়া করবে না? এমনিতেই তো হয়ে গেছে রাত!

প্রাইভেট গাড়ি না হলো, তাতে কি! ট্যাক্সিরা তো আর ধর্মঘট করে বসেনি আজ?

~ www.amarboi.com ~

ভালই হলো।

আমারও বরং লাভ্ হলো। এইরাত্রে আবার বাসে যেতে হতো! ট্যাক্সিতেই নতুনদার কাছ ঘেঁষে বসেন বৌদি, হাসি হাসি মুখে বলেন, 'তুমি কিন্তু রাগ করতে পাবে না, একটা কাজ করে ফেলেছি তোমায় না জিগ্যেস করে!'

দেখতে পাই নতুনদা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাচ্ছেন। কেয়াবৌদি কৈফিয়ৎ দিচ্ছেন! কেয়াবৌদি বলছেন, 'তোমাকে না জিগ্যেস করে—'

নতুনদা বোধহয় অস্ফুটে বলেন, কি?'

কেয়াবৌদি হাসিটা আরো গাঢ় করে বলে, 'ওদের সবাইকে আমি নেমন্তন্ন করেছি সামনের রবিবারে।...মানে ভীষণ করে ধরেছিল সবাই, যদি সাকসেস হয়, সবাই একদিন মুরগী পোলাউ খাবে!"

নতুনদা নড়েচড়ে বসে বলেন, 'কারা? এই যারা সব দেখতে এসেছিল?'

'কী যে বল?'

কেয়াবৌদি লহরে লহরে হেসে ওঠেন। 'এই এতজনকে নেমন্তন্ন করবো আমি? মেয়ের বিয়ে নাকি?...বলেছি শুধু যারা পার্ট নিয়েছে, আর যারা খেটেছে তাদের। সব মিলিয়ে বড় জোর জনা পঞ্চাশ। বাড়ির লোকটোক নিয়ে না হয় ষাটই হল! এদের কিন্তু একটু ভাল করে খাইয়ে দিতে হবে তোমায়!'

নতুনদারও কী ধৈর্যচ্যুতি ঘটে?

না, ওটা আমার মনের ভ্রম?

গলা চড়াননি নতুনদা! শুধু বলেছেন, 'কোথা থেকে খাওয়াবো? এ পাওয়া যায় না, সে পাওয়া যায় না—'

'বোকো না বাপু, পাওয়া আবার কী না যায়?...শুধু চোখকান একটু খোলা রাখতে হয়, শুধু পকেটের দরজাটা একটু খোলা রাখতে হয়।'

ট্যাক্সি চলতে থাকে, বাড়ি নিকটবর্তী হয়, নতুনদা কি এতক্ষণে সাহস সঞ্চয় করেন? তাই গম্ভীর গলায় বলে, 'যাক তোমাদের আয়-ব্যয়ের হিসেবটা নিও 'ট্রেজারারে'র কাছ থেকে। দেখো কত খরচ হল, কতটা ব্যালেন্স থাকলো!'

'ব্যালেন্স! হিসেব?' কেয়াবৌদি যেন ভেঙে পড়েন হাসিতে আর খুশীতে! টাকা কি ওর কাছে একটাও রাখতে দিতে পেরেছি? বলে গাদা গাদা ধারই রয়েছে। হিসেব আমি তোমাকে মুখে মুখে দিয়ে দিচ্ছি—' প্রথম থেকে যা আশা করেছিলাম তার কিছুই তো হয়নি, টাকা উঠেছে মাত্র সাড়ে চারশো মত, আর খরচ—তোমাদের কাছে ধারকর্জ বাদে কোন না চোদ্দ-পনেরো শো!'

'চোদ্দ পনেরো শো!'

'ওমা! তা হবে না? তবু তো টানাকসা করে চালিয়েছি, সাহস করে তোমার কাছে চাইতে পারিনি। তা যাই হোক, হিসেবপত্তর করে যার কাছে যা ধার আছে সে সব শোধ করে দিও বাপু! 'ধেরো' হয়ে মরতে পারব না!'

~ www.amarboi.com ~

নতুনদা নাকের এবং মুখের একত্রিত একটা শব্দ করে বলেন, 'হুঁ! তা আমি যে এতদিন ধরে নয়া পয়সাটির পর্যন্ত বিল রেখে আসছি, সেটা কে মিটোবে?'

'সেটা?'

কেয়াবৌদি হেসে গাড়িয়ে পড়ে বলেন, 'সেটা আমি নে'ট ফাংশানে বুঝেসুঝে চালিয়ে ঠিক শোধ দিয়ে দেব দেখো!'

হাসতে হাসতে কেয়াবৌদির হাতের বটুয়াটা হাত থেকে পড়ে যায়।...সেই সেদিনের বটুয়াটা?

~ www.amarboi.com ~

এক পালকের পাখি

টেলিফোনটা বেজে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই গেটের বাইরে গাড়িটা এসে থামার শব্দ হল।

শুধুই তো থামার শব্দ নয়, যেন আবির্ভাবের দৃপ্ত ঘোষণা।

চিনুর মনে হয় শব্দটা যেন বেশী বাড়াবাড়ির মত। অরিন্দমেরই না হয় গাড়ি নতুন হয়েছে, এই অভিজাত পাড়ায় গাড়িবানের সংখ্যাতো কম নয়। তাদের গাড়িতে কী এমন দাপটে শব্দ ওঠে?

কিন্তু কে আবার এই সময় ফোন করতে বসল।

রিসিভারটা তুলে নিল চিনু।

দ্রুত ভঙ্গিতে বলল, হ্যালো! দ্রুত তো হতেই হবে। অরিন্দম তো এক মিনিটের অমনোযোগ সহ্য করবেনা। এসে যদি দেখে চিনু ফোনে কান দিয়ে বসে আছে রক্ষে থাকবেনা।

লাইনের ওপারে শব্দধ্বনিত হল। আর শুনেই চিনু একদম স্তব্ধ হয়ে গেল। চিনু সত্যিই এই ফোনটা প্রত্যাশা করেছিল? তাও এত তাড়াতাড়ি? যে চিঠিটায় চিনু ঠিকানা দেয়নি পরিচয় দেয়নি এমন কি হাতেও লেখেনি। টাইপ করে পাঠিয়েছিল ইংরেজীতে মাত্র কয়েক লাইন। বিশেষের মধ্যে শুধু যেই সম্বোধনহীন চিঠির তলায় নিজের নামটা ছিল। "চিনু" নয়, 'চিনচিন।' তবু শব্দভেদী বাণের মত সেই চিঠি ঠিক জায়গায় গিয়ে বিঁধেছে।

কিন্তু ও কি ফোন করার আর সময় পেলনা?

চিনুর হঠাৎ স্তব্ধতা ও থমকেও বোধ হয় কিছুটা বিমূঢ় করল। তারপর প্রশ্ন, কী হল?

চিনু আস্তে অথচ দ্রুতলয়ে বলল 'ও' এইমাত্র বাড়ি ফিরল। 'লাঞ্চ করতে আসে। দুটোর পর আবার অফিস যায়। দুটোর পর। এখন ব্যস্ত আছি। নামিয়ে রাখল রিসিভারটা। শেষ কথাটা বাড়তিই বলল, অরিন্দম চলে এসেছে বুঝে।

অরিন্দম ঘরে ঢুকল। টাইটা খুলতে খুলতে। টগবগে ঘোড়ার ভঙ্গী। কী হল? কাকে আবার দুটোর পর টাইম দিয়ে দুপুরের রেষ্টটা ঘোচালে? চিনু টেলিফোনের সামনের টুলটা থেকে উঠে দাঁড়াল। মুখ ফেরাল। আর আশ্চর্য কৌশলে একটা বিদ্যুতের ঝিলিক ফুটিয়ে বলে উঠল ইস। শুনে ফেললে।

নিরুপায় কানে ঢুকে পড়ল।—তারপর অবজ্ঞার গলায় বলল, লোকটা কে?

অবজ্ঞা অবশ্য অরিন্দমের 'লোক' মাত্রকেই।

চিনু মুখে আর একপ্রস্ত বিদ্যুৎ খেলিয়ে বলল, ও আমার এক পুরনো প্রেমিক।

~ www.amarboi.com ~

ঢং রাখো। তোমার সেই পান্টু মাসিটি বুঝি? জ্বালিয়ে খেল। স্পষ্ট বলে দিতে পারছ্না চাকরী গাছের ফল নয়। তাও আবার ওনার ওই বি, এ, ফেল ছেলের জন্যে।

একটু আগে চিনুর গলার খাঁজে খাঁজে আর রাগের চুলের গোড়ায় গোড়ায় কুচি কুচি খাম জমে উঠেছিল, হঠাৎ যেন একটা হালকা হাওয়ায় শুকিয়ে গেল সেগুলো।

চিনুর মুখে এখন যেন অসহায়তা ফুটে উঠল, বলল, এত ইয়ে করছেন, মুখের ওপর ওভাবে বলা যায়? আর উনি তো তবু ছেলের জন্যে একটা অফিসারের চাকরী চাইছেন না বাবা! বলছেন তো পিয়নের চাকরী হয় তাও ভাল।

চমৎকার। তারপর অফিসে সকলের সামনে তিনি আমার 'জামাইবাবু' বলে ডেকে বসুন। অন্ প্রিন্সিপল কোনো হতভাগা আত্মীয়ের চাকরী করে দিতে নেই। আজ এলে সাফ বলে দিও—

চিনু বলল, আসবেন না তো। আবার ফোন করতে বললাম।

অরিন্দম তাচ্ছিল্যের গলায় বলল, এত ফোন টোন করেন কোথা থেকে মহিলা?

চিনু এখন ব্যস্ত। ব্যস্ততার সঙ্গেই বলল, ওইতো বাড়িওয়ালাদের ঘর থেকে। হুঁ পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গতে ভালই জানেন।

এসব লোককে বেশী প্রশ্রয় দিতে নেই। চুলোয় যাক।...আজকের মেনুটা কী?

চিনু ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে বলল, টেবিলেই দেখতে পাবে। নিজস্ব গাড়ি হয়ে পর্যন্ত এই এক স্টাইল অরিন্দমের। লাঞ্চ করতে বাড়ি আসা! আগে যখন কোম্পানীর গাড়িতে অফিস যাওয়া আসা করতো তখন সেই সকাল বেলাই বরকে মোটা ব্রেকফাস্ট খাইয়ে 'লাঞ্চটা' গরম থাকার কৌশলে গড়া টিফিনকারি যাবে ভরে সেই গাড়িতে তুলে দিত। অরিন্দম অফিসে নিজস্ব নিভৃত কক্ষে সেগুলি বার করে সদ্ব্যবহার করতো। ভোজনবিলাসী বরের জন্যে সকালবেলা তাড়াহুড়ো কম ছিলনা চিনুর। একা রাঁধুনী ছোকরার পক্ষে সম্ভব হতনা দুদিকে তাল দেওয়া।

এখন আর সেই তাড়াহুড়োটা নেই। তবে নিত্য নতুন রকমারি রান্নার দায় বেড়েছে। দেশী বিদেশী সব রকম। রান্না ঘরে হ্যাম বীফ্ সব কিছুতেই প্রবেশাধিকার দিয়েছে বলেই যে সুক্ত মোচার ঘণ্ট ধোঁকার ডালনাংকে নির্বাসন দিয়েছে অরিন্দম তা মোটেই নয়। তার সব চাই।

চিনুর বর যে গাড়ির পেট্রল পুড়িয়ে বাড়িতে খেতে আসে এটি যেন চিনুর কাছে রোজই একটা 'বিশেষ ঘটনা' তুল্য হয়।

খেতে আসে, না দিগ্বিজয় করতে আসে। দামী গাড়িটা কিনে পর্যন্ত যেন ধরাকে সরা দেখছে অরিন্দম। যেন বিশ্বভুবনে কেউ আর এমন একখানা চকোলেট কালার উজ্জ্বল মসৃণ অ্যামবাসাডার-এর মালিক হয়নি।

এসময় অরিন্দম ড্রাইভারকে সঙ্গে নেয়না। তাকেও এসময় খাবার ছুটি দিয়ে নিজেই চালিয়ে আসে। স্মার্ট ভঙ্গিতে লাভ দিয়ে গাড়ি থেকে নামে, দমাস শব্দে গাড়ি বন্ধ করে, বাঁকা চোখে একবার নিজের ফ্ল্যাটের বারান্দার দিকে তাকায়। জানে সেখানে একজন

~ www.amarboi.com ~

প্রতীক্ষার মূর্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। (আজও বা তার ব্যতিক্রম হলো)

চিনুকে নিয়ে যখন কোথাও বেড়াতে যায় অরিন্দম, তখনো ড্রাইভার সঙ্গে থাকলেও, গাড়ির ষ্টিয়ারিংটা নিজের হাতে রাখে। ষ্টিয়ারিংটায় হাত দিলেই অরিন্দমের মুখে চোখে একটা অদ্ভুত বিশ্বনস্যাৎ জ্যোতি ফুটে ওঠে। যেন এই বিশ্বচক্রের ষ্টিয়ারিংটাই তার হাতের মুঠোয়।

যতদিন যাবে ততই যেন অরিন্দমের ভঙ্গিতে এই বিশ্বনস্যাৎ ভাবটা প্রখর হয়ে উঠছে। চালে চলনে কথায় বার্তায় সেকালের ভাষায় যাকে বলে 'মদগর্ব' সেটাই বেড়ে চলেছে।

কিন্তু কেন এই গর্বোদ্ধত ভঙ্গি, সেটা আর এখন চিনুর বুঝতে বাকি নেই। প্রথম প্রথম ঠিক বুঝতে পারতোনা চিনু নামের মেয়েটা।

হঠাৎ অবস্থা ফিরছিল, সংসারে অতি সচ্ছলতার জোয়ার আসছিল। ভালই লাগছিল। তখন অবরোধের আহলাদে বলেছে হ্যাঁগো তোমার যে নতুন ডিপার্টমেন্টে বদলি করে দিয়েছে, সেখানে বুঝি মাইনে অনেক বেশি? অরিন্দম বিদ্রূপের ভঙ্গিতে বলেছে, যদি বেশিই হয় তোমার খুব অসুবিধে হচ্ছে?

চিনু বলেছে, আহা কী যে বল। মনে হচ্ছে তাই বলছি।

কিন্তু ক্রমে আর 'মনে হওয়ার' সীমানায় থাকলনা। চিনু উত্তরোত্তর তার বরের পকেটের আর্থিক বিস্ফোরণ দেখে ভীত হতে থাকত, বিচলিত হতে থাকল।

রোজ রোজ এই তাড়াতাড়া একশোটাকার নোট এনে লকার বোঝাই করছ! কী এ?

অরিন্দম প্রথম দিন বলেছিল, সব কৈফিয়ৎ তোমায় দিতে হবে?

চিনু শক্ত গলায় বলেছিল, আমি একটা বিপদের গন্ধ পাচ্ছি।

আর সেদিন অরিন্দম হা হা করে হেসে বলে উঠেছিল, তোমার ঘ্রানেন্দ্রিয়টি বেশ জোরালো দেখছি। আরে বাবা ভয় পাবার কিছু নেই। এসব টাকা আমার এক বন্ধুর। একটা ব্যবসা ফেঁদে বসে বেশ লাভ করছে। অথচ—তা তোমার কাছে কেন? দেশে রাজ্যে ব্যাঙ্ক নেই?

আরে বাবা কথাটা শেষ করতেই দাও।

বলছি—অথচ ও এখনো সরকারি চাকুরে। নিজস্ব ব্যবসা করার নিয়ম নেই। তাই তাই তোমার বেনামীতে?

অসুবিধে কী? আমার তো আর সরকারি চাকরী নয়?

কিন্তু ভাওতা দিয়ে কতদিন চালানো যায়?

চিনু দেখছে বান্ডিল বান্ডিল নোট ব্যাঙ্কের লকারে চালান করা হয়ে গেছে, তথাপি বাড়ির গড্‌রেজের লকার উপচেছে।

অরিন্দম সেইসব কাগজপত্র আনছে বাড়িতে যাতে কালো টাকা হাপিস করে সাদা করে নেওয়া যায়।

~ www.amarboi.com ~

সরকারি আইনের বদান্যতা। তিনি একহাতে 'মারেন' আর অপর হাতে 'ধরেন'।

তবে এখন আর প্রশ্ন করতে সাহস করেনা চিনু। বরের ভয়ে নয়, অপমানের ভয়ে।

বলেছিল তোমার বন্ধুর যখন এতই হচ্ছে, তখন চাকরীটা ছেড়ে দিকনা। 'স্বনামে' প্রকাশিত হোক।

অরিন্দম ভুরু কুঁচকে তেতো গলায় বলেছিল, ওটা নিয়ে মাথা ঘামাবার তোমার কোনো দরকার আছে?

তোমার ভালমন্দ নিয়ে ভাবারও দরকার নেই আমার?

আমি খোকা নই। তুমি নিজের চরকায় তেল দাওগে। মহারানীর হালে রেখে দিয়েছি। সুখটাকে তারিয়ে তারিয়ে ভোগ কর বুঝলে? তা নয় কেবল ঘ্যান ঘ্যান প্যান প্যান।

মহারানীর হালে। হয়তো তাই। চিনুর নিজের আত্মীয় জনেরাইতো তাই ভাবে। তাই বলে। কত সুখ কত ঐশ্বর্য। অভাবের মধ্যে এই সাত আট বছরের মধ্যেও ঘরে একটা শিশুকণ্ঠের কাকলি ধ্বনিত হয়নি।

তা আর কী করা যাবে? চিনুর সৌখিন মেজাজি বর সাত তাড়াতাড়ি ওসব ঝামেলা চায় না তাই।

চিনু তাদের কি ডেকে ডেকে বলতে যাবে 'হ্যাঁ এক সময় চায়নি। এখন চেয়েও পাচ্ছেনা।'

চিনু শুধু বরকে বলছে ওরা কুকুরের জাত নয় বুঝলে? ইচ্ছে না হলে দূর দূর করবে, আর ইচ্ছে হলে তু তু করে ডাকলেই আসবে, এ হয়না। অরবিন্দর সাফ সাফ জবাব জগৎ জুড়ে তাই হচ্ছে তোমারই যত তত্ত্ব কথা। আসলে এখন বুঝতে পারছি প্রথম থেকেই সাবধান হবার কোনো দরকারই ছিলনা। তোমার মধ্যেই রয়েছে ডিফেক্ট।

চিনু লড়াইয়ে মেয়ে নয়। চিনু চুপ করে থেকেছে। চিনু প্রমাণ করতে উঠে পড়ে লাগেনি ডিফেক্টটা কার অথবা ভুলটা কোথায়।

চিনু শুধু বলেছিল, দিন তো কাটতে চায়না। একটা বরং চাকরী বাকরী ধরি। পাড়ায় শুনছি একটা বাচ্চাদের স্কুল খুলেছে—

ও তাই তুমি যাবে সেখানে মাষ্টারী করতে? পাগলামী ছাড়োতো!

যারা কাজ করে তারা পাগল?

সে তাদের ব্যাপার। আমার বৌ বাইরে যাবে চাকরী করতে? ইমপসিবল। দিন কাটেনা কেন? বই নেই? তোমার সাধের উল বোনা নেই? ঘর সাজানো ঘর গোছানো আর কীচেনের সব মারকাটারি মেনু? এরা কোথায় গেল? বলতো আরো কিছু রান্নার বই আনিয়ে দিই। চাইনিজ গোয়ানিজ রাশিয়ান আফ্রিকান যা বলবে।

চিনু ভয়ে বলেছে রক্ষে কারো।

অরিন্দম নিশ্চিত হয়েছে। মেয়ে জাতটার স্বভাবই এই সুখে থাকতে ভূতের কীল খেতে সাধ। এই যে তার মাসতুতো দিদি লাবু। সংসারে সুখের অবধি নেই, অথচ সেই

~ www.amarboi.com ~

সংসার ফেলে ফেলে লাবুদি যখন তখন কোথায় কোন গুরু আশ্রমে ছুটছেন, দু'চারদিন কাটিয়ে আসছেন। এটি হয়েছে জামাই বাবুর প্রশ্রয়েই। পয়লা রাত্তিরেই বেড়াল কাটতে হয়। বাঁশ পেকে গেলে আর নোয়ানো যায় না।

অরিন্দম অমন ভুল-করেনি। করবেও না। আজ পাড়ার ইস্কুলে চাকরী করতে যেতে দিলে, কাল রাইটার্স বিল্ডিঙে যেতে চাইবে কিনা কে জানে। সুন্দরী নারী! চেষ্টা করলে একখানা চাকরী বাগিয়ে ফেলা শক্ত নয়। সাবান ধোয়া হাতটা তোয়ালের মুছতে মুছতে অরিন্দম রাস্তার দিকের জানলার পর্দাটা একটু ভাল করে টেনে আড়াল করে নীচু গলায় বলল, খেতে যাবার আগে অ্যাটাচি থেকে দুটো প্যাকেট বার করে লকারে তুলে রেখে দাও।

শোনামাত্রই মুহূর্তে শক্ত হয়ে উঠল চিনু। শক্ত গলাতে ও বলল, আবার? হচ্ছেটা কী তোমার?

আরে বাবা, 'আরে' আবার কী? জানোতো ব্যাপার। লোকটা একটা ব্যাঙ্কের 'লকার' জোগাড় করতে হন্যে হয়ে বেড়াচ্ছে, পাচ্ছে না। পেয়ে গেলে চিনুর মাথার মধ্যে চড়াৎ করে উঠেছে, চিনু ফেটে পড়ে বলতে যাচ্ছিল, ওই ছেলে ভুলানো গল্পটা আর কতদিন চালানো হবে?

কিন্তু ফেটে পড়লনা চিনু।

সামলে নিল নিজেকে। নাঃ ব্যস্ত হয়ে কাজ নেই।

উচিত শিক্ষার ব্যবস্থা হচ্ছেই। চিনু সন্দেহের আওতার বাইরেই থাকুক।

চিনু তাই নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, লোকটার কপালে দুঃখ আছে। অরিন্দম হালকা গলায় বলল লোকটা তা'বলে বোকা নয়। ঠিকই ম্যানেজ করে ফেলবে। চাকরীটা ছেড়ে দিলেই তো আর আইনের আওতায় থাকবেনা।

তা ছেড়েই বা দিচ্ছে না কেন?

আরে বাবা যতদিন চালানো যায়।

তার মানে গাছেরও খাবে তলারও কুড়োবে?

যা বলেছ। কারেক্ট। কে বলে চিনু রানীর বুদ্ধি নেই। যাক দয়া করে কারো কাছে এসব গল্প করতে বোসোনা।

কার কাছে আবার আমি গল্প করতে বসব?

বলল চিনু। আর মনে মনে একটি হিংস্র হাসি হাসল। যে হাসিটার মানে হচ্ছে 'গল্প' করতে দেবনা। প্রত্যয় দর্শনের সুযোগ করিয়ে দেব। 'শিক্ষা' হওয়া দরকার তোমার একটু। দরকার শাস্তির।

তারপর মনে মনে ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে বলল, ঠাকুর ওর ভালর জন্যেই। ওকে এভাবে ধ্বংসের পথে যেতে দেবনা। ও একেবারে মাঝনদীতে ভেসে গেলে ওকে টেনে তুলবার অবস্থাতো আর থাকবেনা। ওকে একটা নাড়া দিতে হবে। চেতনা এনে দিতে হবে। ভুল শোধরাবার সুযোগ দিতে হবে।

~ www.amarboi.com ~

খেতে বসে অরিন্দম আর একবার বলল, বান্ডিলগুলো তুলেছতো? বাঃ তোমার সামনেইতো তুললাম।

ও হ্যাঁ। চাবিটা কোথায় রাখো?

কেন। বড় আলমারির লকারের মধ্যে। ব্যাঙ্ক লকারের চাবির সঙ্গে। আর কোথাও রাখতে হবে?

না না ঠিক আছে।

এরপর কী করবে? দেয়াল ভেঙ্গে চেম্বার গাঁথবে?

তুমি সব সময় এমনভাবে কথা বল যেন আমার বিরোধী পক্ষ।

আমার ধরণই এই।

মৌজ করে নানাবিধ পদ খেতে খেতে অরিন্দমের হঠাৎ মনে হল আজ যেন বৌ তার প্রতি তেমন মনোযোগী নয়।

বলল মুরগীর পা চিবোতে চিবোতে, আজ কী হল তোমার?

কী হবে?

কোন কথার কোন উত্তর দিচ্ছ না খাচ্ছ না ভাল করে।

মাথাটা ধরেছে একটু।

একটু নয় অনেকটাই। মুখ দেখে বুঝতে পারছি। আবার আজই বেলা দুটোর পর কাকে যেন আসবার টাইম দিলে। বারণ করে দাও।

আসতে বলিনি। ফোন করবে।

তা সেটাও ডিসটার্ব হওয়া। তুমি না পারো আমি বারণ করছি।

তুমি ওদের ফোন নম্বর জানো?

কী আশ্চর্য। আমি কোথা থেকে জানব? তুমি জানোনা?

না।

চমৎকার। এখন উপায়।

এখন আর কোন উপায় নেই।

শান্তভাবে বলল চিনু।

তারপর?

তারপর যা করবার করল।

বরের খাওয়ার পর হাত মুছতে তোয়ালে এগিয়ে দিল, হাতে মশলা দিল।

বারান্দায় চলে এসে বাচ্চাদের ভঙ্গিতে বরকে টা টাও করল।

আর তারপরই রাঁধুনী ছেলেটাকে ডেকে বলল, সুনীল একবার তালতলায় যেতে পারবি?

তালতলায় কেন?

~ www.amarboi.com ~

সেই যে আমার এক মাসি আছে তালতলায় পেন্টুমাসি বলি, তাদের একটু খোঁজ খবর নিয়ে আয়না। অনেকদিন খবর পাইনি। বাস ভাড়া দিচ্ছি গায়ে রোদ লাগিয়ে একটু ঘুরে আয় বাবা। খবর টবর জেনে নিস ভাল করে।

ছেলেটা অবশ্য এসব কাজে একপায়ে খাড়া।

যাক নিশ্চিন্ত। এক ঢিলে দু'পাখি মারা গেল।

সুনীল চলে যেতেই হঠাৎ ভিতরে ভিতরে কেমন একটা অসহায়তা অনুভব করল চিনু। তারপর ভাবল ঠিকই করলাম।

এখন শুধু ঘড়ি দেখা।

না, দুটোর সময় কোনো অবাঞ্ছিত ফোন আসবেনা। আসবে একজন আকাঙ্খিত মানুষ।

লোকটা এলো কাঁটায় কাঁটায় দুটোয়।

লিফটের সুবিধে আছে। উঠে এসেছে নাম নম্বর মিলিয়ে ফ্ল্যাটের দরজায়। দরজা খুলে দিয়েই চিনু যেন অবাক হয়ে গেল। এই সাত আট বছরেও লোকটার চেহারার এতটুকু বদল হয়নি। তেমনি ঝকঝকে তেমনি স্মার্ট। দু'পা পিছিয়ে এসে বলল, খুব পাংচুয়াল তো!

হুঁ। যাক তোমার 'ও'র লাঞ্চ সেরে ফিরে যাওয়া হয়েছে?

হয়েছে। এসো বসবে চলো।

ঘরে এল। বসল।

চিনচিন!

চিনু কিছু বললনা। শুধু তাকাল।

হঠাৎ এমন জরুরি তলব কেন?

জরুরি কোথা?

চিনু হাসবার চেষ্টা করল, শুধুতো লিখে ছিল একটু বিপদে পড়ে ডাকছি। সেটাই কী আমার কাছে দারুণ জরুরি নয়?

চিনু শুধু আঁচল তুলে কপালের ঘাম মোছে। পাখার স্পীডটা বাড়িয়ে দেয়। তারপর বলে আচ্ছা। একেবারেই বুঝতে পেরেছিলে?

পারবনা?...

বাঃ! আমিতো হাতের লেখাও খরচ করিনি।

চিনচিন!

কুশলদা।

এ জগতে আর কার নাম আছে 'চিনচিন?' যেটা শোনামাত্রই কোথায় কোন গভীরে চিনচিন করে ওঠে।

তারপর চারিদিক তাকিয়ে হঠাৎই একটু হেসে বলে, কিন্তু বিপদটা কী?

~ www.amarboi.com ~

দেখে শুনে তো বেশ সম্পদের চিহ্নই চোখে পড়ছে।

চিনু গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, সেটাই তো বিপদ। ... আহা কুশলদা, তুমিতো সরকারের আয়কর বিভাগে কাজ কর?

আচমকা এহেন প্রশ্নে চমকে ওঠে কুশল।

সাবধান করে দিতে চাই।

ওঃ।

কুশল হাতটা সরিয়ে নিল। বলল কিসে এতো কালো টাকা করেছে তোমার বর?

জানিনা। আমায়তো 'ধাপ্পার' ওপর রেখেছো। ঘুষছাড়া আর কী হবে? ঘুষই। এখন যে ডিপার্টমেন্ট আছে—

কুশল কথার মাঝখানেই বলে ওঠে, জানি কোথায় আছে।

এখনো তুমি আমার এতো খবর রাখো কুশলদা?

কুশল শুধু একটু হাসল।

তারপর বলল, এখন বল আমি তোমার কোন্ কাজে লাগতে পারি? ওইতো বললাম, সত্যি বিপদে পড়ার আগে একটা ধাক্কায় ওকে শিক্ষা দিয়ে দাও। তোমায় তো ও চেনেনা, তুমি একটা ফলস্ ওয়ারেন্ট বার করে এনে বাড়ি সার্চ করো। কালো টাকাদের বাড়ি ছাড়া করো—

কুশল পকেট থেকে সিগারেট কেস বার করে। একটা সিগারেট নিয়ে লাইটারে জ্বালিয়ে নেয়, তারপর খানিকটা ধোয়া ছেড়ে বলে, তার মানে খানিকটা অভিনয়ে গোয়েন্দা গল্পের একটি দৃশ্য মঞ্চে উপস্থাপন।

ঠিক ঠিক।

চিনু উচ্ছসিত হয়ে বলে ঠিক ধরেছ।

কুশল গম্ভীর গলায় বলে, কিন্তু চিনু, জানোতো আমি সরকারের চাকর। যদি অভিনয়ের বদলে ঘটনাটা সত্যিই ঘটাই?

চিনু তার বড়বড় দুই চোখ তুলে বলে, তা তুমি পারবেনা জানি। কুশল স্থির গলায় বলে, এতটা নিশ্চিন্ততা?

নিশ্চয়।

তারপর বলে ওঠে, আহা তুমি দু'মিনিট বসো, একটু চা করে আনি। এই না না থাক। চায়ের দরকার নেই। তুমি বোসো! অমূল্য এই সময়টুকু বাজে খরচ করবে কেন?

চিনুর মুখটা আবার লাল হয়ে উঠল। বলল্ আহা! অমূল্য না ছাই। কই একবারও তো একটা ফোনও করনা।

সাহসের অভাব।

চিনু হঠাৎ হেসে ওঠে। বলে চিরকাল একরকম। কথার প্যাঁচেই যাক। তাহলে নাটকের একটি দৃশ্যে রাজী তো?

কুশল সিগারেটটায় শেষ টান দিয়ে অ্যাশট্রেয় গুঁজে রেখে তাচ্ছিল্যের গলায় বলল,

~ www.amarboi.com ~

মশা মারতে কামান দাগা হবে না তো?

কত টাকা করেছে তোমার বর?

চিনুর মুখে একটি আত্মপ্রসাদের হাসি ফুটে ওঠে গোড়ায় গোড়ায় গুণতে চেষ্টা করেছি, এখন আর করিনা। তবে নেহাৎ বোধহয় মশা মারতে কামান দাগা হবে না। দাঁড়াও দেখাচ্ছি।...দোহাই তোমার কুশলদা। আমার জন্যে একটু অভিনয় করো। এমন একটা দিন আর সময় বেছে নাও যাতে ও বাড়িতে থাকে। তারপর ইঃ ভাবতে বেজায় মজা লাগছে, তুমি যখন জেরা করবে কী মশাই এসব টাকা কোথা থেকে এল? তখন ওর মুখ চোখের অবস্থা কেমন হবে? আচ্ছা নিজের চোখে দেখেই নাও। দ্যাখো এই বস্তাবস্তা টাকা তোমাদের আইনে পড়ে কিনা। তাছাড়া ব্যাঙ্কের লকারের খোল উপছে গেছে। আরও একটা লকারের খোঁজে হন্যে হয়ে বেড়াচ্ছে। এসো ওঘরে আমার সঙ্গে এসো।

চিনু উঠে গেল।

চিনু রাজহংসীর ভঙ্গিতে চলে এল শোবার ঘরে। যে চাবিটা তখন বড় আলমারিতে না রেখে ড্রয়ারে রেখেছিল, সেইটা বার করে নিয়ে গডরেজের নতুন লকারটা খুলে ফেলল।

সামনে থেকে সরে পাশে দাঁড়িয়ে বলল, কুশলদা। দেখছ?

হ্যাঁ দেখছি বৈ কি!

কুশল আর এখন তার একদার প্রিয়ার মুখের রেখা পাঠ করতে বসছেনা। কুশল শুধু তার সামনে মেলে ধরা আলমারিটার খোলা কপাটের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে দেখছে।

বাণ্ডিল বাণ্ডিল ব্যাঙ্ক নোট।

কী? গুণে ফেলতে পারবে?

চিনু একটু কৌতুকের গলায় বলে, তুমি বরং সেই চেষ্টাই কর। আমি চা নিয়ে আসছি।...দ্যাখো নেহাৎ মশা কিনা।

চিনু, কুশল ব্যগ্রভাবে বলে, তোমার কাজের লোক টোক কাউকে বলনা চায়ের কথা। তুমি কেন? তুমি থাকো।

কাজের লোক?

চিনু একটু রহস্যময় হেসে উঠে বলে তাকে বাড়িছাড়া করেছি।

আরে। কেন?

বলতো কেন?

কাউকে সাক্ষী রাখতে চাওনা। কেমন?

বাঃ। ধরেইতো ফেলেছ। আমি চাইনা ও আমার দিকে একবারও সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকাক।

কুশলের চোখ এখনো বিস্ফারিত। কুশল চোখ দিয়েই বাণ্ডিল গোনবার চেষ্টা করছে।

~ www.amarboi.com ~

এখন বলল, চিনচিন।

ওই নামটায় ডেকোনা কুশলদা। আমারও ভেতরটা চিনচিন করে ওঠে। নামটা নতুন করে মনে পড়িয়ে দিয়েছ তুমিই।

সেতো 'অভিজ্ঞান অঙ্গুরীয়'। হি হি বোসো।

এই শুধু চা। তবে যদি—

কী হল? থামলে যে?

না বলছিলাম তবে যদি ঘরে কিছু থাকে দিতে পারো। আমার আবার শুধু চা খাওয়ায় ডাক্তারের নিষেধ।

কুশলদা। তুমি ভাবলে কী করে চায়ের সঙ্গে তুমি কী কী ভালোবাসো তাকি একেবারেই ভুলে গেছি?

চিনু বলে গেল মুখে হাসির ঝিলিক ফুটিয়ে কুশলের সামনে খোলা আলমারি রেখে। চিনুর মনের মধ্যে আহলাদের জোয়ার। তাক লাগিয়ে দেবে আজ কুশলকে।

রাতের জন্যে চপ বানাতে মাংসের পুর করা আছে। তা থেকে খানিকটা নিয়ে ডিমের পার্টিসাপটা বানিয়ে ফেলে চায়ের সঙ্গে পরিবেশন করবে। দু মিনিটের কাজ। গ্যাস ষ্টোভের এক দিকে চায়ের জল চাপালো চিনু আর অন্য দিকে ফ্রাই প্যান। চপ জিনিসটা ভারী প্রিয় ছিল কুশলের।

এখন কি আর নেই? কোনো প্রিয় বস্তু কি তার প্রিয়ত্ব হারায়? প্লেটে খাবারটা দেখে কুশল কী অভিভূত বিস্ময়ে ডেকে উঠবে চিনচিন। সেইটি ভেবেই চিনুর মনের মধ্যেটা চিনচিন করে ওঠে।

কিন্তু কুশল কি সেই অভিভূত আবেগের গলায় 'চিনচিন' বলে ডেকে উঠেছিল? নাঃ। অন্ততঃ সেটি শোনবার সুযোগ হলনা চিনুর জীবনে।

চিনু দুহাতে দুটো জিনিস নিয়ে ঘরে এসে ঢুকল। তারপর চিনুর হাত থেকে জিনিস দুটো পড়ে গেল। চিনুর ঘরের মেঝেয় পাতা দামী কার্পেটটা চা পড়ে ভিজে নষ্ট হয়ে গেল।

পায়ের তলায় মাটি হারানো একটা অতলস্পর্শ গভীর গহবরের মধ্যে ক্রমশঃ তলিয়ে যেতে লাগল চিনু একটা পাথরের পুতুলের মত।

চিনু কি বারান্দায় বেরিয়ে দেখতে যাবে? চিনু কি 'অ্যাটাচ্য বাথরুমটার দরজায় কান পেত শুনতে চেষ্টা করবে ভিতরে জলের শব্দ হচ্ছে কিনা বুঝতে? না কি চিনু চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ডাকব কুশলদা। কুশলদা। চা এনেছি কোথায় গেলে হঠাৎ?

নাঃ। এসব কেন করতে যাবে চিনু? চিনুর বরের নতুন কেনা গডরেজ লকারটা একটা ভয়ঙ্কর শূন্যতার হ্যাঁ নিয়ে দাঁড়িয়ে সব কিছু চেষ্টা থেকে নিবৃত্ত করতে? অদ্ভুত একটা ভাবশূন্য দৃষ্টিতে বোকার মত তাকিয়ে থাকে চিনু কতক্ষণ কে জানে। কয়েক মিনিট না কয়েক যুগ?

চিনুর পায়ের কাছে ডাঁই করে পড়ে রয়েছে এগুলো কী? চিনুর একরাশ শাড়ি জামা

~ www.amarboi.com ~

না? এখানে কোথা থেকে এল এগুলো? পাশের ঘরে একটা সুটকেসের মধ্যে ছিলনা? চিন্তাহীন চেতনাহীন, বুঝিবা অস্তিত্বহীন একটা অদ্ভুত অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়েই থাকে চিনু বোধ শক্তি হারিয়ে।

কিন্তু—।

কুশল নামের সেই লোকটাকে কি খুব দোষ দেওয়া যায়? সে তো অনেকখানি আশা নিয়েই ছুটে এসেছিল। ভেবেছিল চিনু বলে উঠবে কুশলদা আর পারছিনা আমায় বাঁচাও।

বোকা চিনু তা বলেনি। বলেছে কুশলদা 'ওকে বাঁচাও'। তার মানে চিনু তার মৃত ভালোবাসাকে ভাঙিয়ে খেতে চেয়েছে তবে? কী দায় কুশলের একটি মরে যাওয়া ভালবাসার ভষ্মশেষের বিনিময়ে মুঠোয় এসে পড়া অগাধ অর্থ ছেড়ে দিয়ে এসে সেই বাঁচানোটা বাঁচাতে?

চিনুও মারা পড়বে। উপায় কী? বোকারা মারাই পড়ে। স্বেচ্ছায় যখন আপন মৃত্যুবাণটা তুলে দিয়েছে অন্যের হাতে।

~ www.amarboi.com ~

ঘটনার নেপথ্যে

গতকাল রাত্তির পর্যন্তও বাড়িতে কিছু চাঞ্চল্য ছিল, এখানে ওখানে কিছু জটলা। গলা নামিয়ে কথা বললেও, মাঝে মাঝে হঠাৎ হঠাৎ এক একজনের গলার স্বর উচ্চকিত হয়ে উঠছিল।

আজ সকাল থেকে বাড়িটা যেন হঠাৎ বোবা বনে গেছে। কেউ কারো সঙ্গে কথা বলছে না, কেউ কারো মুখের দিকে তাকিয়ে দেখছে না। মনে হচ্ছে চোখাচোখি হয়ে যাবার ভয়েই কেউ কারো কাছাকাছি আসছে না।

এই মস্ত তিনতলা বাড়িখানার মধ্যে কে কোন্খানে রয়েছে টের পাওয়া যাচ্ছে না।

অথচ আছেও তো বেশ কয়েকজন।

সরমার দুই বিবাহিতা মেয়ে যারা গতকাল সন্ধ্যায় এবাড়িতে এসেছে রয়েছে। সরমার অবিবাহিতা ছোট মেয়েটা তো আছেই।

আর সরমার অবিবাহিত ছোট ছেলেটা?

সেও হয়তো বাড়িতেই আছে। অথবা এখন নেই। তবে রাতে তো ছিল। খেয়েছিল কিনা আর ঘুমিয়েছিল কিনা, সে খবরটা আজ জানা নেই সরমার।

কিন্তু সরমার বিবাহিত বড় ছেলেটা?

সেও একসময় এই বাড়িতেই থাকত না? খেত, ঘুমোত, লম্বা চওড়া কথা বলত, আরো কত কীই যেন করত!

না, সে ছেলেটার পায়ের শব্দ, গলার শব্দ অনেকদিনই আর এ বাড়িতে শোনা যায় না। আর—সেই না যাওয়াটা তো ক্রমেই অভ্যাস হয়ে গেছে।

সরমার দুই জামাই-ও গতকাল থেকে এখানেই রয়েছে, তারাও যে লম্বা-চওড়া কথা বলতে জানে না তা নয়, তবে আজ বলছে না।

এইসব ছাড়া সরমার সংসারে পুরনো নতুন মিলিয়ে গোটা তিন চার কাজের লোক আছে। গতকাল থেকে তাদের কাজ বেশ খানিকটা বেড়ে গেছে, সরমা নির্দেশ দিতে না এলেও তারা জানে দিদিমণিরা জামাইবাবুরা এলে রান্নাঘরে কতটা কী করতে হয়।

হয়তো আজ ততটা না করলেও চলত, কেউ কিছু বলত না, কিন্তু সেটা তাদের জানবার কথা নয়। তারা শুধু আজ বাড়ির নিথরতার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিথর হয়ে রয়েছে। কাজগুলো করে চলেছে নিঃশব্দে।

সরমার এই বাড়িতে আপাতত এরাই রয়েছে আর রয়েছেন সরমা নিজে।

তিনতলার এই ঘরখানায়।

যে ঘরখানা বাড়ির মধ্যে সব থেকে বড়, সব থেকে হাওয়াদার, সব থেকে সুন্দর।

~ www.amarboi.com ~

বলতে গেলে, এই ঘরটাই পুরো তিনতলা। ঘরের আনুষঙ্গিক হিসেবে এধারে ওধারে বাথরুম ব'রুম ঢাকা বারান্দা খোলা বারান্দা।

ঘরটাই শুধু যে সুন্দর তা নয়, বাড়ির মধ্যে সব থেকে সুন্দর করে সাজানোও।

এই ঘরটা সরমার বড় ছেলের ঘর।

অথবা একদা যাকে বলা হতো ছেলেবৌয়ের ঘর।

সরমা এই ঘরটাতেই বসে আছেন।

সোফায় নয়, চেয়ারে নয়, খাট বিছানায় নয়, বসে আছেন মাটিতে, দুটো জানলার মাঝখানের সরু দেয়ালটায় ঠেস দিয়ে।

কিন্তু কতক্ষণ বসে আছেন?

কত বছর? কত যুগ?

বসে থেকে থেকে কি পাথর হয়ে গেছেন নাকি?

তা নইলে এমন অনড় হয়ে আছেন কী করে?

পাখাটা ফুল ফোর্সে খোলা রয়েছে বলেই সরমার খোলা চুলের গোছা উড়ছে, উড়ছে চওড়া-পাড় শাড়ির এলোমোলো ভাবে ছড়িয়ে থাকা আঁচলটা। সরমা হাত নেড়ে একটু ঠিকও করে নিচ্ছেন না।

কতদিন পরে তিনতলায় উঠে এসেছেন সরমা? কতদিন পরে এই ঘরটায় ঢুকেছেন?

একবরছর? দুবছর? তিন বছর?

কে জানে। সময়ের হিসেবও আর তেমন সঠিকভাবে মাথায় থাকে না। ভাবতে গেলে মাথা গুলিয়ে যায়।

শেষ যেদিন এসেছিলেন, সেটা একটা শীতকালের রাত না?

তারপরে আরো দুটো শীতকাল চলে গেছে মনে হচ্ছে। এখনতো খুব গরম চলছে। তাহলে?

যাকগে মরুকগে। কী হবে ওই হিসেবটা নিয়ে? সরমার দিন রাত মাস বছর কিছুই যেন আলাদা নেই। শুধু জমাটবাঁধা একখণ্ড সময়।

অথচ সেই জমাটবাঁধা ঝাপ্‌সা ঝপ্‌সা সময়টার মধ্যেও এই মস্ত তিনতলা বাড়িটার মধ্যে জীবনযাত্রার লীলা চলেও চলেছে। ছোট মেয়ে এম.এ-র জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে। ছোট ছেলে ঠিক কী করছে, তা সরমার সঠিক জানা না থাকলেও কিছু একটা করছেই মনে হয়।

আচ্ছা, ও তখন, সেই শীতকালটায় সি. এ. পড়ত না? বোধহয়। ভাবলে মনে পড়ে।

এই জমাটবাঁধা সময়টার মধ্যে বড় মেজ দুই মেয়ে সপুত্র-কন্যা সস্বামী কতবারই এসেছে থেকেছে বেড়িয়ে চলেও গেছে। খাওয়ামাখা করেছে হঠাৎ হঠাৎ হাসি গল্পের ঢেউও উঠেছে বাড়ির বাতাসে। আবার যেন হঠাৎ কী একটা মনে পড়ে যাওয়ায় চট করে থেমেও পড়েছে।

~ www.amarboi.com ~

কী মনে পড়েছে? এবাড়ির বাতাসে এখন হাসির শব্দ মানায় না? তা এতোটাই কি আর মানা যায়? বেমানান কাজ কি কেউ কোথাও করছে না? পৃথিবী জুড়েই তো বেমানান কাজের কারবার।

এই যে সরমার ছোট মেয়ে এই পরিস্থিতিতেও দারুণভাবে প্রেম করছে, এটা কি মানানসই? তার কি মনে পড়া উচিত ছিল না এবাড়ির বড় ছেলেটিও একদা এই ইতিহাসই সৃষ্টি করেছিল?

আর এ বাড়ির মেজ মেয়ে? সে যে যখনই বাপের বাড়ি আসে বেদম সেজে, সেটাই কি খুব মানানসই? তবু সবই চোখে সরে যায়। এটাই পৃথিবীর নিয়ম।

সরমাই কি এই 'জমাট' সময়টার মধ্যেও খাচ্ছেন না? ঘুমোচ্ছেন না? গরমে পাখা খাচ্ছেন না? শীতে গায়ে লেপ ঢাকছেন না? অসুখ করলে ওষুধই কি না খাচ্ছেন? 'খাবনা' বলে ধাষ্টামো করবেন না বলেই খাচ্ছেন।

তবে এই সময়টার অন্তরালে বিশেষ একটা ঘটনা প্রবাহ বয়ে চলেছে অবিচ্ছিন্ন ধারায়। সরমাকেও মাঝে মাঝে তার সামিল হতে হচ্ছে। হতে বাধ্য বলেই হচ্ছে।

ওই ঘটনার সূত্র ধরেই মাঝে মাঝে এক একসময় বাড়িতে নিঃশব্দ চাঞ্চল্যের স্রোত বইছে, গৃহকর্তা দুই জামাই এবং আরো কেউ কেউয়ের সঙ্গে গোপন বৈঠক বসছেন, দারুণ উত্তেজিত দেখাচ্ছে সবাইকে।

আবার এক একসময় কেমন ঝিমিয়ে যাচ্ছে সবাই, মিইয়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে একটি নাটক অভিনীত হয়ে চলেছে, যার নাম দেওয়া যেতে পারে "আশা আকাঙক্ষা ধৈর্য"। এ নাটকের কুশীলবের মধ্যে সরমাও একজন। তবে সরমার ভূমিকা তেমন উচ্চকিত নয়।

সেই কবে থেকে যেন বাড়িতে বাংলা খবরের কাগজ আসা বন্ধ হয়ে গেছে এবং ইংরিজি যে দুটো আসে তাদেরও মাঝে মাঝে আসামাত্রই লুকিয়ে ফেলা হয়।

যদিও কারণ কিছু নেই। কার ভয়ে? সরমা তো তদবধি আর খবরের কাগজ ছোন না। অথচ একদা সরমার কাগজ পড়ার নেশা বাড়িতে হাসির খোরাক ছিল।

বাংলা কাগজ বন্ধ করা হয়েছে অবশ্য রান্নাঘরের ভাঁড়ার ঘরের ভারপ্রাপ্ত 'কাজের লোকদের' জন্যে। আগে না থাক হঠাৎই তাদের কাগজ নিয়ে টানাটানি করতে দেখা গিয়েছিল। সুকুমারী বাসনামাজুনি নিরক্ষর। কিন্তু অক্ষরের ভাষা না বুঝলেও ছবির ভাষা বুঝতে আটকায় না।

কৌতূহল উদগ্র? বাড়িতে কাগজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বলেই কি আর তাদের কৌতূহল চরিতার্থ হচ্ছে না? অন্য মুনিববাড়িতে কাগজ নেই? তাঁদের ভিতর সহৃদয়তা নেই? না চাইতেই ধরে দেখিয়ে দেবেন না? প্রশ্ন করবেন না : হ্যাঁরে, তো বাড়ির অবস্থা এখন কেমন?

তিনতলার এই ঘরটার সেই শীতের রাতের পর থেকে তো আর ওঠেননি সরমা,

~ www.amarboi.com ~

কেউই ওঠে না, বাদে উমাপদ। সে নিত্যদিন চাবি খুলে ঘর ঝাড়া মোছা করে আবার চাবি বন্ধ করে রেখে দেয়। আজই সরমা নিজে চাবিটা চেয়ে নিয়েছিলেন উমাপদর কাছে।

কিন্তু আজই বা কেন?

আজই বা কেন কেই সকাল থেকে সারাদিন এইখানে বসে আছেন সরমা স্ট্যাচুর মত। মাটিতে দেওয়ালে ঠেশ দিয়ে।

মাঝে মাঝে একটা অন্যমনস্ক ছায়াছায়া দৃষ্টি তুলে ঘরটাকে দেখছেন সরমা। এই ঘরেই খোকার ফুলশয্যা হয়েছিল না?

হবারই তো কথা। ওই 'ফুলশয্যা'র উপলক্ষেই তো সরমা জেদাজিদি করে তিনতলায় এই অ্যাপার্টমেন্টটি বানিয়ে রেখেছিলেন।

কর্তা বলেছিলেন এতবড় দোতলাটায় তোমার ছেলে বৌয়ের জন্যে একটা ঘর কুলোবে না? না হয় আমরাই ওই পশ্চিমদিকে ঘরটায়—

সরমা খুব রেগে গিয়েছিলেন। বলেছিলেন, কেন? খোকা খোকার বৌয়ের জন্যে অমন 'কোনমতে ব্যবস্থা' হবে কেন? তোমার এত অভাব? তিনতলাটা তোলার কথাটা তো কতদিন থেকেই হয়ে আছে। মেয়েরা আসে থাকে, তাদের বাচ্চাকাচ্চার হৈ চৈ আছে। তার মধ্যে বিয়ে হলে খোকা একটু নিরিবিলি পাবে না।

অতএব রাম না হতেই রামায়ণ।

খোকার বিয়ে হবার আগেই তারজন্যে নতুন বৌ নিয়ে নিরিবিলি থাকার সুখময় ব্যবস্থা!

তা বৌ তো আসবেই। এলও।

ফুলশয্যা হল, ভেলভেটের চাদর পাতা ডানলোপিলোর গদিদার জোড়া খাটটায়।

ডেকরেটারের লোক এসে ফুলের মশারি বানিয়ে দিয়ে গিয়েছিল ঠিক সিনেমায় দেখা ছবি-টবির মত। ফুল আর দামী বিদেশী সেন্টের মিশ্রিত সৌরভ কতদিন পর্যন্ত যেন ঘরটার বাতাসে রয়ে গিয়েছিল।

না কি দেওয়ালে দেওয়ালে আটকে গিয়েছিল? আটকেই আছে? না হলে হঠাৎ হঠাৎ কেন সেই তীব্র সৌরভটা অনুভবে এসে ধাক্কা দিয়ে যাচ্ছে?

ওই ধাক্কাটার ফলেই কি সরমার স্নায়ুতে স্নায়ুতে একটা বিপ্লব ঘটে গেল? ওই ফুল আর সেন্ট-এর গন্ধ ছাপিয়ে একটা চামড়া পোড়া মত গন্ধ পেলেন কেন? তার সঙ্গে চোখ জ্বালা করা ধোঁয়া।

তা ধোঁয়াটা তো দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। পর্দা ফেলা কাঁচের জানলাদার ঘরের মধ্যে তো একটি মোমের আলোর স্নিগ্ধতা আর নির্মল শুভ্রতাও।

তবু চোখ জ্বালা করছে। খুব বেশি জ্বালা।

সরমা যেন হঠাৎ কোনো প্রাচীন পর্বত গুহার মধ্যে এসে পড়েছেন। যেন গুহাপাত্রে চিত্রমালা আঁকা রয়েছে। সরমা টুরিস্টের চোখ নিয়ে তাকিয়ে দেখে যাচ্ছেন।

~ www.amarboi.com ~

সেই ফুলশয্যার পরদিন থেকেই আঁকা রয়েছে গুহার গায়ে।

বেপরোয়া উদ্দাম প্রেমের কুণ্ঠাহীন দৃশ্য।

দেখে দেখে ভারি বিরক্ত বোধ করছেন সরমা।

কী ভেবেছে এরা? ঘরে সংসার আর লোক নেই। 'গুরুজন' শব্দটার কি মানে ভুলে গেছে?

সকালবেলা নটা বেজে গেছে, পড়ে ঘুমোচ্ছে?

অথবা ঘুমোচ্ছে না জেগে জেগেই দিনকে রাত করে মধুর রসের আবেশে ডুবে আছে? ছি ছি।

সরমা তো দেখতে পাচ্ছেন সেই দৃশ্য।

নিচের তলায় ওই নববিবাহিতদের নিয়ে যা সব মন্তব্য হচ্ছে, তা কানে আসায় কানজোড়া লাল হয়ে উঠছে সরমার। মাথা ঝাঁ ঝাঁ করে উঠছে।

কাজের লোকেরা নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করছে। রান্নার লোক বেজার মিশ্রিত ব্যঙ্গের গলায় বলছে, চায়ের পাট তো কোনকালে চুকে গেছে, ভাত খাওয়ার বেলা হয়ে এল। আবার চায়ের পত্তন করতে হবে।

বাসনমাজুনি অন্যের কান বাঁচিয়ে বলছে, বে যেন আর কার হয় না। কী আদিখ্যেতারে বাবা। বৌ নতুন বেলাতেই এত লাজলজ্জাহীন, পরেখ্যে কী হবে?

কান বাঁচাবার চেষ্টা হয়তো করে। কিন্তু কান কি বাঁচে? শুধু মান বাঁচাবার দায়ে কানকে অকেজো করে রাখতে হয়।

এমন কি সংসার করিয়ে উমাপদও ওই সহকর্মীদের কাছে মন্তব্য করে, মাসিমা যাই ভালমানুষ তাই এত আস্কারা পাচ্ছে। হতো আমাদের গ্রামে ঘরে? বৌয়ের বাপের নাম ভুলিয়ে দিতো শাউড়ি।

তা ওরা তো আড়ালে আবডালে, বাড়ির লোকেরা? তারা তো আর আড়ালে বলছে না। সরমাকে আক্রমণ করেই বলছে, পয়লা রাত্তিরেই বেড়াল কাটতে হয় মা। এখন নতুন বৌ বলে সাত খুন মাপ, পরে দেখো!

কর্তাও তো অসন্তোষ প্রকাশ করে বলছেন, দেখা যাচ্ছে তুমি একটু বলতে পারো না?

যদিও অফিসে তিনি এখনো দোর্দাণ্ডপ্রতাপ মজুমদার 'সাহেব', কিন্তু বাড়িতে তেমন রাশভারিত্ব দেখাতে পারেন না। যা কিছু অভিযোগ এই সরমার কাছে এসে।

কিন্তু সরমা তো ওদের মত দৃষ্টি শক্তিহীন নয়। সরমা তো দেখতে পাচ্ছেন আসল আসামী তাঁরই খোকা।

বৌ এই উদ্দাম প্রেম-এর বহরে কুণ্ঠিত হচ্ছে অস্বস্তি পাচ্ছে, কিন্তু বিরাগের ভয়ে মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছে।

সকাল বেলা অতখানি বেলায় ঘুম থেকে উঠে নিচে নেমে আসার সময় বৌয়ের পিঠে হাত জড়িয়ে গালে হাত বোলাতে বোলাতে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসার কি কিছু

~ www.amarboi.com ~

দরকার আছে?...চায়ের টেবিলে বসে অন্যজনের সামনে নানাবিধ খুনসুড়ি করবার? নিজের প্লেট থেকে খাবার তুলে দেবার? এবং বাড়ি মাৎ করে চেঁচাবার, মা, এই দ্যাখো তোমার বৌ আমার প্লেট থেকে সব নিয়ে নিচ্ছে!

মজা করা।

কিন্তু সবাই কি মজাটা অত বোঝে?

আর 'সভ্যতা' 'শালীনতা' 'গুরুজন' এইসব শব্দগুলোকে আমল না দেওয়ার যে মজা সেটাই কি সবাই হজম করতে পারে?

বসবার ঘরে সান্ধ্য আসরে মা বাবা দিদিরা জামাইবাবুরা এবং ছোট বোন সবাই যেখানে সেখানে খোকা যদি হঠাৎ নিজের জায়গা থেকে উঠে গিয়ে বৌয়ের গা ঘেঁষে বসে পড়তে যায়, সেটা কি বৌয়ের দোষ?

কিন্তু সরমার এই ন্যায্য কথাটা কারুরই পছন্দ হচ্ছে না দেখা যাচ্ছে। অন্তত চিত্রমালা তো তাই বলছে।

বলছে, এ হচ্ছে বৌয়েরই অলক্ষ্য ইসারা। কারণ প্রেমে পড়ে বিয়ে করা বৌ! তার খাতিরই আলাদা।

খোকা যে দুম করে একটা প্রেম-ট্রেম করে বসে পরিবারের সকলকেই হতাশ আর বিরক্ত করে তুলেছিল, সেটা তো ঠিকই। সরমাই কি খুব খুশি হয়েছিলেন? তাঁর যে এই খুব দামী ছেলেটির উপর অনেক আশা ছিল। সেই চিরন্তন বাঙালী ঘরের মাতৃহৃদয়ের সুপ্ত কল্পনা।

মেয়ে দেখা শুরু করেননি বটে, তবে আত্মীয়মহলে অনেকেই সরমার ছেলেটির ওপর নজর ফেলে বসে থেকে মেয়ে দেখিয়ে রেখেছিল।

কিন্তু খোকার সুখের উপর তো আর কোনোকিছুই দাঁড়াতে পারে না। মেনে নিয়েছিলেন সরমা, এবং মানিয়ে নেবার জন্যে বাইরে ও ভিতরে চেষ্টা চালিয়ে চলতে হচ্ছিল।

শুধু যদি খোকার মধ্যে অত উদ্দাম বেয়াড়া বেপরোয়া ভঙ্গিটা এত বেশি প্রকট না হতো।

বিয়ে বাবদ যে মাসখানেক ছুটি নিয়েছিল খোকা দেখা যাচ্ছে সেটা ফুরিয়ে যাবার পর উদ্দামতার ভঙ্গি বদল হলো। বৌ নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে যখন তখন হুটহাট। ফিরছে গভীর যত ইচ্ছে রাত করে। এসেই সোজা উঠে যায়।

লজ্জা নেই, কুণ্ঠা নেই, যুক্তি নেই। শুধু খবরটা জানিয়ে দেওয়া।

হয়তো বিনয় মজুমদার কোনো কোনো দিন জেগে থাকেন। আর অসন্তোষের গলায় বলে ওঠেন, হরঘড়ি এত বাইরে খাওয়া! পার্টি ফার্টি থাকলে বলে গেলেই পারিস। তোর মা না খেয়ে বসে থাকে—

সেই অসন্তোষের স্বরটা শুনতে পাচ্ছেন সরমা। ছবিরা মাঝেমাঝেই কথা কয়ে উঠছে।

~ www.amarboi.com ~

এই অসন্তোষের স্বর-এর পরই একটা তাচ্ছিল্যের স্বর! কেউ যদি বোকামি করে কষ্ট পায় সে দায়িত্ব আমার নয়। বহুবার বলা হয়েছে আমাদের জন্যে বসে থাকার দরকার নেই। সিঁড়িতে উঠতে উঠতে আরো কিছু যোগ করে গেল যেন।

এমন কিছু দামী খাবার ছিল নাকি? যা ফেলা গেলে লোকসান! মনে তো হয় না। রান্নার যা মেনু! চাকর বাকরদের দিয়ে দিলে—

শেষটা শোনা গেল না। স্বরে বেশ জড়তা ছিল। তাই থাকে। পার্টি ফেরৎ অবস্থা। অথবা শখ করে কোনো দামী হোটেলে বৌ নিয়ে খেয়ে আসা।

যথেচ্ছ ভ্রমণের অসুবিধে তো নেই কিছু। কোম্পানি একটা গাড়ি দিয়ে রেখেছে সর্বদা ব্যবহারের জন্যে। উর্দিপরা ড্রাইভার।

তাহলে? ডাঁট হবে না? এই বয়েসে এতোটা হয়ে ওঠা? এই 'হয়ে ওঠার' মদমত্ততাতো আছেই তার সঙ্গে মদের মত্ততাও যুক্ত।

প্রথম প্রথম মজুমদারসাহেব ভয়ানক বিচলিত সরমাকে প্রবোধ দিয়েছিলেন, ওতে এত হাপসে পড়ার কিছু নেই। পার্টি-টার্টিতে ওরকম এক আধটু চালাতেই হয়। না হলে অসামাজিক বলে। গাঁইয়া বলে।

কিন্তু ক্রমশ আর বাপের সে উদারতা থাকল না। তখন পাতকী পুত্রের জন্য মায়ের যত উৎকণ্ঠা আব সেটা চাপা দেবার চেষ্টা।

সরমা দেখতে পাচ্ছেন খোকাকে গাড়ি থেকে নামতে সাহায্য করছে ড্রাইভারটা। তারপর বৌ। হ্যাঁ, এখন পালা বদল। এখন আর বৌয়ের পিঠ কোমর জড়িয়ে খোকা সিঁড়ি দিয়ে ওঠে না, ওঠে বৌ, তার বরের পিঠ-কোমরে হাত জড়িয়ে সাবধানে সিঁড়ি উঠতে সাহায্য করছে।

বৌয়ের পিছনটা দেখা যাচ্ছে আঁচল খসে পড়ার অবস্থা। খোঁপায় জড়ানো মোটা গোড়ে মালা পিঠের ওপর দোদুল্যমান।

সরমা দেখছেন সরমার ছোট মেয়ে তার শোবার ঘরের দরজাটা শব্দ করে বন্ধ করে দিচ্ছে আর তিক্ত গলায় বলছে, মা তোমার আদুরে ছেলে বৌ কী শুরু করেছে? বাড়িতে আর থাকা কেন? হোটেলে থাকলেই পারে।

কিন্তু ক'দিন?

ভাব করা বিয়ের সোহাগিনী বৌকে নিয়ে এই বাড়াবাড়ি মাতামাতি ক'দিন চালিয়েছে খোকা?

খুব বেশিদিন কী?

না না। নেহাতই কম।

আসলে ওই বাড়াবাড়ি মাতামাতিটা কি সত্যিই বৌকে ঘিরে? বাড়াবাড়ি মাতামাতি সব কিছুই নিজেকে ঘিরে।

বৌ তার একটা উপকরণ মাত্র।

অথবা খেয়ালের খেলার খেলনা।

~ www.amarboi.com ~

হঠাৎই দেখা গেল খেলনার বদল হয়েছে।

খোকার বেড়ানোর সঙ্গিনী পাল্টেছে।

এ ও সে কানে তুলে দিয়ে যাচ্ছে সরমার, অফিসের একটি সুন্দরী স্টেনোকে নিয়ে খোকা উন্মত্ত।

সুন্দরী।

খোকার বৌয়ের থেকেও?

কী জানি। সরমা তো তাকে দেখেনি। যারা খবরটা কানে তুলে দিয়ে যায়, তাদের মধ্যে সরমার জামাইরা আছে। তবে সরমার কানেই তোলে বিনয়রঞ্জনের কানে নয়।

তা মানুষের মনস্তত্ব জিনিসটা এত জটিল।

যে মানুষটি বৌ মানুষের যখন তখন বেরিয়ে যাওয়া রাতদুপুরে খোঁপায় গোড়ে মালা দুলিয়ে ফেরা বাড়ি থেকে বেরোতে ঢুকতে উগ্র সুরভিসারের গন্ধে বাড়ি 'ম ম' করা নিয়ে ভেতরে ভেতরে গজরাতেন আর অবিরতই গিন্নিকে দোষ দিতেন, 'তুমি কিছু বলতে পারো না?' তিনিই হঠাৎ একদিন বলে বসলেন, বৌমার শরীর-টরির ভালো নেই না কি?

সরমা থমকালেন।

কেন?

না, মানে একবারও আর বেরোতে টেরোতে দেখি না! সব সময় বাড়িতে।

সরমা বললেন, একা বেরোতে?

সে কথা কে বলেছে? মানে—ইয়ে—

মানের কিছু নেই। যে হৈ চৈ করে টেনে বার করে নিয়ে যেত, তার শখ মিটে গেছে!

আবার সরমার ছোট মেয়ে এই একই পরিস্থিতিতে বলেছে, আচ্ছা মা, বৌদি আজকাল রাতদিন অমন বিরহিণী বিরহিণী মুখে ঘুরে বেড়ায় কেন বলতো? ও কি ভেবেছিল চিরকাল দাদা ওকে নতুন বৌয়ের মত মাথায় করে নাচবে? কোনোদিনই বাড়ির বৌ হয়ে সংসার টংসার দেখবে না?

না, সরমার ছোট মেয়ে যে খুব একটা ঈর্ষাপরায়ণ তা নয়, তবে বাড়িতে বৌ আসার আগে বাড়ির ছোট মেয়ে হিসেবে সেই তো ছিল সকলের আদরের আদরিণী। বৌ আসার পর তার সেই সিংহাসনে ভাগ বসলো। সেটা ভাল লাগবার মত ব্যাপার নয়।

এছাড়া আগে ভাবতো বৌদি একটা হলে বাড়িতে বেশ চুটিয়ে গাল গল্প করা যাবে এবং বেশ মৌজে ফাইফরমাস করা যাবে। দাদা সে গুড়ে বালি দিল। কিন্তু দাদা মানেই তো বৌদি! দাদা কি আগে এমন বেহেড ছিল?

সরমা দেখতে পাচ্ছেন, তিনি তাঁর ছোট মেয়ের কথায় রেগে উঠছেন। বলছেন, তোরা সবাই মিলে সব কিছু আমায় জিজ্ঞেস করতে আসিস কেন বলতো?

বাঃ। করবো না? তুমি হলে বাড়ির হেড।

আবার সরমার বড় মেয়েরা পতিগৃহ থেকে পিতৃগৃহে এসে বলছে, যাক তবু ভাল।

~ www.amarboi.com ~

আজকাল তবু বাড়িতে এসে বাড়ির বৌদিকে দেখে চক্ষু সার্থক হচ্ছে। ভাজের হাতের রান্না তো আজ পর্যন্ত একদিন চোখেও দেখলাম না। এখন যদি—

কিন্তু সরমার আরো একটা ছেলে আছে না?

তা আছে। তবে সেই ছোটছেলেটা ছোটবেলা থেকেই সংসার এবং পরিবার সম্পর্কে কেমন যেন নির্লিপ্ত। যেন এ সংসারে কারো সঙ্গে তার বিশেষ যোগসূত্র নেই। বাড়িতে আছে খায় থাকে, কারো সঙ্গে যে কথা বলে না তাও নয়, তবে কোনো কিছুর মধ্যে মাথা গলাতে চায় না।

সরমা হেসে হেসে বলতেন, তুই যেন বহিরাগত। আর কারো বাড়ির ছেলে, এ বাড়িতে বাস করে ধন্য করছিস আমার।

তর্ক করতো না, প্রতিবাদ করতো না শুধু একটু হাসতো!

সরমার ছোট মেয়ে বলতো, ছোড়দা, তোর ভাবভঙ্গি দেখে মনে হয় তুই যেন এবাড়ির 'পেয়িং গেস্ট।' তবে 'পে' করিস না এই যা।

ও অবশ্য তখন হেসে জবাব দিত, আর তোকে দেখলে মনে হয় যেন জবরদস্ত একটি জবরদখলকারিণী। অধিকার আছে কিনা ঠিক নেই দাবির মাত্রা প্রবল।

এইটুকু, এর বেশি নয়।

তো, সেই ছোট ছেলেই একদিন হঠাৎ সরমার কাছে এসে বলল, মা তুমি গল্প করতে তোমার জ্যেষ্ঠপুত্তুরটি একটা বল বেশিদিন খেলতো না। একটা র‍্যাকেট বেশিদিন ব্যবহার করতো না। একই জামাজুতো বেশিদিন পড়তে পারতো না, পুরনো হবার আগে বাতিল করত, তাই না?

হঠাৎ এ কথা কেন রে?

মা অবাক হয়েছিলেন।

ছোট ছেলে বলেছিল, এমনি। কথাটা হঠাৎ মনে পড়ল তাই।

আবার আরও একদিন সরমাকে অবাক করে দিয়েছিল ছেলেটা, সরমা শুনতে পেয়েছিলেন চা খেতে খেতে বলছে সে, উঃ। আজকাল চায়ে ঠিক চায়ের টেস্ট পাওয়া যাচ্ছে। পাঁচনের নয়। বৌদি, আপনি এই ডিপার্টমেন্টটা হাতে নেওয়া পর্যন্ত—

সঙ্গে সঙ্গে ছোট মেয়েকে ফোঁস করে উঠতে শুনেছিলেন, বটে। আমার তৈরি চায়ে পাঁচনের টেস্ট পাস তুই।

তোর তৈরি? তাই বুঝি? তা তো জানি না। তুই বাড়ির কোনো কাজকর্ম করিস না কি?

করি না? বৌদি চিরকাল করেছে, না? উড়েই তো বেড়িয়েছেন এতদিন?

ওরে বাপ! অতশত জানি না। হঠাৎ চায়ে লক্ষ্যণীয় একটু টেস্টের বদল দেখলাম। তাই—

কিন্তু এসব কবেকার কথা?

সুদূর একটা অতীতের না?

~ www.amarboi.com ~

এর পরবর্তী চিত্রমালারা তো আর কোনো কথা বলছে না।

সরমার বিবাহিতা মেয়েরা তো খুব গলা তুলে এবাড়ির বৌকে শুনিয়ে শুনিয়ে গল্প করছে না, শ্বশুরবাড়িতে তাদের কী পরিমাণ ডিউটি দিতে হয়। অথবা বাঁকা চোখে তাকিয়ে বাঁকা গলায় বলছে না, মা তোমার বৌ যে বড় বাড়িতে? পার্টি নেই? প্রমোদভ্রমণ নেই? সিনেমা থিয়েটার, জলসা? কলকাতা শহরের আমোদ আহ্লাদের ভাঁড়ার ফুরিয়ে গেল না কি? বৌ তোমার ভাঁড়ার ঘরে ভাঁড়ার গোছাচ্ছে।

না, এসব আর শোনা যাচ্ছে না। এই ছবিরা যেন মৌনমিছিল করে চলেছে।

কিন্তু কবে থেকে?

কবে থেকে হঠাৎ সব স্তব্ধ হয়ে গেল? সবাই স্তব্ধ হয়ে গেল।

অথচ কী সোচ্চারই ছিল সবাই।

বৌ নিয়ে এত বাড়াবাড়ি। মা কিছু বলে না তাই।...

হঠাৎ বৌকে এমন হ্যানস্থা কেন বাবা? অন্য মেয়ে নিয়ে ঘোরাঘুরি। মা কিছু বলে না বলেই—

মার আদরের খোকা যে।

সব ছেলে মেয়ের থেকে আদরের তাই দোষ ঘাট দেখতে পায় না। স্নেহান্ধ!

কিন্তু মা' কি সত্যিই অন্ধ ছিল? দেখতে পেত না? আগে এবং পরে?

তাই বলে সরমাও কি ওদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে তাঁর খোকার সমালোচনা করবেন? 'খোকা' বলে ডাকেন বলেই কি 'সত্য' সম্পর্কে অবহিত নন?

ওদের সঙ্গে গলা মিলোতে বেধেছে সরমার। পারেননি।

প্রশ্নটা মাতৃস্নেহের নয়, মাতৃমর্যাদার। 'শাসন' যেখানে পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না, সেখানে 'শাসনের হাত' বাড়াতে যাওয়ার মত ধৃষ্টতা আর কী আছে?

কিন্তু কবে থেকে সব প্রশ্ন শেষ হয়ে গেল? সব কিছু স্তব্ধ হয়ে গেল?

সেই উৎসটা খোঁজবার জন্যেই কি সরমা আজ সকাল থেকে এই একটা জায়গায় স্তব্ধ হয়ে বসে অতীতের পাতা উল্টে চলেছেন?

কিন্তু ঠিক হিসেব করতে পারছেন কই? খাতার পাতাগুলো যেন সেলাই খুলে ছিঁড়ে ছড়িয়ে পড়েছে। পৃষ্ঠা নম্বর মারা নেই। কী করে তবে পরপর সাজিয়ে ঠিক করে দেখা যাবে? কী করে বোঝা যাবে, ওই স্তব্ধতার মূল কোথায়?

ঠিক তার আগের সেই ভয়ঙ্কর ঝড়টা?

ঝড়? না কি ভূমিকম্প?

ভয়ঙ্কর ঝড় কি অমন ভয়ঙ্কর নিঃশব্দ হয়?

সরমার বড় মেয়ে একবার কখন যেন নিঃশব্দে তিনতলায় উঠে এসে সিঁড়ির সামনে থেকেই দেখে গেছে সরমাকে। ডাকতে সাহস পায়নি বলতে পারেনি, মা, সকাল থেকে নির্জলা রয়েছো, অন্তত একটু চা খেয়ে গলাটা ভিজিয়ে নাও।

~ www.amarboi.com ~

হ্যাঁ, সেই কথাটাই বলতে এসেছিল সে।

বলতে পারেনি। যেমন নিঃশব্দে এসেছিল তেমনি নিঃশব্দে নেমে গেছে।

মেজ বোন বলল, কী হল? পারলি না?

না বাবা! এমন পাথর প্রতিমার মত বসে আছে! শ্বাসপ্রশ্বাস পড়ছে কিনা তাও বোঝা যাচ্ছে না!

মেজ চমকে বলল, কী বলছিস রে দিদি? কিছু 'খেয়ে' গিয়ে বসেনি তো?

ছোট বোন বিরক্তির গলায় বলল, এমন অদ্ভুত কথা বলিস তুই, মেজদি। এমন কোন বিষ আছে, যা খেয়ে গিয়ে বসে থাকলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকা যায়?

কিন্তু একটু অন্তত চা কি জল—

বৃথা চেষ্টা! মাকে চিনিস না?

বলল। কিন্তু এই মাকে কি তারা সত্যিই চেনে? কখনো দেখছে?

দীর্ঘদিন ধরে অনেক ঝড় চলছে ওঁর ওপর দিয়ে এবং স্তব্ধ করেই দিয়েছে। কিন্তু তবু। আজকের মত এমন—

বাড়িতে এখন 'পুরুষ' বলতে পরিবারের কেউ নেই। আছে 'বেতনভুক' এরা। তাদের কার সাহস হবে এ মুখো হবার, তারা বোবা চোখ আর বোবা কণ্ঠ নিয়ে নিজ নিজ কাজ করে চলেছে মাত্র।

এখন প্রধানত বাড়িতে তিন বয়েসের তিন বোন উপস্থিত। ওদের প্রাণ হাঁফাচ্ছে—বুক কেমন করছে, করবার মত কোনো কাজ পাচ্ছে না।

তাই ঘণ্টা ঘণ্টার চা খেয়ে চলেছে।

মা যদি ওভাবে পাথর হয়ে বসে না থাকতো।

সেজ বলল, আমার বিণ্টুটাকে যদি আনতে পারতাম। সে গিয়ে ঠিক তার দিদাকে হাসিয়ে কথা বলিয়ে ছাড়তো।

বড় বলল, আমার টুনাকেও মা খুব—। ইয়ে বাচ্চাটাচ্চারা সব কিছু ভুলিয়ে দিতে পারে। পারে জমাট পাথরের মধ্যে হঠাৎ হালকা হাওয়া বইয়ে দিতে। কিন্তু উপায় নেই।

কোন ছোট ছেলে মেয়েকে আর আজকাল এ বাড়িতে তেমন আনা হয় না। আর আজকের প্রশ্ন তো ওঠেই না।

ওরা বলে—মা তুমি বেশ মজা করে যাও, আমাদের নিয়ে যাও না।

এখন ওখানে যেতে নেই বাবু।

কেন? কেন যেতে নেই?

মামার বাড়িটা পচে গেছে।

ইস্। যতসব বাজে কথা। বাড়ি আবার পচে যায়?

যায় রে যায়।

তা ওদের কথা সত্যি বৈকি। সরমার সেই সুন্দর বাড়িটা এখন পচেই গেছে। পচে গন্ধ বেরোচ্ছে।

~ www.amarboi.com ~

তাই আর সরমার আত্মীয়স্বজন পাড়াপড়শি এ বাড়ির চৌকাঠ মাড়ায় না।

বাদে সরমার দাদা।

দুঁদে পাকা অইনজ্ঞ পুরুষ।

বলতে গেলে তাঁর হাতেই ঘুড়ির সুতো। লাটাইটা পাক দিয়ে দিয়ে যথেষ্ট সুতো ছেড়ে চলেছেন তিনি এযাবৎ। মানে অনেকদিন যাবৎ।

বাকি জনেরা ঘাড় তুলে ঘাড়ে ব্যথা ধরিয়ে ঊর্ধ্ব আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। দেখছে আশ্চর্য আর রণকৌশল।

আশ্চর্যই। সেই শীতকাল থেকে আজ পর্যন্ত এতগুলো দিনরাত্রি মাস বছর কেটে গেল, ঘুড়িটা তো এখনো সুতোয় ভর করে টিকে আছে, কেটে মাটিতে ছিটকে পড়েনি। তার ওই ঘুড়িটার দিকে তাকিয়ে থাকা মানুষগুলোও কোনোমতে দাঁড়িয়ে আছে এখনো অবধি। লটকে মাটিতে পড়ে যায়নি।

কিন্তু একে কি দাঁড়িয়ে থাকা বলে?

বিশ্বসুদ্ধ লোক জেনে গেছে ওরা ওই পচা বাড়ির লোক। রাস্তায় বেরোলে আঙুল বাড়িয়ে দেখায়, 'ওই যে! ওরা!'

তবু বেরোতেও হয়।

সবকিছুই করে চলতে হয়। আর মাঝে মাঝেই অমোঘ নিয়তির নির্দেশে বাড়ির সকলকেই বেরোতে হয়। মায় বিয়ে হয়ে যাওয়া মেয়েদেরও। ওরাও রেহাই পায় না। পায়নি। বেরোতে হয়েছে ঘোমটায় মুখ ঢেকে। এখনো মাঝে মাঝেই চলে একই নাটকের পুনরাভিনয়। শুধু রঙ্গমঞ্চের বদল ঘটে।

সরমা কি সেই মঞ্চগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখছেন? ঘৃণায় লজ্জায় কুণ্ঠায় কণ্টকিত হয়ে?

না, না।

সরমা তো আরো অতীতে চলে গেছেন। সরমা কোথা থেকে যেন চাপা উত্তেজিত গলায় কথা কাটাকাটি শুনতে পাচ্ছেন।.

কোথা থেকে?

ওই উত্তেজনার চাপা ঝড়টা এই ঘরটাতেই বইত না?

কিন্তু সরমা? সরমা কি তখন এই ঘরে পা দিতেন?

না, সরমা দোতলার কোনখান থেকে যেন শুনতে পাচ্ছেন।

একটা উদ্ধত মত্ত কণ্ঠস্বর! 'বেশ করব! আমার যা খুশি তাই করব।'

তবে আমায় ছেড়ে দাও। রেহাই দাও।

চুপ! একদম চুপ! ওসব নাকী কান্নায় ভেজবার লোক পাওনি আমার। খবরদার। ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করবে না। টুঁ শব্দ করবে না।

রাতের পর রাত!

শুনতে পাচ্ছেন সরমা। বিনিদ্র রাত। বিনয় মজুমদার নামের লোকটা মাঝে মাঝে

~ www.amarboi.com ~

ঘুমের ঘোর থেকে চটকা ভেঙে বলছেন, এখনো ফেরেনি?

অথবা হতাশ গলায় বলছেন, তুমি আর জেগে বসে থেকে কী করবে?

হ্যাঁ! হ্যাঁ। ঠিকই বলেছেন বিনয়।

সরমা কিছু করতে পারেননি। জেগে বসে থেকেও না।

এমন কি সিঁড়ি দিয়ে একবার উঠে এই ঘরটায় ঢুকে পড়ে তাঁর মাতৃমর্যাদার অহঙ্কার ক্ষুণ্ণ করে বলে উঠতে পারেননি, 'খোকা! এসব কী হচ্ছে?'

হঠাৎ সরমার মধ্যে যেন একটা বিকট ভূমিকম্প ঘটে গেল। ভয়ঙ্কর একটা তোলপাড় কাণ্ড হয়ে সবকিছু তালগোল পাকিয়ে গেল।

সেই তালগোলের মধ্যে একটা ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখতে পেলেন সরমা। ঘূর্ণমান পৃথিবীর মধ্যেই দেখতে পেলেন সরমা তাঁর সুন্দর সুকান্তি 'খোকার' দুই চোখে জ্বলন্ত আগুন। খোকার সমস্ত শরীরটা একটা হিংস্র জানোয়ারের মত।

খোকা তার ফর্সা লম্বা লম্বা দুই হাতের দশটা আঙুল দিয়ে সাঁড়াশির মত টিপে ধরেছে তার সুন্দরী বৌয়ের মাখনকোমল গলাটা!

যে-গলায় খোকা অনেক ফুলের মালা দুলিয়েছে একদা। যে গলার সঙ্গে মালা বদল করেছে সেই একদিন শত শত জনের দৃষ্টির সামনে করেছে শুভদৃষ্টি।

কিন্তু এখন? এখানে? তিনতলায় ওঠার সিঁড়ির মুখটায়।'

এখানে কেউ নেই। নেই কারো দৃষ্টি, বাদে সরমার!

সরমার দৃষ্টিতেও তো আগুন। আহত মায়ের বিস্ময় আর আতঙ্কের আকস্মিক জ্বলে ওঠা আগুন!

খোকা! খোকা! কী করছিস তুই? ও খোকা—

খবরদার! সরে যাও। যা করছি ঠিক করছি! ওকে আজ খতম করে ছাড়ব!

সরমা পারলেন না।

পারলেন না সেই সাঁড়াশির আক্রমণ থেকে ছাড়িয়ে নিতে সেই মাখনকোমল গলাটা। নিজে কী একটা ধাক্কায় সিঁড়ির থেকে গড়িয়ে পড়লেন। চোখে একটা ধোঁয়া অন্ধকার দেখলেন। তবু সেই ধোঁয়া ধোঁয়া অন্ধকারের মধ্যেই দেখতে পেলেন ঠিকরে আসা দুটো চোখ। যে চোখের সঙ্গে তুলনা দেওয়া হতো পদ্মপলাশের দীর্ঘ পল্লবাচ্ছন্ন, সেই চোখের কোলেও সুর্মার রেখা টানা থাকতো একসময়।

ঠিকরে বেরিয়ে আসছে সেই চোখ জোড়া

কী ফুটে উঠছে তার মধ্যে?

ভয়? বিস্ময়? ঘৃণা? আতঙ্ক? হতাশা? না কি নিরুপায় হতাশা?

কয়েকটা মুহূর্ত।

সরমার খোকা তার সংকল্প সাধন করে ফেলল।

কিন্তু কংকল্প সিদ্ধ হওয়া মাত্রই সাঁড়াশির বেড়টা আলগা করে কেমন নেতিয়ে গেল! বসে পড়ল গড়িয়ে পড়ে যাওয়া সেই মাখনকোমল দেহটার কাছে। যেটা এখন এইমাত্র

~ www.amarboi.com ~

'লাশ' হয়ে গেল।

সরমা দেখতে পাচ্ছেন দৃশ্যটা।

সরমা উঠে বসেছেন। আর তাঁর খোকা একটু বসেই উঠে পড়ে হুড়মুড়িয়ে ছুটে নেমে গেল। নিচের তলার সিঁড়ির দিকে।

তার মানে ও এখন পালাবে। দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে ছুটবে। ঘরে আগুন লাগলে লোকে যেভাবে পালায়। বন্যার জলকে হুড়মুড়িয়ে বেড়ে আসতে দেখলে যেভাবে পালাবে!

এখন রাত একটা বেজে গেছে না?

বিজয় এত রাত পর্যন্ত বেজার মুখে জেগে বসে থেকে থেকে তার বড়দাদাবাবুর ফেরামাত্রই বাইরের গেটে চাবি দিয়ে সিঁড়ির মুখের কোলাপসিবল গেটে তালা লাগিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে পড়ে খিল লাগিয়ে ফেলেছে।

পালাতে হলে ওকে ডাকাডাকি করে জাগাতে হবে।

নিচে পর্যন্ত নেমে গিয়ে আবার ছুটে ওপরে উঠে এল তাড়া খাওয়া জন্তুর মত প্রাণীটা! উঠে গেল ছাদে।

সুরমা জানেন সেখানেও তালা পড়ে গেছে সন্ধ্যাকালেই। বাড়িটাকে সুরক্ষিত রাখতে চেষ্টার ত্রুটি নেই!

অতএব কলে পড়া ইঁদুরের মত ওপর থেকে নিচে পর্যন্ত ছুটোছুটি করছে খোকা।

সরমা নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে দেখছেন।

বারান্দা থেকে লাফিয়ে পড়তে গিয়ে নিচের দিকে তাকিয়ে থমকে গেল খোকা।

তারপর বিদ্যুতের মত ছুটে গেল বারান্দার বাথরুমের পাশের কোণে জমাদার ওঠবার ঘোরানো সিঁড়িটাতে পাক খেতে খেতে নেমে গেল। আর তারপর প্যাসেজের নালার পাশের ঘেরা পাঁচলিটাতে টপকাতে গিয়ে দেয়ালে ঘসটে পায়ে চোট খেয়ে বসে পড়ল।

দেখা সিনেমাটা আবার দেখার মত ছবিটা দেখতে পাচ্ছেন সরমা! 'সাইলেন্ট ছবি।'

ততক্ষণে বিনয় জেগে উঠেছেন।

উঠেছে সরমার ছোটমেয়েও। বেরিয়ে এসেছে ঘর থেকে। আর ঘুম জড়ানো চোখে হঠাৎ চুপ করে বসে থাকা সরমার খানিকটা দূরে একটা নীল ডুরে শাড়ি জড়ানো গড়িয়ে পড়ে থাকা দেহকে দেখেই আঁতকে উঠে দরজা বন্ধ করে ফের শুয়ে পড়েছে বিছানায়।

কিন্তু বিনয় মজুমদার?

গৃহকর্তা? তিনি অবশ্য তা যায়নি।

তিনি সমস্ত পরিস্থিতিটা অবলোকন করে নিঃশব্দ গলায় সরমাকে প্রশ্ন করলেন, খোকা?

সরমা ভিতর বারান্দার রেলিং দিয়ে আঙুল বাড়িয়ে নিচের প্যাসেজটা দেখিয়ে দিলেন।

~ www.amarboi.com ~

তারপর গৃহকর্তার ভূমিকাতেই নামলেন ভালো করে। নিজের কাছে রাখা যতসব ডুপ্লিকেট চাবির তোড়াটা বার করে সিঁড়ির তলার কোলাপসিবলের তলাটা খুললেন হাত গলিয়ে।

খোকার কাছে পৌঁছে, ছায়ার মত দাঁড়ালেন। তার কাছে। হাত বাড়িয়ে তার হাতটা ধরলেন। যে হাতটা কিছুক্ষণ আগে বীরবিক্রমে সাঁড়াশি হয়ে গিয়েছিল, আর এখন নেতিয়ে পড়ে বাবার পিঠটা ধরে আস্তে আস্তে উঠে এল দোতলায়!

বিনয়ভূষণ নিখুঁত শিল্পীর মত আবার আগের পদ্ধতিতে সিঁড়িতলার কোলাপসিবল গেটটায় তালা লাগালেন। অর্থাৎ ধরে নেওয়া হবে বিজয় যেভাবে রেখে গেছল, ঠিক সেইভাবেই আছে।

সরমা দেখলেন বিনয় ধরে ধরে খোকাকে তিনতলায় তুলে নিয়ে গেলেন। বোধহয় তাকে ঘরে শুইয়ে এলেন।

নেমে এসে চাপা গলায় সরমাকে ডেকে বললেন, নিজের ঘরে চলে যাও। শুয়ে পড়গে। মনে করো তুমি অনেকক্ষণ থেকে ঘুমোচ্ছ।

সরমা খুব বাধ্য হয়ে আর শান্ত মেয়ের মত প্রায় নিদ্রাচ্ছন্নের মতই নিজের ঘরে ঢুকে এলেন। এই ঘরেরই ওদেওয়ালে খুকুর খাট। খাটে উঠে বসে রয়েছে।

বিনয় এসে তার সামনে দাঁড়ালেন। কী যেন বললেন। খুকু উঠে গেল বাপের পিছু পিছু।

আচ্ছা। সরমা, কি সত্যিই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন? তাই হিজিবিজি সব স্বপ্ন দেখছিলেন?

সরমার সেই স্বপ্নের মধ্যে কারা যেন নিঃশব্দে চলাফেরা করছে, সিঁড়িতে উঠছে নামছে।

স্বপ্নের বাতাসের মধ্যে হঠাৎ কেরোসিনের গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল...সরমা তার সঙ্গে চুলপোড়া চুলপোড়া তীব্র একটা গন্ধ পেলেন।

সেই তীব্র গন্ধের ধাক্কায় সরমা আরো দুঃস্বপ্নের গভীরে গড়িয়ে পড়ে যেতে লাগলেন। তলিয়ে গেলেন, ক্লেদাক্ত কটুগন্ধ বহা অন্ধকার একটা গহ্বরে।

সরমা দেখতে পাচ্ছেন—

সরমাকে কিন্তু সেই গহ্বরের মধ্যেও ছুটোছুটি করতে হচ্ছে। কতরকমের লোক কত রকমের গাড়ি, কত অদ্ভুত অদ্ভুত সব কথাবার্তা। কী নির্লজ্জ অপমানের গ্লানি!

আর তারই মধ্যে সরমাকে পাখিপড়ানোর মত মুখস্থ করানো হচ্ছে, সেদিন সরমার মাথাটা খুব ধরেছিল। সরমা রাত নটা বাজবার আগেই ঘুমের ওষুধ খেয়ে শুয়ে পড়েছিলেন। টের পাননি, ছেলে কখন বাড়ি ফিরেছে। এবং ছেলে বৌতে ঝগড়া বচসা হয়েছে কিনা। তবে হ্যাঁ, সরমার বৌটি খুব বেশি অভিমানী ছিল। সেটা সরমার জানা।

সেখানো চলছিল সকলকেই।

~ www.amarboi.com ~

বাড়ির কর্তা কবুল করেছেন, কত যেন রাত্তিরে একবার ছেলেবৌয়ের চাপা গলার ঝগড়া মত শুনেছিলেন। কান করেননি। ওদের দাম্পত্য কলহের ব্যাপার। প্রায়ই তো হয়। আবার সকালবেলা হেসে হেসে কথা বলতে দেখা যায়।

ছোট মেয়ে? খুকু?

তার সাফ জবাব, হঠাৎ ঘুম ভেঙে কেমন পোড়া পোড়া গন্ধ পেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল। বারান্দার ধারের বাথরুমের বন্ধ দরজার মধ্যে থেকে ধোঁয়া বেরোতে দেখে ভয় পেয়ে বাবা আর দাদাকে ডেকেছিল।

তারপর তারা দরজা ধাক্কা মেরে ভেঙে ফেলে—

রাত তখন কটা?

তা জানে না খুকু। হাতে তো আর ঘড়ি বেঁধে ঘুমোতে যায়নি? আর এহেন পরিস্থিতির সময় এমন মনে পড়েনি যে ঘড়িটা দেখে রাখা দরকার।

বিজয় নামের সেই পুরাতন ভৃত্যটি?

সেই বা কী করে জানবে রাত ঠিক কটা বেজে কত মিনিট। বড় দাদাবাবু তো আজকাল কোনোদিনই রাত বারোটার আগে ফেরে না। তিনতলার ঘরে ওদের স্বামীস্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া হয়েছিল কিনা সে কী করে জানবে? তবে বড়দাদাবাবু এ বৌকে মাথার মুকুট করে রাখতো, তা দেখেছে। কত আদর কত সাতজসজ্জা। সেই বৌ অন্তর্ঘাতী হল। কী তাজ্জব!

কিন্তু বিজয়ের ছোট দাদাবাবুটি?

তাকে এই ক্লেদাক্ত পটভূমিতে দেখা যাচ্ছে না। যাবার কথা নয়। সে তার বন্ধুদের সঙ্গে দুর্গাপুরে গিয়েছিল ক'দিনের জন্যে। বন্ধুরা সাক্ষী আছে ওখানকার দু'একজন কেষ্ট-বিষ্টু ব্যক্তি।

সে ফিরেছে।

নির্লিপ্তের ভূমিকাতেই আছে।

অথচ তার জামাইবাবারা? পরের ছেলে হয়েও বিনয় মজুমদারের সাহায্য সহায়তা করে চলেছে এই দীর্ঘদিন ধরে।

কিন্তু ওই মজুমদার নামে লোকটার মধ্যে কি পিতৃমর্যাদা বলে কিছুই নেই? আছে শুধু পিতৃস্নেহ? অগাধ অনন্ত অন্ধ পিতৃস্নেহ।

তাই সেই লক্ষীছাড়া মাতাল খুনি ছেলেটাকে বাঁচাবার জন্যে এ কোর্ট থেকে সে কোর্ট, ও কোর্ট থেকে সে কোর্ট, ছুটোছুটি করে চলেছেন।

কেস সাজালেই কি সাজানো গোছানো থাকে?

'ময়নাতদন্ত' নামের একটা শত্রু আছে না? যে নাকি সাজানো কেস লন্ডভণ্ড করে দিতে পারে।

তবু আশা। তবু আবার নতুন উদ্যমে লড়তে নামা।

সরমার দাদা তাঁর ভগ্নিপতিকে আশ্বাস দিয়েছেন, হাইকোর্টের রায়েই ভেঙে পড়ার

~ www.amarboi.com ~

কিছু নেই। সুপ্রিম কোর্টের রায়ে আকাশপাতাল বদল হয়ে যেতে পারে। পাশার দান একদম উল্টে যেতে পারে। বেকসুর খালাস পাওয়া ছেলেকে নিয়ে ড্যাংডেঙিয়ে বেরিয়ে কালীঘাটে পুজো দিতে যেতে পারে।

আজ সেই শেষ রায়-এর দিন।

সুপ্রিম কোর্টের রায় বেরোবে আজ।

আজ সকালবেলা সরমা এই ঘরটায় উঠে এসেছেন তিন সাড়েতিন বছরের পর।

কেন?

তা তিনি নিজেই জানেন না।

সকাল গড়িয়ে দুপুর। দুপুর গড়িয়ে বিকেল। সরমা দেখে চলেছেন কত চিত্রমালা। কত গুহাচিত্র। উল্টে চলেছেন কত অতীতের খাতার পাতা।

সরমা এইসবের মধ্যে নিজেকে ঘোরাঘুরি করতে দেখতে পেয়েও ঠিক চিনতে পারছেন না। বিকেলের দিকে সাহসী মেজমেয়ে এক গ্লাস ঠাণ্ডা শরবৎ হাতে নিয়ে উঠে এল।

মা, 'না' বললে শুনব না। এটুকু খেয়ে ফেল। আর রায় বেরোনো টেরোনো তো সক্কালবেলাই হয় না। বেলা গড়িয়ে বিকেলের দিকেই হয়। আমি বলছি, ভাল খবর আসবে। গলাটা ভিজিয়ে নাও একটু।

মা মেয়ের মুখের দিকে তাকাননি।

হাত নেড়ে সরে যেতে বলেছেন প্রায় মাছি ওড়ানোর ভঙ্গিতে।

মেয়ে অপমানিতার ভঙ্গিতে চলে এল ঘর থেকে। দরজাটা আবার ভেজিয়ে দিয়ে।

মায়ের প্রতি তাদের কি সহানুভূতি নেই?

খুবই আছে। এই যে এই দীর্ঘকাল ধরে নিজেদের সংসারে কত অসুবিধে ঘটিয়ে ছেলেমেয়েদের বাদ দিয়ে আসছে যাচ্ছে কোর্টে ডাক পড়লে তাও যাচ্ছে ; এবং রায় বেরোবার দিনটায় সকল কর্ম ফেলে মাকে আগলাতে আসছে। এই নিয়ে তিনবার হল। এটুকু মায়ের অন্তত বোঝা উচিত।

কৃতজ্ঞতার কথা বলছে না, তবু স্বীকৃতিটাও তো দিতে হয়? কিন্তু মায়ের মধ্যে সেটুকুও নেই।

তারা যেন ফালতু আসছে যাচ্ছে থাকছে। আর তাদের স্বামীদেবতারা? তারাও তো শ্বশুরের ডানহাত হয়ে আপ্রাণ লড়ে যাচ্ছে। তো মা যেন নির্বিকার।

ভগবান মুখ তুলে চান, আজ এই শেষ রায়টা এত দিনের চেষ্টা যত্ন লড়াইকে সাফল্য দিয়ে অনুকূল হয়ে দেখা দিক, তখন মাকে নেবে একহাত।

বিকেলটা কখন গড়িয়ে সন্ধ্যায় গিয়ে পৌঁছে ক্রমেই গভীর রাতের দিকে ধাবিত হচ্ছে। সরমা টের পচ্ছেন না। ঘর অন্ধকার? সেতো অনেকক্ষণ থেকেই!

ভেজানো দরজাটা ঠেলে আস্তে, কে যেন ঘরের মধ্যে ঢুকে এল। অন্ধকার ছায়ামূর্তির মত।

~ www.amarboi.com ~

একটু দাঁড়াল।

তার পিছু পিছু আরো কারা সব যেন।

এতক্ষণে সিঁড়ির আলোটা কে যেন জ্বাললো। সিঁড়ির সামনের এই ঘরটা তার দৌলতে সামান্য আলোকিত হল।

তবু একজন একটু এগিয়ে এসে ঘরের মধ্যেকার একটা সুইচ অন করল।

হালকা নীল রঙে ভরে গেল ঘরটা।

যেন কে একটা হালকা নীল রেশমি চাদর বিছিয়ে দিল ঘরটায়।

এই 'ঘুমের আলোটা' যে জ্বালোলো সে কি ইচ্ছে করে? না আনাড়ি? জানে না, এ ঘরের সুইচগুলো কোনটা কী।

সুইচটা টিপল সরমার বড়জামাই।

হতে পারে আনাড়িই। অথবা তার একটু নাড়ি-জ্ঞান আছে। হঠাৎ চোখ ধাঁধানো আলো জ্বেলে দিতে চাইল না সরমার সামনে। এসেই তো সবাই সরমার আজকের ইতিহাস শুনছে।

খুকুই বলেছে।

বলেছে, কতকগুলো অর্থহীন কাজ করাই তো মার নেশা। একফোঁটা জলও খাব না! এ আবার কী? এরপর দেখোগে কী ঘটে!

কী ঘটে দেখবার জন্যে সকলেই উঠে এসেছে এ ঘরে।

সরমার স্বামী আর দাদা! দুই জামাই আর তিন মেয়ে।

কিন্তু সরমার ছোটছেলে?

যে এদের সঙ্গে রায় বেরোনো শুনতে যায়নি, বাড়িতেই আছে কিনা কে জানে। বোনেরা যখন দুপুরে কোনোমতে একটু খাওয়া সেরে নিয়েছে, তখন তার খোঁজ করেছিল। বাড়ি ছিল না।

এরা খাবে না কেন? ভেঙে পড়বার কারণ তো ঘটোনি এখনো। আশা নিরাশার দোলাচলে দুলছে।

মামা বলে গেছেন, দেখিস, ভগবান মুখ তুলে চাইবেনই। আমার মন বলছে। পরিস্থিতিও তাই বলছে।

কিন্তু এখন?

বাড়ি ফিরেছেন শ্মশানের স্তব্ধতা নিয়ে। আর সেই স্তব্ধতা নিয়েই উঠে এসেছেন আর এক মহাশ্মশানের স্তব্ধতার কাছে।

হঠাৎ সেই স্তব্ধতা ভেঙে একটা গলা হাহাকার করে উঠল, হল না। সব বৃথা হল! সর্বস্বান্ত হয়েও খোকাকে বাঁচানো গেল না।

আর এই সময়ই কে যেন একটা জোরালো আলো জ্বেলে দিল।

ঘরটা আলোয় ভরে গেল।

অন্তর্হিত হল সেই মায়াময় নীল রেশমী চাদরের মৃদু কোমলতা।

~ www.amarboi.com ~

এই তীব্র প্রখর আলোয় সরমাকে দেখতে পেল এরা।

যেন ভয়ে ভয়ে।

এখনো বসে আছেন পাষাণ প্রতিমার মতই।

বাড়ি ফেরার মুখে পরামর্শ করা হয়েছিল, চটকরে কিছু বলা হবে না সরমাকে। বলা হবে টালবাহানা করে আজও একটু আটকে রেখেছে। আবার 'দিন' পড়বে।

বাড়িতে এসে মেয়েদের সঙ্গে পরামর্শ করেও সেটাই ঠিক হয়েছিল।

ওরা বলেছিল তাই ভাল। মা তো আর খবরের কাগজটাগজ পড়ে না। আজকে যা কাণ্ড করে আছে হঠাৎ শুনলে কী হয় বলা যায় না। হার্টের অবস্থা তো ভাল নয়।

কিন্তু বিনয় মজুমদার নামের শক্ত-পোক্ত বুদ্ধি বিবেচনা সম্পন্ন মানুষটা, যে নাকি এই দীর্ঘদিন মৃত্যুপণ লড়াই করে তার ছেলের মৃত্যুটা ঠেকাবার চেষ্টা করে এসেছে মাথা টাণ্ডা করে, সে আর শেষ রক্ষা করতে পারল না। সব ভেস্তে দিল।

তবে?

তবে আর অন্য সকলের কী করার আছে?

বড় মেয়ে মুখে আঁচল চেপে হু হু করে কেঁদে উঠল। মেজ মেয়ে চীৎকার করে বলে উঠল, মা গো শক্ত হও। ধৈর্য ধরো। আমাদের মুখের দিকে তাকাও।

মনে হল, কথাগুলো যেন তার তৈরিই ছিল। অন্তত উল্টোপাল্টা বুদ্ধি সরমার তাই মনে হল। তবু তিনি সকলের মুখের দিকে তাকালেন আলগা চোখে।

দেখলেন, উত্তেজিত অথচ সান্ত্বনাদাত্রী মেজমেয়ের আরক্ত মুখের দিকে। দেখলেন, আঁচলে আবৃত বড়মেয়ের দিকে, উদাস গম্ভীর অন্যদিকে তাকিয়ে থাকা ছোটমেয়ের দিকে। তাকালেন দুই জামাইয়ের মুখের দিকে। মনে হচ্ছে যাদের মুখে একটা প্রত্যাশার ছাপ।

যেন একটি ক্লান্তকাতর কণ্ঠ থেকে শুনতে পাবে, আমার ভাগ্য আর তার নিয়তি। না হলে—তোমরা তো বাবা অনেক করলে!

কিন্তু তাদের প্রত্যাশা পূরণ হল না।

সরমা তাদের থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে তাঁর ক্লান্ত বিধ্বস্ত শোকাহত আর আশাহত সত্যিই সর্বস্বান্ত স্বামীর যন্ত্রণাদীর্ণ মুখের দিকে তাকালেন।

অথচ আশ্চর্য, সরমার মমতা হল না।

সরমা বেদনাদীর্ণ আর্তনাদে তাঁর পায়ের কাছে আছড়ে পড়লেন না। এ নাটকের এই দৃশ্যে যেটা স্বাভাবিক হতো।

সরমা নিঃশব্দে দরজার দিকে তাকালেন। যেন আরও একটা মুখকে দেখবার আশা করছিলেন। কিন্তু কেন?

সরমার সেই সংসারের সুখদুঃখে উদাসীন হৃদয়হীন নির্লিপ্ত ছোটছেলেটার কাছেই কি 'আশ্রয়ের' প্রত্যাশা করছিলেন?

কিন্তু না সেখানে কেউ নেই!

~ www.amarboi.com ~

ঘরে একটাই সোফা।

তাতে দুই জামাই আর সরমার দাদা বসে পড়েছেন ঘেষাঘেষি করে।

আর বিনয় আর তার তিনমেয়ে ঘরজোড়া জোড়া খাটটার ওপরই।

আধুনিক স্টাইলের নিচু খাট। ডানলোপিলোর গদি গাঁথা। ওপরে মোটা রেশমী বেডকভার পাতা!

মেয়েরা বাবাকে ঘিরে বসে রয়েছে গভীর সান্ত্বনার মূর্তিতে।

এখন আবার স্তব্ধতা। সরমার দাদা এই স্তব্ধতা ভেঙে হঠাৎ গাঢ় গভীর বেদনাময় গলার স্বরে একটু আশার ছোঁয়া মাখিয়ে বললেন, এখনো অবশ্য একটা পথ খোলা আছে!

সরমা চমকে উঠলেন!

যেন অবাক হলেন।

আরো 'পথ' খোলা আছে!

এ যাবৎ তো শুনে আসছিলেন এই সুপ্রীম কোর্টই শেষ পথ। ওর রায়ই শেষ রায়।

সে রায় তো শোনা হয়ে গেল।

সরমা যেন অবোরোধের দৃষ্টিতে তাঁর স্বামীর সেই যন্ত্রণাদীর্ণ মুখের দিকে উত্তরের আশায় তাকালেন।

বিনয় মজুমদার দুহাতে মাথা চেপে ভাঙা গলায় বলে উঠলেন, এখন একমাত্র রাষ্ট্রপতির কাছে প্রাণভিক্ষার আবেদন। ফাঁসির আসামীকে এটুকু সুযোগ দেওয়া হয়ে থাকে কখনো কখনো।

সকাল থেকে স্তব্ধ হয়ে থাকা কণ্ঠ থেকে হঠাৎ একটা স্বর যেন ছিটকে বেরিয়ে এল, তা করলে ছেড়ে দেবে?

ছেড়ে কি আর দেবে?

বড় জামাই বিজ্ঞ হাসি হেসে বলল, হয়তো ওই ফাঁসির বদলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড।

'যাবজ্জীবন কারাদণ্ড!' একমুঠো খুদের মুষ্টিভিক্ষা।

হঠাৎ যেন সরমার মধ্যে সেই তখনকার মতো আর একটা প্রবল ভূমিকম্পের আলোড়ন উঠল।

কী লজ্জা! কী লজ্জা!

ভয়ঙ্কর একটা ঘৃণা অসীম অগাধ ঘৃণা।

হ্যাঁ ঘৃণাই!

মমতা নয় করুণা নয়, তবু তো বাঁচতে পারে ভেবে আশার আভাস নয় শুধু তিক্ত ঘৃণায় সমস্ত চেতনা রি রি করে উঠল।

ছি ছি? কী হ্যাংলামি! কী হ্যাংলামি! মাত্র 'প্রাণটার' জন্য এত লোভ?

ধিক্কৃত নিন্দিত লজ্জা আর অপমান জর্জরিত ক্লেদাক্ত প্রাণটাকে শুধু আরো কতকগুলো অথবা অনেকগুলো দিন শুধু দেহের খাঁচার মধ্য টিকিয়ে রাখার জন্যে এত

~ www.amarboi.com ~

কাঙালপনা।

সেই দিনগুলো তো কাটবে আলোহীন বাতাসহীন নিষ্ঠুর নির্মম আর একটা বড় লোহার খাঁচার মধ্যে। কাটবে নারকীয় পরিবেশের মধ্যে চোর ডাকাত খুনে গুণ্ডা ইতরদের সঙ্গে!

তবু তাও আকাঙ্ক্ষিত?

ওঃ। এর নামই তাহলে 'প্রাণ'।

এত দামী, এত দুর্লভ এ বস্তু।

অথচ এই 'প্রাণ' কেই, ঝকঝকে চকচকে তাজা একটা 'প্রাণ'কে অতি অনায়াসেই যে কোনো মুহূর্তে 'শেষ' করে দেওয়া যায় ; বিনা অস্ত্রে কেবলমাত্র দুহাতের দশটা আঙুলের চাপে!

সরমার চোখটা যেন আপনিই বুজে গেল।

সরমার চোখের সামনে একজোড়া ভয়ার্ত বিস্মিত ঠিকরে বেরিয়ে আসা চোখকে দেখতে পেলেন। সেই চোখ দুটোর মধ্যে দিয়েই কয়েক মুহূর্তের মধ্যে একটা তাজা 'প্রাণ' দেহের খাঁচা থেকে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হলো।

টিকে থাকার জন্যে ঝুলোঝুলি করবার হ্যাংলামি করবার অবকাশ মাত্র পেল না।

তবু সরমা কোর্টে দাঁড়িয়ে 'পাখিপড়া' শেখানো বুলিগুলো আউড়ে এসেছেন।

সরমাও কী হ্যাংলা, কী নির্লজ্জ।

প্রায় ষোলো ঘণ্টা পরে নিথর হয়ে বসে থাকা সরমা হঠাৎ খুব স্বাভাবিক ভাবে উঠে দাঁড়ালেন।

সবাই সচকিত হল।

কী জন্যে হঠাৎ এমন ঝেড়েফুঁড়ে উঠে দাঁড়ালেন উনি?

উনি কি তবে ওই 'প্রাণ ভিক্ষার আবেদন'টা বিশ্বাস করলেন না?

উনি কি উঠে গিয়ে হঠাৎ তিনতলার বারান্দা থেকে ঝাঁপিয়ে পড়বেন?

এতদিনকার আশায় বুক বাঁধা মাতৃহৃদয়।

হতাশ হয়ে কী করতে পারে না পারে।

সবাই সতর্ক চোখে তাকাল।

কোনদিকে যেতে চলেছেন এখন উনি?

কিন্তু না, কোনোদিকেই না। খুব সহজ আর স্বাভাবিক ভাবে বলে উঠলেন সরমা, চলো সবাই নিচের তলায় চলো। তোমাদের তো এখনো চা-টা পর্যন্ত খাওয়া হয়নি। দুপুরে বোধহয় ভাতও জোটেনি। খুকু আয়।

আতিথ্যের দায়িত্বটা তো তাঁর আর খুকুরই।

~ www.amarboi.com ~

সম্মানের ঘর

কিছুক্ষণ ধরে কার সঙ্গে যেন টেলিফোনে কথা বলছে কবিতা। অথচ যেন ঠাণ্ডা আর স্তিমিত গলায়। কান খাড়া করে আর একান্ত মনোনিবেশ করেও কথাগুলো ধরতে পারছে না অনল। দুটো ঘরের মাঝখানে একটা খোলা দরজা, তাতে সামান্য মোটা একটা পর্দা ঝুলছে, তবুও গলার স্বরটা ছাড়া আর কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। তার কারণ ফোনটা বসানো আছে মাঝখানের দেয়ালটার ওপিঠে।

অনলের হঠাৎ মনে হল ফোনটা বসানোর সময় জায়গা নির্বাচনটা খুব ভুল হয়েছিল। দরজার মুখোমুখি দেওয়ালে বসানো উচিত ছিল। তাহলে অতি অনায়াসেই এঘর থেকে প্রতিটি কথা শোনা যেত।

অনলের মনে পড়ল না ফোনটা প্রথম রাখার সময় এঘর থেকে কবিতা কার সঙ্গে কথা কইছে শোনবার কথা মনে পড়ার দরকার ছিল না। ওই ঘরটাই তো অনলের বসার ঘর, লেখার ঘর।

কে ভেবেছিল তখন হঠাৎ তুচ্ছ একটা আকস্মিক অ্যাক্সিডেন্টের ধাক্কায় এভাবে দিনের পর দিন অনলকে শোবার ঘরে আটকা পড়ে থাকতে হবে?

এখন মাঝে মাঝে অনলের মনে হয়, শোবার এই জোড়া খাটখানাও ভুল জায়গায় পাতা হয়েছিল। বাইরের দিকের জানলার ধারে না পেতে বাড়ির ভিতর দালানের দিকের জানলার ধারে পাতাই উচিত ছিল। তাহলে তো সর্বদা দেখতে পেত বাড়িতে কী হচ্ছে না হচ্ছে। কে আসছে না আসছে। আর সর্বদা দেখতে পেত কবিতার ঘোরাফেরা চলা বলা। এমন হা-পিত্যেস করে তাকিয়ে থাকতে হতো না কবিতা কখন কাজের ফাঁকে ফাঁকে একবার করে এসে একটি সাজানো হাসি হেসে বলবে, কী? খুব রেগেমেগে বসে আছো তো?

তবে আসেওতো কাজেই। শুধু শুধু বরকে একটু দেখতে নয়। তার যা নিয়ে যাবার নিয়ে, ওষুধ নিয়ে অথবা চান করবার সরঞ্জাম নিয়ে।

রিসিভারটা নামিয়ে রেখে কবিতা আবার এঘরে আসতেই অনল এ কথা জিজ্ঞেস করল না, ফোন করছিল কে? বলে উঠল, ফোনে এত গলা নামিয়ে কথা হচ্ছিল কার সঙ্গে?

তাকিয়ে দেখেনি কবিতার মুখটা বেজার এবং গম্ভীর।

কবিতা তাকিয়ে দেখল অনলের দিকে। আরো ঠাণ্ডাভাবে বলল, কেন? কি সন্দেহ হচ্ছিল? কোনো পুরনো ভাবের লোকের সঙ্গে কথা বলছি?

বেচারা অনল বিছানায় পড়ে পর্যন্ত এভাবে কথা একবারও বলে নি কবিতা। সর্বদাই

~ www.amarboi.com ~

হেসে আর অনলকে খুশী করবার মত তাজা রাখবার মত কথা বলে। প্রতিটি খুঁটিনাটি ব্যাপারে অনলের কৌতূহল আর খোঁজ নেওয়া দেখে ক্লান্ত হয়ে উঠলেও হেসে বলে, আগে তো মনেও হতো না তোমার একটা সংসার আছে, কি একটা বৌ আছে, এটা তোমার খেয়ালে আছে। এখন যে দেখি ভারী হুঁশ।

অনল হয়তো হতাশ উত্তর দেয়, জীবনের অন্য সব কাজ ফুরিয়ে গেলে লোকের এইরকমই হয়।

তখন রাগ দেখায় কবিতা।

বোকার মত কথা বোলো না তো। সব কাজ ফুরিয়ে যাওয়া মানে? ডাক্তারবাবু বার বার বলছেন না এটা সাময়িক। ঠিক হয়ে যাবে!

তারপর আবদেরে গলায় বলেছে তোমাকে তোমার অফিসের প্রেমের ফাঁদ থেকে তো তবু কিছুদিন আমি পেয়ে যাচ্ছি। সেরে উঠে তো আবার আমার নামটাই ভুলে যাবে।

কিন্তু আজ কবিতা গম্ভীর বিরক্ত।

অনলও বিরক্তি দেখাল, সে কথা বলা হয়েছে?

বলা হয়নি, ভাবা হয়েছে মনে হচ্ছে।

বাজে কথা রাখো। কে ফোন করেছিল?

কবিতা টেবিলের ওষুধপত্রের শিশি গোছাতে গোছাতে বলল, তোমার দরদী কনিষ্ঠ ভ্রাতা অনিলবাবু!

কে? অনল প্রায় ঠিকরে উঠল, অনিল ফোন করছিল? আমায় একবার বললে না?

অনলের স্বরে যেন উত্তেজনা। যেন ওর অমতে একটা দামী জিনিস হাত-ছাড়া হয়ে গেল ওর।

কবিতা ভুরু কুঁচকে বলল, কী বলব?

না মানে জাস্ট একবার মুখটা বাড়িয়ে বলতে পারতে অনিল ফোন করছে। নাঃ, ফোনের দড়িদড়া খানিকটা বাড়িয়ে নেওয়া খুব দরকারি হয়েছে।

সে কথা তো গোড়াতেই বলেছিলুম। তুমি নিজেই তখন—

তখন কী আর শালা জানতাম চিরকালের মতন বিছানায় পড়ে থাকতে হবে।

আবার ওকথা বলছ?

তা পাকেচক্রেও তো তাই দাঁড়াচ্ছে। অপারেশন করলে সুফল পাওয়া যাবে। অথচ এ অপারেশনে কলকাতায় থেকে হবে না, বম্বে যেতে হবে। সেই রাজসূয়র ভারটা জোগানো হবে কোথা থেকে! দায়িত্বই বা নেবে কে?

ডাক্তারবাবু তো বলছেন, ক্যালকাটা নার্সিংহোমে হতে পারে কিনা তার খোঁজ করছেন।

খোঁজ করছেন!

অনল একটু বিদ্রূপের গলায় বলে ওঠে, ঠাকুমা একটা কথা বলত, দুর্ভিক্ষ পীড়িতের

~ www.amarboi.com ~

আত্ম-সান্ত্বনা—"থাক রে মন সয়ে। ভাদ্রমাসে খাবো ভাত পাকা শশা দিয়ে।"

কবিতাও একটু ব্যঙ্গের সুরই ধরল। কারণ কবিতার মনটা এমনিতেই বেজার ছিল। বলল, তোমার বেশ ক্রমোন্নতি হচ্ছে দেখছি। ঠাকুমার টিপ্পুনিও কোট করছ!

অনল হঠাৎ অসহিষ্ণু ভাবে বলে উঠল, ঘণ্টা হয়েছে। কী বলছিল এতক্ষণ সেটাই শুনি? ওরা সব আছে কেমন?

ভালই আছে।

এতক্ষণ কী কথা হল?

আমাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে সওয়াল করা হল।

তার মানে?

মানে—উনি হঠাৎ কী দরকারে তোমার অফিসে ফোন করেছিলেন। অফিসের লোক বলেছে, কী আশ্চর্য, আপনি জানেন না? অনলবাবু তো দু'মাসের ওপর অফিসে আসছেন না। অসুস্থ হয়ে বাড়িতে রয়েছেন।...আবার নাকি তোমার দীপকবাবু জিজ্ঞেস করেছে, অনলবাবু আপনার কী রকম দাদা? আবার তোমার বাড়ির ফোন নাম্বারটা দিতে চাইছিল। এতেই বাবু অপমানে খান খান হয়ে আমায় যা খুশী শোনালেন...আমি কী মনে ঠিক করে রেখেছি, ওর দাদা আমার একার সম্পত্তি? এতবড় একটা অসুখের খবরটা পর্যন্ত দেওয়া দরকার মনে করিনি।...এইসব আর কী!

কিন্তু—ব্যাপারটা কী?

অনলের মুখটায় একটা আলো আলো ভাব ফুটে উঠল কী জন্যে? অনল সেই মুখটাই করুণ করে বলল, তা এ অভিমান করতেই পারে। করতেই পারে!

তা পারে বৈকি। সত্যিই তো ওকে কী একটু খবর দেওয়া উচিত ছিল না?

কবিতা কি ফেটে পড়বে? চেঁচিয়ে উঠবে? বলে উঠবে ওঃ। যত উচিত কর্তব্যটা শুধু আমারই?

নাঃ। কবিতা তা করে না। কবিতার রক্ত বরাবরই ঠাণ্ডা। কবিতার মাথার মধ্যে আচমকা বিদ্যুৎ জ্বলে উঠলেও, কন্ট্রোল সুইচটা ঝপ করে ব্যবহার করতে পারে।

যখন এই বাড়িটায় সবাই ছিল, ছিলেন অনলের মাও। সেই আশ্চর্য মহিলাটি কী অনায়াসেই তাঁর বড় ছেলে আর তার বৌকে (না তখন মেয়েটা জন্মায়নি) নিতান্ত নিষ্পরের কোঠায় রেখে ছোট ছেলে আর তার বৌ-মেয়েকে আপন হৃদয়কক্ষে ঠাঁই দিয়ে তাদেরকে সমস্ত ঝড় ঝাপটা থেকে আড়াল করে রাখতেন, দেখবার মত।

অবশ্য নিষ্পরের কোঠায় রাখলেও, কবিতা সম্পর্কে উদাসীন ছিলেন না। প্রতিপদে তার উচিত অনুচিত বোধের সমালোচনা করতেন, এবং প্রতিক্ষণ অনায়াসেই বলতেন ছোট বৌমার কোলে কচি, ওকে সংসারের কাজের দায়দায়িত্ব চাপালে চলবে কেন? যে ডাণ্ডাখাণ্ডা বাঁজা মানুষ তারই উচিত সবদিকে তাল দেওয়া।

কবিতার একটু বেশী বয়েসে মিতু জন্মেছিল। সেই সুযোগটি নিতে ছাড়েননি সেই মহিলা।

~ www.amarboi.com ~

কবিতা ভেবে পেত না, একই মানুষ একজনের কাছে স্নেহনির্ঝরিণী আর অন্যজনের কাছে রুদ্রাণী!

ভেবে পেত না কেন ওই উদ্ধত মুখরা আয়েসী আর লাজলজ্জাহীন ছোট বৌমাটিকে দেখতে দেখতে তিনি স্নেহে বিগলিত হন, আর তোয়াজে তৎপর হন, আর চিরসহিষ্ণু শান্ত কর্মঠ সেবাপরায়ণা আর প্রায় নির্বাক বড় বৌকে এত বেজার নজরে দেখেন।

কবিতার ভুলক্রমের এক আনার ত্রুটি ষোল আনা হয়ে ওঠে, আর সোমার অহরহর ষোল আনা ত্রুটি 'নীল' হয়ে যায়!

এর নামই কি স্নেহান্ধ?

কিন্তু অনল?

সেও কি তার মায়ের মত ওই একই দিকে স্নেহান্ধ?

না হলে কই অনলের মুখে তো ভাই, ভাই-বৌ সম্পর্কে এতটুকু সমালোচনা শুনতে দেখেনি কবিতা।

অনিল দাদা থেকে অনেক বেশী রোজগার করে বলে? না কী সোমা বিত্তবান বাপের একমাত্র মেয়ে বলে?

কবিতার বাবাও অবশ্য দীনহীন নয়, কিন্তু কবিতার দুর্ভাগ্য যে তার বাপেরবাড়ির সংসারটা কবিতার সৎমার সংসার। সৎমার আরো গুটিকয়েক মেয়ে আছে, কাজেই কবিতাকে যে বাপ ঘন ঘন সমাদরে কাছে নিয়ে যাবেন, অথবা তত্ত্বতাবাসে শাশুড়ীর মনোরঞ্জন করে শ্বশুর বাড়িতে মেয়ের 'মুখ' রাখবেন এমন আশা করা চলে না। বিয়ে হওয়া অবধিই কবিতার এইখানেই স্থিতি। কবিতাকে তাই সবই মেনে নিতে হয়েছে। তবু ভেতরের ক্ষোভ অভিমান এগুলোকে কি একেবারে মুছে ফেলা যায়?

রোজগারের তারতম্যে মায়ের কাছে দুই ছেলের মূল্যের তারতম্য তবু বোঝা যায়, কিন্তু এই জায়গাটায় অনল কবিতার কাছে দুর্বোধ্য!

সেই কি মাতৃমনোভাবে অনুপ্রাণিত?

কর্তব্যবোধের বালাইহীন ছোট ভাই একটু ফোন করে দাদার খোঁজ নিয়েছে বলে কৃতার্থ বোধ করবে সে? এবং নিজের দিকের ত্রুটির পাল্লাটা ভারি করে দেখবে?

মেজাজ সামলে রাখা শক্ত হচ্ছে।

কবিতা বলল, উচিত ছিল! ওঃ। তা সেটা তুমি মনে করনি কেন? হুকুম করলেই উচিত কর্তব্যটা করে ফেলতুম।

আশ্চর্য। বাঁকা কথা কওয়াটা যেন তোমার একটা স্বভাব হয়েছে। অন্যের মুখে খবরটা শুনতে হল ওকে, তাছাড়া তারা যেভাবে কথা বলেছে, যাক, ব্যাপারটা যে বেশ সিরিয়াস তা বলেছ তো?

ব্যাপারটা ঠিক যা তাই বলেছি। বাড়তি কিছু বলতে যাব কেন?

অনলের মুখটা নামের সঙ্গে খাপ খেয়ে ওঠে।

অদ্ভুত! বাড়তি বলার কথা কে বলতে বলেছে? যা ফ্যাক্ট—

~ www.amarboi.com ~

কবিতা ভেবে পেত না, একই মানুষ একজনের কাছে স্নেহনির্ঝরিণী আর অন্যজনের কাছে রুদ্রাণী!

ভেবে পেত না কেন ওই উদ্ধত মুখরা আয়েসী আর লাজলজ্জাহীন ছোট বৌমাটিকে দেখতে দেখতে তিনি স্নেহে বিগলিত হন, আর তোয়াজে তৎপর হন, আর চিরসহিষ্ণু শান্ত কর্মঠ সেবাপরায়ণা আর প্রায় নির্বাক বড় বৌকে এত বেজার নজরে দেখেন।

কবিতার ভুলক্রমের এক আনার ত্রুটি ষোল আনা হয়ে ওঠে, আর সোমার অহরহর ষোল আনা ত্রুটি 'নীল' হয়ে যায়!

এর নামই কি স্নেহান্ধ?

কিন্তু অনল?

সেও কি তার মায়ের মত ওই একই দিকে স্নেহান্ধ?

না হলে কই অনলের মুখে তো ভাই, ভাই-বৌ সম্পর্কে এতটুকু সমালোচনা শুনতে দেখেনি কবিতা।

অনিল দাদা থেকে অনেক বেশী রোজগার করে বলে? না কী সোমা বিত্তবান বাপের একমাত্র মেয়ে বলে?

কবিতার বাবাও অবশ্য দীনহীন নয়, কিন্তু কবিতার দুর্ভাগ্য যে তার বাপেরবাড়ির সংসারটা কবিতার সৎমার সংসার। সৎমার আরো গুটিকয়েক মেয়ে আছে, কাজেই কবিতাকে যে বাপ ঘন ঘন সমাদরে কাছে নিয়ে যাবেন, অথবা তত্ত্বতাবাসে শাশুড়ীর মনোরঞ্জন করে শ্বশুর বাড়িতে মেয়ের 'মুখ' রাখবেন এমন আশা করা চলে না। বিয়ে হওয়া অবধিই কবিতার এইখানেই স্থিতি। কবিতাকে তাই সবই মেনে নিতে হয়েছে। তবু ভেতরের ক্ষোভ অভিমান এগুলোকে কি একেবারে মুছে ফেলা যায়?

রোজগারের তারতম্যে মায়ের কাছে দুই ছেলের মূল্যের তারতম্য তবু বোঝা যায়, কিন্তু এই জায়গাটায় অনল কবিতার কাছে দুর্বোধ্য!

সেই কি মাতৃমনোভাবে অনুপ্রাণিত?

কর্তব্যবোধের বালাইহীন ছোট ভাই একটু ফোন করে দাদার খোঁজ নিয়েছে বলে কৃতার্থ বোধ করবে সে? এবং নিজের দিকের ত্রুটির পাল্লাটা ভারি করে দেখবে?

মেজাজ সামলে রাখা শক্ত হচ্ছে।

কবিতা বলল, উচিত ছিল! ওঃ। তা সেটা তুমি মনে করনি কেন? হুকুম করলেই উচিত কর্তব্যটা করে ফেলতুম।

আশ্চর্য। বাঁকা কথা কওয়াটা যেন তোমার একটা স্বভাব হয়েছে। অন্যের মুখে খবরটা শুনতে হল ওকে, তাছাড়া তারা যেভাবে কথা বলেছে, যাক, ব্যাপারটা যে বেশ সিরিয়াস তা বলেছ তো?

ব্যাপারটা ঠিক যা তাই বলেছি। বাড়তি কিছু বলতে যাব কেন?

অনলের মুখটা নামের সঙ্গে খাপ খেয়ে ওঠে।

অদ্ভুত! বাড়তি বলার কথা কে বলতে বলেছে? যা ফ্যাক্ট—

~ www.amarboi.com ~

তাইতো। ঠিক ফ্যাক্টটাই বলেছি। বলেছি বাস থেকে নামতে গিয়ে হঠাৎ হুমড়ি খেয়ে পড়ে যান, আর ঠিক সেই সময় একটা সাইকেল পায়ের ওপর দিয়ে চাকা চালিয়ে চলে যায়। ফলে পায়ের গোছের কয়েকটা টিসু ছিঁড়ে গিয়ে দাঁড়াবার ক্ষমতা হচ্ছে না। বিছানায় থাকতে হচ্ছে।

বাস? আর কিছু না?

আর কী বলব?

কী কী চিকিৎসা হয়েছে, এবং ডাক্তার প্রথমটা শীগগির ঠিক হয়ে যাবে বলার পর এখন হাসপাতাল থেকে ফেরৎ দিয়ে বলছে অপারেশন দরকার, আর সে অপারেশন বম্বে গিয়ে ছাড়া হবে না—

অত কিছু বলা হয়নি।

হয়নি। ওঃ। কিন্তু কথা তো অনেকক্ষণ চলছিল। আমি কতটা অবুঝ হয়ে পড়েছি, তোমার ওপর কতটা চাপ পড়েছে এইসব চলছিল বোধহয়?

কবিতা একবার অনলের মুখের দিকে তাকাল। হঠাৎ খুব সূক্ষ্ম একটু হাসল। তারপর বলল, নাঃ। তাও বলা হয়ে ওঠেনি। ছোটবাবু নিজেই কথা চালিয়ে যাচ্ছিলেন, ক্রুদ্ধ ক্ষুব্ধ উত্তেজিত। বললেন, এমন ভাবে খবরটা পেয়ে অতিশয় আহত হয়েছেন। কিন্তু এমন সময় পেলেন খবরটা যে, এখনি একবার এসে দেখে যাবেন তার উপায় নেই।

কেন? কেন? উপায় নেই কেন? বাড়িতে কারো অসুখ-বিসুখ নাকি?

কবিতা হেসে ওঠে, না না। খবর সুখের। শালার মেয়ের বিয়েতে কাল সকালেই সিউড়িতে যেতে হচ্ছে, থাকতেও হবে কদিন। কাজেই—

ওঃ। তাহলে আর কী করে আসবে! কালই বুঝি বিয়ে?

তা জানি না। কাল যেতে হবে সেটাই শুনলাম।

সেটাই শুনলে।

অনলের স্বর ক্ষুব্ধ তিক্ত। তারপর আর কিছু জিজ্ঞেস করা হল না। অনিলের শালার মেয়ে মানে ছোট বৌমার ভাইঝি। একটা সাধারণ সৌজন্যেও মানুষ জিজ্ঞেস করে কবে বিয়ে, কোথায় বিয়ে হচ্ছে।

কি জানি বোধহয় করে। আমার ওই সৌজন্য জ্ঞানটা বড় কম।

অনলের ভারী রাগ আসে কবিতার এ ধরনের গা ঝাড়া দেওয়া কথায়। না বলে পারে না, কম কেন হবে? বরং বেশী মাত্রায় বেশী। বাসনমাজুনির ঘরের সুখ দুঃখের খবর নিতেও তোমার খেয়াল হয়। আসলে ওদেরকে তুমি একদম পরের মত ভাবো! ভুলে যাও অনিলের সঙ্গে আমার সম্পর্কটা কী! আসলে—

কী হল। আসলটা বলতে গিয়ে থেমে গেলে যে?

কিছু না।

তবে থাক। আমার শুনেও কাজ নেই বাবা। আসলটা শুনতে গিয়ে নিজের স্বরূপটা বুঝে ফেলব। দুধটা আনছিলাম জুড়িয়ে গেল। যাই নিয়ে আসি।

~ www.amarboi.com ~